রবীন্দ্রনাথ

(কবি ও দার্শনিক)

শ্রীমনোরঞ্জন জানা, এম.এ., ডি-ফিল (কলিঃ)
অধ্যাপক, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্দ্ধমান

অশোক পুস্তকালয়
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৯.

প্রকাশক :
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫২

মুদ্রাকর :
শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য্য
শ্রীশিবদুর্গা প্রেস
১৩/সি, বেচু চাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

নিবেদন

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে আমার রচিত **'রবীন্দ্রনাথ (কবি ও কাব্য)'** গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও নানা কারণে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

অনেক পরে যখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি তখন আমার অভিমতের এতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিযাছে, যে সংস্কারের চেষ্টা পরিহার করিয়া প্রায় সমগ্র রচনাই নূতন করিয়া লিখিয়া শেষ করি। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সেই চেষ্টারই ফল। ইহাকে তাই সম্পূর্ণ নূতন রচনা বলিয়া বিবেচনা করিলে বাধিত হইব। পূর্ব্ববর্ত্তী রচনার প্রকাশ ও প্রচার এই গ্রন্থ প্রকাশের পর স্বাভাবিক ভাবে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার লেখা **"রবীন্দ্র-নাটকের ভাব-ধারা"** এবং **"রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)"** দুইটি সমালোচনা গ্রন্থ পর পর প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনকে এই তিনটি গ্রন্থে তিন দিক হইতে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ধারাবাহিক্রমিক কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যে সামগ্রিক জীবন-দর্শনটিকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আপাতদৃষ্টিতে কতকটা অভিনব বোধ হইলেও বিশ্বের অতীত সকল অধ্যাত্মসাধনা ও দার্শনিক চিন্তার যে স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে ওই সকল অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক চিন্তার বিশিষ্ট ধর্ম্মগুলির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। তাহার পর ইহাকে ধীরে সম্পূর্ণ করিয়া তোলা। তাহা একক চেষ্টার ফল কখনই হইতে পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় চেষ্টার রূপটি যদি উত্তরোত্তর ফুটিয়া উঠিতে থাকে তবে আমার সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ করিব। ইতি—

মনোরঞ্জন জানা

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠাঙ্ক
ভূমিকা	...	...	১
সন্ধ্যা সঙ্গীত	...	...	৬৩
প্রভাত সঙ্গীত	...	...	৭০
ছবি ও গান	...	...	৭৬
কড়ি ও কোমল	...	...	৮৩
মানসী	...	...	৯৪
সোনার তরী	...	...	১১৭
চিত্রা	...	...	১৫০
চৈতালি	...	...	১৮৯
কল্পনা	...	...	২০৮
ক্ষণিকা	...	...	২৩০
নৈবেদ্য	...	...	২৫৪
স্মরণ	...	...	২৭১
উৎসর্গ	...	...	২৮১
খেয়া	...	...	২৯৮
গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি	...	...	৩১৬
বলাকা	...	...	৩৪৩
পূরবী	...	...	৩৭৫
মহুয়া	...	...	৪০০
বনবাণী	..	...	৪২৬
পরিশেষ	...	...	৪৩৫

পৃষ্ঠাঙ্ক

পুনশ্চ	...	...	৪৬১
বিচিত্রিতা	...	...	৪৮৪
শেষ সপ্তক	...	...	৪৯৪
বীথিকা	...	...	৫১৫
পত্রপুট	...	...	৫৩৫
শ্যামলী	...	...	৫৪৭
প্রান্তিক	...	...	৫৬২
সেঁজুতি	...	...	৫৭২
আকাশ প্রদীপ	...	...	৫৮১
নবজাতক	...	...	৫৯২
সানাই		...	৬১২
রোগশয্যায়	...	..	৬২০
আরোগ্য	...	...	৬২৭
জন্মদিনে	...	...	৬৩১
শেষ লেখা	...	...	৬৪৮

লেখকের লেখা অন্য বই

রবীন্দ্র-নাটকের ভাব-ধারা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন :

RABINDRA-NATAKER BHAVA-DHARA

In Bengali

By

Monoranjan Jana

It was during the sun-rise of his life that Rabindranath felt a new sensation and inspiration. He had a vision of Love Undying and Beauty Unfading. In joy radiant he found the shadow of sorrow intolerable. This the great poet expressed in his *Prakritir Pratishodh.*

Rabindranath in his "My Reminiscences" thus writes about the genesis of his *Prakitir Partishodh.*

"This was to put in a slightly different form the story of my own experience of the entrancing ray of light which found its way into the depths of the cave in which I retired away from all touch with the outside world and made me more fully one with Nature again."

A great poet and a seer with intuition was thus born. Sri Jana feels what Rabindranath once felt and it is therefore that his critical appraisement is so vibrant with life and light. He has, wherever possible, offered documents to strengthen his argument. Only a poet with similarity of emotional reaction is entitled to offer an insight into the mind of Rabindranath.

It must be said of the author of the volume under review that he sits on the crest of the waves or lies in the trough along with Rabindranath. It is a mind with intuitive faculty highly developed that can make the public feel what Rabindranath felt. The criticism and appreciation of Sri Monoranjan Jana reminds one of Coleridge and Bradley.

We are glad to note that Sri Jana has been in company with Rabindranath's works for years and years and opened himself out to have a glimpse of the mind of the poet. His criticism makes you receptive. He has striven hard not to show his erudition,—because to him academic erudition without receptivity is meaningless. He has definitely enriched Bengali literature by the publication of the volume under review.

The following books provide the medium of Sri Jana's self-expression : *Prakritir Pratishodh, Malini. Visarjan, Chitrangada, Raja, Achalayatan, Phalguni, Raktakarabi. Griha Prabesh, Tapati and Vanshari.*

It is said that the seer who has his mind illumined by realization of Truth is capable of having the vision which makes a man immortal,—the vision of the Invisible and Life Force expressing itself in numberless ways. Sri Jana emphatically states that Rabindranath has been and will remain for ever and ever the Poet Seer of India.

It is a nice book,—a grand book that should change the angle of your vision.

ভূমিকা

(১)

কেবল রবীন্দ্রনাথেরই নয় সমগ্র মানব-সমাজের অধ্যাত্ম সমস্যাকে যদি একটিমাত্র কথায় ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যায়, তাহা সামঞ্জস্য সাধনের সমস্যা। তাহা এমন এক পরম ঐক্য তত্ত্বের সন্ধান লাভ যাহার মধ্যে সমস্ত বিরোধ নির্ব্বিরোধে স্থান লাভ করিতে পারে।

ব্যক্তির একদিকে দেহ ও প্রাণ, অন্যদিকে তাহার সচেতন মন। দেহ-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা একদিকে, অন্যদিকে মন চাহিতেছে এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা জয় করিয়া উঠিতে। দেহ, প্রাণ ও মনের ধর্ম্ম মনে হয় সম্পূর্ণ পৃথক। একের সহিত অন্যের যেন কোন মিল বা সংযোগ নাই; একটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বা দমিত না করিলে যেন অন্যটির বিকাশ সম্ভব নয়।

মন যতই সমৃদ্ধ হইতে থাকে, এই বহু বিচিত্র জটিল বিরোধ ততই তীব্র ও বিক্ষুব্ধকর হইয়া উঠে। মানুষ তাই এমন একটি চেতন-ভূমি লাভ করিতে চায় যেখানে দেহ-প্রাণ-মন তাহাদের সকল ধর্ম্ম লইয়াই সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে।

এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বাধিক তীব্র ও সর্ব্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করে যখন দেহ-প্রাণ-মনের সহিত অধ্যাত্ম চেতনা আসিয়া যোগ দেয়। উহা এমন এক অলৌকিক অনুভূতি, এমন এক নিগূঢ় সংবেগ, যাহাকে জাগতিক কোন বোধ দ্বারা মানুষ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মানস-ধর্ম্মের তাহা যেন এক সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা। মানুষের সমগ্র সত্তার, তাহার সমগ্র জাগতিক বোধের ইহা যেন এক নির্ম্মম অস্বীকৃতি, নিষ্করুণ প্রতিবাদ।

মানুষ বুদ্ধির সহায়তায় জাগতিক জীবনের সহিত ইহার যখন কোন মিল খুঁজিয়া পায় না, তখন ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে। তখন একদিকে দেহ-প্রাণ-মন, অন্যদিকে অধ্যাত্ম চেতনা মানুষের সমগ্র সত্তাকে স্পষ্ট দ্বিধা করিয়া দেয়। তখন জীবনের এক প্রেরণার সহিত আর এক প্রেরণার কোন মিল থাকে না।

মানুষের অখণ্ড সত্তাকে এইরূপে দ্বিধা করিয়া লইলে সমস্যার একপ্রকার সমাধান লাভ হয়ত করা যায়, কিন্তু ইহাতে জীবনের অখণ্ডতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

ইহা তাই কোন সমাধান নহে। অখণ্ড সত্য দেহ-প্রাণ-মন ও আত্মার পূর্ণ স্বীকৃতি এবং সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যে।—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক, অন্তর্লোক ও বহির্লোক —এই উভয়ের পূর্ণ মিলনে।

বিশ্বের সকল রূপ এবং ব্যক্তির বিচিত্র বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনই শুধু নয়, বিশ্ব ও ব্যক্তিকে আবার এক বৃহত্তর মিলন-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

ব্যক্তি ও বিশ্ব শুধু নয়, ইহার সহিত বিশ্বাতীত সকল লোক আবার এই সমস্ত কিছুর ঊর্দ্ধতর কোন চেতনার দ্বারা বিধৃত। মানুষের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা এই মিলন তত্ত্বে আসিয়া পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে। বিরোধের এই বিভিন্ন দিকগুলিকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সেই সকল আলোচনার কিছু কিছু অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনটাকেই ছাড়তে চাইনে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস যা কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্ত্তি দেখবার জন্যেই দুয়ের মধ্যেই এককেই লাভ করবার জন্য।" (শান্তিনিকেতন)

"প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত।" (শান্তিনিকেতন)

বিচিত্র বোধের সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যে যে মানুষের পরম কল্যাণ, মানুষের সাধনা যে পরিণামে এক অখণ্ড ঐক্য লাভ করিতে চায়, রবীন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

"বস্তুতঃ স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম্ম ও নীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পাবে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্ম্মনীতি তো এই জন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

"এই সংযমের কাজটা কী, প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয়, প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোন একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপে প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়।" (শান্তিনিকেতন)

একদিকে মানুষ বিশিষ্ট অনন্য একক সত্তা, অন্যদিকে সে সমগ্র মানব-সমাজের, বিশ্বের অন্তর্গত; সমগ্রতার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। জীবনের এই দুই কোটির উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারি সামঞ্জস্য সঙ্ঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়।

সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্য সাধনের ইতিহাস।" (শান্তিনিকেতন)

"মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে, তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি ও আত্মার দ্বন্দ্ব, স্বার্থের দিক ও পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।"

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্গত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোট বড়ো, অন্তর-বাহির পূর্ণ সামঞ্জস্য।" (ধর্ম্মপ্রচার : ধর্ম্ম)

"সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্র হইয়া পড়ে।" (ধর্ম্মপ্রচার : ধর্ম্ম)

"কোন একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তাহার এই সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখ-বেদনার একটি আনন্দ পরিণাম আছে এটা সে সহজে দেখতে পায় না।"

"অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত দুঃসহ বাধা বিরোধ ছিন্ন বিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে। অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্য শক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করছে।"

মানুষের মধ্যে একটি ইচ্ছা-শক্তি আছে। বিশ্ব-ইচ্ছার সহিত ইহার প্রতিনিয়ত সঙ্ঘাত বাধিতেছে। এই ইচ্ছা-শক্তি বিসর্জ্জন দিতে পারিলে সঙ্ঘাতের অবসান হয়ত ঘটে, কিন্তু তাহা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়; কারণ মানুষের সমগ্র সত্তা একটি ইচ্ছা-শক্তি আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে। মনুষ্য-সত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছা-শক্তি ক্রমিক প্রবল আকার ধারণ করে। তাই ইচ্ছা-শক্তি বিসর্জ্জন দিয়া নয়, বিশ্ব-ইচ্ছা-শক্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধনের ভিতর দিয়া সমস্যার সমাধান লাভ ঘটিতে পারে।

সামঞ্জস্য সাধনের এই প্রয়াসের ভিতর দিয়া ইচ্ছা-শক্তির সহিত মানুষের সমগ্র সত্তার ধীর বিলুপ্তি ঘটে না। ইহার ভিতর দিয়া তাহার সমগ্র সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইতে থাকে। ব্যক্তি-ইচ্ছাই শেষে বিশ্ব-ইচ্ছায় পরিণাম লাভ করে। তখন ব্যক্তি-সত্তা ও বিশ্ব-সত্তা, কিংবা ব্যক্তি-ইচ্ছা ও বিশ্ব-ইচ্ছার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না

"দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছা-শক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতি যন্ত্রের সাধনা

বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে প্রাণ-শক্তির সুর অনেক দিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সে জন্য বড়ো ভাবিতে হয় না, কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির সুর বাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়।" (ততঃ কিম : ধর্ম্ম)

"এই ইচ্ছা-শক্তিকেই বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এইজন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে এক সুরে বাঁধাই আমাদের সকল ইচ্ছার চরম লক্ষ্য।" (ততঃ কিম : ধর্ম্ম)

অদ্বৈত বা মায়াবাদে মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, দিব্যচেতনা ও প্রকৃতি, দেহ-প্রাণ-মন ও আত্মার বিরোধ মীমাংসায় পরিণামে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। একদিকে এই যেমন প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া সমাধান লাভের চেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি রূপের জগৎকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া ঊর্দ্ধতর যে কোন চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।

এই উভয়ের স্বীকৃতি যেখানে আছে, যেখানে এই দুই এক অখণ্ডতার সৃষ্টি করে, সেখানে সেই পূর্ণ ঐক্য তত্ত্বের মধ্যেই মানুষের সত্যানুসন্ধান চরিতার্থ হইতে পারে। মনুষ্য-চেতনাকে চিৎ ও প্রকৃতি এমন স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করিবার কোন উপায় নাই ; তাহা সত্য নহে বলিয়াই। মনুষ্য-সত্তা একক, অখণ্ড, অবিভাজ্য।

মানস-লোকের নিম্নে যেমন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-লোক, তেমনি তাহার ঊর্দ্ধে উন্নততর নানা চেতনা-লোক আছে। চেতনার এই আদি-অন্ত কোন এক তত্ত্ব সূত্রে গ্রথিত। মানুষ সেই পরম তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিতে চায়।

মানুষের সমস্যা কেবল এককে লাভ করা নয়, কেবল বহুকেও লাভ করা নয়। ঐক্য-বিরহিত বৈচিত্র্যবোধ শূন্যতামাত্র, কিন্তু বৈচিত্র্যবিহীন ঐক্য ততোধিক শূন্যতা। মানুষ তাই কোন একটিতে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না।

মানুষ এমন একটি তত্ত্ব লাভ করিতে চায়, যাহা এক যোগে এক ও বহু। তাহা যেমন বহুকে বিনষ্ট করিয়া রূপহীন একাকারত্বের বোধ নয়, তেমনি উহা কেবল রূপের সমাহার নয়। মানুষ সেই এককে লাভ করিতে চায়, যে এক আবার অন্তহীন রূপে রূপে উদ্‌ভাসিত।

নিখিল বিশ্ব এক অন্তহীন শক্তির পরিস্পন্দ। এই শক্তির স্পন্দন-সমুদ্রে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংখ্যাতীত রূপ বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার একাকার হইয়া যাইতেছে। ব্যক্তি-চেতনা এই স্পন্দন-সমুদ্রের বক্ষে এক একটি ক্ষুদ্র বীচি

বিক্ষেপ মাত্র। অনন্ত কোটি ব্যক্তি-রূপ উহার বক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বের এই স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। আমরা রূপ বলিতে যাহা বুঝি তাহা শক্তির এক একটি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গী। উহার বৈচিত্র্যই রূপে রূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিও এই শক্তি-সঙ্ঘাতের ফল।

এই শক্তি-স্পন্দনের পশ্চাতে এক শাশ্বত স্থির চেতনা-লোক আছে। মানুষ এই স্পন্দন জগতের সীমাকে অতিক্রম করিয়া অনুবিদ্ধ করিয়া সেই অধিষ্ঠান-ভূমি লাভ করিতে পারে।

জীবন-সাধনায় এই দুই সত্তা কোথাও স্পষ্ট দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। একদিকে সে কেবলমাত্র দিব্য-চেতনাকে মানিয়া দেশ-কালে সীমাবদ্ধ শক্তি-স্পন্দকে অস্বীকার করিয়াছে। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি-তত্ত্ব এবং শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের উল্লেখ এক্ষেত্রে করা যাইতে পারে। অন্যদিকে সে শক্তি-স্পন্দকেই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বৌদ্ধ স্পন্দবাদের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। এই স্পন্দনের যে শাশ্বত কোন স্থির অধিষ্ঠান-ভূমি আছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না।

মানুষের সমস্যা হইল এই বিরোধ বৈচিত্র্যের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করা। বাহির হইতে তাহা কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং এইরূপে একটা আপোষ মীমাংসা করিবার চেষ্টা নহে। পূর্ণ ঐক্যের উপলব্ধিতে দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় একটি অখণ্ডতা বোধ জাগ্রত করে। আত্মার ঐশ্বর্য্য তখন ঐ মন প্রাণ দেহ আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। বাহির হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও কুঁড়ির ঐশ্বর্য্য ফলে পূর্ণ পরিণাম লাভ করে না, বরং ক্রমাগত শ্রীহীন ও বিকৃত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রাণ মূলে রসের সংযোগ ঘটিলে উহা ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও সৌরভ লইয়া ফলে পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানুষের জীবনেও একথা সত্য। দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইলে তবেই সকল চেতনার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয়। বাহির হইতে আর যে কোন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-দর্শনের পশ্চাতে যে এই সামঞ্জস্য তত্ত্বের স্থির উপলব্ধি ছিল, রাধাকৃষ্ণন তাহা উল্লেখ করিয়া এক স্থলে মন্তব্য করিয়াছেন:

"রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সামগ্রিক। উহা দেহ ও মন, জড় ও চৈতন্য, ব্যক্তি ও সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতি, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে একান্ত বিচ্ছেদ স্বীকার করে না।"

(২)

মন ও বুদ্ধির সহায়তায় এই ঐক্য তত্ত্বটিকে লাভ করিতে পারা যায় না। আমাদের বুদ্ধি ও বোধ সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, বিভাজনধর্ম্মী। ইন্দ্রিয়ই মন ও বুদ্ধির আশ্রয়স্থল। ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধগুলিকে মার্জ্জিত করিয়া মন একটি সুস্পষ্ট রূপ দান করে। মনের শক্তি-সীমা এই পর্য্যন্ত। মনের ধর্ম্ম রূপের পর রূপ যোজনা করা, রূপ হইতে রূপে বিহার করা। সকল রূপ যে অরূপের লীলা, মন তাই তাহাকে লাভ করিতে পারে না। অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে তাই আমিত্ব বা অহঙ্কারবোধ (অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির দ্বারা সীমিত বোধ) বিসর্জ্জন দিতে হয়।

সকল অধ্যাত্ম-সাধনার গোড়ার কথা হইল এই অহঙ্কারবোধের বিসর্জ্জন। যে-কোন অধ্যাত্ম-সাধনার, ধর্ম্ম ও দর্শনের ইহা যেমন গোড়ার কথা, তেমনি শেষ কথাও বটে। কোন একটি উপায়ে এই সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে অসীমের উপলব্ধি ঘটে। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি সাধনার যে পথই হোক-না-কেন, অহঙ্কার বিসর্জ্জনই আদি ও অন্ত কথা।

এই জীবন ও জগৎকে দুইদিক হইতে দেখা আছে; একটি জাগতিক দৃষ্টিতে দেখা, অপরটি অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে দেখা। একটি সীমার দিক হইতে দেখা, অপরটি অসীমের দিক হইতে দেখা। একটি মন ও বুদ্ধির সহায়তায় দেখা, অপরটি মন ও বুদ্ধির ঊর্দ্ধতর চেতনাশ্রয়ী হইয়া দেখা। সকল সাধনার লক্ষ্য হইল এই জীবন ও জগৎকেই অসীমের দিক হইতে প্রত্যক্ষ করা। অসীমের দিক হইতে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

“হে সত্য আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেই দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও, আমি যে কেবল অসত্যের দিকে তাকিয়ে আছি। * * * তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবল দেখছি মৃত্যু—তার কোন মানেই ভেবে পাচ্ছিনে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক তার ওপাশে যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে।” (রবীন্দ্রনাথ)

কিংবা

“সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয় রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্য বেঁচে যায়।

জোড়া দিয়ে অনন্ত কালেও আমরা একক পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্ত্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়।" (রবীন্দ্রনাথ)

শেষোক্ত উদ্ধৃতিটির মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ মন ও বুদ্ধির সহায়তায় আমরা রূপকে কেবল জোড়া দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যে "জোড়া দিয়ে অনন্ত কালেও আমরা এককে পেতে পারিনে।" দ্বিতীয়তঃ অসীম বা অরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, "স্বাভাবিক সংশয় রহিত বোধশক্তি", অথবা "হৃদয়ের সহজবোধ" দ্বারা। এই জাতীয় শব্দ সমষ্টির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ মানুষের এমন একটি বোধের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা মন ও বুদ্ধি অতিরিক্ত। দর্শন শাস্ত্রে ইহাকে বলা হয় বোধি। এই বোধি একপ্রকার অখণ্ড দৃষ্টি। বোধির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনা বস্তুর সাধর্ম্ম্য ও সারূপ্য লাভ করে, ভাব ও বিষয় একাত্ম হইয়া যায়। ইহা বস্তুর সহিত একাত্ম হইয়া বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা।

মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে, অন্তরে অপার শান্তি বিরাজ করিলে তবেই এই বোধির প্রকাশ ঘটে। মানুষের সকল বৃত্তি একমুখীন হইয়া যখন বিক্ষোভশূন্য, শান্ত, সমাহিত হয়, তখন ধ্যান তন্ময় চিত্ত নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত জ্বলিয়া উঠে। ইহাই অধ্যাত্ম দৃষ্টি, ইহাই বোধি।

রবীন্দ্রনাথ ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষের সাধনা কিসের জন্য, না "আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা বশতঃ আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে সেইটে দূর করে দিতে থাকা।"

রবীন্দ্রনাথ ইহার পরেই বলিয়াছেন, "এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক দিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখ দুঃখের সঙ্কীর্ণ পথেই চালাতে চায়।"

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির বিস্তারিত পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার কয়েকটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

*"তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভবে উঠল। তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না। পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার এই এতবড়ো আকাশ ভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্ছি নে, গ্রহণ করতেই পারছি নে, কিসের জন্য ওই এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে আমি।"

"সে অহংকারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্ছে। পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তর সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্ম্মটিকে যে পর্য্যন্ত সে না পাচ্ছে সেই পর্য্যন্ত তার যত কিছু দুঃখ যত কিছু অপমান।"

"মানুষ অহংকে দিয়ে যতই নাড়া চাড়া করুক, তাই দিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন যত উত্থান পতনই হ'ক না কেন তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়।"

"এই বড়োর দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেই দিকেই তার সত্য এই সহজ কথাটি কখন সে ভুলতে থাকে যখন সে আপন হাতের গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চারিদিক ঘিরে তুলতে থাকে।"

পরিশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

"এই নানা সংস্কারে আঁকা নানা প্রয়োজন আঁটা-আমির পর্দ্দাটিকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখন চারিদিকে দেখতে পাব জগৎ কি আশ্চর্য্য অপরূপ। মানুষ কী বিপুল রহস্যময়। তখন মনে হবে এই সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এ যেন আমি সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয় নি। সেই দিনই এই জ্যোৎস্না রাত্রি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দেবে, এই আকাশে এই বাতাসে একটি চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সেইদিন আমাদের মানব সংসারের মধ্যে জগৎ সৃষ্টির চরম অভিপ্রায়টিকে সুগভীরভাবে দেখতে পাব এবং অতি সহজেই দূর হয়ে যাবে সমস্ত দাহ, সমস্ত বিক্ষোভ, এই অহমিকা বেষ্টিত ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত দুঃসহ বিকৃতি।"

মানুষ যখন তাহার সীমার মধ্যে তাহার প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের অনুকূল করিয়া ভূমাকে লাভ করিতে চায়, তখন তাহার মধ্যে তাহার সীমাবোধ, তাহার বহুবিচিত্র সংস্কারই বাহিরে রূপ লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম একটি শাশ্বত মূল্যবোধ। ইহাকে লাভ করিবার সাধনার ভিতর দিয়া মানুষ ইহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। পূর্ণতার আদর্শকে আপনার অনুকূল করিয়া গড়িতে গেলে এই বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়। ধর্ম্মের জন্য সংখ্যাতীত জীবন যদি যায় যাক, জীবনের জন্য ধর্ম্মের আদর্শ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সত্যোপলব্ধি।

ধর্ম্মের বিচিত্র রূপ, জটিলতা এবং বিরোধিতার একমাত্র কারণ এই যে মানুষ তাহার জীবনকে পূর্ণতার শাশ্বত আদর্শের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া পূর্ণতাকেই আপনার সামর্থ্যের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলিয়াছেন "ইহার একমাত্র কারণ সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্ম্মের অনুগত না করিয়া ধর্ম্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া।"

মানুষের সাধনা অসীমের অনুকূল করিয়া আমিকে গড়িয়া তোলা। আমিত্বকে স্ফীত করিয়া তাহার প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অনুকূল করিয়া অসীমকে লাভ করিতে গেলে সমস্যার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাই নিরন্তর এই প্রার্থনা জানাইয়াছেন,

"ফিরাও ফিরাও তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্ব্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্ব-লোকে, তোমার সৌন্দর্য্য-লোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চির জীবনের দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো।" (উৎসব-ধর্ম্ম)

মনুষ্য-সমাজ সমগ্র সৃষ্টি-রূপের একটি পর্য্যায়। আবার এই নিখিল বিশ্ব এক শাশ্বত চিরস্থির তত্ত্বের বক্ষে অস্থির একটি বিন্দু, একটি চঞ্চল বীচি বিক্ষেপ, একটি চপল ছায়া। ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত যে তত্ত্বে বিধৃত, এই সমস্ত কিছু যাহার ক্ষণিক প্রকাশ, তাহারই মধ্যে এই জীবন ও জগতের অর্থ অন্বেষণ করিতে হইবে। কেবল ওই তত্ত্ব লাভ করিলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান লাভ ঘটে। সেই রহস্যভেদ করিলে সব কিছুর সহিত জীবনেরও রহস্য ভেদ হইয়া যায়। কারণ এই জীবন ও জগৎ তাঁহার অখণ্ড রূপ কল্পনার অন্তর্গত সামান্য একটি অংশ মাত্র।

জাগতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় মন ও বুদ্ধির সহায়তায়। তাই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থের প্রকাশ কোন রূপেই ঘটিতেছে না। জীবন ক্রমাগত জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। অধ্যাত্মজীবন নিয়ন্ত্রিত হয় সম্পূর্ণ পৃথক এক প্রেরণার দ্বারা। উহার স্বরূপ তাই জাগতিক কোন সংস্কার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। উহার মূল্য-বোধ, নীতিবোধ আমাদের জীবন-ধারার এমনই বিপরীত!

তখন তাহার সকল কর্ম্ম, সকল ভাব ও ভাবনা দিব্য-কর্ম্ম, দিব্য-ভাব ও ভাবনায় পরিণত হয়। মানুষ তখন হয় ঈশ্বরীয় কর্ম্মের যন্ত্রস্বরূপ। তখন তাহার সকল প্রেরণা, সকল প্রয়াস তাই অভ্রান্ত, অমোঘ ও অনিবার্য্য হয়।

এই দিব্য-জীবন লাভের একমাত্র অন্তরায় মানুষের অহঙ্কার বা আমিত্ব বোধ। ইহাই সীমার বোধ। অহঙ্কার বিসর্জ্জন না দিলে দিব্য-জীবন লাভ অসম্ভব।

এই জন্যই নিরন্তর প্রার্থনা, এই জন্যই যোগাভ্যাস, এইজন্যই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। কোন একটি পথ আশ্রয় করিয়া মন ও বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরীয় বোধে নিঃশেষ বিলুপ্তি, পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন—ইহাই একমাত্র সাধনা। সমগ্র জীবন যেন হয় এক অখণ্ড প্রণাম আত্ম নিবেদনের ভাবে ভরা।

জীবন আশ্রয় করিয়া তখন ঈশ্বরের ইচ্ছাই শুধু অভিব্যক্ত হয়। জীবন তখন মর্ত্ত্য-লোকে ঈশ্বরীয় চেতনা প্রকাশের পথ স্বরূপ হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয় চেতনাশ্রয়ী, রূপাভিসারী, বহির্মুখী মনকে প্রথমে অন্তর্মুখীন করিয়া বিশ্ব হইতে সমগ্র সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। ইহাই ধ্যান। তখন অন্তরের মধ্যে যে মহানির্জ্জনতা যে একাকীত্ব বোধ জাগে সেই নির্জ্জনতা এবং নিঃসঙ্গ বোধের ভিতর হইতে উন্নতর চেতনার আহ্বান ধ্বনি শোনা যায়। হৃদয় বৃন্তে তখন আর এক আলোক শিখা জ্বলিয়া উঠে, যাহা পার্থিব নহে। সেই আলোকে দিব্য-লোক উদ্ভাসিত হইয়া যায়। এমনি করিয়া ব্যক্তি ও বিশ্বকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া আবার উহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লাভ করিতে হয়। বস্তুতঃ এই বিশ্বই তখন আর এক রূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃত ধর্ম্ম বলিতে তাই প্রার্থনা বা অনুষ্ঠান বুঝায় না। ধর্ম্ম বলিতে বুঝায় সমগ্র বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতা। বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা। দিব্য চেতনার সহিত অস্খলিত যোগযুক্ত হইয়া থাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মূল অধ্যাত্ম উপলব্ধি স্বরূপ কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা পরবর্ত্তী জীবনে নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের কয়েকটি পরিশেষে সঙ্কলন করিয়া একত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই সাক্ষাৎকারগুলি ঘটিয়াছিল কবির কৈশোরে, কয়েকটি পরবর্ত্তী জীবনে।

"একদিন অপরাহ্ণের শেষ ভাগে আমি আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বারান্দায় পদ-চারণা করিতেছিলাম। সূর্য্যাস্ত আভার সহিত প্রায়ান্ধকার গোধূলি মিলিয়া আসন্ন সন্ধ্যার ইঙ্গিত দান করিতেছিল। ইহা আমার নিকট এক বিশিষ্ট বিস্ময়কর আকর্ষণীয় সামগ্রী। মনে হইল যেন সন্নিকটবর্ত্তী গৃহের দেওয়ালগুলি পর্য্যন্ত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম সন্ধ্যালোকের কোন যাদু স্পর্শে কি তুচ্ছতার আবরণ উঠিয়া গিয়াছে ? তাহা নহে।

মুহূর্ত্তে দেখিলাম, যে সন্ধ্যা আমার মধ্যে আসিয়াছে ইহা তাহারই ফল, ইহার ছায়া আমার আমিত্বকে মুছিয়া দিয়াছে। দিনের আলোকে আমার আমিত্ব উদগ্র থাকে বলিয়া আমার সমস্ত উপলব্ধি আমিত্ববোধ মিশ্রিত কিংবা উহার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এখন আমিত্ব পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বকে তাহার যথার্থ স্বরূপে দেখিতেছি। তাহার মধ্যে তুচ্ছতা বলিয়া কিছু নাই, ইহা সৌন্দর্য্য ও আনন্দ পরিপূর্ণ।"

"আমাদের সর্দ্দার স্ট্রীটের ঘর হইতে সর্দ্দার স্ট্রীটের শেষ প্রান্ত এবং ফ্রী স্কুলের মাঠের গাছগুলি দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় ওইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। গাছগুলির পত্রবহুল শীর্ষের মধ্য হইতে সদ্য সূর্য্যোদয় হইতেছে। উহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ মনে হইল

আমাব দৃষ্টি হইতে একটি আববণ যেন খুলিযা গিযাছে। দেখিলাম সমস্ত জগৎ আশ্চর্য্য প্রভায স্নান কবিতেছে, চতুর্দ্দিকে সৌন্দয্য ও আনন্দের ঢেউ উঠিতেছে। এই প্রভাময মুহূর্ত্তে আমাব হৃদযে সঞ্চিত বিষাদ ও হতাশাব আববণ বিদীর্ণ কবিযা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত আলোকেব প্লাবন বহিযা গেল।"
('মানুষেব ধর্ম্ম' হইতে অনূদিত)

"সেই মুহূর্ত্তটি এখনও আমাব মনে পড়ে। একদিন বিকালে স্কুল হইতে ফিবিযা গাড়ি হইতে নামিতেছি হঠাৎ আমাদেব ঘবেব উপবেব বাবান্দাব পশ্চাতেব আকাশ চোখে পড়িল। সেখানে বর্ষণ ভাবাক্রান্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘেব প্রাচুয্য চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধ, শীতল ছাযা বর্ষণ কবিতেছে। ইহাব অপরূপতায় এবং দাক্ষিণ্য আমি এমন এক আনন্দ বোধ কবিলাম যাহাকে মুক্তি বলা যাইতে পাবে, ইহা সেই মুক্তি যাহা আমবা আমাদেব প্রিয বন্ধুব প্রেমেব মধ্যে বোধ কবি।" ('শিল্পীব ধর্ম্ম' হইতে অনূদিত)

"পবিণত বযসে একবাব কোন গ্রামে দাযিত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। সেখানে সমযেব স্রোত অত্যন্ত মন্থব, আনন্দ ও বেদনাব মধ্যে অকৃত্রিম এবং আদিম ছাযা ও আলোক। যে দিনটি বিশেষ অর্থান্বিত হইযা আমাব নিকট আসে তাহা সাধাবণ জীবনেব তুচ্ছতাপূর্ণ। সকালেব সামান্য কাজ শেষ হইযা গিযাছে, স্নানে যাওযাব পূর্ব্বে মুহূর্ত্তেব জন্য জানালাব সম্মুখে দাঁড়াইযাছি, চোখে পড়িল শুষ্ক নদীব তীবে একটি বাজাব। নদীব খাদে প্রথম বর্ষাব জল নামিতেছে। অকস্মাৎ আমি আমার অন্তবস্থিত আত্মাব চাঞ্চল্য সম্পর্কে সচেতন হইলাম। মুহূর্ত্তেব মধ্যে মনে হইল আমাব অভিজ্ঞতাব জগৎ যেন লঘু হইযা গিযাছে এবং যে সমস্ত তথ্য বিচ্ছিন্ন ও অস্পষ্ট ছিল তাহাদেব মধ্যে একটি অর্থময মহান ঐক্য খুঁজিযা পাইলাম। কোন লোক যদি তাহাব গন্তব্যস্থল না জানিয়া কুযাসাব মধ্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অকস্মাৎ অনুভব কবে যে উহা তাহাব চোখের সম্মুখে অবস্থিত তাহা হইলে যে অবস্থা হয, আমাব তখনকাব অবস্থা সেইরূপ হইযাছিল।" ('মানুষেব ধর্ম্ম' হইতে অনূদিত)

"সেই বিলেত যাবাব পথে লোহিত সমুদ্রেব স্থিব জলেব উপবে যে একটি অলৌকিক সূর্য্যাস্ত দেখেছিলুম—। আমাব সেই পেনেটিব বাগানেব গুটি কতক দিন, তেতলাব ছাতেব গুটি কতক বাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণেব বাবান্দাব গুটি কতক বর্ষা, চন্দন নগবেব গঙ্গাব গুটি কতক সন্ধ্যা, দার্জ্জিলিঙে সিঞ্চল শিখবেব একটি সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয, এইবকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দব স্বর্ণ-খণ্ড আমাব যেন ফাইল কবা বযেছে।" (ছিন্নপত্র)

কোন তত্ত্বালোচনার সূত্র ধবিযা নয, সৌন্দর্য্যবোধকে আশ্রয করিযা ক্ষণে ক্ষণে তিনি এমন একটি লোকে উত্তীর্ণ হইযা গিযাছেন, যেখান হইতে বাক্য ও মন প্রতিহত হইযা ফিরিযা আসে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে কত বাববাব চেতনাব সীমাহীন প্রসার বোধ করিযাছেন। তাঁহার সেই স্বীকৃতিটিই এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিযা দিতেছি।

"তবু আমি নিশ্চিৎ যে এমন একটি মুহূর্ত্ত আসিযাছে, যখন আমার আত্মা অসীমকে স্পর্শ করিয়াছে এবং আনন্দবোধেব বিকাশেব ভিতব দিযা ইহাকে অতি তীব্রভাবে বোধ কবিয়াছে। আমাদের উপলব্ধিগুলিব মধ্যে এরূপ উক্তি আছে, যে চবম সত্য হইতে আমাদের মন ও বচন প্রতিহত হইয়া ফিরিযা আসে। যে উহাকে আপন আত্মার প্রত্যক্ষ আনন্দবোধেব ভিতব দিয়া জানিতে পারে, সে সর্ব্ববিধ সংশয ও ভয হইতে বাঁচিযা যায়।" ('শিল্পীব ধর্ম্ম' হইতে অনূদিত)

(৩)

মন ও বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া তাহাকে উত্তীর্ণ হইযাই যে জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ ঘটে, জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান যে কেবলমাত্র ওই লোকেই লাভ করা যায় এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ছিলেন।

জড়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একদিন প্রাণের প্রকাশ ঘটিয়াছে। প্রাণের এই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির এক অভাবিত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর এই পৃথিবী কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। এই কক্ষাবর্ত্তনের কালে এক সময বিশ্ব-প্রাণ-সাগর মথিত করিয়া মানস-লোক ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি সম্ভাবনার আর একটি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আজ তাহার ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যও যেন অকস্মাৎ সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

জড়ের মধ্যে প্রাণের এই প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে, উহার মধ্যে প্রাণ কোন একটা উপায়ে সুপ্ত বা সংহত অবস্থায ছিল বলিয়া। জড় একটি পরিণাম পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে প্রাণের আত্মপ্রকাশ ঘটিযাছে। ইহা সম্পূর্ণ আকস্মিক বহিরাগত কোন অস্তিত্ব হইতে পারে না। মানস-চেতনাসম্পর্কেও এ কথা সত্য। অর্থাৎ প্রাণের মধ্যে মানস-চেতনা সুপ্ত ও সংহত অবস্থায় না থাকিলে উহার প্রকাশ কোন প্রকারেই সম্ভব হইত না। প্রাণ একটি পরিণাম লাভ করিয়া তাই মানস-চেতনারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলে ইহা সত্য যে জড়, প্রাণ ও মনের আধার,এক অচিন্তনীয় মহাশক্তির সুপ্তাবস্থা।

মানুষের উপলব্ধি ও জ্ঞানের সীমা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। এই সীমা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিবে যতদিন পর্য্যন্ত না মন পূর্ণ পরিণাম লাভ করে।

বিশ্ব অভিব্যক্তির এই ধারা যদি সত্য হয়, তবে মানুষ একদিন মন ও বুদ্ধির সীমাকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে। অর্থাৎ মন আপনার পূর্ণ পরিণাম লাভের পর অনিবার্য্য রূপে উন্নততর চেতনার প্রকাশ ঘটাইবে। অভিব্যক্তির এই প্রেতি দিব্য-চেতনার পূর্ণ পরিণাম না লাভ করা পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইতে পারে না।

মানুষ অন্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত অতৃপ্তি বোধ করে বলিয়াই বুঝা যায়, যে মনুষ্য-চেতনা মন ও বুদ্ধি অপেক্ষাও উন্নত। তাহা না হইলে এই অতৃপ্তি বোধ জাগিত না। মানুষ আপনার সেই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে চায়।

বিশ্ব-বিকাশের এই ধারা একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলে লক্ষ করিতে পারা যায় যে মন ও বুদ্ধির উন্নততর পরিণামের দিকে তাহার প্রত্যেকটি ইঙ্গিত, ঐ পরিণাম লাভের জন্য তাহার সকল প্রয়াস।

জড়ের মধ্যে প্রাণ ও মন যেমন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, পূর্ণ চেতনাও তেমনি উহার মধ্যে সুপ্ত হইয়া আছে। মন একটা পরিণাম লাভ করিয়া অনিবার্য্য রূপে উহার প্রকাশ ঘটাইবে। জড় তাই পূর্ণ চেতনারই এক মূর্চ্ছাবস্থা। পূর্ণ চেতনাই আপনার উপর আবরণের পর আবরণ টানিয়া, আপনাকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন ও সীমিত করিয়া জড় রূপে সর্ব্বশেষ পরিণাম লাভ করিয়াছে। জড় পূর্ণ চেতনারই সংবৃততম প্রকাশ।

এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের এই সমস্ত কিছু তাই দিব্য-চেতনারই প্রকাশ। এক দিব্য-চেতনাই পর্ব্বে পর্ব্বে, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে মন-প্রাণ-জড় চেতনা রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহাই আবার আপনার পূর্ণ স্বরূপ ফিরিয়া লাভ করিতে চলিয়াছে। সুপ্ত দিব্য-চেতনা পর্ব্বে পর্ব্বে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে জড় হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মানস-চেতনায়। জীবের পূর্ণ পরিণাম অপেক্ষা করিতেছে মনেরও ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের মধ্যে।

অভিব্যক্তির এই তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁহার এই উপলব্ধির পরিচয় নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে দান করিয়াছেন। সেই সকল আলোচনা হইতে কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণ কণায়, তার পরে জন্তুতে, তারপরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্ব্বমেবাবিশন্তি সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।"

"এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটির পর একটি করে খুলে গিয়েছে।"

"অন্তরের মধ্যে আমাদের এই যে জাগরণ, এই যে নানা দিকের জাগরণ গভীর থেকে গভীরে উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি।"

"এই মনুষ্যত্বের মুক্ত দ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগবণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে—এই জাগবণে এবাব যার সম্পূর্ণ জাগা হল না, ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে না যেতে মানব জন্মেব অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল সে কৃপণঃ সে কৃপা পাত্র।"

"মনুষ্যত্বের এই যে জাগা এও কি একটি মাত্র জাগরণ। গোড়াতেই তো আমাদের দেহ-শক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা।*** তার পরে মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মাব জাগা আছে। বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, যেখানে মানুষ মন ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটাইতেছে, তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে এবং এইরূপে পরিণামে মন ও বুদ্ধির সীমাকেও অতিক্রম করিযা যাইতে চাহিতেছে। এই কয়েকটি উক্তির মধ্যে মনুষ্য-জীবনের সেই পর্য্যায়ের পরিচয় মিলিবে।

"দুর্গমেব দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতাব দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখন মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে, ভূমার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি মানুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে।"

"মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত, সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তার সঙ্গেই কারবার করে। সেই তার আকাশ, তাব বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি, তাব গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।"

"হে গুহাহিত আমাব মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তার চিরন্তন বন্ধু, প্রগাঢ় গভীবতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ। সেই ছায়া গভীব নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের গভীর সখ্যকে আমবা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বাবা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের এই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই কাব্য সঙ্গীত ললিতকলা অনির্ব্বচনীয় রসের আভাসে বহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তেব ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।"

যে অন্তর্লোকে চেতনা এইরূপ গভীর হইতে গভীরতর, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর ব্যাপ্তি লাভ করিয়া চলে, তাহাই অধ্যাত্ম লোক। মানুষ ইহাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছে তাহার জীবন ততই সকল দিকে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। অন্তরের ক্রম প্রসারিত সৌন্দর্য্য-লোককে বাহিরে রূপায়িত করিয়া বহির্বিশ্বকে সে ক্রমাগত সুন্দর করিয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া মানুষ অন্তরের পথ বাহিয়াই একদিন পূর্ণ

পরিণাম লাভ করিতে সমর্থ হইবে। চেতনাকে বাহিরে অনন্ত কাল প্রসারিত করিয়াও মানুষ এই পূর্ণ পরিণাম কখন লাভ করিতে পারিবে না।

পূর্ণ চেতনা-লোক হইতে জাগতিক সর্ব্ব নিম্ন পর্য্যায় জড় জগৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একই চেতনার লীলা। পূর্ণতা সকল পর্য্যায়ে বিরাজ করিতেছে। এই পূর্ণ চেতনা এবং তাহাকে ক্রম পরিণাম স্বরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে যে তত্ত্ব, ইহার নাম ও স্বরূপ যাহাই হোক-না-কেন,—এই উভয়ের অবিচ্ছেদ্য মিলন চেতনার সকল পর্য্যায়ে। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ পরম সখ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিব্য-চেতনায় এই আবরণ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, জড়ে এই আবরণ সর্ব্বাধিক।

অভিব্যক্তি এই আবরণের ধীর উন্মোচন। দ্বৈতবোধ তাই চেতনার সকল স্তরে। এক দিব্য-চেতনা যে কোন দ্বৈতবোধ শূন্য।

পূর্ণ চেতনা ছাড়া এইযে অপর সত্তা, শঙ্করাচার্য্য ইহাকে বলিয়াছেন মায়া। এই মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা তিনি যে ভাবেই করুন না কেন, তাঁহার মতে উহা যে পূর্ণ চেতনা বিবিক্ত অপর কোন সত্তা তাহাতে সংশয় নাই।

তন্ত্র ইহাকে দিব্য-চেতনার শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমান যেমন অভিন্ন, তেমনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন। প্রকৃতি দিব্য-চেতনার চিৎ শক্তি। উহা দিব্য-চেতনাকে আবৃত বা সীমিত করিয়া অন্তহীন রূপ উৎসারিত করিতেছে।

সর্ব্বোচ্চ চেতনা-লোক হইতে সর্ব্বনিম্ন চেতনা-লোক পর্য্যন্ত এক পূর্ণ চেতনার লীলা। বিকাশের তারতম্য অনুসারে বিশ্বের অনন্ত চেতনা বৈচিত্র্য।

বিশ্ব অভিব্যক্তির একটি ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস ঊর্দ্ধ পরিণামের একটি ধারাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে। চেতনার সর্ব্বনিম্ন প্রকাশ জড়ের মধ্যে, প্রাণে তাহার ঊর্দ্ধতর প্রকাশ। প্রাণেরও ঊর্দ্ধতর প্রকাশ মানস-লোকে। মানুষের মধ্যে যাঁহারা মনস্বী ব্যক্তি, ঋষি ও দার্শনিক, তাঁহাদের মধ্যে এই চেতনা সমধিক বিকশিত। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুই একজন আছেন, যাঁহাদের জীবনে চেতনার পূর্ণ লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়।

চেতনার এই যে একের পর এক উন্নততর পর্য্যায়, উহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম বিভিন্ন। ঊর্দ্ধতর চেতনা নিম্নতর চেতনার প্রসার নয়। উভয়ের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক। জড়ের ধর্ম্মকে যতই প্রসারিত করা যাক না কেন তাহার মধ্যে

প্রাণের ধর্ম্ম কোথাও পরিলক্ষিত হইবে না। প্রাণ-ধর্ম্মকে যদৃচ্ছা প্রসারিত করিলেও মনোধর্ম্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। মনকে যদৃচ্ছা প্রসারিত করিয়াও তাই দিব্য-চেতনা লাভ করিতে পারা যায় না।

মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাস অভিব্যক্তির এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। অভিব্যক্তির এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলিয়াই ইতিহাসের মূল্য, নহিলে ইতিহাস অর্থহীন। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক বোধ বলিতে অভিব্যক্তির এই বোধটিকে বুঝায়। জীব ও জগৎ এমনি করিয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার যুগ হইতে দিব্য প্রভাতের দিকে তাহার এই ধীর ক্লান্তিহীন পরিক্রমণ। তাহার এই যাত্রা ফুরাইয়া যায় নাই।

নিহিত এই অভিপ্রায়, এই ক্রম পরিণামের দিক হইতে যদি বিশ্ব-রচনা পাঠ না করা যায় তাহা হইলে বিশ্ব ব্যাপার অকারণ, উদ্দেশ্যহীন, শৃঙ্খলা শূন্য আবর্ত্তন মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্ব ব্যাপারের পশ্চাতে একটি স্থির উদ্দেশ্য সক্রিয়, উহা ক্রমাগত চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে।

অভিব্যক্তি প্রেরণা আজ মনুষ্য-সমাজকে বর্ত্তমান পরিণাম পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। মানুষের মধ্যেই চেতনা বিকাশের কত না পর্য্যায়। মন ও বুদ্ধির ঊর্দ্ধতর পরিণাম এখনও অবশিষ্ট আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রেরণা ক্রমিক ঊর্দ্ধতর পরিণাম লাভ করিয়া মানস-লোক পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, সেই প্রেরণাই একদিন মানুষকে ইহার ঊর্দ্ধতর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

মানুষের মধ্যে চেতনার এই যে বিভিন্ন লোক মানুষ ইহার যে কোন একটিতে বাস করিতে পারে। এই প্রত্যেকটি পর্য্যায়ের চিন্তা ও অনুভূতি ভিন্ন, কর্ম্ম প্রেরণাও পৃথক পৃথক। একটি জগতের সহিত আর একটি জগতের কোন মিল নাই।

মানস-লোক পর্য্যন্ত জীব-বিকাশ মুখ্যতঃ প্রকৃতি প্রভাবাধীন। মানস-লোক প্রকৃতি প্রভাবের শেষ সীমা। মনুষ্য-চেতনার একদিকে আছে দিব্য-চেতনা অন্যদিকে প্রকৃতি। মানুষ এই উভয়ের সংযোগ স্থলে অবস্থিত।

"যে চেতনার ক্রমাভিব্যক্তি তত্ত্বটি জানে, তাহার চেতনা আরও বিকাশ লাভ করে। গুল্ম, তরু ও জীবের মধ্যে একই চেতনার ক্রমিক উন্নততর প্রকাশ। তরু ও গুল্মের মধ্যে কেবল প্রাণের প্রকাশ, কিন্তু হৃদয় ও চৈতন্যের প্রকাশ কেবল জীবের মধ্যে। চেতনা সম্পন্ন জীবের মধ্যে আবার

আত্মা ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষের মধ্যে চিত্ত ও চৈতন্যের প্রকাশ দেখা গেলেও অন্য কোন প্রকার চেতনা উহাদের মধ্যে নাই। মানুষের মধ্যে আত্মা ক্রমিক বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। সে জ্ঞানের সর্বাধিক অধিকারী। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা সে জানে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমস্ত জগৎ তাহার পরিচিত।" (ঐতরেয় আরণ্যক)

এই অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজ একদিন দিব্য-চেতনা লাভে সমর্থ হইবে। যুগে যুগে ধর্ম্ম ও দর্শন মানুষকে এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে। এই জগৎ দিব্য-জগতে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে, এই জীবন দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত হইবে। যুগে যুগে ঋষি ও দার্শনিক মানুষকে এই আশ্বাস দিয়াছে। ইহা তাই মানুষের অলস কল্পনা নয়, বাস্তববোধ হীন আশাবাদ মাত্র নয়, মানুষের শুদ্ধ জ্ঞানের উপর এই উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা। এই দিব্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যুগে যুগে আত্মত্যাগ করিয়াছে, মানুষের বিচিত্র সাধনা এই লক্ষ্যাভিমুখীন হইয়া ফুটিয়াছে।

তাহার সাহিত্য ও ক'লা, তাহার ধর্ম্ম ও দর্শন, তাহার বিজ্ঞান ইহাকেই ক্রমাগত সত্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বিপরীতমুখী যে কোন প্রেরণা, যাহা মানুষের স্বার্থের দিক, লোভের দিক, পাপের দিক তাহাকে মানুষ একদিন সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিবে।

বিশ্ব অভিব্যক্তির মর্ম্মমূলে সম্পূর্ণতার একটি স্থির ধ্যান রহিয়াছে। মানুষের এই লক্ষ্যাভিমুখীন প্রয়াসই ধর্ম্ম, ইহার বিপরীতমুখী যে-কোন প্রেরণা অধর্ম্ম।

মানুষকে এই ধর্ম্মাশ্রয়ী হইতে হইবে। বিকাশের স্বাভাবিক প্রেরণাগুলির মধ্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চারিত করিয়া মনুষ্য-সমাজের ধীর পরিণামকে দ্রুততর করিয়া তুলিতে হইবে। যে চেতনা এই সম্পূর্ণতা সাধন করিতে চায় এই জীবনকে তাহার অভিপ্রায়ের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে এই দিব্য-সমাজের স্বপ্ন অচিরেই সফল হইবে।

এই দিব্য-সমাজের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ যে নানাভাবেই দেখিবেন তাহা একান্ত স্বাভাবিক। তাঁহার এই স্বপ্নের পরিচয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার নানা রচনার মধ্যে।

এক্ষেত্রে 'শিল্পীর ধর্ম্ম' নিবন্ধের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"আমি বিশ্বাস করি যে সূর্য্যালোকে, ধরিত্রীর শ্যামলিমায়, নর-নারীর মুখের সৌন্দর্য্যে মনুষ্য জীবনের ঐশ্বর্য্যে আপাত তুচ্ছ এবং অবহেলিত সামগ্রীর মধ্যেও স্বর্গ-লোকের ছবি দেখা দিবে। এই বিশ্বের সর্ব্বত্র স্বর্গ-লোকের চেতনা জাগ্রত এবং সে তাহারই আহ্বান প্রেরণ করিতেছে। সেই আহ্বান আমরা না জানিলেও আমাদের অন্তঃকর্ণে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। ইহা আমাদের জীবন-বীণার তার বাঁধিয়া তুলিতেছে। উহা আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সীমার অতীতে প্রেরণ করিতেছে। কেবল প্রার্থনা এবং আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া নয়. প্রস্তরের মধ্যে অগ্নি-শিখা-রূপ আলেখ্যের মধ্যে চঞ্চলতার স্থির কেন্দ্রসমূহের উন্মনী-ধ্যান-রূপ নৃত্যের মধ্যে ইহার প্রকাশ।"

সঙ্গীতের যেমন একটি পূর্ণ আদর্শ বা রূপায়ণ সঙ্গীতকারের অন্তরে থাকে এবং সুরের জাল বিস্তার করিয়া তাহাকে তিনি ধীরে ধীরে রূপায়িত করিতে থাকেন, তেমনি এই সৃষ্ট জগতের একটি সম্পূর্ণ ধ্যান স্রষ্টার অন্তরে রহিয়াছে, সৃষ্টির এই অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া তাহাকেই তিনি ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

সমগ্র সৃষ্টি লীলার পশ্চাতে স্রষ্টার অন্তরের একটি অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আছে। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে বিকাশ ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে বিকাশ ঘটিবে, সেই অতীত, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সকল বিকাশ তাঁহার অন্তরে যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, ইহা জড় অভিব্যক্তিবাদীরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা এক অন্তহীন পরিণামশূন্য বিকাশে বিশ্বাস করেন। সে অভিব্যক্তি কখন সম্পূর্ণতা লাভ করে না, তাহার সমাপ্তি নাই। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে অথচ ক্রমাভিব্যক্তি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব এক সুরকে আর এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে।

"যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্ব জগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে জগতের ঈশ্বরও ক্রমশঃ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।"

(৪)

চেতনার এই অভিব্যক্তির দিক হইতে জীবের যে নিয়তি রূপটি ফুটিয়া উঠে, নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে তাহারই একটি পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আলোককে পাবার আনন্দের জন্য তপস্যা ছিল। সেই তপস্যা অন্ধ জীবের অন্ধকার দেহের মধ্যে চক্ষুকে বিকশিত করে স্বর্গের আলোকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। সেই একই সাধনা অন্ধ চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে—আত্মা কাঁদছে সেখানে। যতদিন পর্য্যন্ত অন্ধ জীব চক্ষু পায় নি সে জানত না তার ভিতরে আলোক বিরহী কাঁদছিল সে না জানলেও সেই কান্না ছিল বলেই চোখ খুলেছে। অন্তরের মধ্যে চৈতন্য গুহায় অন্ধকারে পরম জ্যোতির জন্য মানুষের তপস্যা চলেছে। মগ্ন চৈতন্যের অন্ধকারময় বিরহী আত্মা কাঁদছে—সেই কান্না সমস্ত কোলাহলের আবরণ ভেদ করে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত উঠেছে। আনন্দ যেদিন আসবে সেদিন চোখ মেলে দেখব, সেই জ্যোতির্ম্ময়কে।" (রবীন্দ্রনাথ)

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ একদিন দিব্য-চেতনা লাভে সমর্থ হইবে, কারণ ইহাই তাহার নিয়তি। মনুষ্য-সমাজ হইবে দিব্য-চেতনার আধার স্বরূপ, তাহার রূপক। দিব্য চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া এই জীবন ও জগতের আমূল রূপান্তর সাধন সম্ভব। মানুষকে সচেতন হইয়া তাহার এই নিয়তি সার্থক করিতে হইবে।

"তাদের থেকে এই কথাটাই বুঝি যে সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীব মানব কেবলই তার অহং আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্ব মানবে। বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্ব পৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে।" ('মানুষের ধর্ম্ম' রবীন্দ্রনাথ)

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ এক অখণ্ড চেতনার দ্বারা বিধৃত। ব্যক্তি চেতনা তাহারই অন্তর্গত একটি অংশমাত্র, সেইজন্য সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সহিত ব্যক্তির নিয়তি, তাহার সকল দর্শন বিজড়িত। একক মুক্তি তাই সত্য নহে। যে অধ্যাত্ম পরিণাম লাভকে পূর্ণ মুক্তি বলা হয়, সেই পরিণাম লাভ করিবার পরও মানুষ যে করুণার বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্ব মানবের মুক্তির জন্য নিয়ত কর্ম্ম করেন তাহার পশ্চাতে এক অলৌকিক অপূর্ণতাবোধের বেদনা থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে পূর্ণ মুক্তি সামগ্রিক, একক নহে। অর্থাৎ বিশ্ব মানবের সহিত মানুষের একযোগে মুক্তি ঘটিবে। তাহার পূর্ব্বে একক ভাবে মানুষের পূর্ণ মুক্তি ঘটিতে পারে না।

"সমস্ত মানব সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোন একটি মাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না।" (রবীন্দ্রনাথ)

এই জীবন ও জগতের দিব্য রূপান্তর সাধন যে সম্ভব এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ছিলেন।

অদ্বৈতবাদীদের উপলব্ধি ভিন্নতর। তাঁহাদের মতে এই জীবন ও জগতের নিত্য রূপান্তর ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু এই নিয়ত অন্য রূপ প্রাপ্তির ভিতর দিয়া কোন উন্নততর পরিণাম লাভ ঘটিতেছে না। এই জগতে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের পরিমাণ সকল সময় এক। জ্ঞান-বিজ্ঞান যে পরিমাণে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিযাছে, ঠিক সেই পরিমাণে মানুষের দুঃখ ভারও বাড়াইয়াছে। ত্রিগুণাত্মিকা এই বিশ্বে গুণের পরিমাণ সকল সময় এক। সৃষ্টির ইহাই শাশ্বত স্বরূপ বলিয়া মানুষ কেবল একক ভাবে এই ত্রিগুণাত্মক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহাই জীবের নিযতি।

তাঁহাদের মতে একদিকে যেমন খণ্ডভাব প্রকৃতির চিরন্তন ধর্ম্ম, অন্যদিকে তেমনি মনোময় জীবের অহংবোধও শাশ্বত। সীমাবদ্ধ চেতনায তাই দিব্যবোধের প্রকাশ অসম্ভব। জীবনের সীমায দিব্য-চেতনা লাভ করিবার যে-কোন সাধনা ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত হইতে বাধ্য।

জীবন ও জগৎকে কেবল সীমার দিক হইতে দেখিলে এই বোধ অনিবার্য্যরূপে আসে। বিভাজক মনই সৃষ্টির আদি বীজ। বিভাজক মন আছে বলিয়া সৃষ্টির এই অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্য। মনের ধর্ম্ম ছাড়াইযা উঠিলে সৃষ্টির রূপ-বৈচিত্র্য মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

যদি জানি দিব্য-চেতনাই আপনাকে সংহত করিয়া জডরূপে প্রকাশ করিযাছেন, জড় দিব্য-চেতনারই এক লীলারূপ, দিব্য-চেতনাই মানস-চেতনারূপে খণ্ডতার বোধ জাগাইয়া তুলিযাছেন বহুর মাঝে একের লীলাকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য তাহা হইলে রূপের মধ্যে অরূপের লীলা, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ মিথ্যা হইয়া যায় না। এক দিব্য-চেতনাই যে পর্ব্বে পর্ব্বে নানা চেতনা পরিণাম লাভ করিয়াছে মন-প্রাণ-জডরূপে।

অজ্ঞেযবাদীরা আবার জগৎ ও জীবনের আর এক স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন সৃষ্টির নিয়ামক এক দিব্য-চেতনা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ তাহাকে কখন লাভ করিতে পারিবে না; কারণ সীমাবোধ মানুষের শাশ্বত নিয়তি। এই

আদর্শ মানুষের জ্ঞানের উপর সীমা টানিয়া দিয়াছে। কিন্তু চূড়ান্ত সত্য লাভের জন্য মানুষের যে নিয়ত অনুসন্ধিৎসা ও অভীপ্সা, জ্ঞানের জন্য তাহার যে নিত্য জিজ্ঞাসা, যে নিত্য জাগরণ, তাহাকে এইরূপে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। মানুষের এই ঊর্দ্ধাভিমুখী প্রেরণার মুখ ফিরাইবার কোন উপায় নাই।

অপরপক্ষে মানবতাবাদীরা বৃত্তিনিচযের সামঞ্জস্যের কথা বলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই অনুশীলন ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখিলেন যে মানুষের সকল ধর্ম্ম বা বৃত্তি মনুষ্য চেতনার ঊর্দ্ধতর কোন চেতনায় বিধৃত। এই ঊর্দ্ধতর চেতনা লইয়া মানুষের সমগ্র সত্তা। এই দিকটি বাদ দিলে মানুষের সমগ্র সত্তা একান্ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে। মানুষের বর্ত্তমান সত্তা তাহার সমগ্র সত্তার ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। মনুষ্য সত্তার অচিন্তনীয বৃহত্তর অংশ তাহার সচেতন মনের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহাকে লাভ করিতে না পারিলে বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন একপ্রকার অসম্ভব। মানুষের লক্ষ্য মনুষ্য-সমাজের ইতস্ততঃ সংস্কার সাধন করা নয়, উহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা, একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের উপর উহার প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের মধ্যে অভিব্যক্ত যে অনন্ত চেতনা তাহা লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিকে সর্ব্ববিধ সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। কারণ সীমার বোধে অসীমের উপলব্ধি অসম্ভব। অসীমকে লাভ করিবার অর্থ হইল ব্যক্তির ওই অসীম স্বরূপতা লাভ। শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিকেই ব্রহ্ম স্বরূপতা অর্জ্জন করিতে হয়। একমাত্র তত্ত্বময় হইয়া তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে এমন বৃত্তি আছে যাহার সহায়তায় মানুষ মানবীয় চেতনার সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে।

"সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাব ভিতব দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিবাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পয্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে,*** যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আপনাকে সর্ব্বাংশে তাহাব অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহাব উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।"

(রবীন্দ্রনাথ)

জীবন ও জগতের অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুব প্রতিনিয়ত একটি ঐক্যের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। এই জীবনের পরম সাধনা সেই ঐক্য লাভ করা। এই

জীবন ও জগৎ তাহারই সাধনক্ষেত্র। মানুষ যতদিন না ওই পরিণাম লাভ করিতেছে ততদিন সীমার বিচিত্র জটিল বোধের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

দিব্য-চেতনা লাভ করিয়া উহারই সহায়তায় মানুষ এই জীবন ও জগৎকেই রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিবে। ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় মনুষ্য জীবনে সর্ব্বশেষ সার্থকতা লাভ করিতে চায়, যে অভিপ্রায় যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া ধীরে সার্থক হইয়া উঠিতেছে জীবনকে তাহারই অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। জীবন ও জগতের পূর্ণ রূপায়ণ সাধন করিতে ঈশ্বর ও মানুষ মিলিত হইযা একত্রে কাজ করিবে। উভয়ের পূর্ণ মিলনে উভয়ের সর্ব্বশেষ সার্থকতা।

দিব্য-চেতনার সহিত নিত্য যোগ যুক্ত হইযা মানুষ তাঁহারই অভিপ্রায়কে জীবনে ও জগতে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিবে। মানুষের আর পৃথক কোন সার্থকতা থাকিবে না। মানুষের সাধনা কেবল উন্নততর চেতনা লাভ করা নয়, উহাকে আবার জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া। মানুষের এই সাধনা আরওআয়াস সাধ্য।

ব্রহ্ম শুধু অরূপ নন, দেশ-কালের মধ্যে তিনি আবার বহুরূপে প্রকাশমান। তিনি শুধু অসীম নন, তিনি আবার সীমা। দেশ-কাল পূর্ণ করিযা দেশ-কালের উর্দ্ধে আপন মহিমায় তিনি আপনি সমাসীন। দেশ-কাল সেই কাল শূন্য জ্যোতি-সমুদ্রের বক্ষে একটি চঞ্চল ছায়াবিন্দু। মানুষ ব্রহ্মের অদ্বৈত রূপ প্রত্যক্ষ করিবে না, তাঁহার সীমা-রূপ তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যকেও প্রত্যক্ষ করিবে।

দিব্য-চেতনার চকিত আভাস লাভ বা মুহূর্ত্তের সমাধি অবস্থা মানুষের লক্ষ্য নয়। এই চকিত আভাস লাভের ভিতর দিয়া মানুষ উন্নততর কোন পরিণামই লাভ করে না। ইহাতে অধ্যাত্ম জগতের একটি দ্বার কেবল উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। ধীর অনুশীলন, পরিপূর্ণ ভক্তি, নিঃশেষ আত্ম সমর্পণের ভিতর দিয়া পরিণামে ওই চেতনা লাভ না করিলে মনুষ্য-সত্তা দ্বিধা গ্রস্ত হইয়া যায়। তখন দুটি সত্তার মধ্যে ব্যবধান এত দুস্তর হইয়া উঠে, যাহার ফলে নিম্নতর চেতনাকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া পরিহার করিবার একটা প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মধ্যে দেখা দেয়। কোথাও বা এই উভয় সত্তার মধ্যে সর্ব্বনাশা সঙ্ঘাত দেখা দেয়। তখন জীবনের একটি সত্তার সহিত অপর সত্তার, এক আচরণের সহিত অন্য আচরণের এক প্রেরণার সহিত অপর প্রেরণার কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণ বা ঈশ্বরীয় ভক্তির ভিতর দিয়া মানুষ যখন নিম্নতর সকল চেতনাকে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধমুখীন করিয়া পরিণামে দিব্য-চেতনা লাভ করে তখন সমগ্র সত্তার মধ্যে একটি অখণ্ডতা বোধ জাগে। মানুষ তখন উহাকে স্থায়ী রূপে লাভ করিয়া উহারই আলোকে নিম্নতর সকল চেতনা-লোক উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলে।

কোন একটা উপায়ে দিব্য-চেতনার চকিত আভাস লাভ করিতে পারিলেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায় না। মানুষকে উহার সহিত অস্খলিত যোগ যুক্ত হইয়া থাকিতে হয়। এই যোগযুক্ত অবস্থায় সংসারের সকল কর্ম্ম সম্পাদনই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। এই জাতীয় কর্ম্মের ভিতর দিয়া জগৎ ও জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন সম্ভব।

জীবনের সার্থকতা কেবলমাত্র ওইখানে,—পরিপূর্ণ আত্ম নিবেদনের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় চরিতার্থ করিয়া তুলিবার জন্য কর্ম্ম করা। জীবনে আর কোন সার্থকতা নাই।

মানুষ একদিকে সীমা বদ্ধ, মৃত্যুভয় জর্জ্জরিত, শোক তাপ দগ্ধ ; আর একদিকে সে অসীম, মৃত্যুঞ্জয়ী, পরম আনন্দ স্বরূপ। সে ব্রহ্মের অংশ মাত্র নয়, তাহারই পূর্ণ প্রকাশ।

মানুষকে আপনার এই পূর্ণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সীমার লোক হইতে অসীমে, মৃত্যু-লোক হইতে অমৃতে উত্তীর্ণ হওয়াই জীবের লক্ষ্য। তাহারপর সেই উপলব্ধিকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সার্থক করিয়া তোলা।

দিব্য-চেতনাশ্রয়ী হইয়া মানুষের যে কর্ম্ম-প্রেরণা তাহা ব্যক্তিগত কোন ইচ্ছা অথবা স্বার্থ প্রণোদিত নয়, সামাজিক অথবা অন্য কোন নৈতিক বোধ প্রসূতও নয়। মানুষের জীবনে তখন দিব্য-ইচ্ছার স্বতঃ স্ফূর্ত্ত প্রকাশ ঘটে।

মনুষ্য-চেতনা বিকাশের প্রথম পর্য্যায়ে মানুষের কর্ম্ম প্রেরণা কেবল স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা প্রসূত। ইহার উন্নততর পর্য্যায়ে মানুষের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম প্রেরণা নৈতিক বোধ নিয়ন্ত্রিত। মানুষের জীবনে তখন স্বার্থ ও পরার্থ, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগে ; তখন হইতে কখন একটি কখন অপরটি জয়যুক্ত হইতে থাকে। পূর্ণ চেতনাধিষ্ঠিত অবস্থায় স্বার্থ বা নীতি বোধের (তাহা শ্রেষ্ঠ নীতিবোধও হইতে পারে) কোন প্রেরণা থাকে না। উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অধ্যাত্ম প্রেরণা প্রসূত। ইহার

মধ্যে কোন সংশয় নাই, দ্বন্দ্ব নাই। তাহার প্রত্যেকটি কর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও সুষমা ফুটিয়া উঠে। তাহাতে মানুষের সকল প্রকার নৈতিক বোধ, ব্যক্তি ও বিশ্ব পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে।

অধ্যাত্ম প্রেরণা নৈতিক প্রেরণা অপেক্ষা উন্নত হইলেও বিরোধী নয়। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম প্রেরণা নিম্নতর চেতনা-লোকে তীব্র নৈতিক বোধ রূপে ক্রিয়া করে। অতি কঠোর নৈতিক বোধের ভিতর দিয়া মানুষ তাই পরিণামে অধ্যাত্ম চেতনা লাভে সমর্থ হয়।

জীবনে কর্ম্ম প্রেরণার দুটি দিক আছে; একটি মন ও বুদ্ধি আশ্রয়ী (তাহা সর্ব্বাধিক পরিশুদ্ধ মন ও বুদ্ধি হইতে পারে), আর একটি মন ও বুদ্ধির অতীত ঈশ্বরীয় চেতনাশ্রয়ী। ব্যক্তি একটি ক্রিয়ার প্রেরণা, অন্যটির প্রেরণা নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তি-বোধ সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষকে এই নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরীয় চেতনাশ্রয়ী হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় বর্ত্তমানে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে চায় মানুষকে তাহার যন্ত্র স্বরূপ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এই জীবনের তাহাই একমাত্র সার্থকতা। তাহার একমাত্র ধর্ম্ম ও নিয়তি।

(৫)

অধ্যাত্ম সাধনার পরম সিদ্ধি সম্পর্কে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে, যে উহা লাভ করিলে মানুষ আপনার চেতনাকে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে এবং বিশ্বের সমস্ত কিছুকে আপনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট দেখে। ব্যক্তি ও বিশ্ব-চেতনা তখন একাকার হইয়া যায়। ব্যক্তি তখন আপনাকে বিশ্ব-রূপে প্রত্যক্ষ করে। ব্যক্তির দেহ-প্রাণ-মন তখন বিশ্বের জড়-প্রাণ-মনে পরিণত হয়। ব্যক্তির চেতনা তখন বিশ্ব-চেতনায় আপনাকে অপ্রতিহত সীমাহীন বলিয়া বোধ করে।

আমাদের মধ্যে একটি ঐক্যবোধ আছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা বহির্জগতে এই ঐক্যের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। যত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক-না-কেন মানুষ মাত্রেরই জীবনে এই সন্ধান ক্রিয়া চলিতেছে।

মানুষের অধ্যাত্ম বোধ যত উন্নত হয়, ঐক্যবোধ যত গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করে, বহির্জগতে সে তত বেশি ঐক্যের সন্ধান পায়। অন্তর ও বহির্জগতে এই যে মিলন ইহাই একটি মানুষের অধ্যাত্ম বোধের সীমা। এই সীমা ক্রমাগত গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করিতে থাকে। পরিণামে ইহা নিঃসীমতা প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব ও বিশ্বাতীত সকল লোক ইহার অন্তর্গত। এই অখণ্ড পূর্ণ ঐক্য তত্ত্বের বাহিরে আর কিছু নাই।

মানুষ তাই প্রকৃতিগত ভাবে ধার্ম্মিক, কারণ কোন না কোন স্বরূপে সে জীবনে এই ঐক্যের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। এই অনুসন্ধিৎসাই ধর্ম্ম, তাহা যে-কোন জীবন-পদ্ধতি এবং জীবনের যে কোন পর্য্যায় আশ্রয় করুক না কেন। ইহার কোন বিধি বন্ধন নাই।

"আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্ব্বমেবাবিশন্তি।
ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মনা হয়ে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন।"

(রবীন্দ্রনাথ)

বিশ্বের সহিত বিশ্বাত্মার যে সম্পর্ক, জীবের সহিত জীবাত্মার সেই সম্পর্ক। আত্মা স্বরূপতঃ উভয়ের এক। বস্তুতঃ এক অখণ্ড অনন্ত স্বরূপই বিশ্বাত্মা এবং জীবাত্মা রূপে প্রকাশমান।

অন্তরের ঐক্য বোধটিকে মানুষ বাহিরে বিশ্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে চায়। এইরূপে বিশ্বের যোগে ব্যক্তি ধীর বিকাশ লাভ করিতে থাকে, তাহার ঐক্যবোধের সীমা বাড়িয়া যায়। এই অনুসন্ধান সেইখানে সম্পূর্ণতা লাভ করে, যেখানে ব্যক্তি ও বিশ্ব-চেতনা একাত্ম হইয়া যায়।

অনন্তের সহিত অনন্ত স্বরূপে বিশ্বের সহিত একাত্ম হইয়া যে অখণ্ড রূপে দেখা ইহাই অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য। মানুষ তখন আর আপনাকে বিশ্ব হইতে পৃথক কতকগুলি বাসনা-কামনা চিন্তা ও ভাবনার সমষ্টি বলিয়া বোধ করে না।

মানুষ তখন এমন এক পরম সত্যের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যাহা শাশ্বত, সর্ব্বব্যাপ্ত, অখণ্ড অনন্ত স্বরূপ। মানুষের তখন আর হারাইয়া যাইবার ভয় থাকে না। মৃত্যুভয় তো অনস্তিত্বের ভয়। পরম অস্তিত্বকে লাভ করিয়া মানুষ তখন মৃত্যুভয় জয় করিয়া উঠে। যে সত্য, যে প্রেম ও করুণা, যে সুষমা ও শান্তি

ব্রহ্ম হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, মানুষ আপনাকে তৎস্বরূপেই প্রত্যক্ষ করে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। উক্তিগুলির মধ্যে মুক্তির স্বরূপ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

"আত্মাকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করা হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।"

"আমরা যে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই নিজের ঐক্যকে সেই পর্য্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না।"

"আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং সেই এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্ব্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।"

"যখন সমস্তকে সংহত সংযত করে, এক করে আত্মাকে পাই, তখন আমি সত্য যে কী তাহা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে উঠে এবং জীবনের ছোটোবড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মের মধ্যেই একটি আনন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুব-লোকে আপনার সত্য প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভর হই। তখন আমার এই ভয় ঘুচে যায় যে, আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর আবর্ত্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চির সত্যে বিধৃত হয়ে আছে।"

"তাহা নিত্য তাহা ভূমা তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তর ও বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।"

"তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র তিনি অন্তরতম তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।"

"আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধনা।"

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ এই পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে। তাহার জ্ঞানে, তাহার প্রেমে, তাহার কর্ম্মে, সর্ব্বক্ষেত্রে ঐক্যের আভাস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সমগ্র মনুষ্য-সমাজ বিকাশের ইতিহাসকে এই একটি মাত্র সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মানুষের ধর্ম্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব যে পরিমাণে এই ঐক্য বোধ করিতে এবং প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই

পরিমাণে সে সভ্য ও উন্নত। এই একটি মাত্র আদর্শের সহায়তায় সভ্যতার মান নির্ণয় করিতে পারা যায়।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যে একদিন এই পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সংশয় নাই। তাহার ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্ত কিছু এক অখণ্ড ঐক্য বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনুষ্য-সমাজ হইবে পূর্ণ ঐক্য তত্ত্বের ভাব-প্রতীক স্বরূপ।

ঐক্যবোধের ধীর বিকাশের সূত্র ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মনুষ্য-সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া পরিণামে যে পরম ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান লাভ করেন, তাহার পরিচয় লাভ করিতে আমি রবীন্দ্রনাথের দুই একটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই বোধের শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যেব আত্মাকে ও অন্যেব আত্মাব মধ্যে আপনাব আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।" (মানুষের ধর্ম্ম)

"এক আত্মালোকে সকল আত্মাব অভিমুখে আত্মার সত্য, এই সত্যের আলোকে বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের অনুষ্ঠান, তাব রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্ব্বর।' (মানুষের ধর্ম্ম)

"নিজের মধ্যে সর্ব্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্য ধর্ম্মেব উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া।"

বাহিরে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু রূপের পর রূপ স্তূপীকৃত করিয়া তুলি, তাহাদের মধ্যে অভিপ্রায়মুখী কোন শৃঙ্খলা নাই, সামঞ্জস্য নাই। অন্তর্জগতেও এই একই ভাব। এখানে বিপরীতমুখী সহস্র চিন্তা ও ভাবনা, উপলব্ধি ও প্রেরণার মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে। মানুষ চায় একটি অখণ্ড বোধকে অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে, যে অখণ্ডতায় ব্যক্তি ও বিশ্ব সমাশ্রিত। তাঁহারই আনন্দ বস্তুর ভাঙ্গাগড়া, উঠা নামার ভিতর দিয়া পূর্ণ সুষমায় নিত্য উচ্ছ্বসিত।

মানুষ বহুমুখী সাধনার ভিতর দিয়া এই ঐক্যকে গভীর হইতে গভীরতর ভাবে উপলব্ধি করিতেছে। সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যে পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে, এককভাবে কোন মানুষ যখন তাহা লাভ করে তখন ব্যক্তি ও বিশ্ব-চেতনা একাত্ম হইয়া যায়। বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-লীলায় তখন ব্যক্তি-প্রাণ পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। বিশ্ব-রূপের সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া যেন তাঁহারই আনন্দ-রূপ উদ্বেলিত হইতে

থাকে। নিম্নে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি দুইটির মধ্যে এই উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"আনন্দ আপনাকে নানা রূপে নানা কালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানা রূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোন আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। (শান্তিনিকেতন)

"বিশ্ব জগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে লীলা করছে—তারই নৃত্যের ছন্দে তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্য্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর বাহিরকে সুধাময় করে তোলে।"

দিব্য-চেতনা বিশ্ব-চেতনা রূপে অভিব্যক্ত হইলেও বিশ্ব-চেতনাকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত পরিব্যাপ্ত। তাই বিশ্ব-চেতনা আশ্রয় করিয়া উহার ভিতর দিয়া দিব্য-চেতনা লাভ করিতে হয়। চেতনার ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভের ইহাই স্বাভাবিক পথ। কিন্তু বিশ্ব-চেতনার আশ্রয় না লইয়াই দিব্য-চেতনা লাভ করা যাইতে পারে, এমন সাধনাও আছে। তাই বিশ্ব-চেতনা পরিহার করিলে দিব্য-চেতনা অস্বীকৃত হইয়া যায় না।

ব্যক্তি যেমন বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলন বোধ করিতে পারে, তেমনি এই মিলনের ভিতর দিয়া আরও উর্দ্ধে বিশ্ব-চেতনাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

দিব্য-চেতনা বিশ্ব-চেতনা রূপে ব্যক্ত হইলেও বিশ্ব-চেতনা বিবিক্ত তাঁহার একক অনন্ত অস্তিত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে তত্ত্বতঃ ইহা স্বীকার করিলেও বিশ্ব-চেতনা মুক্ত দিব্য-চেতনার পৃথক অস্তিত্ব একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ একথা বলিয়াছেন, "যে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত কিছু বিবর্জ্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।"

পূর্ণ ঐক্যবোধ চূড়ান্ত অধ্যাত্ম উপলব্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উক্তিগুলি 'মানুষের ধর্ম্ম' হইতে সংগৃহীত।

"মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যখন আত্মার আলোক বিধৌত হয়, তখন সেই মুহূর্তে সে সমস্ত পার্থক্যের ঊর্দ্ধে এক অধ্যাত্ম ঐক্যের প্রসারতা বোধ করে।"

"সে বোধ করে যে শান্তি বহিঃ সন্নিবেশের মধ্যে নাই, আছে সত্যে, আন্তর সুষমায়।"

"আমাদের আত্মায় আমরা অসীম সত্য সম্পর্কে সচেতন, ইহা ভূমা, দিব্য-মানব এবং এই ব্যক্তি অধ্যাত্ম সত্তা যখন দিব্য-চেতনার জন্য ব্যক্তি সত্তা বিসর্জ্জন দেয় তখনই আনন্দ বোধ করে।"

"অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া যখন বস্তুর উপর আছাড় খাইয়া পড়ি তখন তাহাকেই একমাত্র আশার পাত্র বোধ করিয়া জড়াইয়া ধরি। যখন আলোক আসে তখন আমাদের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তখন বোধ করি, যে অখণ্ডতার মধ্যে আমরা বিধৃত উহা তাহার সামান্য একটি অংশ মাত্র।"

ঐক্য-তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির সর্ব্বশেষ পরিণাম রূপে বোধ করিতেন উক্তি কয়েকটির মধ্যে তাহারই পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

ব্যক্তি-চেতনার সীমা ছাড়াইয়া গেলে অর্থাৎ অহঙ্কার বোধ সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দিলে ব্যক্তি-চেতনা বিশ্ব-চেতনায় একাকার হইয়া যায়। ব্যক্তি তখন আপনাকে বিশ্ব রূপে প্রত্যক্ষ করে। মানুষ মুহূর্তে বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুতে পরিণত হইয়া যায়। ইহাই বিশ্ব স্বরূপতা লাভ। মনুষ্য চেতনা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাধা মুক্ত, অবাধ।

মুক্ত অবস্থা বলিতে বিশ্ব বিলুপ্তি বুঝায় না। অর্থাৎ ওই পরিণাম লাভ করিলে এই নিখিল বিসৃষ্টি, দেশ-কাল অন্তর্হিত হইয়া যায় না। মুক্তি বলিতে অহঙ্কার বিলুপ্তি বুঝায়। তখন ব্যক্তির পৃথক কোন অস্তিত্ব বোধ থাকে না। তাঁহার সকল কর্ম্ম, চিন্তা ও ভাবনা ঈশ্বরীয় কর্ম্ম চিন্তা ও ভাবনায় পরিণত হয়।

এই পরিণাম লাভ করিলে জগৎ ও জীবনের অর্থের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। মুক্তি তাই এক ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনকে দেখা। আমরা জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করি, ব্যবহার করি প্রাণ মন ও বুদ্ধির সহায়তায়, অর্থাৎ ব্যক্তি-চেতনার দিক হইতে; ইহা বন্ধন। জগৎ ও জীবনকে দিব্য-চেতনার দিক হইতে প্রত্যক্ষ করাকে বলে মুক্তি।

তখন ব্রহ্মকেই বিশ্ব-রূপে প্রকাশমান বলিয়া বোধ হয়। তখন বোধ হয় যে এই বিসৃষ্টি অন্তহীন চেতনা-সমুদ্রের বক্ষে এক বীচি বিক্ষেপ-মাত্র, সীমাশূন্য জ্যোতি-প্লাবনের একটি বিচ্ছিন্ন কিরণ-ধারা।

এই পূর্ণ পরিণাম লাভের পর মানুষ ব্রহ্মস্থিত হইয়া ব্রহ্মকেই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার ভাবনা ও চিন্তা তখন শুধু ব্রহ্মময়। ইহাকেই বলে ব্রহ্মস্থিতি, ব্রহ্মবিহার।

ইহা জন্ম ও মৃত্যুর ঊর্দ্ধতর এক শাশ্বত অচঞ্চল অবস্থা। মানুষ তখন বোধ করে যে তাহার আত্মা মুক্ত, কেবল গুণত্রয় প্রকৃতি-কর্ম্মে লিপ্ত। কর্ম্ম তখন আর তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

দিব্য-চেতনা অচঞ্চল অপরিবর্ত্তিত থাকিয়াই আপনাকে দেশ-কালের সীমায় অন্তহীন রূপে রূপে নিত্য উৎসারিত করিতেছেন।

অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তির ভিতর দিয়া মানুষ যখন দিব্য-চেতনার সহিত নিত্য যুক্ত থাকে, তখন দিব্য-চেতনার অচিন্তনীয় শক্তি বিপুল কর্ম্ম-ধারায় নিম্নে নামিয়া আসে। তাহা ব্রহ্মেরই মত অনায়াস, লীলাময়। এই সকল মানুষের জীবনে একদিকে থাকে অবিক্ষুব্ধ শান্তি, নীরবতা, মহামৌনী ভাব, অন্যদিকে থাকে চূড়ান্ত কর্ম্ম তৎপরতা।

মানবিক বোধের দিকে হইতে অনন্ত জীবন বলিতে সাধারণতঃ ব্যক্তি-রূপের স্থায়িত্ব বুঝায়। এই স্থায়িত্ব কেবল যে ইহ জগতে এরূপ বুঝিবার কোন কারণ নাই। এই রূপের একটি ধারা চলিয়াছে লোক হইতে লোকান্তরে জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া। এই ধারার মধ্যে ছেদ নাই। এই অনিঃশেষ ধারাটিকেও আমরা অনন্ত জীবন বলিয়া বোধ করি।

ইহ জগতে হোক অথবা লোকান্তরে হোক, রূপের বোধ মাত্রেই অশাশ্বতের বোধ। শাশ্বত সত্তা বা শাশ্বত জীবন যে-কোন রূপ-তত্ত্বের ঊর্দ্ধে। যাঁহাদের চেতনা ইন্দ্রিয় প্রাণ মনের ঊর্দ্ধে উঠে না, রূপের বোধ যে-কোন পরিণামে রহিয়া যায়, তাঁহারা যখন অনন্ত সম্পর্কে কোন তত্ত্ব গড়িতে চান তখন এই জাতীয় বোধ অনিবার্য্য রূপে গড়িয়া উঠে।

জীবের এই ধীর অভিব্যক্তিকে দ্রুততর করিয়া তুলিবার জন্য যুগে যুগে একশ্রেণীর মানুষ আবির্ভূত হন, যাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে জড়-বন্ধন মুক্ত। দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া জড় দেহ আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা কর্ম্ম করেন মানুষের মধ্যে ঊর্দ্ধ পরিণামমুখী আবেগকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য। সমগ্র জীবও জগতের অন্তঃস্থিত যে শক্তি পূর্ণ পরিণাম লাভের জন্য সদা সক্রিয়, তাহার বিরুদ্ধ

শক্তি গুলিকে দূরীভূত করিয়া তাহার প্রকাশের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা কর্ম্ম করেন।

মানুষের বহুমুখী অনুসন্ধিৎসা, বহুবিধ সৃষ্টি-প্রেরণার মধ্য দিয়া একটি প্রেরণা ধীরে ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে দিব্য-শক্তি নিম্নে প্রতি মুহূর্ত্তে সঞ্চারিত হইতেছে। মহাপুরুষদের দিব্য-দেহ আশ্রয় করিয়া দিব্য-শক্তি নিম্নতর ভূমিতে লীলায়িত হয়। তাঁহারা ঈশ্বর ও মানুষের, মুক্তি ও বন্ধনের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ সেতু স্বরূপ।

"মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্ব্বাঙ্গীন রূপে কোন ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারিনে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন।"
(রবীন্দ্রনাথ)

মানুষের জীবনে পাপ-পুণ্য সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব এক চিরন্তন সমস্যা। মানুষকে বীরের মত এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়, জীবন ও জগৎ হইতে অসত্য ও পাপ দূরীভূত করিবার জন্য। এই জীবন হইবে দিব্য-জীবন, এই জগৎ হইবে দিব্য-জগৎ।

স্বয়ং ঈশ্বর মর্ত্ত্য-লোকে স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। মানুষের অন্তরে থাকিয়া মানুষের সহিত তিনিও পাপ ও অসত্যের পীড়ায় জর্জ্জরিত ক্ষত বিক্ষত হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন। মানুষকে সচেতন হইয়া এই সংগ্রামে ঈশ্বরের সহযোগিতা করিতে হইবে।

মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করি যে বিশ্বে স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে ঈশ্বরের সহিত একযোগে অন্যায়, অসত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়।

"অসত্যের সকল প্রকার আক্রমণ হইতে ধর্ম্মরাজ্য 'ক্ষত্র'কে প্রসারিত ও রক্ষা করিবার জন্য উহা মানুষকে ঈশ্বরের শাশ্বত চেতনার সহিত একত্রে কর্ম্ম করিবার জন্য আহ্বান করে।" (রবীন্দ্রনাথ)

এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথ কি, কেমন করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়, কোন্ কর্ম্ম জীবনে সিদ্ধি লাভ ঘটায়, সর্ব্বাধিক কর্ম্ম শক্তি কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়, কোন্

বোধাশ্রয়ী হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম ও মুক্তি একাকার হইয়া যায় মহাপুরুষদের জীবন ও বাণীর মধ্য হইতে সেই রহস্যই আমরা শিক্ষা করি।

সেই রহস্য কি, না মনুষ্য চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম না করিয়া দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করা। ব্যক্তি যেখানে ঈশ্বরীয় চেতনার সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্ম করে সেখানে কর্ম্ম সিদ্ধি যেমন ঘটে তেমনি ঈশ্বরীয় বোধে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া ওই জাতীয় কর্ম্ম কখন বন্ধন সৃষ্টি করে না, তখন কর্ম্ম ও মুক্তি একাকার হইয়া যায়। তাঁহাদের অন্তরে একদিকে থাকে অখণ্ড শান্তি অন্যদিকে এই নৈঃশব্দ্যের ভিতর দিয়া কর্ম্ম সহস্র ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উৎসারিত হইতে থাকে।

চূড়ান্ত গতিবেগের জন্যই দিব্য-চেতনা অচঞ্চল। মহাপুরুষদের অন্তরে যে অপার শান্তি তাহা চিন্তার চূড়ান্ত গতি চাঞ্চল্য হেতু; তাহা জড়াবস্থা নহে।

মহাপুরুষদের প্রশান্ত চিত্ত হইতে তাই কর্ম্ম-ধারা বিপুল বন্যা রূপে নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে। অন্তরের গভীর প্রশান্তির ভিতর দিয়া তাঁহারা দিব্য-চেতনার সহিত নিত্য যোগ যুক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনে এই প্রকাশ সম্ভব। দিব্য-চেতনার অচিন্তনীয় শক্তি নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসিয়া চূড়ান্ত কর্ম্ম-চাঞ্চল্য রূপে প্রকাশ পায়।

এক্ষেত্রে যাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি তাহা এই, যে মহাপুরুষগণ দিব্য-চেতনার সহিত যোগ যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন। তাঁহারা যে কর্ম্মের কথা বলেন তাহা যোগযুক্ত কর্ম্ম। ইহাই কর্ম্ম-যোগ। রবীন্দ্রনাথ এই কর্ম্ম-যোগের উল্লেখ করিয়াছেন এইভাবে।

"শাশ্বতের সম্মুখে যে কর্ম্ম, প্রশান্ত আত্মার যে নিষ্কাম সংগ্রাম উহা পরম ব্রহ্মের সহিত যুক্ত থাকিতে আমাদের সহায়তা করে।"

সাধারণ মানুষের কর্ম্ম হইতে মহাপুরুষদের কর্ম্মের পার্থক্য কেবল এইখানে; অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কর্ম্ম করে একমাত্র মন ও বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, অন্যদিকে মহাপুরুষগণ কর্ম্ম করেন দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনকে উহার যন্ত্র স্বরূপ করিয়া।

মহাপুরুষদের জীবনের সকল কর্ম্ম-প্রেরণা দিব্য-চেতনা প্রসূত। মন ও বুদ্ধি প্রসূত কোন তত্ত্ব কিংবা কোন নৈতিক আদর্শের দ্বারা তাঁহাদের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত

হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম প্রেরণা তাই অভ্রান্ত, ঋজু, সংশয় বোধ লেশহীন। তাঁহাদের জ্ঞান আশ্চর্য্য সরল, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অনিবার্য্য, অনুবিদ্ধ, অনুপ্রাণিত।

মহাপুরুষগণের জীবনের বৈশিষ্ট্য কেবল এইখানে, কোন অলৌকিক আচরণের মধ্যে নয়। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ মানুষের জীবন প্রকৃতি তাড়িত, অনিয়ন্ত্রিত, প্রাণ ও মনের অবশ প্রেরণা ক্ষুব্ধ, দ্বিধা ও সংশয় বিহ্বল, অস্থির।

যে রহস্যের ফলে পরম নৈঃশব্দ্যের মধ্য হইতে দেশ-কালের পরিসীমায় অন্তহীন রূপ অনন্ত ধারায় উৎসারিত হইতেছে, মহাপুরুষদের জীবনে সৃষ্টির সেই রহস্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাঁহাদের অন্তরের অচঞ্চল প্রশান্তি আশ্চর্য্য নীরবতা হইতে কর্ম্ম-স্রোত শত ধারায় নামিয়া আসে। ধ্যান তন্ময়তার ভিতর দিয়া তাঁহাদের চেতনা পরম চেতনার সহিত নিয়ত যুক্ত থাকে বলিয়া নিম্নতর চেতনা-লোকে তাহারই দুর্ব্বার আবেগ বিচিত্র কর্ম্ম-ধারা রূপে প্রকাশ পায়। তাঁহাদের জীবনের এক প্রান্তে মহাশান্তির বিপুল নৈঃশব্দ্য অন্য প্রান্তে অচিন্তনীয় কর্ম্ম চাঞ্চল্য। সাধারণ মনুষ্য জীবনে এই অবস্থা কল্পনাতীত।

দিব্য-চেতনা লাভে মানুষের বিচিত্র অনুভূতি একটি অখণ্ডতা বোধে অন্তর্হিত হয়। সমস্ত কিছু চৈতন্যময় হইয়া যায়। মহাপুরুষগণ সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই সেবা বা পূজা বোধে কর্ম্ম করেন। কর্ম্মের জন্য ভক্তির এই পৃথক বোধটিও কখন কখন লুপ্ত হইয়া যায়। ব্যক্তি, বিশ্ব ও দিব্য-চেতনা তখন একাকার হইয়া যায়।

দিব্য-চেতনা লাভের সাধনা তাই জীবন-বিমুখতা নয়, পূর্ণজীবনেরই স্বরূপ লাভের সাধনা, জীবন ও জগৎকেই এক ভিন্ন স্বরূপ হইতে দেখা।

মহাপুরুষগণ পূর্ণ চেতনা লাভের পরও দেহ আশ্রয় করিয়া জগতে কর্ম্ম করেন, যে পর্য্যন্ত না জগৎ হইতে অসত্য ও পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়, এই মর্ত্ত্যে স্বর্গ-লোকের প্রতিষ্ঠা হয়।

সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক চেতনাশ্রয়ী হইয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহাদের সকল প্রয়াস ও জীবন পদ্ধতির মধ্যেও একপ্রকার অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। উহা আমাদের চিন্তা

ও জীবন-পদ্ধতির এতদূর বিপরীত যে আমাদের বোধকে আঘাত না করিয়া পারে না। মহাপুরুষগণ তাই যুগে যুগে উপেক্ষা, ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। যে কেহ তাহার চতুস্পার্শ্বের জীবন কিছুমাত্র ছাড়াইয়া উঠে, তাহাকেই লোকে সংশয় করে, এবং সমাজ হইতে অশ্রদ্ধা ও লাঞ্ছনা তাহাকে অনিবার্য্য রূপে লাভ করিতে হয়।

(৬)

এই জগৎ সম্পূর্ণ সৎ স্বরূপ নয়, আবার সম্পূর্ণ অসৎ বা মিথ্যাও নয়; পূর্ণ চেতন নয়, আবার অচেতনও নয়। এই জগতে জড় হইতে মানস-লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র চেতন-অচেতন, সৎও অসতের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

জাগতিক চেতনার উর্দ্ধে সম্পূর্ণ মুক্ত দিব্য-চেতনা-লোক। জাগতিক চেতনার সর্ব্ব নিম্নে জড় জগতেরও অতীতে সম্পূর্ণ অচেতন জগৎ, অনস্তিত্বের লোক। এই উভয় প্রান্তই আমাদের উপলব্ধি বহির্ভূত।

এই উভয় সীমা এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বিচিত্র চেতন জগৎ সমস্ত কিছুই সৎ-অসৎ, চেতন-অচেতনের মিলনাবস্থা। জড় জগতে চেতনা বা সতের সর্ব্বনিম্ন প্রকাশ, মানস-লোকে চেতনা বা সতের প্রকাশ সর্ব্বাধিক। মানস-লোকে অজ্ঞানতা বা অচেতনতার পরিমাণ সর্ব্বনিম্ন, জড় লোকে উহার পরিমাণ সর্ব্বাধিক।

আমাদের অন্তরতম সত্তায়, আত্মায় এই বিশ্বের সমস্ত কিছু সমাশ্রিত। এই সত্তা ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নহে। ব্রহ্মই ব্যক্তি-সত্তা (জীবাত্মা), বিশ্ব-সত্তা (বিশ্বাত্মা), তিনিই আবার এই সমস্ত কিছু ছাড়াইয়া অনন্ত ব্যাপ্ত; আপনার মহিমায় আপনাকে আপনি ধারণ করিয়া আছেন।

এই বিসৃষ্টি ব্রহ্মের প্রকাশ হইলেও সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়। ইহা ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। সৃষ্টির উর্দ্ধে তিনি স্বীয় মহিমায় অনন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। পূর্ণ চেতনা-লোক হইতে এই সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে উহা হ্রাস পায় না।

তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অচঞ্চল অব্যাকৃত থাকিয়া এই বিসৃষ্টির নিত্য চঞ্চলতার সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তিনিই এই সমস্ত কিছুর একমাত্র চেতনা স্বরূপ। অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি শৃঙ্খলা স্বরূপ এক অখণ্ড সুষমা ফুটাইযা তুলিয়াছেন। সীমাবদ্ধ দৃষ্টির দ্বারা আমরা এই অখণ্ড স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। এই সমস্ত কিছু যে আত্মার দ্বারা পূর্ণ তাহা বোধ করিতে পারা যায় সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে।

এই নিখিল বিসৃষ্টির একটি বীজভূত অবস্থা কল্পনা করা যায়। সেই বীজ এই বিসৃষ্টি মহীরূহে পরিণত হইয়াছে। তিনি এই সৃষ্টির নিয়ন্তা। সৃষ্টির এই ক্রম পরিণাম অবস্থায় জীব বারংবার জন্ম লাভ করিযা আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে।

এই নিখিল বিশ্ব পুনরায সঙ্কুচিত হইয়া বীজাবস্থা লাভ করিতেছে। এই বীজ আবার সৃষ্টিরূপে বিকাশ লাভ করে।

মানুষের চিন্তা ও কল্পনার শেষ সীমা এই ঈশ্বরীয় বোধ। মানুষ যুক্তি চিন্তা এবং কল্পনার সহায়তায় পরোক্ষভাবে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধতর কোন সত্তার উপলব্ধি তাহার পক্ষে অসম্ভব। ইহা উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ পৃথক এক বৃত্তির প্রয়োজন। ঈশ্বরীয় তত্ত্বেরও ঊর্দ্ধতর তত্ত্বকে বলা হয ব্রহ্ম। ঈশ্বরও সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত নন। একমাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক নন, আবার সম্পূর্ণ একও নয়। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, ঈশ্বর ও বিশ্ব এবং বিশ্ব ও ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া অজ্ঞানতাকে আড়াল দিবার জন্যই মানুষ 'অনির্ব্বচনীয়' 'মায়া', 'অবিদ্যা' ইত্যাদি তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কোন দর্শন সীমা ও অসীমের এই সম্পর্ক নিরূপণ করিতে পারে নাই। সকল দর্শন এখানে মূক।

বিশ্বের অন্তহীন রূপ বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য সূত্র কোন না কোন রূপে আছে। ইহা না মানিযা লইলে আমাদের চেতনা আশ্রয় পায় না। ইহা মানিয়া লইয়া মানুষকে তাহার পর অগ্রসর হইতে হয়। আদিতে ইহা মানিয়া লইয়া মানুষ তাহার পর জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণ ঐক্য বোধের দিকে অগ্রসর হয়।

যদি দিব্য-চেতনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক না থাকিত, যদি ঊর্দ্ধতর চেতনা-লোক হইতে নিম্নতম জড় জগৎ পর্য্যন্ত এক প্রাণ পরিব্যাপ্ত হইয়া না থাকিত তাহা হইলে এই অভিব্যক্তি কোন প্রকারেই সম্ভব হইত না। মানুষ কৃচ্ছতা ও তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়া জ্ঞান ও ভক্তি আশ্রয় করিয়া যে উন্নততর চেতনা লাভ করিতে পারে তাহা দিব্য-চেতনার অস্তিত্ব আছে বলিয়া। মানস-লোক হইতে জড়-জগৎ পর্য্যন্ত যেমন অজ্ঞানতা ধীরে বাড়িয়া যাইতে থাকে, জড়-জগৎ হইতে মানস-লোক পর্য্যন্ত তেমনি চেতনা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিম্নতম অনুভূতি লোক হইতে ঊর্দ্ধতম অতীন্দ্রিয় দিব্য-চেতনা-লোক পর্য্যন্ত একই চেতনার প্রসার। এই উভয় সীমার মধ্যে চেতনার অসংখ্য পর্য্যায় ও ক্রম বিদ্যমান। এই প্রত্যেকটি চেতনা-লোকের চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন।

বিশ্ব জগৎ অসীমকে লাভ করিতে চাহিতেছে। এই আকাঙ্ক্ষার নিয়ত প্রেরণায় বিশ্বের জীব অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। যে-কোন পরিণামে তাহার প্রাপ্তির বাহিরে একটি সীমাহীন লোক রহিয়া যাইতেছে। তাহাকে সে নিঃশেষে লাভ করিতে পারিতেছে না। বিশ্বের অভিব্যক্তি যেমনই হোক, সীমার ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম। বিশ্ব তাই বিশ্ব স্বরূপে অসীমকে লাভ করিতে পারে না।

বিশ্ব তাহার এই স্বরূপ ছাড়াইয়া উঠিতে চায়। প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত অনন্ত স্বরূপ আপনার পূর্ণ পরিণাম ফিরিয়া লাভ করিতে চায় বলিয়া প্রকৃতির মধ্যে যে এই প্রেরণা কেবল তাহাই নহে, স্বয়ং অসীম যিনি তিনিও এই সাধনায় রত। ঊর্দ্ধ হইতে তিনিও প্রকৃতিকে সহায়তা করিতেছেন এই পূর্ণ পরিণাম লাভের জন্য। এমনি করিয়া সীমা ও অসীমের যুগপৎ সাধনায় এই জগৎ ধীরে উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে।

(৭)

দিব্য-চেতনা অব্যাকৃত ও অবিভক্ত থাকিয়াই দেশ-কালের মধ্যে অসীমকে অন্তহীন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মই এই সমস্ত কিছুর মূল বা কারণই শুধু নন, তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশমান, আপনার অপার প্রেমে (কোন অসৎবস্তু আশ্রয় করিয়া নয়) আপনাকে আপনি সীমিত করিয়াছেন।

"তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের অন্য উৎসর্জ্জন করছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ।—সেই স্বয়ম্ভু সেই স্বতঃ উৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।" (রবীন্দ্রনাথ)

ব্রহ্মের সহিত বিশ্বের, কারণের সহিত কার্য্যের সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ গায়কের সহিত গানের, শিল্পীর সহিত শিল্পের, কবির সহিত কাব্যের, মাতার সহিত সন্তানের সম্পর্কের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রেও এই সমস্ত উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে। একটি উপমা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই বিশ্ব-সঙ্গীতটিও তাঁর গায়ক থেকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়া নাই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই নিঃশ্বাসে তাঁরই আনন্দ রূপ ধরে উঠছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের নিকট এই বিশ্ব জগৎ স্বরূপতঃ সৎ। তাহা দিব্য-চেতনা বিবিক্ত কোন অসৎ সত্তা নহে। তাঁহার আরও দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

তাঁহার আনন্দ দেশ-কালের সীমায় নিত্য রূপ লাভ করিতেছে। আবার সেই সকল রূপ তাঁহার রূপ-হারা-আনন্দের মাঝে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

"অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্ম্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে আসছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব আনন্দ চলেছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের আরও দুই একটি উক্তি বিস্তারিত সত্ত্বেও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশ-কাল, সেই দিকেই রূপ-রস-গন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যু তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

"অনন্তকে অন্তকে যে এক করে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

"তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারে ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে।

"তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কি করে? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সঙ্কুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।"

শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যে একের মত বৈচিত্র্যও সত্য। একের সহিত যুক্ত না করিয়া বৈচিত্র্যকে কেবল মাত্র বৈচিত্র্য স্বরূপে দেখিলে সম্পূর্ণ দেখা হয় না। অন্যদিকে বৈচিত্র্য বিহীন এককে লাভ করিবার সাধনা শূন্যতার সাধনা। বৈচিত্র্যকে একের সহিত মিলিত করিয়া কিংবা একক‌ে বৈচিত্র্যের সহিত যুক্ত করিয়া এক অখণ্ড স্বরূপে দেখিবার যে সাধনা তাহাই সত্য ও পূর্ণতার সাধনা।

পূর্ণ চেতনাই পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে মন-প্রাণ-জড় রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। জড়ের মধ্যে সুপ্ত চেতনা আবার ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া প্রাণ ও মানস-চেতনা রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। মন এখন আপনার পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে চায়। সীমা ও অসীমের পরিণাম ও বিপরিণামের আসা ও যাওয়ার এই নিত্য লীলা। রবীন্দ্রনাথ একস্থলে কাব্য-শ্রী মণ্ডিত করিয়া ইহার স্বরূপ এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

"আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত, তারপরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসাম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভ মণিব হাব দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙ্গের সাজ পরে অভিসারে চলেছে ওই কালোব দিকে, ওই অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তের দিকে।

আবার উল্‌টো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ওই কালো অনন্ত আসছেন তাঁব আপনাব শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দ মূর্ত্তির দিকে। অসীমেব সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেই জন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকাবের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে * * * অব্যক্ত যে ব্যক্তব মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে ফিরে পাচ্ছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

এক পরমার্থ সৎ চেতনাই পর্ব্বে পর্ব্বে আপনাকে মন-প্রাণ-জড় রূপে প্রকাশ করিয়াছে। দিব্য-চেতনার সংবৃতির এই এক দোলা। আর এক দোলায় দিব্য-চেতনা জড় হইতে পর্ব্বে পর্ব্বে আপনাকে বিকশিত করিতেছে। সমগ্র সৃষ্টি জুড়িয়া সংবৃতি ও বিবৃতির এই দুই ধারার নিত্য চলাচল। জড়-প্রাণ-মন এবং তদূর্দ্ধ চেতন জগৎ সমূহের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা স্বরূপতঃ নহে, পরিণাম গত। ব্রহ্মের ধ্যান তাঁহার আনন্দ ও প্রেম বিশ্ব-রূপে প্রকাশমান।

ব্রহ্মই দেশ-কালের সীমার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিত্যকাল ধরিয়া আপনাকে অন্তহীন রূপে রূপে উৎসর্জ্জিত করিয়া চলিয়াছেন।

ব্রহ্মই বিশ্বরূপে প্রকাশমান একথা সত্য হইলেও ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকাশ নহে। বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তিনি স্বীয় মহিমায় আপনাকে আপনি ধারণ করিয়া অনন্ত প্রসারিত। তিনি চির স্থির, চির জ্যোতির্ম্ময়।

এই সৃষ্টি-লোক সেই সীমাহীন জ্যোতির্লোকের একটি কিরণ রেখা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে একত্র করিলে তাই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারা যায় না।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করিলে ব্রহ্মের যেমন বৃদ্ধি ঘটে না, তেমনি উহাকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ব্রহ্মের হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে না। বিশ্ব ব্রহ্মের অত্যাবশ্যকীয় কোন সত্য প্রকাশ নয়।

এই জগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই বক্ষে এই অন্তহীন রূপ-লীলা একবার সংঘটিত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। তিনি এই বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়াও এই সমস্ত কিছু হইতে মুক্ত। বিশ্ব প্রকৃতি ও জীব কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। জীব এক জন্মের কর্ম্ম ফল আর একজন্মে ফিরিয়া লাভ করে। জন্ম-মৃত্যু, কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার দ্বারা জীব বদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্ম এই কর্ম্ম ও তাহার ফল ভোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিশ্বের নিয়ত পরিবর্ত্তন বা ব্যাকৃতি তাঁহার মধ্যে কোন ব্যাকৃতি বা পরিবর্ত্তন ঘটায় না।

সৃষ্টির প্রকাশ কালে জীব বারংবার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া চলে। ইহাকে শাস্ত্রে বলা হইযাছে ব্রহ্মার দিন। তাহার পর এই সমস্ত কিছু আবার তাঁহার মধ্যে সংহৃত হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহা ব্রহ্মার রাত্রি। ব্রহ্মা সৃষ্টি ও প্রলয়, দিন ও রাত্রি, শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রবাহের উর্দ্ধে।

সমগ্রতা, সম্পূর্ণতা, অনন্ত ইত্যাদি বোধের জন্য আমাদের এমন একটি সত্তার প্রয়োজন যাহা কেবল সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ নয়, যাহা সৃষ্টির উর্দ্ধে অনন্ত ব্যাপ্ত। ইহা ব্রহ্মকে স্বয়ং সম্পূর্ণ পরমানন্দ এবং পরম গতি বলিয়া বোধ করে।

ধর্ম্মের এমন দিক আছে যাহা ঈশ্বরকেই পরম সত্তা বলিয়া বোধ করে। বিশ্বরূপে এই প্রকাশই তাঁহার একমাত্র প্রকাশ। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান, প্রেম ও

কল্যাণ বোধ ঈশ্বরের মধ্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। তিনি মানুষের সহিত ব্যক্তিগত বিচিত্র বন্ধনে আবদ্ধ।

কিন্তু মানুষ সত্তার সেই স্বরূপ সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করিতে চায়, যখন এমনকি দেশ-কালও সৃষ্টি হয় নাই। যিনি সকল সীমাবোধের উর্দ্ধে এক অখণ্ড, সম্পূর্ণ প্রকাশ। তাঁহার মধ্যে যখন সমস্ত কিছু বিলীন, যখন সমস্ত সম্ভাবনা তাঁহার মধ্যে অব্যক্ত, সৎ স্বরূপের সেই অবস্থা সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে চায়। মানুষ সেই চেতনার পরিচয় লাভ করিতে চায়, যে চেতনা দেশ-কালের উর্দ্ধে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিযাছি তাহাদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিযাছি যে নিখিল বিস্‌ষ্টির সহিত যুক্ত করিয়া এককে লাভ করিবার যে সাধনা একমাত্র তাহাই পূর্ণতার সাধনা। বৈচিত্র্যবিহীন এককে লাভ করিবার সাধনা যে শূন্যতার সাধনা ইহা তিনি সুস্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে নির্গুণ ব্রহ্মকে অস্বীকার করিবার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; অন্ততঃ নীরব থাকিবার ইচ্ছা। পরে তিনি উহাকে অস্বীকার না করিয়া ব্রহ্ম সম্পর্কে মৌন থাকিযা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেন। 'মানুষের ধর্ম্মে'র মধ্যে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিযা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের এই চেষ্টাটিই লক্ষ্য করা যায়।

(৮)

এক একটি বিশিষ্ট চেতনা বিকাশের সঙ্গে সৃষ্টি শতদলের এক একটি দল খুলিয়া গিয়াছে। ওই বিশিষ্ট চেতনা তাহার অনুকূল কতকগুলি বৃত্তি সেই সঙ্গে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে আপনাকে লীলায়িত করিবার জন্য।

এই রূপে আজ মানস-লোকে সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জীবের বিকাশ এইখানে আসিয়া শেষ হইয়া যায় নাই। সে অসীম বা ভূমাকে যত গভীর করিয়া উপলব্ধি করিতেছে তাহার সৃষ্টি প্রতিভা তত মহৎ তত বিচিত্র

হইয়া উঠিতেছে; তাহার জ্ঞান, তাহার কর্ম্ম, তাহার প্রেম ঐক্যকে তত সত্য করিয়া লাভ করিতেছে। এমনি করিয়া মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ ধীরে সত্য হইয়া উঠিতেছে।

যে ভূমার উপলব্ধি মানুষের বুদ্ধি, প্রেম ও কর্ম্ম, তাহার দেহ প্রাণ মন আশ্রয় করিয়া গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতেছে, তাহা কখন মানস-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ যে উন্নততর চেতনার বিকাশ স্বীকার করেন তাহা মানস-চেতনাকে ক্রমিক প্রসারিত ও বিকশিত করিয়া লাভ করা যায়, তাহা বিশ্ব-মন।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে মানস-লোক যতই সমৃদ্ধ ও বিকাশ লাভ করুক না কেন, তাহা কোন দিন ভূমা লাভ করিতে পারিবে না। মানস-লোকের সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটে; কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে উহার সহিত মানবীয় চেতনার কোন সম্পর্ক নাই। ঊর্দ্ধতর চেতনা বিকাশে দেহ প্রাণ মন আশ্রয় করিযাই সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক বোধের প্রকাশ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ মানস-ধর্ম্মকেই একমাত্র সত্য বলিযা বোধ করেন, উন্নততর যে পরিণাম তাহা ইহার বিকাশ মাত্র। তাই ভূমাকেও তিনি মানস-ধর্ম্মী করিয়া তুলিয়া তাহাকে বিশ্ব-মন বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন।

আমি রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে আমি যাহা উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি তাহা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

"তার যোগে আমরা যদি আমাদেব জীব-ধর্ম্ম সীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনই অমানব নয়, তাহা মানব-ব্রহ্ম।" (মানুষের ধর্ম্ম)

"মানব মনেব সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্ব্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারে ছাড়িয়ে গেছে কিনা, আমাদের মন দিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তা মাত্রকে যেভাবে যেখানেই স্বীকাব কবি সেটি মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। সেই কারণেই দোষারোপ করে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার কবে, তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। * * * মানুষের বুদ্ধির. যুক্তির কাঠামোব মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোন চিত্ত কোথাও কোথাও থাকতে পারে যার উপলব্ধির জগৎ আমাদের জাগতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই

আকাশে সে বিরাজ করে না। কিন্তু যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তা প্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কী করে। *** মানুষের বহিরিন্দ্রিয়, অতিরিন্দ্রিয়ের যত কিছু গুণ তাব আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানব ব্রহ্ম, তাই তার জগৎ মানব জগৎ। এ ছাড়া অন্যজগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।" (মানুষের ধর্ম্ম)

"আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি কবাব ক্ষেত্র আছে তিনি নিখিল মানবেব আত্মা। তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে। কোন অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবাব শক্তি আমার নেই। কেন না আমাব বুদ্ধি মানব বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয়, আমার কল্পনা মানব কল্পনা। তাকে যতই মার্জ্জনা কবি, শোধন করি তা মানব চিত্ত কখনই ছাড়াতে পাবে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানব বুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা থাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবেব চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি কবি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষেব মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।" (মানব সত্য)

মানস-চেতনার ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা যে ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন, সে পরিচয় তিনি স্বয়ং দান করিয়াছেন। যে কারণেই হোক কবি ওই পথ পরিহার করেন।

দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর চেতনাকে কবি এক্ষেত্রে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিলেও এককালে তিনি এই সত্তা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন। মানবীয় চেতনা অতিক্রম করিয়া তাহাকে যে লাভ করা যায় এমন অভিমতও তিনি করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় লাভ করিতে কবির একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেশ-কালের বাহিরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তা হলে যিনি দেশ-কালের অতীত, যিনি অভিব্যক্ত নন, যিনি আপনাতে পবিসমাপ্ত, তিনি আমাদেব পক্ষে একেবারেই নাই। সেই পূর্ণতাব স্থিতিধর্ম্ম যদি আমাদেব মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মেব প্রতি আমরা যা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ কবি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র আমাদের কাছে তার কোন অর্থই নাই।"

ঈশ্বরীয় বোধ হইল মানবীয় বোধেরই পূর্ণ পরিণাম। তাঁহার সহিত মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, এবং ওই সম্পর্ক স্থাপনের নানা পন্থার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে 'মানুষের ধর্ম্মে'র মধ্যে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

তাহা হইলে সৎ স্বরূপ এবং মানুষের ধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁহার ধারণা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

"এই গ্রন্থে আমি যাহা উল্লেখ কবিতে চাহিযাছি তাহা এই যে দিব্য-সত্তাব যে নামই দেওয়া যাক না কেন, উহাব মানব ধর্ম্মেব জন্যই উহা আমাদেব ধর্ম্মেব ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ কবি -আছে। এই মানব ধর্ম্মই আমাদেব পাপপুণ্য বোধকে অর্থান্বিত কবিয়াছে, উহা সম্পূর্ণতাব সকল প্রকাব আদর্শেব শাশ্বত পটভূমি স্বরূপ। উহাব সহিত মানুষেব নিজস্ব প্রকৃতিব সামঞ্জস্য বহিয়াছে।"

এই মানব ব্রহ্মের সহিত মানুষ তাহার এই স্বরূপ লইয়াই কি ভাবে আচরণ করিবে, ওই স্বরূপ সম্পর্কে তাহাব মনোভাব কিরূপ থাকিবে রবীন্দ্রনাথ তাহাই নির্দ্দেশ কবিতে চাহিযাছেন। তিনি উল্লেখ করিযাছেন,

"যে ধর্ম্ম একমাত্র মানুষেব সহিত সম্পকান্বিত হইয়া মানুষকে অসীমেব মানবিক সত্তা সম্পর্কে তাহাব মনোভাব এবং উহাব সহিত আচবণকে নিযন্ত্রিত কবিতে সহায়তা কবিতেছে, আমি ধর্ম্মেব সেই বিষয়েব উপব আমাব লক্ষ্য স্থিব বাখিযাছি।"

ধর্ম্ম বলিতে তিনি বুঝিতেন,

"ধর্ম্ম হইল আমাদেব একক সত্তা হইতে মুক্ত হইযা বিশ্ব-সত্তা লাভ। বিশ্ব-সত্তা আবাব মানবিক সত্তা।"

সৎ স্বরূপেব অতি মানবিক যে সত্তা এবং উহাকে লাভ করিবার জন্য মানবীয চেতনাকে অতিক্রম করিযা যাইবার যে সাধনা তাহাকে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে কোথাও কোথাও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিযাছেন। বস্তুতঃ ভারতীয ঋষিদের কযেক সহস্র বৎসরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জাত সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এই উপলব্ধিকে স্বীকার করিযাই পরে তিনি আপনার সাধনার স্বরূপ এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আমাদেব মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহাবা দ্বৈতেব জন্য প্রার্থনা কবেন, যেন ঈশ্বরের সহিত চিরকাল ভক্তিব বন্ধন থাকে। তাঁহাদেব নিকট ধর্ম্ম পবম সত্য এবং যাঁহাবা মানবিক সত্তা বোধেব সীমা ছাড়াইয়া যাইতে প্রস্তুত তাঁহাদেব ইঁহাবা ঈর্ষা কবেন না। তাঁহাবা জানেন যে মানুষেব দুঃখেব মূলে আছে তাহাব অপূর্ণতা, কিন্তু প্রেমে আমাদেব সীমা-লোকেব মধ্যে সম্পূর্ণতা ঘটে, উহা সকল দুঃখ দুর্দ্দশাকে স্বীকাব কবিয়াও উহাদের সকলকে ছাড়াইযা উঠে।"

দেশ-কালের অতীত মানবীয় চেতনার উর্দ্ধতর সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি।

"যদিও যোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ মনুষ্য চেতনার শেষ সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে এবং পরম ব্রহ্মে অখণ্ড ঐক্য বোধের ভিতর দিয়া চেতনার শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থার মধ্যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করিতে পারে এমন কেহ নাই, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল, যুক্তি তর্কের বিষয় নহে। এই সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, যাঁহারা মানবীয় সকল জ্ঞান ও কর্ম্মের আকর স্বরূপ কোন সত্তার প্রতি গভীর প্রেম, তীব্র ঐক্য বোধ করিয়াছেন তাঁহাদের সাক্ষ্যকেও যেন সেই সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারি। তিনি কেবল তথ্য সমূহের সামগ্রিক প্রকাশ নহেন, তিনি অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত কিছুর সুদূরাতীত লক্ষ্য।"

(৯)

রবীন্দ্র-দর্শনের আর একটি দিক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দিব্য-জীবন লাভের জন্য মানুষকে নূতন দেহাধার গড়িয়া তুলিতে হয়, উহা এমন কতকগুলি বৃত্তির বিকাশ যাহাতে মর্ত্ত্য-দেহে দিব্য-চেতনার লীলা সম্ভব।

জীবের বারংবার মৃত্যু ঘটাইয়া প্রকৃতি এই দেহাধারে নূতনতর সামর্থ্য সকল গড়িয়া তুলিবার সাধনায় রত। জীবের মৃত্যুর সার্থকতা এইখানে।

এই ধারণা পরিস্ফুট করিয়া লইলে ব্যক্তি বা আমির পৃথক মূল্য নিরূপণের যে চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সকল পর্য্যায়ে লক্ষ্য করা যায় তাহার দার্শনিক স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। আমি এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কবির জীবন-দেবতা তত্ত্বের কথাই উল্লেখ করিতে চাহিতেছি।

ইহা যে অদ্বৈত চেতনার উন্নত ভূমিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনাকে অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে লীলায়িত হইতে দেখা নহে; তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে এক অনির্দ্দেশ্য শক্তি তাঁহার জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ব্যক্তি-সত্তায় তাহারই কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যায়।

বস্তুতঃ মানস-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই তাহার কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যায়। মানস-লোকের গভীরে অধিচেতনা কিংবা আরও গভীরে দিব্য-চেতনার যে লীলা তাহার স্বরূপ কি, জীবনকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কোন সাধনা চলিতেছে,

তাহার কোন উপলব্ধি ব্যক্তি চেতনায় লাভ করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নিকটও তাই তাহার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিল। কেবল দিব্য-চেতনা লোকে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবনের সামগ্রিক রূপ, উহার সমগ্র অর্থ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানব সত্য' নিবন্ধের মধ্যে জীবন-দেবতা সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

"পরম পুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে জীবন দেবতা শ্রেণীর কাব্যে।"

মন দ্বারা বিশ্বের যোগে ব্যক্তির লীলার একটা আভাস মাত্র লাভ করা যায়, কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-সত্তায় অধিষ্ঠিত না হইলে এক ও বহুর লীলা রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না।

মানস-লোকেই অধিচেতনা কিংবা আরও গভীরে দিব্য-চেতনার যে প্রেরণা বোধ করা যায়, উহার যে আভাস লাভ ঘটে জীবন-দেবতা তাহারই প্রকাশ।

বিশ্ব-লীলার সহিত একাত্মতা বোধ করিযাও কবি আপনার ব্যক্তি-সত্তার একটি পৃথক মূল্য নিরূপণের চেষ্টা কোথাও কোথাও করিয়াছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের ইহা একটি বিশিষ্ট দিক।

রবীন্দ্রনাথ আমির যে পৃথক মূল্য নিরূপণ করিযাছেন, তাহার নানা পরিচয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে। আমি এক্ষেত্রে তাঁহার প্রবন্ধাবলী হইতে দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই আমিটিকে আর সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদি কাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। * * * কোন নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্প নির্ঝর থেকে পরমাণুকে চলন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির মধ্য দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদি কালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদি কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখা পাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা।"

অন্যত্র,

"এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। অথচ এই অন্তহীন আমি মণ্ডলীর প্রত্যেক আমিব মধ্যেই তাঁব এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই।"

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি আত্মার যে সম্পর্ক বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাত্মার সেই এক সম্পর্ক। ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে একই চেতনার লীলা। অর্থাৎ ব্যক্তি আত্মা ও বিশ্বাত্মা স্বরূপত এক। আবার বিশ্বাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই বলিয়া ব্যক্তি বিশ্ব-চেতনা লাভ করিলে বিশ্ব-চেতনা স্বাভাবিক ভাবে দিব্য-চেতনায় বিলীন হইযা যায়।

ব্যক্তি ও ব্যক্তি আত্মা এবং বিশ্ব ও বিশ্বাত্মার মধ্যে একই রহস্য নিহিত বলিয়া ব্যক্তি যতই আপনার গভীরতর সত্তা লাভ করিতে থাকে, বিশ্বের সহিত তাহার মিলন ততই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। ব্যক্তি-আত্মা লাভ এবং বিশ্ব-চেতনা লাভ সমার্থক।

দার্শনিকগণ মন ও আত্মার মধ্যবর্ত্তী উন্নততর ও সূক্ষ্মতর নানা চেতনা পর্য্যায়কে মনের প্রসার বলিয়া বোধ করেন বলিয়া মন ও আত্মার মধ্যে আর কোন চেতনা-লোকের স্পষ্টত উল্লেখ করেন নাই।

মনের ধর্ম্ম যে লোকে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে নির্জ্ঞান মন, অবচেতনা অধিচেতনা, ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, শাস্ত্রকার-গণ যাহাকে বলেন বাসনা-লোক, অথচ আত্মার প্রকাশও সম্পূর্ণ নয়, এমন একটি চেতনা-লোককে রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বিশ্ব চেতনা বা ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যবর্ত্তী আর একটি পর্য্যায় যাহার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক আর কিছুটা ব্যক্তি স্বরূপতা লাভ করিয়াছে তাহাকে রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতা আখ্যা দান করিয়াছেন। ব্যক্তি-লীলা-রসাস্বাদই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বলিয়া সর্ব্ব-রস-সাধারণ বোধটিকে ক্রমাগত অসাধারণ করিয়া তুলিবার একটি প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবল ছিল। জীবন দেবতা তাহারই প্রকাশ।

"এই সত্তার নিকট আমি আমার ভিতরের সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই সৃষ্টি যেমন আমার, তেমনি তাঁহারও। হইতে পারে ইহা সেই একই সৃজনকারী মন যাহা বিশ্বকে তাহার চিরন্তন ভাবে

রূপায়িত করিতেছে, কিন্তু আমি মানুষটির মধ্যে তাহার একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্কের কেন্দ্র আছে। এই সম্পর্ক ক্রমিক গভীরতর চেতনা লাভ করিতেছে।"

আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল চিন্তা, ভাবনা সমস্ত কিছু সংস্কার রূপে মনের মধ্যে থাকিয়া যায়, কখন বিনষ্ট হয় না। ইহার সহিত সচেতন মনের কিছু যোগ থাকে সত্য, কিন্তু এই সংস্কার আরও গভীরে যে সূক্ষ্ম বাসনা-লোক সৃষ্টি করে তাহার সহিত সচেতন মনের আর প্রত্যক্ষ কোন যোগ থাকে না। সচেতন মনের সীমার বহির্লোকে এই বাসনা-লোক।

মৃত্যুতে স্থূল দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু উহা সূক্ষ্ম ভাব বা বাসনা রূপে থাকিয়া যায়। শাশ্বত আত্মার সহিত এই সূক্ষ্ম রূপটিও শাশ্বত। নির্ব্বিশেষ ও বিশেষের এই লীলা তাই চিরন্তন।

আত্মার সহিত সংলগ্ন এই বাসনা পুনরায় স্থূল রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের বাসনা বর্ত্তমান জীবনের অমোঘ এবং অনিবার্য্য নিয়ন্তা হয়। ইহাকে বলা হয় নিয়তি।

মুক্তির কোন তত্ত্ব স্বীকার না করিলে জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত জীব ও আত্মার এই লীলাকেও শাশ্বত তত্ত্ব বলা যাইতে পারে।

বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীব যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ রূপে ক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল লাভ মুক্ত অথবা বাসনা মুক্ত হইতেছে, ততদিন ব্যক্তি-রূপ বিনষ্ট হয় না। জীব যখন আত্ম স্বরূপতা লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করে তখনই ব্যক্তি-রূপ সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তর ও অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলেও অর্থাৎ ক্রমিক উন্নততর চেতনার বিকাশ স্বীকার করিলেও চিরন্তন ব্যক্তি-রূপের পক্ষপাতী, তাই যে-কোন পরিণামে তাঁহার জীবন দর্শনে নির্ব্বিশেষ পরিণাম লাভের কোন প্রশ্ন উঠে নাই। তাঁহার লীলা তত্ত্বের দিক হইতে এই ব্যক্তি-রূপের লীলাটিকেও চিরন্তন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই বাসনা ও আত্মার মধ্যবর্ত্তী আর একটি চেতনা পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চেতনা পর্য্যায়টি রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা। শাশ্বত আত্মা এবং শাশ্বত বাসনা ও ব্যক্তি রূপের সহিত এই চেতনাও শাশ্বত। লীলা স্বরূপে এই চেতনা পর্য্যায়গুলিকে তিনি উপলব্ধি করেন

বলিয়া ব্যক্তি-চেতনার সহিত এই চেতনার মিলন রহস্য লীলা রহস্যে পরিণত হইয়াছে।

আরও একটি বিশিষ্ট দিক এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রযোজন। রবীন্দ্রনাথ সত্তার গভীর হইতে গভীরতর লোকে নিমজ্জিত হইতে হইতে এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছেন যেখানে জীবন দেবতা তত্ত্ব দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরীয় তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। তখন ব্যক্তির লীলা কেবল ঈশ্বরের সহিত। চেতনার ক্রমিক উর্দ্ধ পরিণাম যদি সত্য না হইত তাহা হইলে পরিণাম কখন এমন স্বাভাবিক হইত না। বস্তুতঃ কবির জীবন দেবতা তত্ত্ব গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে আমরা পাই কবির সচেতন মনের নানা প্রেরণা, ভাব ও ভাবনা। এই কালের উর্দ্ধতর. চেতনার চকিত ক্ষীণ আভাস ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া পরে জীবন দেবতা, আরও পরে ঈশ্বরীয় তত্ত্বে পরিণাম লাভ করিয়াছে।

(১০)

ভারতীয় সাধনায় মধ্যযুগে এই সামগ্রিক দৃষ্টি নানা কারনে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। মনোজগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎকে একান্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে মানুষ ক্রমে বহির্জগৎ সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবে উদাসীন হইয়া যায়। অন্তর ও বহির্জগতের কোন অসঙ্গতি আর দৃষ্টি গোচর হয না, উহা মনকে কোন প্রকারে পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ করে না। এক কালে ইহাই জাতি-মানসের মূল প্রেরণা হইয়া উঠে বলিযা এই অসঙ্গতির পরিচয় তাহার জীবনের সকল বিভাগেই লক্ষ্য করা যায়। অন্তরের ভাবকে বাহিরে রূপায়িত করিতে বহির্বিশ্বের সহিত সঙ্গতি বা সুষমা স্থাপনের কোন প্রয়োজন সে বোধ করে নাই। প্রতীক ইত্যাদি নাম দিয়া প্রাকৃতিক সকল সংস্কারকে এমন হেলায় অস্বীকার করিবার বিচিত্র দৃষ্টান্তে বিস্মিত হইতে হয়। শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, তাহার অধ্যাত্ম সাধনার আশ্রয় স্বরূপ তাহার বিচিত্র দেব-দেবীর মূর্ত্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে এই একই কথা বলা যাইতে পারে।

ভারতীয় শিল্প-সাধনার-ক্ষেত্রে এই অসঙ্গতির মূলে রহিয়াছে এই সামগ্রিক জীবন বোধের অভাব। ইহা লক্ষ্য না করিয়া প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কয়েকজন ভারতীয় শিল্প সমালোচক শিল্প বোধের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়াছেন। সামগ্রিক জীবনবোধের দিক হইতে ভারতীয় শিল্প সাধনার বিচার আজও হয় নাই। কেবল শিল্প সাধনা কেন জীবন সাধনার সকল বিভাগের এই জাতীয় বিচার প্রয়োজন। সামগ্রিক জীবন বোধ বলিতে প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য বুঝায়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জীবন সাধনার এই অসঙ্গতির বিচিত্র দিক গুলিকে নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে উপস্থাপিত করিযাছেন, তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিযাছি। এক্ষেত্রে তাঁহার সেই সকল আলোচনা হইতে একটি বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গ্রীকদেব নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল, এই জন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে মনেব সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টিব সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোনো বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেইজন্য তাঁহারা আপন দেব দেবীর মূর্ত্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন নতুবা জাগতিক সৃষ্টিব সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টিব একটি প্রবল সঙ্ঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত কবিত। আমাদেব সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদেব দেবতাকে যে মূর্ত্তিই দিই না কেন, আমাদের কল্পনাব সহিত বা বহির্জগতেব সহিত তাহাব কোনো বিরোধ ঘটে না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদেব নিকট প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে, আমরা যে-কোনো একটি উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি। * * * বহির্জগতেব আদর্শকে যাহারা নিজের ইচ্ছা মতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্য্য ভাবকে মূর্ত্তি দিতে গেলে কখনোই কোনো অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পাবে না।

যুরোপীয়েরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তথাপি তাঁহাদেব সন্দেহ মিটিতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসঙ্গত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি তবে তাহার সুসঙ্গতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ করি। জ্ঞান বৃত্তি সম্বন্ধে যেমন, হৃদয় বৃত্তি সম্বন্ধে ও সেইরূপ। আমরা সৌন্দর্য্য-রসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু সেজন্য অতি যত্ন সহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না—যেমন-

তেমন একটা কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি ; এমন কি, আলঙ্কারিক অত্যুক্তির অনুসরণ করিয়া একটা বিকৃত মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই অসঙ্গত বিরূপ বিসদৃশ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই ; আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্য্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না। ভক্তি রসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্বেষণ করিবার কোনো আবশ্যকতা বোধ করি না—অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা সন্তোষ থাকি।

* * * এই অসন্তোষটি না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজ্যকে উন্নত হইবার, মূর্ত্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই। * * * ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগতকেই সর্ব্বপ্রধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।" (সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ : পঞ্চভূত)

(১১)

স্রষ্টা দিব্য-দৃষ্টির সহায়তায় যে অলৌকিক রূপের জগৎ প্রত্যক্ষ করেন, বিশ্ব সৃষ্টি পরিকল্পনার যে আভাস লাভ করেন, তাহাকেই ভাবনা ও চিন্তার সহায়তায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। যতদূর সম্ভব উহারই আভাস দান করিবার জন্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচিত হয়। সাহিত্য-রূপ অরূপের রূপক।

দিব্য-সাক্ষাৎকারকে মানস অধিগম্য রূপ দানের জন্য যে ভাবও ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তাহা তাই সম্পূর্ণ যুক্তি সম্বদ্ধ হইতে পারে না। সেই অলৌকিক উত্তাপে বিগলিত হইয়া সাহিত্যের বাণী-রূপটিও অলৌকিক অনন্য সাধারণ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সাহিত্য সৃষ্টি ও সম্ভোগ উভয়ই আদৌ বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত ক্রিয়া।

এক অলৌকিক মুহূর্ত্তে স্রষ্টার দৃষ্টি সম্মুখ হইতে মায়ার আবারণ স্খলিত হইয়া পড়ে। রূপ-লোকের অন্তরালে যে পূর্ণ প্রজ্ঞাময়, যে পূর্ণ মুক্ত চেতনা বিরাজ করিতেছে, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া তিনি যেন মুহূর্ত্তের জন্য সৃষ্টির সকল রহস্য প্রত্যক্ষ করেন। এই অবস্থা একান্ত ক্ষণিক। বিশ্বের উপর আবার মায়ার আস্তরণ পড়িয়া যায়। মনের মধ্যে তাহার মূর্চ্ছনা তখনও পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত উহা নিরাধার উপলব্ধি মাত্র।

তাহার পর স্রষ্টার চেতনা আরও নিম্নে রূপ-রস-গন্ধ যুক্ত মানস-লোকে নামিয়া আসে। মনে তখন উহার স্মৃতি মাত্র থাকে। স্রষ্টা এই স্মৃতি-লোকটিকে ভাষায়

প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। যে সৃষ্টি এই দিব্য সাক্ষাৎকারের আভাস যত অধিক পরিমাণে দান করিতে পারে সেই সৃষ্টি তত উন্নত ও মহৎ।

কাব্য-জগৎ তাই রূপ শূন্য দিব্য-চেতনা-লোক নয়, আবার প্রতিভাসিত রূপের জগৎও নয়। উহা দিব্য ও জাগতিক চেতনার মধ্যবর্ত্তী একটি লোক। কবি এই মধ্যবর্ত্তী একটি লোকে বিচরণ করেন। দিব্যালোক প্রতিফলিত হইয়া এই জড় বস্তুই সেখানে আর এক রূপে প্রতিভাত হয়। স্রষ্টার একদিকে দিব্য-চেতনার চির জ্যোতির্ম্ময়, চির স্থির লোক, অন্যদিকে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল রূপ জগৎ। স্রষ্টা এই উভয় তীরের সেতু-বন্ধন স্বরূপ। কিংবা সৃষ্টি সেই গবাক্ষ যাহার মধ্য দিয়া ওপারের সীমাহীন প্রসার চোখে পড়ে। সকল রূপের মধ্যে সেই গবাক্ষ, স্রষ্টা তাহারই সন্ধান দান করেন।

বস্তু বা বিষয়ের সহিত তন্ময়তা স্রষ্টার আত্ম বিস্মৃতি ঘটায়, ব্যক্তি ও বিশ্ব-সত্তা তখন একাত্ম হইয়া যায়। এই একাত্মতার ভিতর দিয়া বস্তুর সৎ স্বরূপ ব্যক্তির চেতনায় ভাসিয়া উঠে। এই দিব্য রূপ সাক্ষাৎকারকে কবি তাহার পর চিন্তা, ভাবনা ও কল্পনার সহায়তায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। এই রূপ আশ্রয় করিয়া কবি বা শিল্পী এই সাক্ষাৎকারের যতটা আভাস দান করিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্টি সেই পরিমাণে মহৎ ও সার্থক।

কবির দৃষ্টি কোন আংশিক দৃষ্টি নয়, তাহা জীবন ও জগতের সামগ্রিক অপরোক্ষ দৃষ্টি। চিন্তা ভাব ও কল্পনার সহায়তায় এই সামগ্রিক দৃষ্টি লাভ অসম্ভব। সামগ্রিক বোধের জন্য ভাব ও চিন্তার অতীত বোধের প্রয়োজন। বোধি মানুষের অখণ্ড, সামগ্রিক, সম্পূর্ণ দৃষ্টি। এই সাক্ষাৎকারকে কবি তাঁহার কাব্যে রূপ দান করেন। মুহূর্ত্তের উপলব্ধির যে অনুরনন, যে মূর্চ্ছনা অন্তরে রহিয়া যায়, তাহারই স্মৃতি প্রেরণায় যে ধ্বনি ও রূপ সৃষ্টি হয় তাহা লৌকিক ধ্বনি ও রূপ নহে।

সৃষ্টি দিব্য-প্রেরণা প্রসূত বলিয়া সম্পূর্ণ যুক্তি মূলক হইতে পারে না। অযৌক্তিক বলিতে যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহাও নহে, বলা যায়, উহার ভাব ও ভাষা, উহার সুষমা যুক্তি-সীমার ঊর্দ্ধতর সামগ্রী। কাব্যের তথাকথিত অযৌক্তিকতা এবং অসঙ্গতির পশ্চাতে একটি সামঞ্জস্য বা সুষমা বোধ কোন না কোন রূপে থাকেই। সৃষ্টিরূপের সহিত একাত্মতা বোধের ভিতর দিয়া সেই মিলন তত্ত্বটির সন্ধান লাভ

করিলে এই সমস্ত কিছুকে পূর্ণ সুষমা মণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। লৌকিক বোধের দিক হইতে প্রথমে যাহাকে অযৌক্তিক অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, অলৌকিক বোধের দিক হইতে তাহাকে আবার পূর্ণ সুষমা মণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। এই বিশেষ রূপ সম্বন্ধ না থাকিলে ওই পরিণাম লাভ ঘটিত না।

কাব্য পাঠে যতই আমরা তন্ময় হইতে থাকি জাগতিক বোধের মধ্যে ততই এক প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিতে থাকে। আবার এই বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে আর একটি সুষমাময় জগৎ গড়িয়া উঠিতে থাকে। পরিণামে উহা এক অখণ্ড সুষমা মণ্ডিত হইয়া আমাদের চেতনায় ভাসিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কোন এক অলৌকিক জগতের আভাস দান করে।

এই যে আর এক জগৎ উহার সকল ক্রিয়া জাগতিক প্রেরণাতীত বলিয়া তাহার যুক্তি-বিচার, তাহার ভাব-ভাবনা, তাহার ধ্বনি ও রূপ আমাদের নিকট অপ্রাকৃত বলিয়া বোধ হয়। কাব্যের চিন্তা, ভাব ও ভাবনা দিব্য-প্রেরণা প্রসূত বলিয়া উহা দিব্য-চিন্তা, দিব্য-ভাব ও ভাবনা। ওই বাণী-রূপ যেন স্রষ্টার নিজস্ব নয়, ঈশ্বরের বাণী-রূপ। দিব্য তন্ময় মুহূর্ত্তের এই প্রকাশ তাই চিরন্তন, অননুকরণীয়, অনন্য সাধারণ।

মহৎ কাব্যের বাণী-রূপ অনুকরণ করিতে পারা যায় না, উহার রূপান্তর সাধনও অসম্ভব। বিশিষ্ট সাক্ষাৎকারটি যেমন, তেমন ওই প্রেরণা প্রসূত বিশিষ্ট বাণী-রূপটিও কবির চিরকালের নিজস্ব। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"প্রত্যেক কবির আপনার নিজস্ব একটি বিশিষ্ট ভাষা মাধ্যম আছে ইহার অর্থ এই নয় যে সমগ্র ভাষা তাঁহাব নিজস্ব সৃষ্টি, ইহার অর্থ ভাষাব বিশিষ্ট প্রয়োগ। প্রাণের ইন্দ্রজাল স্পর্শে ভাষা রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টিব বিশেষ আধার হইয়া উঠে।"

কাব্যের রূপটিই যে মুখ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাব সর্ব্বকালের মানব সাধারণের সম্পদ কিন্তু তাহার বাণী-রূপটি কেবল একলা কবির। কবির সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় এই রূপায়ণের মধ্যে। ইহা যে সত্য তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু মহৎ সাহিত্য এবং ক্ষণকালীন তুচ্ছ সাহিত্য-কর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য কেবল রূপগত নহে প্রকৃতিগতও বটে। অর্থাৎ মহৎ অনুপ্রেরণা ও ভাব ব্যতিরেকে কেবল আঙ্গিকের সম্পূর্ণতায় তুচ্ছ

কোন ভাব বা বিষয় মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না। রূপায়ণ দক্ষতা ও তাহার সম্পূর্ণতা তো চাই-ই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের বিচার করিতে হইবে চেতনার কোন উন্নততর পর্য্যায়ের অনুপ্রেরণায় উহা সৃষ্ট।

রূপ ও ভাবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া কেবল উন্নততর ভাব উন্নততর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে। তাই মহৎ ভাব ব্যতিরেকে মহৎ কাব্য সৃষ্টি হইতে পারে না।

আপাত প্রতীয়মান রূপের পশ্চাতে যে একটি অসীম লোক আছে রূপ বা সীমা আশ্রয় করিয়া কবি বা শিল্পী সেই অসীমের আভাস দান করেন। এই যে রূপের অতীত রূপাবিষ্কার তাহা যে কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়া ঘটিবে তাহা নহে; তাহা নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়াও ঘটিতে পারে। এমনি করিয়া এক একটি বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষের এক একটি চেতনা পর্য্যায়ের প্রকাশ ঘটে। এই বোধের যেমন এই চেতনার তেমনি উন্নততর নানা পর্য্যায় আছে।

চেতনার এবং সেই সঙ্গে ভাবের মধ্যে এই যে ক্রমিক উন্নততর পর্য্যায় তাহা সাহিত্য-রূপের মূল্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না করিলেও বস্তুগত মূল্যে যে সুদূর পার্থক্য সৃষ্টি করে তাহাতে কোন সংশয় নাই। এক কথায় সাহিত্যে ত্রুটিহীন রূপ এবং সৌন্দর্য্যাবিষ্কারের সঙ্গে থাকিবে মানুষের চেতনা এবং চেতনা রূপ আশ্রয় করিয়া যাহা প্রকাশ করিতে চায় তাহার প্রকাশ। বিশিষ্ট চেতনা এবং রূপাশ্রয়ী বিশিষ্ট বোধের প্রকাশের মধ্যে অন্তহীন উন্নততর পর্য্যায় আছে।

সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যেই যে সৃষ্টি প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় নিহিত একথা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা যায় যে রূপের উন্নততর নানা পর্য্যায় আছে এবং এই পর্য্যায় ভেদে রসাস্বাদনের তারতম্য ঘটে। রূপায়ণ দক্ষতা সকল পর্য্যায়ে এক রূপ হইলেও বিষয় বস্তু বা ভাব রসাস্বাদনের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য সৃষ্টি করে। সৃষ্টি প্রতিভার মুখ্য পরিচয় যে রূপায়ণ দক্ষতার মধ্যে তাহা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভাবের তারতম্যে সাহিত্য রসের এবং উহার মূল্যের যে পার্থক্য ঘটে তাহা তিনিও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার ইন্দ্রিয় দ্বারে আছে তাহার ক্রমিক ঊর্দ্ধতর চেতনায় মন,

বুদ্ধি ও বোধিতেও আছে। অর্থাৎ আমাদের চেতনা বিশ্বের যোগে যতই ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করিতে থাকে বিশ্ব সৌন্দর্য্য-শতদলের একটির পর একটি দল ততই খুলিয়া যায়, সৌন্দর্য্য ততই সীমাহীন হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড়ো করিয়া দেখা যায় না। * * * মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধির বিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে হৃদয় ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরও বাড়িয়া যায় ধর্ম্ম বুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেক দূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্ম দৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টি ক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।"

"সৌন্দর্য্যবোধ যখন শুধু মাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয়, তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি, তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রেই চোখে পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে একদিকে সুন্দর আর একদিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট। তারপরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্য্যবোধের সহায় হয়, তখন সুন্দর অসুন্দরের ভেদটি দূরে গিয়া পড়ে। * * * তারপরে কল্যাণ বুদ্ধি যেখানে যোগ দেয়, সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরও বাড়িয়া যায়, সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরও ঘুচিয়া যায়। শুধু মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালোমন্দের একটা সজ্ঘাতের অপেক্ষা রাখে। আমাদের সৌন্দর্য্য বোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুইয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়। * * * তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়। তখন সত্য ও সুন্দর এক হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রেই আনন্দ তাহাই চরম সৌন্দর্য্য।"

রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলির সারমর্ম্ম এই যে আমাদের চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে, সৌন্দর্য্যবোধ ততই বাড়িয়া যায়, জগৎ ততই সুন্দর হইয়া উঠে, সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ-রেখা ততই ক্ষীণ হইয়া আসে। আবার চেতনা যতই উন্নত হয়, বস্তুর গভীরতর সত্তা ততই আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। গভীরতর সত্তার এই আবিষ্কারটিই আবার গভীরতর সৌন্দর্য্যাবিষ্কার। সত্য ও সুন্দর তাই সমার্থক। সত্য ও সুন্দরের এই আবিষ্কারই আনন্দ। চেতনা যতই উন্নত হইতে থাকে, সত্য সুন্দর ও আনন্দ ততই বাড়িয়া যায়।

চেতনা যতই গভীর হইতে থাকে, বিশ্বের সহিত ব্যক্তিত্বের যোগ ততই নিবিড় হয়,

বিশ্ব তাহার নিকট তত সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। ব্যক্তি এইরূপে ক্রমিক ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমাগত বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে থাকে। পরিণামে বিশ্ব-সত্তা ও ব্যক্তি-সত্তা, বিশ্ব-চেতনা ও ব্যক্তি-চেতনা এক হইয়া যায়। ব্যক্তি-চেতনা বিশ্বকে এইরূপে যত গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকে, সৃষ্টি প্রেরণা তত উন্নত, তত স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে।

সাহিত্য বিচারের দুটি দিক আছে, একটি স্রষ্টার চেতনা বিশ্বকে কত গভীর ও ব্যাপকভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, অপরটি এই উপলব্ধিকে তিনি কতদূর প্রকাশ করিতে সমর্থ হইযাছেন। এই দুটি দিক বস্তুতঃ একটি দিক। অর্থাৎ স্রষ্টা বিশ্বকে যত গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকে তাহার সৃষ্টি ক্ষমতাও তত বাড়িয়া যায। একটি অধ্যাত্ম উপলব্ধির দিক, অপরটি তাহার রূপাযণের দিক। প্রযোজন বিশ্ব-সত্তার গভীর হইতে গভীরতর প্রবাহে আত্ম নিমজ্জন, সেই সঙ্গে যে রূপের বোধ আসে, তাহাকে রূপ-রঙ্গ ও রেখা, ভাব ও ভাষা-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য নিরলস অনুশীলন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"সাহিত্যেব বিচাব কবিবাব সময় দুইটি জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম বিশ্বেব উপব সাহিত্যকাবেব হৃদয়েব অধিকার কতখানি—দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকাবে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা?"

"বস্তুতঃ বহিঃ প্রকৃতি এবং মানব চবিত্র মানুষেব হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধাবণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা বচিত সেই চিত্র সেই গানই সাহিত্য।"

"এই জগৎ সৃষ্টিব আনন্দগীতেব ঝঙ্কার আমাদেব হৃদয় বীণা তন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে, সেই যে মানব সঙ্গীত, ভগবানেব সৃষ্টিব প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টিব আবেগ, সাহিত্য তাহাবই বিকাশ।"

"সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্ম প্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আববণেব ভিতর দিয়া কেবল মাত্র দশেব নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না কবেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহাব একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ব ও বিশ্ব-বসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোব।"

মানুষের মধ্যে এই যে সৃষ্টি প্রেরণা, যে প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ বিস্মৃত কোন সুদূর অতীত কাল হইতে সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে তাহা কোন আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। তাহার পশ্চাতে একটি স্থির অভিপ্রায় ক্রিয়া করিতেছে। তাহার মধ্যে

সমগ্র মানব সভ্যতার চিরন্তন নিয়তি রূপটিও নিহিত। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, এক কথায় সর্ব্ববিধ সৃষ্টি-রূপ মনুষ্য জীবনের যে সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া চলিয়াছে, মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাস সেই একই সত্যকে আর এক ভাবে প্রকাশ করিতেছে। সেই সত্য এই যে মানুষ তাহার জ্ঞান, উপলব্ধি ও সৌন্দর্য্য-বোধের সীমাকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে, সেই সঙ্গে একটি ঐক্যের আভাস ক্রমাগত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

একটি পূর্ণতার আদর্শ তাহার অন্তরে কোন-না-কোন রূপে থাকে, উহার সহিত মিলাইয়া তাহার সকল সৃষ্টি ক্রিয়া চলে। সৃষ্টির ভিতর দিয়া নর-নারী ধীরে ধীরে ওই আদর্শের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের মানুষ এই যে নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সকলের অন্তরে পূর্ণতার একটি ধ্রুব আদর্শ রহিযাছে। উহাকে বিশ্ব-মন বা বিশ্ব-চেতনা বলা যাইতে পারে। পূর্ণতার এই ধ্রুব আদর্শ দেশে কালে সংখ্যাতীত নর-নারীর সৃষ্টি প্রতিভা আশ্রয় করিয়া আপনাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছে। আজ পর্য্যন্ত মানুষ যাহা সৃষ্টি করিযাছে, তাহার মধ্যে পূর্ণতার আংশিক প্রকাশ ঘটিয়াছে মাত্র। এই খণ্ড রূপগুলিকে একটির পর একটি যোজনা করিয়া বিশ্ব-মন কালে কোন মহারূপ সৃষ্টি করিবে তাহা আজ কে বলিতে পারে।

স্রষ্টা ধ্যানে এই পূর্ণতার যে একটি খণ্ড রূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার সৃষ্টিকে ত্রুটিহীন করিযা তুলিবার প্রযাস করেন। এমনি করিয়া স্রষ্টা আপনার সৃষ্টিকেই বারংবার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ওই আদর্শের অভিমুখীন হইয়া চলেন।

এই ধীর অভিব্যক্তি ইহা কেবল অন্তহীন বিকাশ মাত্র নয়, ইহার পশ্চাতে একটি শাশ্বত আদর্শ আছে। সকল সৃষ্টি প্রয়াস ওই পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে। তাই একটি সম্পূর্ণতায় তাহার সমাপ্তি আছে।

ঈশ্বরের অন্তরে যে একটি স্থির ধ্যান আছে, তাহাকেই তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টির ভিতর দিয়া ক্রমাগত রূপাযিত করিতেছেন। মানুষের অন্তরে সকল সৃষ্টির ঊর্দ্ধে তেমনি একটি স্থির সম্পূর্ণতার আদর্শ বিরাজ-মান। সকল সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষ সেই সম্পূর্ণতাকে ধীরে লাভ করিয়া চলিয়াছে।

অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য সৃষ্টি প্রতিভার ক্ষেত্রেও একথা তেমনি

সত্য যে, মানুষ যত সংস্কার মুক্ত ও অহঙ্কার মুক্ত হয় বিশ্ব-মন বা বিশ্ব-চেতনাকে সে তক অধিক রূপে লাভ করে। কারণ অধ্যাত্ম সাধনা যে জীবন ও জগতের সামগ্রিক বোধ, সাহিত্য সেই জীবনেরই সামগ্রিক প্রকাশ। স্রষ্টার সৃষ্টি যতই সংস্কার ও প্রথা মুক্ত হয়, হৃদয় যতই স্বচ্ছ অর্থাৎ পবিত্র হয় তাঁহার সৃষ্টিও ততই বিপুল ও মহৎ হইয়া উঠে।

যেখানে মানুষ সীমাবদ্ধ, নিঃশেষিত, একান্ত পরিচয়ের আলোকে যেখানে তাহার সকল বিস্ময় বিলুপ্ত, সেখানে সাহিত্য নাই, শিল্প নাই, সঙ্গীত নাই। যে প্রেরণায় মানুষ তাহার সীমার জগৎকে প্রতিমুহূর্তে ছাড়াইয়া যাইতেছে, সেই প্রেরণাই সৃষ্টি প্রেরণা। এই প্রেরণার ভিতর দিযাই মানুষের সীমার জগৎ ক্রমাগত প্রসারিত হইতেছে। এমনি করিযা মানুষ ভূমামুখীন হইয়া চলিযাছে। বস্তুতঃ মানুষের অন্তরে এই ভূমার প্রেরণাই তাহাকে প্রতিমুহূর্তে সীমা হইতে অসীমের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

জীবনের দুটি দিক, একটি সীমা আর একটি অসীম। সাহিত্যের মধ্যে আমরা জীবনের এই অসীমতার আভাস পাই। যেখানে বীর বিশ্বের কল্যাণের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দেয়, জ্ঞানী জ্ঞানের জন্য, প্রেমিক প্রেমের জন্য, সাধক আরাধ্য দেবতার জন্য আত্ম বিসর্জ্জন দেয়, সেখানে আমরা মানুষের এমন একটি শাশ্বত বিরাট মহিমা প্রত্যক্ষ করি, যেখানে ক্ষুদ্রতর বোধের সীমাবদ্ধ চেতনার জীবন একান্ত তুচ্ছ বলিযা বোধ হয়। প্রকৃত সাহিত্য মানুষের এই মহিমার পরিচয় দান করে। শিল্পের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই এইরূপ একটি মন্তব্য করিয়াছেন।

"শিল্প কি? না, রিযেলের আহ্বানে মানুষের সৃজনকারী আত্মার সাড়া।" এখানে 'রিয়েল' বলিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মন বা বিশ্ব-চেতনার কথাই বুঝাইয়াছেন।

বিশ্ব-মন ব্যক্তি মনকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। ইহাই সাহিত্য, শিল্প, প্রভৃতি সকল প্রকার সৃষ্টি প্রতিভা। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিযাছেন।

"মানুষ তাহার সকল সৃষ্টি কর্ম্মের ভিতর দিয়া চিরন্তন মানব, স্রষ্টাকে লাভ করিবে, তাহাকে অনুভব ও উপস্থাপিত করিবে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্পর্ক। এই প্রতিভাকে বিশ্ব-মানব-মন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্ব-মানব-মন পুনশ্চ নিজেব জিনিস নির্ব্বাচন কবিয়া নিজেব জন্য গড়িয়া লইতেছে।

জগতের উপবে মনেব কাবখানা বসিয়াছে, এবং মনেব উপরে বিশ্ব-মনের কাবখানা—সেই উপরেব তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।"

"সাহিত্যে আমরা কিসের পবিচয় পাই না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য্য, যাহা ঐশ্বর্য্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।"

"এমনি কবিয়া স্বভাবতই মানুষেব যাহা কিছু বড়ো, যাহা কিছু নিত্য, যাহা সে কাজে কর্ম্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পাবে না, তাহাই মানুষেব সাহিত্যে ধবা পড়িয়া আপনা আপনি মানুষের বিরাট রূপকেই গড়িয়া তুলে।"

"লেখকেরা নানা দেশ-কাল হইতে আসিয়া তাহার বিশ্ব মানব মন যা গড়িয়া তুলিতে চায় তাহাব মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমাবতেব প্লানটি কী তাহা আমাদের কাবও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুক্ ভুল হয়, সেটুকু বাব বাব ভাঙ্গা পড়ে, প্রত্যেক মজুবকে তাহার নিজেব স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া নিজেব রচনা টুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওযাইয়া সেই অদৃশ্য প্লানেব সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়, ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।"

"যে জানে মানুষ সমস্ত ইতিহাসেব মধ্য দিয়া নিজের গভীরতম অভিপ্রায়কে নানা সাধনায় নানা ভুল ও নানা সংশোধনে সিদ্ধ করিবার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে, যে জানে, মানুষ সকল দিকেই সকলের সহিত বৃহৎভাবে যুক্ত হইয়া নিজেকে মুক্তি দিবাব প্রয়াস পাইতেছে, মানব বিশ্ব মানবেব মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত কবিবাব জন্য, ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবাব জন্য নিজেকে লইয়া কেবলই ভাঙ্গা গড়া কবিতেছে, সে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস হইতে লোক বিশেষকে নহে, সেই নিত্য মানুষেব নিত্য সচেষ্ট অভিপ্রায়কে দেখিবার চেষ্টা করে।"

"জগতের মধ্যে মানুষেব আত্মীয়তা কতদূব পয্যন্ত সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূব পয্যন্ত তাহাব আপনার হইয়া উঠিল, ইহাই জানিবাব জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ কবিতে হইবে। ইহাব তত্ত্ব আমাদের কোন ব্যক্তি বিশেষের আয়ত্তাধীন নহে, বস্তু জগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই, অথচ এই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তিব আদর্শ অচল হইয়া আছে।"

"আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটি খাম খেয়ালী ব্যাপার নহে, ইহা বস্তু সৃষ্টির মতোই একটি অমোঘ নিয়মেব অধীন। প্রকাশেব যে একটা আবেগ আমবা বাহিরের জগতে সমস্ত অণু পবমাণুব ভিতরেই দেখিতেছি সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবল বেগে কাজ করিতেছে।"

"কোন খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায় যা সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টি রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন

অসীম গৌরব লাভ করবে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্যে সমগ্র মানুষের তপস্যা। যেখানে মহাসাধকেরা সাধন করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে।"

স্রষ্টা দিব্য-দৃষ্টির সহায়তায় লৌকিক ভাবনা ও চিন্তার অতীত যে জগৎ প্রত্যক্ষ করেন, বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহারই আভাস দানের চেষ্টা করেন। সৃষ্টি ক্রিয়া মাত্রেরই পশ্চাতে রূপ ও সীমার অতীত লোকের কোন-না-কোন প্রকার আবিষ্কার থাকে। এই আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দবোধকে স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। সৃষ্টি তাই উদ্ভাবনা নহে, আবিষ্কার, বস্তুর অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য সত্তার আবিষ্কার।

"সত্যের সেই আনন্দ রূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য।"
(রবীন্দ্রনাথ)

"সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে—ইহাতেই সৃষ্টির নৈপুণ্য। ইহাই সাহিত্য, ইহাই সঙ্গীত, ইহাই চিত্রকলা।" (রবীন্দ্রনাথ)

আমাদের মধ্যে একটি ঐক্যের বোধ আছে, উহার সহিত অন্বিত করিয়া আমরা সমস্ত কিছু জানি। যাহাকে সেই একের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিতে পারি না তাহা আমাদের নিকট অস্পষ্ট রহিয়া যায়। অখণ্ড ঐক্যের যোগে অন্তরে এই যে ঐক্যের বোধ ইহার আনন্দকেই স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেন।

বিশ্বের যোগে ব্যক্তির ঐক্য বোধের সীমা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। এই ঐক্য বোধের সীমা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক। চেতনার এমন পূর্ণ প্রসার দেখা যায় যেখানে ব্যক্তি ও বিশ্ব-চেতনা একাকার হইয়া গিয়াছে।

সমগ্রতার অপরোক্ষ অনুভূতি সাহিত্যের লক্ষ্য বলিয়া সাহিত্যের ফল লাভ তাহার বিষয় বস্তুর অতীত সামগ্রী। বিষয় বস্তুর সমগ্রতা আশ্রয় করিয়া সেই অতীত বোধের প্রকাশ ঘটিলেও বিষয় বস্তুর কোন অংশের মধ্যেও উহার প্রকাশ নাই। রূপ বা সীমা আশ্রয় করিয়া স্রষ্টা অসীম বা অরূপের আভাস দান করেন। এই আভাস দানের মধ্যে সাহিত্যের রস। সাহিত্য যে ঐক্যের উপলব্ধি ঘটায় তাহার ভিতর দিয়া ব্যক্তি আপনার অন্তরস্থিত ঐক্য উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির আনন্দ সকল সৃষ্টি প্রেরণার মূল, এই আনন্দ আস্বাদ সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ লাভ।

রূপ আশ্রয় করিয়া যে ঐক্যের বোধ লাভ কিংবা ঐক্যের উপলব্ধিকে রূপ আশ্রয় করিয়া প্রকাশের যে চেষ্টা তাহা মনন বা চিন্তার ফল নয়। মন ও বুদ্ধির সহায়তায় সামগ্রিক অপরোক্ষ দৃষ্টি লাভ সম্ভব নয়। ইহা বোধির ফল। এই বোধির সহায়তায় মানুষ সামগ্রিক অপরোক্ষ দৃষ্টি লাভ করে। মুহূর্তের এই উপলব্ধির অলৌকিক আনন্দকে স্রষ্টা তহার পর আপন আপন মাধ্যমে প্রকাশ করেন। আমি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়াছে।

"আমাদেব আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যেব আদর্শ আছে। আমবা যাহা কিছু জানি কোন না কোন ঐক্য সূত্রে জানি। কোন জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। যেখানে দেখি আমাদেব পাওয়া বা জানাব অস্পষ্টতা সেখানে জানি মিলিয়ে জানতে না পাবাই তাব কাবণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জ্ঞানে ভাবে এই যে একের বিহাব, সেই এক যখন লালাময় হয়, যখন সে সৃষ্টিব দ্বাবা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন একেকে বাহিবে সুপরিস্ফুট কবে তুলতে চায। তখন বিষয়কে উপলক্ষ্য কবে উপাদানকে আশ্রয় কবে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্প কলায় গ্রীক শিল্পীর পূজা পাত্রে বিচিত্র বেখার আবর্ত্তনে যখন আমরা পবিপূর্ণ একেকে চবম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মাব একের সঙ্গে বহির্লোকেব একেব মিলন হয়।"

"বিজ্ঞান আমাদেব মনকে জ্ঞানেব জগতেব উপব নিবিষ্ট বাখিতে প্রেবণা দেয়, অধ্যাত্ম গুরু গতি ও পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক ঘটনাবলীর গভীবে অসাম চেতনাব সহিত আমাদেব আত্মাকে যুক্ত কবে, আমাদের শিল্পী প্রকৃতির মূলে আছে প্রত্যক্ষ জগতে ব্যক্তিত্বেব প্রকাশটিকে উপলব্ধি করা, অস্তিত্বেব সেই পরম সত্তা যাহার সহিত আমাদের পরম সত্তার সামঞ্জস্য আছে।"

অধ্যাত্ম জীবনে এই উপলব্ধির পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়।

"আমাদের ইতিহাসে এমন এক একটি সময় আসিয়াছে যখন বিপুল জনতা নিত্য দিনেব নিষ্প্রাণ ঘটনাবলীর অনেক উর্দ্ধের এক সত্তার উপলব্ধির ভিতর দিয়া অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। জগৎ উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয় আমবা আমাদেব সমগ্র আত্মা দিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করি, ইহাকে উপলব্ধি করি।"

"যেহেতু সাহিত্য ও ললিত কলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, সেইজন্য তথ্যেব পাত্রকে আশ্রয় কবে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমেব স্বাদ।"

"সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বেশিটুকু পবিমাণ জাত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সে হল রূপ রহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটা হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে সকল অর্থাৎ তার মধ্যে

সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্ফল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।"

"এই সমস্তকে দিয়ে বিরাজ করে এই সমস্তের অতীত একটি ঐক্য তত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য্য। সেই ঐক্য উদ্বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তি পুরুষ।"

"বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্শোনালিটিকে। আমার ব্যক্তি পুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয় রূপে জানে আপনাকে। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ। শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।"

এই পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম তাহা মুখ্যতঃ সাহিত্যের স্বরূপ ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত। ইহাতে সাহিত্য-কর্ম্মের ক্রমাভিব্যক্তির দিকটি বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিভিন্ন দেশ-কালের সাহিত্য-কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এই অভিব্যক্তি ঘটিয়া চলিয়াছে একটি ধ্রুব পরিণাম লক্ষ্য করিয়া।

একটি পূর্ণতার আদর্শ সকল সৃষ্টির ন্যায় সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া ধীরে চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ম তন্ত্র শূন্য কোন খাম খেয়ালী মানস-ক্রিয়া নহে। সকল সাহিত্য-কর্ম্ম পরিব্যাপ্ত করিয়া একটি স্থির অভিপ্রায় একটি অমোঘ শাসন উদ্যত হইয়া আছে। ইহা সর্ব্ব দেশ-কালের সাহিত্য-কর্ম্মকে একান্ত বিচ্ছিন্নতা হইতে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া উহাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব।

বিশ্বের যোগে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তার ধীর বিকাশ শুধু নয়, তাঁহার সকল সৃষ্টি প্রেরণার পশ্চাতে সেই এক সৃজনকারী প্রেরণা বিদ্যমান যে প্রেরণা সমগ্র বিশ্ব ব্যাপারের অন্তরালে নিগূঢ় থাকিয়া একের পর এক ধীর বিকাশ ঘটাইয়া চলিয়াছে।

বিশ্বের সকল সত্তাকে আশ্রয় করিয়া এই সৃজন ক্রিয়া চলিলেও যে সত্তা যত বেশি বিকশিত, তাহার মধ্যে বিশ্ব সৃষ্টির অভিপ্রায় তত বেশি সার্থক। নিম্নের উদ্ধৃত অংশ দুইটির মধ্যেও এই দিকটির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"অহমিকার প্রভাবেই যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়। যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থ রূপে তাকে প্রকাশ করে তোলাই তার স্বাভাবিক পরিণাম। ভিতরকার একটা শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা মনে হয় না, সে একটা জগৎ ব্যাপ্ত শক্তি। নিজের কাজের মাঝখানে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত আর একটি পদার্থ এসে তারই স্বভাবমত কাজ করে। সেই শক্তির হাতে আত্ম সমর্পণ করাই জীবনের আনন্দ।"

"নিজের ভিতরকার এই সৃজন ব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে আমাব ভিতরেও তেমনি অনাদি কাল ধরে একটা সৃজন চলেছে ; আমাব সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ কবছে।"

মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিচিত্র স্পর্শ কাতর অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাগ-বিরাগ, ভালো-মন্দ বোধের গভীরে আছে সমসাময়িক সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবোধ, উহাদের বিচিত্র সমস্যা ও সমাধান লাভের প্রযাস। তাহারও গভীরে আছে একটি সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবোধের সম্মিলিত বিচিত্র প্রকাশ। তাহারও গভীরে আছে বিভিন্ন দেশ বা জাতির মানবিক আদর্শ ; ধর্ম্ম, নীতি ও অধ্যাত্ম বোধ আশ্রয় করিয়া মানব ভাগ্যের চিরন্তন নিয়তি সাক্ষাৎকার।

ব্যক্তিগত অনুভূতির পর্য্যায় ছাড়াইয়া যে সাহিত্য যত গভীরতর চেতনা পর্য্যাযের সাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে সে সাহিত্য তত বেশি উন্নত। অর্থাৎ উহার মধ্যে ততই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব ও রসোপলব্ধির প্রকাশ ঘটে, মানুষের শাশ্বত নিযতি রূপ উহাকে আশ্রয় করিয়া ততই অভিব্যক্ত হয়।

স্রষ্টার জীবন তাই স্বেচ্ছা, অর্থাৎ সচেতন সত্তার আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত নহে। তাঁহার জীবন আশ্রয করিয়া তাঁহাকে যন্ত্রে পরিণত করিয়া সমসাময়িক সমাজ-চেতনা জাতি-চেতনা কিংবা আরও গভীরে বিশ্ব-চেতনা আপনার অভিপ্রায সিদ্ধ করিতে চায়।

স্রষ্টার জীবন বস্তুতঃ ঊর্দ্ধতর চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উহা আপনার অভিপ্রায় সার্থক করিবার জন্য স্রষ্টাকে এমনকি তাঁহার সচেতন মানসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারে। উহারই অতি প্রবল প্রেরণায় তাঁহার সকল সচেতন অভিপ্রায় তৃণগুচ্ছের মত কোথায় ভাসিয়া যায়। স্রষ্টা কেবল অসহায় হইয়া বিস্ময বিস্ফারিত নেত্রে আপনার জীবনে সেই শক্তির অমোঘ লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ওই স্রোতে আত্ম সমর্পণ করা ছাড়া উহাকে নিরুদ্ধ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার থাকে না।

সন্ধ্যা সঙ্গীত

"বাহিরের সহিত তাহার অন্তরের যখন সুর মেলে না সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তর নিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। * * * সন্ধ্যা সঙ্গীতের মধ্যে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোন মতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপনের মধ্যে লড়াই করিয়া কোন মতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমন করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতর অলক্ষ্য প্রদেশে সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্টভাষায় সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে।" (জীবন স্মৃতি)

পূর্ণতালাভের জন্য ব্যক্তি ও বিশ্বকে পরস্পর নির্ভরশীল হইতে হয় এবং তাহারই সহিত ক্রমিক মিলন বোধের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনার ধীর জাগরণ ঘটে। এই সত্য রবীন্দ্রনাথ কবি জীবনের একেবারে আদি হইতে নিঃসংশয় রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বিস্মিত অভিভূত হইয়া এই বিপুল বিশ্বকে সেই প্রথম দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখা। বিস্মৃতি সাগরের নীল জল মথিত করিয়া একটির পর একটি স্মৃতি-প্রতিমা বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিয়া আবার কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। যেন কাহার অভিশাপে মিলনের সেই স্মরণ চিহ্ন কাল-সমুদ্রের অতলে কোথায় কখন অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। ব্যক্তি ও বিশ্বের মাঝখানে এমনি বিস্মৃতির যবনিকা।

দারুণতম দুঃখ দহনের ভিতর দিয়া একদিন এই অভিশাপ যবনিকা উঠিয়া ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের তখন মিলন ঘটে।

সমগ্র জীবন ধরিয়া ব্যক্তি সত্তার বিচিত্র সুর জাগাইয়া বাঁধিয়া তুলিতে হয়। তাহার পর একদিন ব্যক্তির সঙ্গীত বিশ্ব-সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া এক অখণ্ড সঙ্গীত ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে।

বিশ্বের সহিত সঙ্ঘাতে একদিকে ব্যক্তির ধীর জাগরণ, অন্যদিকে আবার উহার সহিত মিলাইয়া ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে সঙ্গীত স্থাপনা, কবির কাব্যে প্রথম হইতে এই দুইটি দিক আমরা প্রত্যক্ষ করি।

সৌন্দর্য্য বোধ আশ্রয় করিয়া বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-স্পন্দন মানব-চেতনায় ধীরে সঞ্চারিত হইয়া যায়। সন্ধ্যা সঙ্গীতে কবির জীবনে প্রাণের প্রথম উপলব্ধি।

এই যে দুঃসহ প্রাণের বেগ, ইহার স্বরূপ কি, ইহার লক্ষ্য কোন্ দিকে, ইহার পরিণাম কোথায়? এই প্রেরণার দার্শনিক স্বরূপ যাহাই হোক, এই জিজ্ঞাসা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এমনি এক প্রকার অধ্যাত্ম প্রত্যয় কবি ওই শৈশব কালেই কেমন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন যে বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলন বোধে কেবল এই বেদনার অবসান ঘটিতে পারে।

আজ কবির অন্তরেও যেমন, বাহিরেও তেমনি সামঞ্জস্যের কোন বোধ নাই, সর্ব্বত্র কেবল এক প্রকার অন্ধ, মূঢ়, জড়প্রবাহ। নিখিল বিশ্ব কবির নিকট আজ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য শূন্য, মিল বিরহিত, ভঙ্গুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"পূর্ণকবি অন্ধকাব তোব
তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায়,
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙ্গাচোরা জগতের প্রায়।" (সন্ধ্যা)

মনে হয় সমস্ত কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, হারাইয়া যাইতেছে, ফুরাইয়া যাইতেছে, এখানে আশ্রয় করিবার মত কিছু নাই। সেই সঙ্গে জাগে এক অলৌকিক নিঃসহায়তা ও একাকীত্ব বোধ।

"একবাব ফিরে কেহ দেখে নাকো ভুলি
সবে চলে যায়।" (পবিত্যক্ত)

ব্যক্তি চেতনায় এমনি এক গূঢ় মিলন বোধ জাগে। সে যেন কোন্ জন্মান্তরীণ স্মৃতি। মনে হয় এক কালে যেন আমরা তাহার সহিত একাত্ম হইয়া ছিলাম, কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিযাছি। মিলন লাভের জন্য তাই এমন ব্যাকুলতা। আমরা তাহার জন্য অশ্রুজলে পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছি।

"ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাঁদিত ওইখানে।
আর বার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।" (সন্ধ্যা)

সৌন্দর্য্য সম্ভোগের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটে। প্রাণের এই উপলব্ধিতে প্রথমে বিশিষ্ট কয়েকটি বোধ একান্ত হইয়া পড়ে। এক প্রকার

প্রবল ভাবাতিরেকে সমগ্র চেতনা একমুখীন হইয়া অসহনীয় বন্ধন-বেদনা বোধ করিতে থাকে। মনে হয় অতি সঙ্কীর্ণ এই বোধের আবেষ্টনী হইতে আর বুঝি সে কোন প্রকারে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এমনি এক প্রকার মানসিক অবস্থা কবিও বোধ করিয়াছিলেন।

"ভূমিপানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়
তবু গান ফুরায় না আব।" (হৃদয়ের গীতধ্বনি)

আবার এই বিশ্ব প্রকৃতির যোগেই ধীরে ধীরে সামঞ্জস্য বোধ গড়িয়া উঠে। এই সম্পর্কে একান্ত কৈশোর হইতে কবির অন্তরে স্থির এক প্রকার অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। ইহা যেন কোন্ অতি-চেতনা-লব্ধ নিয়তি নির্দেশ। ভাবের ঐকান্তিকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কবি তাই বিশ্বের মিলন বোধটিকেই নিবিড়তর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"হৃদয়রে আর কিছু শিখিলিনে তুই
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান।" (হৃদয়ের প্রতিধ্বনি)

ভাবাতিরেকে হৃদযের সামঞ্জস্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য মানুষ প্রথমে দুটি উপায় অন্বেষণ করে,—হয় ব্যক্তিকে লোপ করা, অর্থাৎ হৃদয় নিরুদ্ধ করা নতুবা বিশ্বকে কোন একটা উপায়ে অস্বীকার করা। ইহার কোনটিই সমস্যা সমাধানের পথ নয়। বিরোধে যে সমস্যা জাগে মিলনে তাহার সমাধান হয়। আর কোন পথ নাই। মিলন বোধের রূপ বিচিত্র হইতে পারে, কিন্তু উহাই তাহার একমাত্র নিয়তি। ভাবাতিরেকে যখন হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে কবি তখন ওই হৃদয়কেই একেবারে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হৃদয নিরুদ্ধ করিয়া সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের সেই আকাঙ্ক্ষা—

"আজ রাতে রব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়।" (শান্তি গীত)

ব্যক্তি ও বিশ্বের এই বিরোধটিকে লোপ করিয়া দিতে কবি কখন নিখিল বিশ্বকে আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছেন। একটি ভাব-লোকে বহির্বিশ্বকে আত্মসাৎ করা কোথাও সম্ভব হইলেও তাহা একটি স্বল্পকাল স্থায়ী ভাব-তন্ময় অবস্থা মাত্র। তাহা

পূর্ণ সামঞ্জস্য তত্ত্ব নহে। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র মধ্যে এই জাতীয় অতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার একটি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

"প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই।" (অসহ্য ভালোবাসা)

প্রাণ যেমন বিচিত্র ভাব জাগাইয়া সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া দেয়, তেমনি বিশ্ব-প্রাণের যোগে অন্তরের মধ্যে আবার ধীরে ধীরে একটি সুষমা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই আন্তর সুষমার সহিত পরিণামে বিশ্ব-সুষমার মিলন ঘটে।

ব্যক্তি-চেতনা মুক্ত হইলে যে সকল সমস্যার সমাধান ঘটে ওই মুক্তি লাভের জন্য যে বিশ্বকে আশ্রয় করিতে হয়, বিশ্বের সহিত ব্যক্তির পূর্ণ মিলনে যে মানুষ পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ পায়, জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান যে কেবল ওই পরিণাম লাভে ঘটিতে পারে, এমনি এক প্রকার বোধ যত অসম্পূর্ণ এবং অস্ফুট ভাবে হোক না কেন কবি ওই কৈশোরেই কেমন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন!

ব্যক্তি-চেতনা মুক্ত হইয়া যে বিশ্বের সহিত মিলিত হইতে হয় তাহারই স্থির প্রত্যয়।

"বিশ্ব চরাচর ময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়
উল্লাসে পুরিবে চারিধার,"—(সংগ্রাম-সঙ্গীত)

ভাব মুক্ত হইয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার জন্য কবি কখন কখন ভীষণ বিক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

"যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গনি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রনায়,—"(দুঃখ-আবাহন)

প্রাণের এই জাগরণের পূর্ব্বে শৈশবে কবি যে সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ করিতেন, তাহাতে বেদনা বোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণতর সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারও নয়। প্রাণের জাগরণে সকল সামঞ্জস্য বোধ যেন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যায়, মনে হয় যেন সৌন্দর্য্য বোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অসহনীয় বেদনা বোধের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনার ধীর বিকাশ ঘটে। তাহার পর আবার ওই বিশ্ব-প্রাণের সহিত গভীরতর মিলন বোধের ভিতর দিয়াই হৃদয়ে এক পূর্ণতর নূতনতর সামঞ্জস্য বোধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

'আমি হারা' কবিতাটির মধ্যে কবি প্রাণের জাগরণের পূর্ব্বে এবং ওই জাগরণ মুহূর্ত্তের উপলব্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন। ওই বেদনার সমুদ্র পার হইয়া মানব চেতনা যে শাশ্বত আনন্দ ও সৌন্দর্য্য-লোকে উত্তীর্ণ হয়, এক্ষেত্রে অবশ্য তাহার কোন পরিচয় থাকিতে পারে না। তাহা অনেক পরের কথা।

কবি ইহাও বোধ করিয়াছেন, যে এই রূপময় জগৎ প্রতিভাস স্বরূপে সত্য। কোন এক পরম তত্ত্বের সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই অনন্ত কোটি বিচ্ছিন্ন রূপের আশ্চর্য্য প্রকাশ, এবং ওই বিচিত্র রূপ তাহাকে আভাসিত করিয়া তুলিতেছে। কবি তাই কোন কালেই এই প্রতিভাসকে আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

"তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালোবাসি বলে যেন কখনো ক'রো না ভুল।
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমি তো কেবল তার পাষাণ-প্রতিমাখানি"। (পাষাণী)

বহির্বিশ্বের সহিত সঙ্ঘাতে কবির অন্তর্লোক ধীরে ধীরে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। এই ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎ করিয়া কবি ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত পুলকিত অন্যমন হইয়া পড়েন। সমুদ্রনিহিত অপার ঐশ্বর্য্য যেমন ঢেউএ ঢেউএ প্রহৃত হইতে হইতে বেলা-ভূমিতে বিকীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি কবির চিত্ত-সমুদ্রের অপার সৌন্দর্য্য বহির্বিশ্বের তটে আছড়াইয়া পড়িয়া একে একে ছড়াইয়া যাইতেছে।

অন্তরের এই জাগরণ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে, বাহিরের সৌন্দর্য্য-লোক ততই বাড়িয়া যায়। সামঞ্জস্য বোধ যেমন, সৌন্দর্য্য বোধও তেমনি ব্যক্তি ও বিশ্বের যোগে গড়িয়া উঠে। বস্তুতঃ যাহা সামঞ্জস্য তাহাই সুষমা বা সৌন্দর্য্য।

ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রাণের সেই প্রথম জাগরণ বলিয়া প্রেম-বোধে কেবল প্রবৃত্তির দাহ, ইন্দ্রিয় নিপীড়নের অসহনীয় জ্বালা।

"প্রণয় অমৃত একি? এযে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে—প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ শোনিত করেছে জল।" (হলাহল)

বিচ্ছেদ-আকীর্ণ এই জীবনে স্মৃতি তাই একমাত্র সম্বল। উহারই আলোকে জীবনে পথ চলিতে হয়। সত্যদিক্‌দর্শী প্রেম।

"এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পুরবে
আর কিবে এ জীবনে ফিরে আসা হবে।" (দু-দিন)

জীবনে প্রেম এমনি অসহায়। কাহাকেও আমরা চিরকাল বাহু বেষ্টনে ধরিয়া রাখিতে পারি না। পথের বিচিত্র আকর্ষণে কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। দূরে নির্জ্জন অবসরে তাহারই ব্যাকুল মিনতি বিজড়িত অসহায় মুখ হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। নিদ্রায় সে বেদনা জাগিয়া উঠিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে থাকে ;—যেন একেবারে মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া সেই হাহাকার উঠে ; 'তোমাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা নাই'—একান্ত অবোধ অসহায় সেই আকাঙ্ক্ষা।

"শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার,
স্বপনেতে প্রতি নিশি হৃদয়ে উঠিবে ভাসি
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।

*   *   *

চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে,
"যাবে তবে ? যাবে ?" সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে।" (দু-দিন)

প্রাণের এই ধীর জাগরণের ভিতর দিয়া মানব-চেতনার বিকাশ ঘটে। প্রাণের জাগরণের ভিতর দিয়া চেতনার সেই ধীর বিকাশ—

"আগে কে জানিত বল কত কী লুকানো ছিল হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া পাইনু দেখিতে।" (উপহার)

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রাণ ব্যক্তিচেতনায় আপনাকে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করে। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের যোগ যত সম্পূর্ণ হয় অন্তরে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ ততই ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করিতে থাকে। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও অন্তরের মধ্যে কোন একটি রূপ তাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না, বারবার খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই রূপটিই (একটি ভাবের আকর্ষণে একটি আনন্দের টানে খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ আবর্ত্তিত হইতে হইতে একটি পূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠে) অধ্যাত্ম সত্তা ; ইহার যোগে বিশ্বের সকল রূপের সহিত কবি প্রাণের মিলন ঘটে। কবির সেই অপর সত্তার বিকাশ এক্ষেত্রে একান্ত অসম্পূর্ণ। নিম্নের

উদ্ধৃতিটির মধ্যেও এই রূপ একটা আভাসে ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়া আবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

"যবে এই নদী তীরে বসি তোব পদ তলে,
তাবা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেবে ঘিরিয়া চাবি পাশে ;
হয় তো একটি হাসি একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে, কভু বা মিলায়।" (সন্ধ্যা)

এইকালে কবির অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহা একান্ত অসম্পূর্ণ, এতই ভঙ্গুর—

"অনন্ত এ আকাশেব কোলে
টলমল্ মেঘেব মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর—," (গান আরম্ভ)

এই সৌন্দর্য্য-লোক তো বিশ্বপ্রাণের যোগে সত্য নয়। ইহা কেবল ভাব কল্পনায় গড়িয়া তোলা, তাহাও আবার একান্ত দুর্ব্বল।

যত অসম্পূর্ণ হোক-না-কেন একটা সামঞ্জস্য বোধ কোন-না-কোন রূপে সকল সময় মানব চেতনায় থাকে। প্রাণের আন্দোলনে যে সৌন্দর্য্য সম্পদ হৃদয়-তটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা কুড়াইয়া লইয়া কবি আপনার অন্তরে একটি নিভৃত সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। ওই সৌন্দর্য্য-ধ্যানে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও কবি তন্ময় হইয়া যাইতেন। ওইকালে আর প্রাণের বিক্ষোভ অনুভূত হইত না।

"এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহেব নিকেতন,
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।

* * *

এমনি হয়েছে শান্ত মন
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা—" (আবাব)

এই সামঞ্জস্য বোধ একান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া আবার মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

"আবার আশ্রয় হারা ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘখণ্ড সম—" (আবার)

প্রভাত সঙ্গীত

'প্রভাত সঙ্গীতে' আসিয়া কবি-চেতনা কতকটা হৃদয়াবেগ মুক্ত হইয়াছে। কবি-চেতনা কেমন করিয়া এই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল, এই মুক্তির স্বরূপই বা কি তাহার পরিচয় লাভের পূর্ব্বে কবিকে এই মুক্তি লাভের জন্য যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

হৃদয়াবেগের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া একদিকে ব্যক্তির অসহনীয় বন্ধন নিপীড়ন,

"ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত—" (আহ্বান সঙ্গীত)

অন্যদিকে নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত করিযা দেশ-কালের উভয় তীর পূর্ণ করিয়া অনন্ত প্রাণ-ধারা সংখ্যাতীত রূপের ঢেউ তুলিয়া ছুটিযা চলিয়াছে।

"অসীম আকাশে, স্বাধীন পবাণে
প্রাণের আবেগে ছোটে।" (আহ্বান সঙ্গীত)

ব্যক্তির আবেষ্টন মুক্ত হইয়া মানবীয় চেতনা যখন বিশ্ব-চেতনা লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ বিশ্বের প্রাণ স্পন্দের সহিত ব্যক্তির প্রাণ-স্পন্দন যখন সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্তির আস্বাদ পায়। কবি এই অপরিণত বয়সেও এমন স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় লাভ করিয়াছেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, যে কবি আপনার সাধন পথ সম্পর্কে প্রথম হইতেই একপ্রকার নিঃসংশয় ছিলেন।

ওই পরিণাম লাভ করিলে মানুষ আপনার চেতনাকেই বিশ্বের অনন্ত কোটি রূপের মধ্যে লীলায়িত দেখে। এক জ্যোতি সমুদ্রে এই অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র বুদ্বুদের মত মুহূর্ত্তে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার হারাইয়া যাইতেছে। কে যেন অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া দেশ-কালের বক্ষে আগুনের ফুল ঝুরি জ্বালাইয়া দিয়াছে! এই সংখ্যাতীত গ্রহ নক্ষত্র তাহারই এক একটি অগ্নি কণিকা—মহাশূণ্যে আলোর ফুল ফুটাইয়া নিমেষে ঝরিয়া যাইতেছে।

"শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়।" (স্রোত)

এই যে সৃষ্টি-লোক জুড়িয়া অনন্ত প্রাণ-ধারা নিত্যকাল ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? ব্যক্তি ও বিশ্বের স্বরূপ কি? ব্যক্তি ও বিশ্ব অন্যোন্য নির্ভরশীল হইয়া কোন্ গূঢ় অভিপ্রায় সার্থক করিয়া তুলিতেছে?—এই সমস্ত জিজ্ঞাসার কোন উত্তর লাভ না ঘটুক, (তাহা অনেক পরের কথা) কবি অন্ততঃ জীবের নিয়তি সম্পর্কে এই কালেই একপ্রকার নিঃসংশয় হইয়াছেন। সেই পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষা—

"জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না" (স্রোত)

আমাদের সকল বেদনার সকল অপরাধের মূলে আছে এই বিচ্ছিন্ন বোধ। এই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া কবি আপনার সঙ্কীর্ণ ভাব-লোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এক দুর্লভ মুহূর্তে আকস্মিক ভাবে কবি-চেতনা ভাবাবেগ মুক্ত হইয়া কল্পনায় বিশ্ব-বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। বিশ্ব-বিহারের সে পরিচয় রহিয়াছে বিশেষ করিয়া 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' এবং 'প্রভাত উৎসবে'র মধ্যে।

"আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

মুহূর্তের এই বন্ধন-মুক্তির অসহনীয় আনন্দ-আবেগকে কবি এমনি করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা একপ্রকার ভাব-যোগে এবং কল্পনায় বিশ্বকে আলিঙ্গন করা।

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।

*　　*　　*

পরাণ পুরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর।

*　　*　　*

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একই গান।" (প্রভাত উৎসব)

যে কবি-কল্পনা 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে' দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ হইয়াছিল, 'প্রভাত সঙ্গীতে' সেই কবি কল্পনা মুক্তিলাভ করিয়া অমন জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। 'প্রভাত সঙ্গীতে'র মধ্যে কবি কল্পনার প্রথম মুক্ত বিহার।

বিচিত্র কল্পনা বিলাস এবং সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবির মানস-লোক কিছুটা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 'কড়ি ও কোমলে' কবি অন্তর ও বহির্জগতের মধ্যে একপ্রকার সংযোগ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের এই মিলন অনুভূতিই রবীন্দ্র-কাব্যে গভীর হইতে গভীরতর হইযাছে।

এই কালে কবির জ্ঞানের বিকাশও অনেকটা ঘটিয়াছে। বিশ্ব-সত্তার যে স্বরূপ কবি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার যে আভাস অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি সেই প্রথম নানা দার্শনিক চিন্তার সহায়তায় বুঝিবার চেষ্টা করিযাছেন। এই দার্শনিক চিন্তা গুলির তাই কিছু বিচার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে না, অন্তরে তাহাদের স্মৃতি রহিয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া আমাদের অন্তরে একটি ভাব-জীবন ধীরে গড়িয়া উঠে। আমাদের অলক্ষ্যে এক অজ্ঞাত নিয়মে এই ভাব-লোক গড়িয়া উঠে। যে গুহাবাসী শিল্পী অন্তরে এই ভাব-লোক গড়িয়া তুলেন তাঁহার স্বরূপ যেমন আমরা জানি না, তেমনি তাঁহার যে গোপন অভিপ্রায়ের ভিতর দিয়া এই ভাব-লোক গড়িয়া উঠে, সেই অভিপ্রায়ও আমাদের অজ্ঞাত।

"স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—" (অনন্ত জীবন)

ভাব বা স্মৃতি-লোকের এই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কবি উহারই বিকল্প স্বরূপে আর একটি তত্ত্ব গড়িয়া তুলেন। বিশ্বে যাহা কিছু বিনষ্ট হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইতেছে না। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া এক আশ্চর্য্য উপায়ে আর একটি মহাদেশ গড়িয়া তুলিতেছে। ব্যক্তির সেই ভাব-জীবনটি যেমন, বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সেই মহাবিশ্বটি তেমনি শাশ্বত কাল ধরিয়া কেবলই গড়িয়া উঠিতেছে। ব্যক্তি ও বিশ্বের এই শাশ্বত সত্তায় কি কোন মিল আছে? মিলনের সেই তত্ত্বটি কি?

"জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ—" (অনন্ত জীবন)

ভাব-লোকের ধীর বিকাশ লক্ষ্য করিয়া কবি তাহারই বিকল্প স্বরূপে অনন্ত জীবনের এমনি এক প্রকার বোধ গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিয়া ব্যক্তি ও বিশ্বাত্মা কবির নিকট অমন বিকাশ ধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে।

'অনন্ত মরণ' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধিটিকেই আর একটি বিশিষ্ট উপায়ে প্রকাশ করিযাছেন।

"মুহূর্ত্ত কালীন মৃত্যু পরম্পরা নিয়ে মর্ত্ত্য-জীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে— ।"

ইহলোকে অথবা লোকান্তরে বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিযা জীবনের যে বিকাশ ঘটিতেছে, এমনি একপ্রকার বোধ কবি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই বিকাশের স্বরূপ কি, এই বিকাশের ভিতর দিযা জীবের কোন্ নিয়তি-রূপ সার্থক হইয়া উঠিতেছে, সে উপলব্ধি কবির জীবনে আজও ঘটে নাই। 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে কবির আর একটি দার্শনিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সৃষ্টির এই নিত্য প্রবাহ যেন কোন কেন্দ্রস্থলে অবিরাম নিপতিত হইতেছে, আর সেই কেন্দ্রস্থল হইতে তাহারই প্রতিধ্বনি আলো রূপে, ধ্বনি রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

কবি ইহা বোধ করিয়াছেন, যে এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপের অন্তরালে একটি পরম কোন তত্ত্ব রহিয়াছে, এই তত্ত্বে অনন্তকোটি রূপ-লোক বিধৃত। এই বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য সেই পরম তত্ত্বের আভাস স্বরূপে সত্য।

> "সৌন্দর্য্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া
> একি তোরি ছায়া।" (প্রতিধ্বনি)

ইহাও কবি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, যে মানব অন্তরে যে ব্যাকুলতা তাহা এই বিচিত্র রূপের অন্তরালবর্ত্তী তত্ত্ব লাভের জন্য।

মানস-চেতনায় সীমা-লোকে অসীমকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে কবি মানস-লোকটিকে জীবের শাশ্বত নিয়তি বলিয়া বোধ করিয়াছেন। তাই অসীমের জন্য জীবকে নিত্য কাল বেদনা-ভার বহন করিয়া ফিরিতে হইবে।

"এই বিশ্ব জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্য্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী।" (প্রতিধ্বনি)

বিচ্ছিন্ন রূপের অন্তরালে যে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা রহিয়াছে এসম্পর্কে কবি নিঃসংশয় ছিলেন। এই অবিচ্ছিন্ন সত্তার স্বরূপ কি? কবি বলিতেছেন, তাহা এক অখণ্ড রূপ। এই অখণ্ড রূপের বক্ষে খণ্ডরূপের নিত্য আবির্ভাব ও বিলয়। অখণ্ড রূপের এই বোধটিকে কবি অমন 'প্রতিধ্বনি' রূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবি অখণ্ড রূপের এই তত্ত্ব গড়িয়া তোলেন অনুভূত সীমাবদ্ধ বোধের বিকল্প স্বরূপে। বস্তুতঃ তাহা এক পরম অস্তিত্ব বোধ মাত্র। আমাদের মন সীমাবদ্ধ বলিয়া অসীম বা অরূপ সম্পর্কে আমরা যখন কোন বোধ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করি, তখন তাহা সীমার বিচিত্র তত্ত্ব, বিচিত্র সমাহার হইয়া উঠে। তত্ত্বগুলি তাই মন বা সীমাধর্ম্মী।

অখণ্ড রূপের এই তত্ত্বটিকে আর একটি দিক হইতে বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। ইন্দ্রিয় চেতনা আশ্রয় করিয়া অন্তরের মধ্যে যে বিচিত্র, বিচ্ছিন্ন, খণ্ড সৌন্দর্য্য সঞ্চিত হইতে থাকে, কোন একটা আবেগ মুহূর্ত্তে ওই সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্য্য এক একটি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে।

অন্তরের মধ্যে এই যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য এক একটি দিব্য মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহার দার্শনিক স্বরূপ কি? ইহা সেই গূঢ় প্রেরণার মুহূর্ত্ত যে মুহূর্ত্তে উর্দ্ধতর চেতনার অতি চকিত আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়।

ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া অন্তরের মধ্যে যেমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য গড়িয়া উঠিতেছে, তেমনি উর্দ্ধ পরিণাম লাভের প্রেরণায় ওই বিচিত্র সৌন্দর্য্য এক একটি সুষমা মণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। অধ্যাত্ম সত্তায় এই দুটি প্রক্রিয়া যুগপৎ চলিতে থাকে যে পর্য্যন্ত না মানস-লোকের পূর্ণ জাগরণ ঘটে।

কবি-মানসের পরিণাম ধারা এই দুই দিক হইতে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। একদিকে ইন্দ্রিয় চেতনা আশ্রয় করিয়া অন্তরে সৌন্দর্য্য আহরণ, অন্যদিকে উর্দ্ধতর চেতনার প্রেরণায় আর এক সুষমা মণ্ডিত খণ্ড রূপের সৃষ্টি। কবির সৃষ্ট বিচিত্র খণ্ড-রূপ তাই অরূপের সিম্বল বা প্রতীক হইয়া উঠে।

'অনন্ত জীবন' 'অনন্ত মরণ' ও 'প্রতিধ্বনি' কবিতা তিনটির মধ্যে একটি সাধারণ ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই জীবনে যেমন এই জগতে তেমনি কোন কিছু হারাইয়া যাইতেছে না। ব্যক্তির প্রতি মুহূর্ত্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভাবনা-চিন্তা, আনন্দ-বেদনার ভিতর দিয়া অন্তরে একটি স্থায়ী সত্তা যেমন ক্রমাগত হইয়া উঠিতেছে, যে সত্তা মৃত্যুঞ্জয়ী, জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত; তেমনি বহির্বিশ্বের নিয়ত উঠা-পড়া, ভাঙ্গা-গড়া, সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া বিশ্বাত্মা ক্রমাগত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বের যোগে ব্যক্তি-সত্তার প্রকাশ, তাহার বিচিত্র সৃষ্টি বলিয়া বিশ্বাত্মায় সকল ব্যক্তি-সত্তার সহিত তাহাদের সকল সৃষ্টি-রূপও কোন-না-কোন স্বরূপে রহিয়া যাইতেছে, তাহাদের একান্ত বিনষ্টি ঘটিতেছে না।

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, পরবর্ত্তী জীবনে কবির এই উপলব্ধি যেমন গভীরতর ও স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, তেমনি ইহাকে তিনি নানা রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের একটি দিক অর্থাৎ সকলের যোগে সমস্ত কিছুর যে চির অস্তিত্ব, তাহার নিঃসংশয় উপলব্ধি কবি এই জীবন-পর্য্যায়েই একপ্রকার লাভ করিয়াছেন!

এই প্রসঙ্গে পরিশেষে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি। কবিতাটির নাম 'মহাস্বপ্ন'। এক শাশ্বত চেতনার বক্ষে রূপের বিচিত্র লীলা—

"এক শুধু পুরাতন, আব সব নূতন নূতন
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।" (মহাস্বপ্ন)

ইহার মধ্যে

"অপূর্ণ স্বপন সৃষ্ট মানুষেবা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতা তরে পাইতেছে কত না প্রয়াস।" (মহাস্বপ্ন)

বিশ্বের এই সৃজন-প্রলয়-লীলা, বারংবার এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া জীব পূর্ণতা লাভের জন্য সাধনা করিতেছে। জীবের এই নিয়তি সম্পর্কে কবির দৃষ্টি কখন বিচলিত হয় নাই। এই মুল উপলব্ধি আশ্রয় করিয়া কবির জীবনে একটির পর একটি দার্শনিক জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। পরিণামে এই সমস্ত উপলব্ধি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে।

ছবি ও গান

কবি-চেতনা হৃদয়াবেগ মুক্ত হইয়া উহারই অসহনীয় আনন্দ নিপীড়নে একযোগে সমস্ত কিছু লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বময় বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু এমনি করিয়া সমস্ত কিছু একত্রে লাভ করিবার চেষ্টা করিলে কাহাকেও লাভ করিতে পারা যায় না।

একটি সীমাবদ্ধ রূপ আশ্রয় করিয়া মন প্রথমে ধ্যান তন্ময় হয়, তাহার পর গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উহা পরিণামে সকল রূপের মর্ম্মস্থলে পৌঁছাইয়া যায়—, যেখানে এই নিখিল বিস্মৃষ্টি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত একটি চেতনাবৃন্তে বিধৃত হইয়া আছে। ইহাকেই বলিয়াছি বিশ্বাত্মা। মানবীয় চেতনা এইরূপে এক একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া পরিণামে তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। বিশ্বকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র পথ। যে মন রূপ ইহাতে রূপে বিহার করিয়া ফিরে সে মন কখন ওই পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

বিশ্ব পরিণাম লাভ অনেক পরের কথা, ধ্যান তন্ময়তা না থাকিলে কোন রূপও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। মানবীয় চেতনা যতই ধ্যান তন্ময় হইতে থাকে ততই রূপের গভীরে একটির পর একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য-লোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

'ছবি ও গানে'র মধ্যে কবিচেতনা এক একটি রূপ আশ্রয় করিয়া ধ্যান তন্ময় হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টা কবির ওই বয়সে যত অসম্পূর্ণ হোক তাহা বড় কথা নয়, বিচারের কথাও নয়। আমাদের যাহা লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা ওই পথ ও প্রয়াসের রূপ। 'ছবি ও গানে'র সৌন্দর্য্য কল্পনা ভিত্তিহীন অর্থাৎ বাস্তব প্রেরণা শূন্য বলিয়া ছবিগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাস্তব প্রেরণা শূন্য বলিয়া রূপ-সৃষ্টির সহিত কবির অন্তরের ধ্যানের মিলন ঘটে নাই।

বাস্তব সৌন্দর্য্যের সীমা বেষ্টনীতে অন্তরের ধ্যানই আগুন ধরাইয়া দেয়, এই অগ্নির অসহনীয় উত্তাপে রূপ সীমা হারাইয়া অরূপে বিগলিত হইয়া যায়।

রূপগুলি যেমন বাস্তব ভিত্তিহীন, কবির অন্তরের ভাবনাগুলিও তেমনি জীবনাশ্রয়ী নহে, কল্পনার উত্তাপে একান্ত স্ফীত। জীবনের সহিত জগতের নিবিড় মিলনের অনুভূতি 'ছবি ও গানে' কোথাও সত্য হইয়া উঠে নাই।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের স্বপ্ন বিহ্বলতা এবং কল্পনা যোগে বিশ্ব বিহার বলিতে কী বুঝাইতে চাহিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

একটি কবিতার নাম 'জাগ্রত স্বপ্ন'। জাগ্রত স্বপ্নই বটে। ইহা খাঁটি সৌন্দর্য্য-ধ্যান কিংবা ওই জাতীয় সৌন্দর্য্য তন্ময়তা নহে। এক প্রকার মধুর কল্পনা বিলাস মাত্র। খাঁটি সৌন্দর্য্য-ধ্যানে দেহ-প্রাণ-মনের সকল বৃত্তি একমুখীন হইয়া দীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠে।

"চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন-মাধুরী ভরে—।" (জাগ্রত স্বপ্ন)

'পাগল' ও 'মাতাল' এই দুটি কবিতায় কবির এই স্বপ্ন বিভোরতার বিহ্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি ওই দুটি কবিতা হইতে দুটি অংশ কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

"সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
সৌরভের মত উড়ছে বাতাসেতে,—" (পাগল)

কিংবা

"বুঝিবে চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলুঢুলু আঁখি দুটি
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।" (মাতাল)

ইহা কবির বয়ঃসন্ধিকাল, কৈশোর অতিক্রম করিয়া কবি সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন; সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ তাই ক্ষীণ ভাবে জাগ্রত হইবেই। তবে তাহার বিষক্রিয়ার সহিত কবিকে তখনও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। বিষক্রিয়া বলিতে প্রাণ-মনের অতি তীব্র বিক্ষোভের কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছি।

'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র মধ্যে তাহার পরিচয় একান্ত স্পষ্ট হইয়া আছে। এক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সপ্ত জাগ্রত বোধ বহির্লোকে অমনি কল্পনা আশ্রয় করিয়া চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে।

"বাঁধিবে সে বাহু পাশে   চোখে তার স্বপ্ন ভাসে
মুখে তাব হাসিব মুকুল,
কে জানে বুকেব কাছে   আঁচল আছে না আছে
পিঠেতে পড়েছে এলো চুল।" (মধ্যাহ্নে)

ইহা যে বাস্তব-জীবন লব্ধ সত্য প্রেম পিপাসা এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্য্য-প্রেরণা নহে তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে সৌন্দর্য্য-প্রেমের এই স্বপ্ন সঞ্চরণের মধ্যে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কোন-না-কোন স্বরূপে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বারংবার ব্যক্ত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার একটি রূপ নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"নিদ্রাব সাগব জলে মহা আঁধাবেব তলে,
চারিদিকে প্রসারিত একী এ নূতন দেশ,—" (নিশীথ চেতনা)

সকল রূপের অন্তরালে যে এক অখণ্ড রূপ-লোক রহিয়াছে, জাগতিক রূপের মধ্যে যে তাহারই কিছু আভাস লাভ করা যায়, এমনি এক প্রকার ধারণা এই কালে কবির অন্তরে ছিল।

অতৃপ্তি বোধের নিত্য পীড়া হইতে কবির অন্তরে এমন বোধ জাগিয়াছে। নিম্নে যে কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, সৌন্দর্য্য-কল্পনা ও ভাব-প্রেরণার দিক হইতে তাহা বোধ করি এই কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা।

"কে তুমি গো উষাময়ী,   আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে কবেছ গোপন,
রূপের সাগর মাঝে   কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিণী লক্ষ্মীর মতন।

*   *   *

সৌন্দর্য্য-কোরক টুটে   এস গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়,
আমি তাহে ডুবে যাব   সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।" (আচ্ছন্ন)

মাঝে মাঝে কবির সৌন্দর্য্য-কল্পনা-বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিশিষ্ট একটি রূপ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া এই মনন, তাহা বাস্তব জীবন লব্ধ নয়। জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কবি তখনও আসিতে পারেন নাই। দূর অলিন্দ হইতে অসংলগ্ন ভাবে যে সমস্ত ছবি তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে ভাসিয়া উঠিত, সেগুলি অনেকটা কল্পনায় ভরিয়া তোলা। কিন্তু এই জাতীয় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কল্পনা বিলাস সত্ত্বেও কবির অন্তরের মিলন পিপাসাটি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবে কল্পনা মাত্র বলিয়া আসঙ্গ লাভের পিপাসা তীব্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা, বিশ্ব মিলন লাভের গভীর অধ্যাত্ম-প্রেরণা এই জাতীয় কল্পনা-বিলাসে বেশী দিন নিরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র, মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। 'ছবি ও গান' হইতে কবির চিত্র চিত্রনের সেই বিচিত্র প্রযাসের কিছু পরিচয় দান করিতেছি।

> "ঝিকি মিকি বেলা,
> গাছেব ছায়া কাঁপে জলে,
> সোনাব কিবণ করে খেলা।" (দোলা)

সূর্য্য কিরণ বৃক্ষের ঘন পত্রান্তরাল হইতে তরল কালো জলের বুকে পড়িয়া আলো-ছাযার বিচিত্র আলপনা আঁকিয়া আঁকিয়া মুছিয়া মুছিয়া খেলা করিতেছে।

ছবি ফুটাইয়া তুলিবার কী প্রাণপণ প্রয়াস। অতি সূক্ষ্ম রেখা টানিবার চেষ্টাটিও লক্ষ্য করিবার মত, কিন্তু ওই প্রত্যেকটি রেখা একটা পরিপূর্ণ রূপের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠে নাই। ইহার কারণ কবির অন্তরে অতিস্থির সৌন্দর্য্য-ধ্যান নাই। বাহিরের রূপের সহিত কবির ধ্যান-রূপটির মিলন ঘটে নাই বলিয়া তাহা ঠিক সৃষ্ট সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। কতকটা যেন ফটোগ্রাফীর মত। উহা সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার নয়।—বাহিরে রূপের আশ্রয়ে যাহা অন্তরের সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারই বটে। ইহার আরও কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

> "একটি মেয়ে একেলা
> সাঁঝের বেলা
> মাঠ দিয়ে চলেছে
> চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।
> ওব মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
> চুলেতে করিছে ঝিকি মিকি।" (একাকিনী)

হেমন্তের সন্ধ্যা আসন্ন। চারিদিকে পরিপক্ক ধানের ক্ষেত। উহারই মাঝ দিয়া একাকী একটি তরুণী পথ চলিয়াছে। অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রক্তিম আভা রমনীর মুখে, আলুলিত বিস্রস্ত কেশ পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে ওই সৌন্দর্য্য-বিহ্বলতা এবং কল্পনা বিলাস যখন কিছুটা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে তখন এমনি করিয়া দূরস্থিত জগতের এক একটি ছবি আপনিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি গুলি তাই কল্পনার কুয়াসা বিজড়িত হইয়া যথেষ্ট স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাণের এই গূঢ় আকর্ষণে কবি উহাদের সহিত একাত্মতা বোধ করিয়াছেন। উহাদের দেখিলে তাই তাঁহার হৃদয় অমন স্নেহ বিগলিত হইয়া পড়ে, পরম স্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতে সাধ যায়।

> "একা একটি বনফুল ফোটে ফোটে হয়েছে,
> কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।" (আদরিণী)

এখানেও ওই রূপ ফুটাইয়া তুলিবার সচেতন প্রয়াস।

> "আকাশের ধাবে ধারে ঘিরে
> বসেছে রাঙ্গা মেঘের মেলা,
> শ্যামল ঘাসেব পবে, সাঁঝে
> আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে,
> ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা।" (খেলা)

রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের প্রান্ত ঘিরিয়া চতুর্দ্দিকে মেঘ করিয়াছে। যেন প্রবাল ঘেরা নীলকান্ত মনি। নিম্নে শিশুর কলরব মুখরিত শ্যামল তৃণাবৃত প্রান্তর—উহার উপর আলো-ছায়ার বিচিত্র জাল বোনা হইতেছে। এতটুকু বাতাস বহিতেছে না। ঝাউগাছের পাতাটি পর্য্যন্ত স্থির। পস্ফুটিত কামিনীর অতি শিথিল পাঁপড়িটি পর্য্যন্তও নড়িতেছে না।

এমনি করিয়া দূর হইতে কবি একের পর এক ছবি দেখিয়া চলিয়াছেন,—অস্পষ্ট, কল্পনার বাষ্প ঘেরা, ভাসা ভাসা।

সেই একই রূপ-কল্পনার পরিচয়—

> "ওই জানালার কাছে বসে আছে
> করতলে রাখি মাথা।
> তার কোলে ফুল রয়েছে
> সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।" (সুখ স্বপ্ন)

এই রূপ গভীর ধ্যান তন্ময়তার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।—যে ধ্যান পরিণামে রূপকে ছাড়াইয়া সকল রূপের অতীত লোকে মনকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, বিশ্বের সকল রূপ যে রূপের পদতলে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে চায়, যাহার বিকীর্ণ জ্যোতিতে বিশ্বের সকল রূপ উদ্ভাসিত, সেই জাতীয় রূপ-ধ্যানের কোন পরিচয় অবশ্য এখানে থাকিতে পারে না।

কবি যে সুখকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন,—

"মধুব আলস,—মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে—প্রাণেব মাঝারে
বাজিছে মধুব বাঁশিটি।" (সুখ স্বপ্ন)

তাহাকে একটি রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেও সমর্থ হন নাই। —বিশ্ব ও রূপ যেখানে পরস্পর পরস্পরকে সার্থক করিয়া একটি অখণ্ডতা লাভ করে।

নিশীথিনীর মূক বেদনাকে একটি নারী-বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা।

"ঘন গাছের পাতার মাঝে, আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা,
তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ আঁচল খানি পেতে যেন
গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।
গভীর রাতে বাতাসটি নেই; নিশীথে সবসীব জলে
কাঁপে না বনের কালো ছায়া,
ঘুম যেন ঘোমটা পরা বসে আছে ঝোপে ঝাপে,
পড়ছে বসে কী যেন এক মায়া।
চুপ করে হেলে সে বকুল গাছে,
রমণী একেলা দাঁড়ায়ে আছে।" (বিদায়)

উদ্ধৃতিটির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, সেই নারী-রূপ যেমন সেই বেদনাও তেমনি জীবন ও জগতের যোগে সত্য নহে বলিয়াই কোন একটা স্পষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

'মধ্যাহ্নে'র পরিব্যাপ্ত আনন্দকে যে রূপ আশ্রয় করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মানবিক প্রেম ও প্রীতির দিকটা একান্ত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক মহিমার দিকটিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া কবি অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে মোহ-লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই বিভোর হইয়া থাকিতে চাহিতেন, তাহা এক এক সময় বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তব সংস্পর্শে এই জাতীয় অবাস্তব সৌন্দর্য্য-ধ্যান ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার পর জীবন ও জগতের যোগে ভিন্নতর সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া উঠে।

বাস্তবের রূঢ় সংস্পর্শে কবির একান্ত স্পর্শ কাতর মন যেমন বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে, তেমনি পর মুহূর্ত্তে ওই সৌন্দর্য্য-লোকটির মধ্যে আত্ম গোপন করিয়া কবি আপনার প্রাণকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তব লোক হইতে পলাইয়া কবির সেই আত্ম গোপনের প্রয়াস—

"কেবল রয়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে লয়ে
কারণ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।" (নিশীথ-জগৎ)

"ভালোবেসে কাছে গেলে দূরে চলে যায় সবে,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ।" (নিশীথ-জগৎ)

এই জগতে যেমন সুন্দর আছে তেমনি অসুন্দর আছে, যেমন মঙ্গল আছে, তেমনি অমঙ্গল আছে। ওই সৌন্দর্য্য-ধ্যান কোনকালেই স্থায়ী হইতে পারে না যতদিন না কবি সকল সুন্দর-অসুন্দর পাপ-পুণ্যের পশ্চাতে সেই পরম মিলন তত্ত্বটি সাক্ষাৎ করিতে পারেন। 'নিশীথ জগৎ' কবিতাটির মধ্যে কবি সুন্দর-অসুন্দরের বহিঃ প্রকাশটি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পশ্চাতে পূর্ণ মিলন তত্ত্বটিকে তখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। মানবীয় চেতনায় পাপ-পুণ্যের, সুন্দর-অসুন্দরের পৃথক বোধটি থাকে। উহার সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে এক অখণ্ড চেতনায় সকল বিরোধাভাস মুহূর্ত্তে লুপ্ত হইয়া যায়। বাহিরে অতি জটিল, অতি কুটিল, অতি নির্ম্মম সংসার প্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়া কবি ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যদিকে আবার অন্তস্তল হইতে বাঁশরির মিনতি মাখান করুণ আহ্বান ধ্বনি, স্বর্গ-লোকের পারিজাতের গন্ধ ভাসিয়া আসে— ওখানে যেন প্রাণের সকল পিপাসা মিটে, যেন সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়—সকল

বিরোধ ওখানে যেন সামঞ্জস্যীভূত। ওই সুরে ওই গন্ধে কবি মন আবার ধীরে ধীরে তন্ময় হইয়া হারাইয়া গিয়াছে।

"কোথায় ফুটেছে ফুল, আঁধারের কোন্ তীরে
কোথা কোন্ দেশ।" (নিশীথ-জগৎ)

কিন্তু সেই হৃদয়-লোকটিকে কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়, কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া তাহা কবি আজও নিঃসংশয়ে বোধ করিতে পারেন নাই।

"হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায় ফুল ফোটে
পথ জানি নাই।" (নিশীথ-জগৎ)

কড়ি ও কোমল

'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আপনার কবি-ধর্ম্মটিকে নিঃসংশয় রূপে লাভ করিয়াছেন। কবি-প্রাণের এই জাগরণ যেমন অত্যন্ত দ্রুত, তেমনি অভ্রান্ত। অত্যন্ত দ্রুত বলিলাম, এই কারণে যে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান' হইতে 'কড়ি ও কোমলে'র ভাব পরিণাম গত পার্থক্য অনেক খানি।

কবি-প্রাণের পূর্ণ জাগরণ এবং আপনার কবি-ধর্ম্মের অভ্রান্ত উপলব্ধি বলিতে কী বুঝাইতে চাহিয়াছি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবির সমগ্র জীবন ব্যাপী অধ্যাত্ম-সংগ্রামের বীজাবস্থা ইহার মধ্যেই মিলিবে।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" (প্রাণ)

একদিকে জীবন ও জগতের দুর্লভ মহিমা ও সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার ;—আকাশ-নীলিমার দুকুল বেষ্টিত এই সুন্দরী বসুন্ধরা, উহার বিচ্ছেদ কাতর অশ্রু কলুষিতা প্রেম, অন্যদিকে মৃত্যুতে এই সমস্ত কিছু হইতে নিঃশেষে বিদায় লইয়া যাইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুর এই বোধ, এই বিচ্ছেদ কাতরতা জীবন ও জগতের সৌন্দর্য্য ও মহিমাকে বিকৃত তো করে নাই, পরন্তু আরও আকাঙ্ক্ষিত, আরও দুর্লভ, সমগ্র চেতনাকে আরও উন্মুখ, সদা জাগ্রত করিয়া দিয়াছে।

একদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের অবসান স্বীকার করিয়াছেন, (এই স্বীকৃতি না থাকিলে জীবনের এই জাতীয় পিপাসা, অর্থাৎ অশ্রু কলুষিত বিচ্ছেদ কাতর মানবীয় প্রেমের অত্যাশ্চর্য্য অধীরতাবোধ), অন্যদিকে অবসান স্বীকার করিলে জীবন সান্ত্বনা শূন্য হইয়া পড়ে, কারণ মৃত্যুতে উহা শূণ্যময় হইয়া যায়। শূণ্যতা বোধে মানুষ সান্ত্বনা পায় না।

এই উভয় প্রেরণার সঙ্ঘাত সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া তিনি যে জীবন-দর্শন যে অনন্ত জীবনের বোধ গড়িয়া তুলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের এই জীবন-ধর্ম্ম অর্থাৎ সীমার বোধই একটা বিশিষ্ট উপায়ে চরিতার্থ হইয়াছে।

উহার মধ্যে ব্যক্তি বা সীমার সকল ধর্ম্মই বিদ্যমান, অথচ অনন্ত জীবনের একটা তত্ত্ব যুক্ত থাকায় কবি যত স্বল্পকালের জন্য হোক-না-কেন মাঝে মাঝে সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু উহা আদৌ অসীমের বোধ নয় বলিয়া প্রাণ সান্ত্বনা লাভ করে নাই, ক্ষণে ক্ষণে সকল তত্ত্ব উৎক্ষিপ্ত করিয়া কবি-প্রাণ আর্ত্তনাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

অসীমের দিক হইতে জীবন ও জগৎ প্রত্যক্ষ করিলে উহাদের যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা আর যাই হোক সীমার বোধ নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এই সীমার দিক হইতে দেখিতে চান। তাহার ফলে তিনি উহার সকল অপূর্ণতা ও ক্রটির সহিত সকল ধর্ম্মকে মানিয়া লইয়াছেন।

যাঁহারা অসীমের দিক হইতে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার কথা বলেন এবং ওই দিক হইতে জীবন ও জগতের সকল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে জীবনে মুহূর্ত্তের জন্য এই সাক্ষাৎকার ঘটিলে জীবনের এই জাতীয় প্রেরণা, উহার শাশ্বত মূল্য নিরূপণের অনুরূপ বিচিত্র প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু অসীমের-বোধে জীবনের এই বিশিষ্ট রূপ ও রসটিকে তো আর ফিরিয়া

লাভ করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রাণ-মন ভুলিয়াছে জীবন ও জগতের বর্ত্তমান স্বরূপের দুর্লভতায়।

কেবলমাত্র প্রাণ তত্ত্বের দিক হইতে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করিলে জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। কবির জীবনে এই পর্য্যায়ে প্রাণের প্রেরণাই মুখ্য, তাই জগৎ ও জীবনের মুখ্যতঃ এই স্বরূপই উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বিশ্ব-প্রাণ লীলায় একদিকে মুহূর্ত্তে যেমন অন্তহীন রূপ সৃষ্টি হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে সংখ্যাতীত রূপ মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইতেছে। একদিকে সৃষ্টির আনন্দ কলধ্বনি, অন্যদিকে বিনষ্টির আর্ত্তি। মানব-জীবন ঘিরিয়াও নিত্যকাল ধরিয়া হরণ-পূরণের এই লীলা চলিতেছে। যে সকল জাতি এই প্রাণকে একান্ত করিয়া লাভ করিতে ও সঞ্জীবিত করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের সৃষ্টি-রূপের মধ্যে আনন্দের গভীরতা যেমন, বেদনার তীব্রতাও তেমনি। আশ্চর্য্যবোধ হইলেও ট্র্যাজেডির সহিত ঠিক এই কারণে কমেডির সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষেত্রে গ্রীক সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জীবনের এমন গভীর আকাঙ্ক্ষা কবির কাব্যে ইতিপূর্ব্বে এত গভীর ভাবে যেমন কোথাও প্রকাশ পায় নাই, তেমনি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বোধের জন্য এমন বাস্তব বেদনাও কবি ইতিপূর্ব্বে কোথাও বোধ করেন নাই।

জীবন ও জগতের যদি এই স্বরূপই হয়, তবে তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে এই আনন্দ-বেদনাকেই প্রকাশ করিবেন।

> "ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
> বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
> মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত—" (প্রাণ)

এই আনন্দ-বেদনাকে কবি যে তত্ত্ব-দৃষ্টির সহায়তায় একটি নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিতে পারিয়াছেন, তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় 'যোগিয়া' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও। এই জগতে কালে কালে কত নর-নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, আবার জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে, আবার নূতন নর-নারী আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছে। জগৎ-সংসারে তাই একদিকে সৃষ্টির আনন্দের একটি ধারা অন্যদিকে বিনষ্টির বেদনার একটি প্রবাহ

চলিয়াছে। যে কোন অস্তিত্বের মুহূর্ত্ত এই দুইয়ের মিলন বোধ জাত। তাহা এক অংশে আনন্দ অপর অংশে বেদনা নহে, তাহা এই উভয়ের মিলনে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি।—তাহা করুণায় কোমল, প্রশান্তিতে গভীর।

ইহাই যদি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণার সত্য স্বরূপ হইয়া থাকে, তবে কবির এই আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কি?

"তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।" (ছোটফুল)

ইহা কি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরণার সম্পূর্ণ বিপরীত নয়? কবির জীবনে এই উভয় প্রেরণার মিল কোথায়? পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরণাকে যদি পাশ্চাত্ত্য আখ্যা দেওয়া যায় তবে পরবর্ত্তী প্রেরণাকে নিঃসংশয়ে প্রাচ্য আখ্যা দান করা যাইতে পারে। কোন্ অধ্যাত্মবোধাশ্রয়ী কোন্ অখণ্ড তত্ত্ব-দৃষ্টির ফলে কবি এই উভয় প্রেরণার মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হন? তাহারই পরিচয় দানের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে ভূমিকায় করিয়াছি, পরে প্রসঙ্গ ক্রমে সর্ব্বত্র ইহার উল্লেখ করিব।

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগৎকে যে-কোন স্বরূপে, যে-কোন পরিণামে অস্বীকার করিতে চান নাই। জীবন ও জগৎ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ সত্য। তেমনি অন্যদিকে অসীম বা অরূপও তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ সত্য। এই উভয়ের মিলনের দৃষ্টিই অখণ্ড দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। বিশ্বের সহিত সঙ্ঘাত ও সংযোগ ব্যতিরেকে মানবিক বোধের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ অসম্ভব। আবার এই বিকাশের সর্ব্বশেষ সার্থকতা অসীম বা অরূপের সহিত মিলন বোধে।

সীমা বা রূপের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্র-কাব্যে সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সীমা বা রূপ অসীম বা অরূপের আধার হইয়া উঠিয়াছে;—তাঁহার প্রেমের আশ্রয়, তাঁহার সকল মাধুর্য্যের আশ্রয়। রূপ বা জীবনকে অস্বীকার করিলে তাহার সহিত, তাঁহার প্রেম, তাঁহার সকল মাধুর্য্য মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া যায়। জীবনকে কোন একটা উপায়ে পরিহার করিয়া জীবনাতীতকে লাভ করিবার চেষ্টায় জীবনের কোন সার্থকতা নাই; জীবনাতীত কেবল জীবনের যোগে সত্য। দুই শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব।

"সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।" (ক্ষুদ্র অনন্ত)

তাঁহার সম্পর্কে শাস্ত্রে এমন উক্তি করা হইয়াছে, তিনি মহৎ হইতে মহান তিনি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণকে মিলিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই শুধু নয়, উভয়ের যোগে যে দিব্য আনন্দ বোধ জাগে তাহা সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের পশ্চাৎগত প্রেরণা।

সঙ্গীত শিক্ষার্থীর অন্তরে যেমন একটি পূর্ণ সুর বোধ থাকে এবং সেই সুরের সহিত মিলাইয়া ক্রমে সে সমস্ত বেসুরকে সঙ্গত করিয়া পরিণামে একটি অখণ্ড সঙ্গীত সৃষ্টি করে, তেমনি নিখিল বিশ্বে যে পরিপূর্ণ সঙ্গীত রহিয়াছে তাহার সহিত প্রতিনিয়ত মিল সাধন করিয়া ব্যক্তির ছন্দটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হয়।

জীবন ও জগতের অন্তরালে যে একটি পূর্ণ ঐক্য বোধ রহিয়াছে, এমনি এক প্রকার নিঃসংশয় ধারণা শুধু নয়, কবি এই সত্যও ইতিমধ্যে স্থিরভাবে লাভ করিয়াছেন, যে ওই ঐক্যবোধে জীবনের সব পিপাসার, সকল বিরোধ-বিক্ষোভের অবসান ঘটে।

মৃত্যুতে এই অপরূপ প্রেম ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ জগৎ কি একান্ত শূন্য হইয়া যায়? জীবন যদি মৃত্যুতেই একান্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে জীবন বিকাশের সার্থকতা কোথায়? এমনি সহস্র জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তকে মথিত করিয়া দিয়াছে।

এই জিজ্ঞাসা জাগিবেই। জীবন-রস-পিপাসা যদি সত্য হয়, তবে এই জিজ্ঞাসার একটা উত্তর ও কোন না-কোন রূপে লাভ করিতেই হইবে।

সর্ব্বাগ্রে এই জাতীয় জিজ্ঞাসাগুলির কিছু পরিচয় দান করিব। সেই সঙ্গে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা মথিত করিয়া কবি-চিত্তে কেমন করিয়া সত্য বোধ ধীরে ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

জগতে বিচিত্র নর-নারীর সহিত আমরা প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাদের জন্য আমাদের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। অথচ একথাও সত্য যে মৃত্যুতে তাহাদের অন্তরে আমাদের প্রেমের স্মৃতিমাত্রও থাকিবে না। স্মৃতিলোকে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াস যে কত অসহায় তাহা নিঃসংশয়ে বোধ করিয়াও মন বারংবার উহাদের স্মৃতি-লোকে স্থান অন্বেষণ করিয়া ফিরে।

এই যে বিশ্বের নর-নারীর অন্তরে বাঁচিয়া থাকিবার এমন সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, ইহার

কারণ কি? ইহার পশ্চাতে সত্য মূল্য কি কিছুই নাই? চিরন্তন কাল ব্যাপী অনন্ত কোটি নর-নারীর কেবল অর্থহীন অন্তহীন বেদনা বোধ মাত্র?

কবির অন্তরে প্রেম অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই চিরন্তন ব্যথা বিজড়িত, হৃদয়রক্ত-নিষিক্ত প্রশ্নও জাগিয়াছে।

"বারেক যে চলে যায়, তারে তো কেহ না চায়
তবু তার কেন এত মায়া—" (পুরাতন)

যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অন্তরে প্রেম অনুভূত হয় তাহাকে যখন চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলি তখন জগতের সব আলো নিভিয়া যায়, উহার অপরূপ সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে কালিমাবৃত হইয়া পড়ে। জীবনের ভার তখন একান্ত অসহনীয় বলিয়া বোধ হয়।

প্রাণের সংস্পর্শে মানুষ আবার এমন ব্যথাকেও একদিন জয় করিয়া উঠে। এমন একান্ত করিয়া পাওয়া ইহাও যেমন সত্য, এমন একান্ত করিয়া হারান, ইহাও তেমনি সত্য।

তবে এই প্রেমের মূল্য কি? অন্ততঃ এইকালে রবীন্দ্রনাথ তাহার কোন্ মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন? আমি সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আয়রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দুদিন বই
এ পবিত্র অশ্রু বারি ধারা।" (নূতন)

প্রাণ-ধর্ম্মে এই বিস্মরণটা সত্য। সেক্ষেত্রে এই অন্তহীন বিস্মৃতি পরিপূর্ণ জীবনে দু-দিনের পবিত্র অশ্রুবিন্দু পাতটাই যে প্রেমের একমাত্র সত্য মূল্য হইয়া উঠিবে ইহাই স্বাভাবিক।

প্রাণধর্ম্মে স্মৃতির বেদনা ভার যেমন সত্য, তেমনি ইহার বিস্মরণও সত্য। কিন্তু মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে ততই বুঝিতে পারে যে প্রাণের বোধ মানব জীবনের এক নিম্নতর বোধ। প্রেম ধ্যান-লোকে একনিষ্ঠতা লাভ করিলে স্মৃতি আর বোঝামাত্র থাকে না। মানব জীবনের এবং মানব-প্রেমের এই অসহায় বোধ কবি-চিত্তে ফিরিয়া ফিরিয়া জাগিয়াছে।

"যারে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চলে, সে তো নেই আর।" (ভবিষ্যতের-রঙ্গভূমি)

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় ওই কালে কবির অন্তরে এই জিজ্ঞাসা কী ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল।

যতদিন না অনন্ত প্রেম বা প্রাণের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটে, ততদিন হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা কিছুতেই ঘুচে না।

রবীন্দ্রনাথ যখন অনন্ত প্রাণের এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তখনই মৃত্যু ভয় ঘুচিয়াছে। তিনি উপলব্ধি করিযাছেন, যে এই বিচ্ছিন্ন প্রাণ অনন্ত প্রাণের যোগে সৃষ্ট। মৃত্যু একান্ত বিনষ্টি নয়,—ওই অনন্ত প্রাণেই তাহা বিলীন হয়, ভিন্নরূপে আবার তাহার প্রকাশ ঘটে। জন্ম-মৃত্যুর বারংবার এই আসা-যাওয়ার ভিতর দিয়া জীবের কোন্ নিয়তি সার্থক হইয়া উঠিতেছে,—এই জাতীয় কোন জিজ্ঞাসা এখনও কবির মনে জাগে নাই, উত্তর লাভ আরও অনেক পরের কথা।

কবির প্রেমোপলব্ধি তাঁহার সীমাবদ্ধ চেতনার মত একান্ত সঙ্কীর্ণ একটি লোককে উদ্ভাসিত করিযা তুলিয়াছে। এই সীমা-লোকের বাহিরে যে অচিন্তনীর বিরাট বিশ্ব তাহা কবির সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, সেই হেতু ভয়ঙ্কর। একান্ত অপরিচিত এই বিশ্বে তাই প্রেমাস্পদকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া রাখিবার এমন প্রাণপণ প্রয়াস, এমন একান্ত ব্যাকুলতা।

"হায়, কোথা যাবে।
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি
পথ কোথা পাবে।" (কোথায়)

এই একান্ত অপরিচিত লোকে নর-নারী চিত্ত-বৃন্তে প্রেমের শিখা জ্বালাইয়া তাহারই ক্ষীণ আলোকে কোন প্রকারে পথ চিনিয়া চলে। বিয়োগে বা বিচ্ছেদে ওই দীপ-শিখাটি নিভিযা গেলে দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আর্ত্তনাদ তুলিয়া তাহারা কোথায় হারাইয়া যায়।

"ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।" (বিরহীর পত্র)

মৃত্যুতে যখন মানুষ জীব-লোক ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন মর্ত্ত্য-প্রেমের কোন সঞ্চয়, কোথাও কোন একটা স্বরূপে কি থাকিয়া যায় না? পরিচিত সমস্ত কিছুকে

কি নিঃশেষে পরিহার করিয়া সেদিন একান্ত এক অপরিচিতের সম্মুখীন হইতে হয় ? তবে জীবনের এত প্রেম প্রেমের এমন মাধুর্য্যের সার্থকতা কোথায় ?

"তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি
* * *
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালবাসে
সেও কি রবে না এক কালে।" (বিরহীর পত্র)

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই একই জিজ্ঞাসা। জীবন যদি মিথ্যা হয়, তবে এত প্রেম কেন, কেন প্রেমে এমন হৃদ্ বিদারণ? ইহার পশ্চাতে কি কোন সত্য নাই? যদি না থাকে তবে জীবনে তাহা যে নিরতিশয় নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনা।

"কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
* * *
মানব-হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা
খেলা যদি, কেন হেন মর্ম্মভেদী খেলা।" (কেন)

এই কালে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 'বৈতরণী' কবিতাটির মধ্যে তাহার একটি পরিচয় মিলিবে।

মনে হয় বিশ্ব যেন কুল-হারা-বেদনার সমুদ্র নিত্য আন্দোলিত হইতেছে। অগণিত নর-নারী এই সমুদ্রে জীবন-তরী বহিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। একান্ত অপরিচ্ছিন্ন এই জগৎ, অপরিচিত এই নর-নারী। এখানে কেহ কাহাকে চেনে না। নর-নারীর প্রেমে যে সঙ্কীর্ণ আলোক রেখাটুকু ফুটিয়া উঠে তাহা মেঘাবৃত রজনীতে বিদ্যুৎ বিকাশের মত অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিয়া তুলে।

"মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ বিকাশ
কেহ কারে নাহি চেনে বসে নত শিরে।" (বৈতরণী)

জীবলোক হইতে বিদায় লইবার কালে প্রিয়জনের বিলাপধ্বনি, তাহার অশ্রু সিক্ত আঁখি পল্লব, প্রেমের সর্ব্বশেষ অর্ঘ্য স্বরূপ পরাইয়া দেওয়া কুসুম মাল্য সমস্তই একে একে ঝরিয়া মুছিয়া যায়। মৃত্যুর ওই লোকে ইহ-জীবনের সকল স্মৃতি ধীরে ধীরে ছায়া হইয়া মিলাইয়া যায়।

মৃত্যু-লোক পার হইয়া মানবাত্মা কি পরিশেষে ধ্রুব কোন লোকে গিয়া পৌঁছায়,

"অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী,
ভেসে চলে কর্ণধার বিহীন তরণী।" (বৈতরণী)

এ পর্য্যন্ত কবির জীবন-জিজ্ঞাসা গুলিকে একে একে উপস্থাপিত করিলাম। এই জিজ্ঞাসা-ক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিতে কবি এই কালে যে উত্তর লাভ করিয়াছিলেন তাহারও স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই উত্তর কবি কোন জ্ঞানানুশীলন অথবা তত্ত্ব আলোচনা করিয়া লাভ করেন নাই। উহা এক প্রকার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার রূপে কবির অন্তরে প্রতিভাত হয়।

বহু বিচিত্র জিজ্ঞাসা মথিত করিয়া ওই সত্যটি ধীরে ধীরে কেমন ফুটিয়া উঠিতেছে! একদিকে কবির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা শত ধারায় উৎসারিত হইয়াছে—

"তাই কি? সকলি ছায়া? আসে, থাকে, আব মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগ যুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা উপহাব?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়?
বিশ্বেব উঠিছে গান, বধিবতা বসি সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রু বারি ধাব?
যুগ যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে
বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার।" (চিরদিন)

অন্যদিকে পরিণামে যে উত্তর লাভ করিয়া কবি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন—

"অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান।" (চিরদিন)

দেশ-কালের ঊর্দ্ধে এক দিব্য-চেতনা চির স্থির হইয়া আছেন, নিম্নে দেশ-কালের মধ্যে নিত্যকাল ধরিয়া সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। এক অপরিবর্ত্তনীয় দিব্য-চেতনাই সত্য, সৃষ্টির আর সমস্ত কিছু অ-সৎ বা মায়া, মায়াবাদীদের এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারকে রবীন্দ্রনাথ কখন অন্তরের সহিত মানিয়া লইতে পারেন নাই।

দিব্য-চেতনাই যে অপার প্রেমে আপনাকে দেশ-কালের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের অনন্ত কোটি রূপ-বৈচিত্র্য সেই দিব্য-চেতনারই প্রতিভাস, এই সত্যটিকে কবি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেন। অসীম যেখানে প্রেমে সীমার মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছেন সেইখানেই সৃষ্টি। বিশ্ব অর্থাৎ সীমা বা রূপ আশ্রয় করিয়া কবি তাই সেই অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে চান।

বিশ্ব-বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে পরম তত্ত্ব, মানবাত্মায় সেই একই তত্ত্ব রহিয়াছে। এক পরম তত্ত্ব জীব ও বিশ্বের মধ্যে অভিব্যক্ত। সেই পরা তত্ত্বের নাম প্রেম।

সৌন্দর্য্য বা প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া বিশ্ব তাহার অসীম প্রাণ স্পন্দ অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। প্রাণের এই অনুভূতি আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা পরিণামে বিশ্ব-চেতনায় একাকার হইয়া যায়। এই একাকার মুহূর্ত্তে সে সাক্ষাৎ করে যে এক অনাদ্যন্ত প্রাণ-ধারার বিচিত্র স্পন্দনে এই অনন্ত রূপ-লোকের সৃষ্টি। প্রত্যেকটি রূপ বা সীমা অরূপ বা অসীমের যোগে অনন্ত স্বরূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

"সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।" (ক্ষুদ্র অনন্ত)

জীবন ও জগতের যে সাধারণ শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান ভূমি, কেবল মাত্র উহা লাভ করিতে পারিলে জীবনের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিতে পারা যায়।

"মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।" (শেষ কথা)

এই পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ মানুষ তখনই লাভ করে যখন সে ব্যক্তি-বোধের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। জীবনের পূর্ণ পরিণাম যে ব্যক্তি চেতনার সীমার ঊর্দ্ধে, অন্তরের মধ্যে যে অহর্নিশ অতৃপ্তি বোধ তাহার মূলে যে এই ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষা মূল এই তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ এই কালেই এক প্রকার উপলব্ধি করিয়াছেন।

যেখানে কবি এই সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে চাহিয়াছেন, আমি এক্ষেত্রে তাহারই দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্ত কালের মোর জীবন মরণ।" (পূর্ণ মিলন)

কিংবা

"আমারে কাড়িয়া লও করগো গোপন,
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।" (ক্ষুদ্র আমি)

অন্যত্র

"আপন হৃদয়-দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া।" (সত্য)

এখানে সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিবার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাহা অহঙ্কার বিসর্জ্জনের সেই জাতীয় অধ্যাত্ম প্রেরণা না হইলেও স্বরূপতঃ এক। অর্থাৎ এই প্রেরণার ভিতর দিয়া মানুষ নিম্নতর চেতনা-লোক অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে। মানস-চেতনা এই সীমাবোধের শেষ প্রান্ত। উহার বিকাশ অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্পূর্ণ না হইলে তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার প্রশ্ন উঠে না।

কবি-প্রাণের এই জাতীয় প্রেরণার কথা ছাড়িয়া দিলে একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যেও কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক বেশ সঙ্কীর্ণ।

কেবল ইন্দ্রিয়-চেতনায় মানুষের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ সর্ব্বাধিক সঙ্কীর্ণ। ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের ভিতর দিয়া যখন প্রাণ জাগে, তখন এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ আরও বিস্তৃত ও গভীর হয়; কিন্তু ইহাও মানুষের চেতনাকে একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আবর্ত্তিত করিতে থাকে। ইহাতে তাই চিত্তের শান্তি, মনের মুক্তি লাভ ঘটে না। এমনি করিয়া মানস-চেতনায় ধ্যান-লোকে প্রাণের বিক্ষোভ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ আরও গভীর হইয়া উঠে। কিন্তু মানস-চেতনাও খণ্ডিত চেতনা বলিয়া উহাও সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ পরিণাম নয়। মানস-চেতনার সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আর সীমা থাকে না।

কবির কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার চেতনার ধীর জাগরণ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য বোধটি যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে তেমনি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি ও কেমন গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিয়াছে তাহাও উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

চেতনার প্রত্যেক স্তরে জীবনের প্রত্যেক পর্ব্বে কবি যেমন এক প্রকার সামঞ্জস্য বোধ করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে সেই সঙ্গে কবির অন্তরে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের একটি লোক গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ওই অপূর্ণতা বা সঙ্কীর্ণ সামঞ্জস্য বোধে কবি অতৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, ওই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধও কবিকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তখন কবি সঙ্কীর্ণ সামঞ্জস্য বোধটিকে যেমন, তেমনি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ওই সঙ্কীর্ণ লোকটিকে প্রাণপণ বলে ভাঙ্গিয়া দিয়া উন্নততর সামঞ্জস্য এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের বিচিত্র ধারাকে তাই মানবাত্মার ধীর জাগরণের সহিত মিলাইয়া পাঠ করাই শ্রেয়।

কড়ি ও কোমলে যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক, তাহাতে কবি আজ ক্লান্ত, এই সঙ্কীর্ণ লোক হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য তাই এমন প্রাণপণ প্রয়াস।

"মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে
দেখিনা এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।" (স্বপ্ন রুদ্ধ)

মানসী

কবির কাব্য পাঠের ভূমিকা স্বরূপ যে সামঞ্জস্যতত্ত্বের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, সমগ্র জীবন ধরিয়া কবি যে তত্ত্বটিকে জীবনে ধীরে ফলবান হইতে দেখিয়াছেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্য পাঠের ভূমিকা স্বরূপ কবির 'জীবনস্মৃতি' হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই অসামঞ্জস্য বোধের পীড়া এবং তাহাকে জয় করিয়া উঠিবার প্রাণপণ প্রয়াসের পরিচয় 'মানসা' কাব্যের মধ্যেও লাভ করা যায়। মানসী কাব্যের মর্ম্মমূলে যে বিষাদ ও নৈরাশ্য ধ্বনিত হইতেছে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কবি একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন।

"এখন এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা, আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশ হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্যে সব সুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে কবির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বোধের ধীর সম্পূর্ণতাই কেবল ঘটিয়া চলে নাই, তাহা যেমন বহু বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে, তেমনি সেই সকল বহু বিচিত্র বিপরীত বা বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য কবির আন্তর সত্তায় বিক্ষোভ আরও তীব্র হইয়াছে। এমনিই হয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেখানে অসম্পূর্ণ বা অপরিণত সেখানে সামঞ্জস্য সাধন হয়ত সহজ হয়, (কিংবা আদৌ হয়ত সে চেষ্টা করিতে হয় না, সুদীর্ঘ কালের প্রথা ও সংস্কাররূপে তাহা জীবনে এক প্রকার সহজ বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করে) কিন্তু বহু বিচিত্র বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন এবং এইরূপে যে অখখণ্ডতা বোধ তাহার ফললাভ যে অনেক বেশি তাহাতে সংশয় নাই।

মানসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, "মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা।"

মানসীর মধ্যে আসিয়া আমরা প্রথম লক্ষ্য করি কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক ইন্দ্রিয়-প্রাণের বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে উঠিয়া কতকটা শান্ত পরিণাম লাভ করিয়াছে। ইহা যেন দীর্ঘকালের প্রাণ-সমুদ্র মন্থন শেষে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। প্রাণ-মনকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া কোন অপরোক্ষ সাক্ষাৎকাররূপে এই রূপ তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া যায় নাই। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ, দুঃখ-সুখের বিচিত্র অনুভূতি ধীরে তাঁহার প্রাণকে জাগ্রত করিয়াছে, এইরূপে তাঁহাকে দিয়া প্রাণের সকল বিক্ষোভ বা নিপীড়ন ভোগ করাইয়াছে, এবং এই অসহনীয় অবস্থাকে নিয়ত জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া ধীরে মনের জাগরণ ঘটাইয়া একটি রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই রূপের মধ্যে অসঙ্গতি দূর হইয়া সুষমা যতই ফুটিয়া উঠিতেছে, যতই উহা সুদূর ব্যাপ্ত মহিমা বিজড়িত হইয়া উঠিতেছে, কবির অন্তর ও বহিঃসত্তার মধ্যে ততই যে সামঞ্জস্য সাধিত এবং চেতনার সকল বিকাশ পর্য্যায়ের মধ্যে আপাত বিরোধ ও সঙ্ঘাত ততই যে দূর হইয়া যাইতেছে তাহা স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায়।

এই সৌন্দর্য্য প্রেমের ধ্যান-লোক, এই দিব্য প্রভা বিজড়িত রহস্যময়ী নারী মূর্ত্তিই তাঁহাকে হাতছানি দিয়া দূর হইতে সুদূরে, ঊর্দ্ধ হইতে সুঊর্দ্ধে আহ্বান

করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাঁহারই সহিত তাঁহার কান্না-হাসির বিচিত্র লীলা। আর এই সমস্ত কিছুকে জড়াইয়া এক অপূর্ব্বতার আস্বাদ, কোন এক সুবর্ণকূলের চকিত আভাস। জীবন-মরণ জন্ম-জন্মান্তর তাহাতে যেন ধন্য হইয়া যায়।

এই জাতীয় বোধের পরিচয় লাভ করিতে আমি রবীন্দ্রনাথেরই দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এই বোধ কেমন ধীর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া একটি ধর্ম্মবোধ রূপে গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে, তাহা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

বিশ্ব প্রকৃতির যোগে বৃক্ষ যেমন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুষ্পিত হইয়া পুনরায় বিশীর্ণ হইয়া ঝরিয়া যায়, কিন্তু তাহাব তেজ যেমন বৃক্ষের সত্তায় সঞ্চিত হইয়া বৃক্ষকে সজাব রাখে, তেমনি "আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তের পল্লব রাশি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতেব সমস্ত প্রবহমান সুখ দুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখ দুঃখের উত্তাপেই শুষ্ক হয়ে, দগ্ধ হয়ে, ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমাদের চিব জীবনকে সেই প্রতি মুহূর্ত্তের দাহ স্পর্শ কবতে পাবছে না, অথচ তার তেজটুকু সে ক্রমাগতই গ্রহণ কবছে।" (ছিন্নপত্র)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"নিজেব ভিতরকার এই সৃজন ব্যাপাবেব অনন্ত ঐক্যসূত্র যখন একবাব অনুভব কবা যায় তখন এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুবতে ঘুরতে চিবকাল ধরে তৈবি হয়ে উঠছে আমার ভিতরেও তেমনি অনাদি কাল ধরে একটি সৃজন চলছে; আমার সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনাব আপনার স্থান গ্রহণ করছে।" (ছিন্নপত্র)

বিশ্ব প্রাণের যোগে ব্যক্তির জীবনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়া আবার ঝরিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই সকল অনুভূতির সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে আর একটি সত্তা ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তাহা মানুষের স্থায়ী সত্তা। এই স্থায়ী সত্তাটিকে তিনি নানা চেতনা পর্য্যায়ে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। মানসীর মধ্যে আসিয়া তিনি প্রথম আপনার এই অপর সত্তা সম্পর্কে নিঃসংশয় হন। ইহাকেই তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা।" ঈশ্বরীয় প্রতিমা বলিবার অর্থ, এই সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি বারংবার অসাম বা অরূপের চকিত আভাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহার চেতনা মাঝে মাঝে কোন অতল রহস্যের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কাব্য-ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার এই আন্তর সত্তাটির ধীর বিকাশ ও সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

'মানসী'র মধ্যে কবির সামঞ্জস্য বোধ যেমন আরও গভীর, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধও তেমনি আরো ব্যাপ্ত ও উদার হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান এবং ধ্যান-লোকে স্বপ্ন সঞ্চরণের বিচিত্র পরিচয় মানসীর মধ্যে রহিয়াছে। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই সম্ভোগ ও লীলা সম্ঘটিত হইয়াছে কবির মানস বা ধ্যান-লোকে, তাই উহার যেমন অতি ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, তেমনি কাব্যের 'মানসী' নামকরণ বড় যথার্থ হইয়াছে।

মানসীর মধ্যেই কবির মানস-জাগরণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং এইরূপে অন্তরের ধ্যান-লোকটি একান্ত হইয়া উঠিবার ফলে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগৎ ও জীবনের একান্ত সীমার পরিচয় প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। মানস বা ধ্যান-লোকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আনন্দ-বেদনা বোধ একপ্রকার অতি বিস্তার লাভ করিয়া করুণ শান্ত শ্রী লাভ করে।

বিশ্বানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা যে স্বরূপে ব্যক্ত হোক-না-কেন, কবির অন্তরের মুখ্য প্রেরণা বলিয়া কবির কাব্যেরও ইহা মর্ম্মগত উপলব্ধি।

মানসী কাব্য হইতে সর্ব্বাগ্রে তাহার কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। কবি বোধ করেন তিনি যেন এক কালে এই বিশ্বের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন। তাহার পর ওই অনন্ত প্রাণ-ধারা হইতে কেমন করিয়া, কোন্ রহস্যের বশে তিনি আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনকার বিশ্বের অচিন্তনীয় বৈচিত্র্যময় অনুভূতি কবির হৃদয়-তটে স্মৃতির এক একটি স্তর রূপে সঞ্চিত হইয়া আছে। কবি আজ তাই বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুর সহিত নিবিড় একাত্মতা বোধ করেন। কবির অন্তরে তাই মিলন লাভের জন্য এমন ব্যাকুলতা, কিন্তু মিলিত হইবার পথ হারাইয়া গিয়াছে।

কোন্ অরূপ-লোকে এক চেতনা প্রবাহে আমরা যেন একাকার হইয়াছিলাম, তাহার পর কেমন করিয়া অন্তহীন রূপে রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। সকলের সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছি, মাঝখানে রূপের ব্যবধান।

অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া বস্তুতঃ কবি আপনার এই অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতাকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অহল্যার মত কবিও একদিন বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন।

"—সেই গূঢ় মাতৃ কক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চির রাত্রি সুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে,
যেথায় অনন্ত কাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলিব শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝবে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্ত্তি শ্রান্ত সুখ দুঃখ দাহ হারা।" (অহল্যার প্রতি)

এখন বিচ্ছিন্ন সত্তায়

"হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ ;—" (অহল্যার প্রতি)

এমন করিয়া মন উদাস হইয়া যায়। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অতি গোপন কী এক অনুভূতি জাগে, মনে হয় যেন একদিন এই সকলের সহিত আমাদের নিবিড় আত্মিক মিলন ছিল। সে যেন কোন জন্মান্তরীণ স্মৃতি। নহিলে প্রাণ-মন এমন করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মিলন যাচ্ঞা করে কেন?

কিন্তু ইহা কি সেই প্রেরণা যাহার বশে মানুষ সকল রূপের অন্তরালবর্ত্তী এক শাশ্বত চেতনা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সকল দীপ একে একে নিভাইয়া দিয়া ধ্যান মগ্ন হইয়া যায়? বস্তুতঃ ইহা এক জাতীয় রূপ-পিপাসা ছাড়া আর কিছু নয়। জাগ্রত ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন অমন করিয়া বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে এক সৌন্দর্য্য-প্রতিমা তিলোত্তমার মধ্যে রূপায়িত করিয়া বাহু বেষ্টনে লাভ করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছে। এই রূপ-পিপাসার সহিত একপ্রকার ঐতিহাসিক বোধ বিজড়িত থাকায় উহা আরও প্রসারতা লাভ করিয়াছে।

বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত রূপকে একটি বিগ্রহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার, একটি দেহাধার পূর্ণ করিয়া বিশ্ব-রূপামৃত নিঃশেষে পান করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহা সীমা বা রূপেরই এক বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষা।

মানস-লোকে অসীমের যে-কোন পিপাসা অমনি করিয়া রূপের মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করিবেই। রূপাশ্রয়ী হইয়া মানব-চেতনায় ধ্যান জাগে। এই রূপ-ধ্যান একটি পরিণামে দেখিতে দেখিতে এক নিস্তরঙ্গ জ্যোতি সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়।

মুহূর্ত্তের অমৃত স্পর্শে প্রাণ-মনের এই জাতীয় পিপাসা চিরকালের জন্য পরিতৃপ্ত হইয়া যায়।

এই পরিণামেও রূপের বোধ থাকে, কোন রূপই হারাইয়া যায় না, কিন্তু অনন্ত স্বরূপতা লাভ করিলে রূপের এই জাতীয় পিপাসা, প্রাণের এই জাতীয় আর্ত্তি আর থাকে না। এই রূপ, এই জীবন ও জগৎ তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে।

'মেঘদূত' কবিতাটি বিশ্লেষণ করিলে ইহার স্বরূপ আরও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্য্যই হোক, কিংবা বিশিষ্ট কোন কবির কাব্য আশ্রয় করিয়া হোক উভয় ক্ষেত্রেই সেই এক সৌন্দর্য্য-ধ্যানের পরিচয় লাভ করা যায়।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিচিত্র সৌন্দর্য্য-লোক রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল মুগ্ধ করিযাছে। কল্পনায় কবি মেঘদূতের সেই সৌন্দর্য্য-লোক সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। কবির অন্তরেও যে সেই এক সৌন্দর্য্য-লোকের ধ্যান।

বিচিত্র খণ্ড রূপের অন্তরালে যে এক অরূপ বা অখণ্ড রূপ-লোক রহিয়াছে, কালিদাসের সৌন্দর্য্য-ধ্যান যেমন, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-ধ্যানও তেমনি পরিণামে সেই অরূপলোকে বিগলিত হইয়াছে। সেই অখণ্ড সৌন্দর্য্য-লোকটিকে কবি এই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

> "অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্প বনে
> নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈল মূলে
> সুবর্ণ সরোজ ফুল্ল সরোবর কূলে
> মনি হর্ম্মে অসীম সম্পদে নিমগনা
> কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।" (মেঘদূত)

কবির মন পরিণামে এই অখণ্ড সৌন্দর্য্য-লোকে সীমাহীন বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহাই কবির মুক্তি। "কবি তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়, রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা"।

মনে সৌন্দর্য্যের সীমাবদ্ধ রূপ ধরা পড়ে। মনেরও সীমা ছাড়াইয়া দিব্য-চেতনা লাভ করিতে হয়। মানবীয় চেতনার ঊর্দ্ধে এই যে অরূপ তত্ত্ব, তাহা অখণ্ড তত্ত্ব বটে, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সমাহার নহে।

কবির এই অখণ্ড সৌন্দর্য্যোপলব্ধি মানস-চেতনায় অনুভূত বিচিত্র খণ্ড সৌন্দর্য্যের মিলিত প্রকাশ মাত্র, তাহা ঊর্দ্ধতর চেতনা সাক্ষাৎকার নহে। অখণ্ড সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব আসিয়াছে মানস-লোকে অনুভূত খণ্ড সৌন্দর্য্যের বিকল্প স্বরূপে।

এই অখণ্ড সৌন্দর্য্যকে কবি ধ্যানে আলিঙ্গন করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, তাহাকে বাহিরে ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। উহাকে আবার একটি নারী-বিগ্রহ সমাশ্রিত করিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। আমি কবির সেই জিজ্ঞাসাটিকে এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মনি দীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।" (মেঘদূত)

অতি মানবীয় চেতনায় যে অরূপের সাক্ষাৎকার ও আসঙ্গ লাভ, সেই দিব্য-চেতনায় নহে, ইহলোকে এই ইন্দ্রিয়-দ্বারে কবি তাঁহাকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। মর্ত্ত্যের কোন একটি নারী বিগ্রহের মধ্যে সেই অখণ্ড সৌন্দর্য্যকে কি বাহু বেষ্টনে লাভ করিতে পারা যায় না?—এই অধ্যাত্ম-পিপাসা রবীন্দ্র-কাব্যে বিচিত্র তত্ত্ব-পরিণাম লাভ করিয়াছে।

মানস-লোকে সৌন্দর্য্য যে পরিণাম লাভ করুক না কেন, তাহা আদৌ ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী বলিয়া খণ্ডিত। ইন্দ্রিয় বোধের উপর ইহার ভিত্তি বলিয়া সৌন্দর্য্যকে বাহিরে সম্ভোগ করিবার অমন আকাঙ্ক্ষা কবি-চিত্তে কোন-না-কোন স্বরূপে থাকিবেই। কবির মানস সমৃদ্ধির ফলে রূপ-পিপাসা যেমন দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, অতৃপ্তির পীড়াও তেমনি অসহনীয় বোধ হইয়াছে। কবি তখন এই অতৃপ্তি দূর করিতে চাহিলেন এক তিলোত্তমার পরিকল্পনা করিয়া। বিশ্বের সকল রূপ তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিয়া এই তিলোত্তমার সৃষ্টি। এক্ষেত্রে বিশ্বাত্মা বলিতে কবি এই তিলোত্তমাটিকে বুঝিয়াছেন।

প্রভাত সঙ্গীতে 'অনন্তজীবন' কবিতাটির মধ্যে ব্যক্তি-আত্মার এবং 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে বিশ্বাত্মার একটি স্বরূপ কল্পনা আছে। মানসীর মধ্যে এই তিলোত্তমা বিশ্বাত্মা রূপে অনুভূত হইয়াছে।

বলিয়াছি, মানস-প্রেরণায় ব্যক্তি-আত্মা বা বিশ্বাত্মার এমনি এক একটি স্বরূপ অনুভূত হয়। পরবর্ত্তী কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রত্যেকটি তত্ত্ব-সৃষ্টি প্রয়াসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব।

এমনি করিয়া রূপের এক একটি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কবি প্রাণের জ্বালা নিভাই-বার চেষ্টা করিযাছেন। কিন্তু এমনি করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়ায় না। প্রাণের অতৃপ্তি ঘুচে সকল রূপ বা সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে।

বিশ্বের শক্তি স্পন্দন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়। এমনি করিয়া বিশ্বের যোগে মানুষ একে একে উর্দ্ধতর চেতনা লাভ করিয়া পরিশেষে বিশ্ব-চেতনা লাভ করে।

এখন মানসী হইতে কবির প্রেমবোধের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। প্রাণের অনুভূতিকে কবি আজ মানস বা ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। মানসী কাব্যে কবির ধ্যানৈক প্রেমের পরিচয় লাভ করা যায়।

ধ্যানে প্রেমের যে অসীম সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহাই আপাততঃ কবির মুক্তি-লোক। প্রেম-লোকে অন্তহীন মানস-অভিসারের ভিতর দিয়া কবির কাব্য সৃষ্টি। যে প্রেমে এই ধ্যান সদা জাগ্রত থাকে না, সে প্রেম পুরুষকে বিনষ্ট করে। পুরুষ মনোধর্ম্মী, মিস্টিক, পুরুষ ধ্যানী। এই ধ্যানের ভিতর দিয়া সে নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া চলে।

আসক্তির বসে পুরুষ যখন নারীকে নিকটে লাভ করিতে চায়, তখন ওই ধ্যান-লোকটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ওই কালে পুরুষ সকল সৃষ্টি প্রেরণা নিরুদ্ধ এক প্রকার অসহনীয় বন্ধন নিপীড়ন বোধ করে।

„বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।" (ভুল ভাঙ্গা)

মানস-অভিসারে আনন্দ-লোকের দ্বার একটির পর একটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে চরম প্রাপ্তি বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে চরম

প্রাপ্তির যে-কোন আকাঙ্ক্ষা কবির নিকট অধ্যাত্ম-প্রেরণা বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের রসলোক নিরন্তর সৃষ্টি-প্রেরণা-লোক। নিঃশেষে কোন কিছু লাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহাতে সৃষ্টি-প্রেরণা নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

'পুরুষের উক্তি' কবিতাটির মধ্যে কবি প্রেমের এই অবিরাম সৃষ্টি-প্রেরণা তত্ত্বটিকে অস্বীকার করিয়াছেন। প্রেমের সীমা-লোকটিকে পুরুষের ধ্যান সহজেই অতিক্রম করিয়া যায়। পুরুষ তখন নারী-প্রেমের সীমা-লোকটিকে পরিহার করিয়া অসীমকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। পর পর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"সৌন্দর্য্য সম্পদ মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।"
"তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।"
"এস থাকি গৃহ কোনে সুখে দুঃখে দুই জনে
দেবতার তরে থাক পুষ্প অর্ঘ্য ভার।" (পুরুষের উক্তি)

নর-নারীর প্রেম একান্ত মিথ্যা নয়। কিন্তু উহার সার্থকতার একটি সীমা আছে। উহাকে তাই একটি বৃহৎ নামে চিহ্নিত করিয়া অসীম তত্ত্বের সহিত একাত্ম করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রেম বোধ মানবীয় চেতনায় একটি বিশিষ্ট প্রকাশ হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র প্রকাশ নয়, শ্রেষ্ঠ প্রকাশও নয়। নর-নারীর বিরহ-মিলনের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া এই জগৎ ও জীবন অনন্ত বিস্তৃত। বিশ্ব লীলা, জীবনের অনন্ত প্রসারকে প্রেমের সীমা-লোকের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া দেখিলে জীবন ও জগৎ একান্ত খণ্ডিত হইয়া যায়।

ধ্যানে সৌন্দর্য্য ও প্রেম যত বিস্তার লাভ করুক-না-কেন, তাহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয় বোধের উপর বলিয়া সীমা-লোক। ধ্যান-লোকে নিরন্তর সৃষ্টি-প্রেরণা বা রস-প্রেরণার যে তত্ত্বকে কবি আপাতত মুক্তি-লোক বলিয়া বোধ করিয়াছেন, তাহাও বস্তুতঃ সীমার লোক।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সীমার বোধ যে-কোন-পরিণামে অসীমতা লাভ করিতে পারে না বলিয়াই কবি উহাকে কখন কখন অধ্যাত্ম-প্রেরণা বিরোধী বলিয়া বোধ করিয়াছেন।

কবির প্রেম-ধ্যান এবং সৌন্দর্য্য-লোকে অন্তহীন মানস-অভিসার যে কী তাহার আরও কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

> "দিবস নিশি ধরে ধ্যান করে তাহারে
> নীলিমা পরপার পাব তার দেখা কি ?" (বিরহানন্দ)

ধ্যানে নিঃশেষ কোন প্রাপ্তি বোধ নাই বলিয়া মনে অমন এক প্রকার সংশয় ব্যাকুল জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়।

ধ্যান-লোকে মিস্টিক মিলন সম্ভোগের পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

> "কখনো সারারাত ধরি হাত দুখানি
> রহি গো বেশ বাসে কেশ পাশে মরিয়া।" (বিরহানন্দ)

ধ্যান-লোকও সীমার লোক বলিয়া মানবীয় চেতনা যে কোন মুহূর্ত্তে নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসিতে পারে এবং আসেও। বস্তুতঃ ওই সীমা ছাড়াইয়া না উঠিলে মানবীয় চেতনা উন্নত স্থায়ী পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

ধ্যান ভঙ্গ হইতে কবির সে কী অসহায় অবস্থা! সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যলেশহীন, করুণাশূন্য সে শুধু প্রবৃত্তির দহন জ্বালা। এখানে ধ্যান নাই, সৌন্দর্য্য সম্ভোগ নাই, উহার আনন্দ প্রেরণায় সৃষ্টি নাই।

> "নাই গো দয়ামায়া স্নেহ ছায়া নাহি আর,
> সকলি করে ধূ ধূ প্রাণ শুধু শিহরে।" (বিরহানন্দ)

যাহাকে আমরা জীবনাধিক করিয়া ভালবাসি সে যখন চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন ও জগতের সমস্ত মাধুর্য্য অন্তর্হিত হয়। অন্তরে বাহিরে কেবল এক প্রকার অতল গহ্বর শূণ্যতা বিরাজ করে। আর সেই অতলতার মধ্যে মানব মন নিক্ষিপ্ত হইয়া শূন্য হইতে শূন্যে তলাইয়া যায়।

"সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়" (ক্ষণিক মিলন)

এই শূণ্যতার আকাশ পূর্ণ করিয়া আবার কোথা হইতে সৌন্দর্য্যের মেঘ ভাসিয়া উঠে। বিরহের শূণ্যতা পূর্ণ করিয়া একদিন সুর উৎসারিত হয়। পুরুষের সকল সৃষ্টির সহিত তাই এমন দুঃসহ বেদনা বোধ বিজড়িত হইয়া যায়।

বিরহে প্রাণের শূন্যতা এমনি করিয়া ধ্যানে অমৃতরূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। এমনি করিয়া বেদনার সমুদ্র পার হইয়া ধ্যানের আনন্দ-তীরে উত্তীর্ণ হওয়াকেই

বলে প্রেমের মুক্তি। বিরহে যে প্রেমে প্রাণ শূন্যতায় হারাইয়া যায় সে প্রেম বন্ধন মাত্র।

"যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।" (ক্ষণিক মিলন)

আসক্তি বিজড়িত প্রেম পুরুষকে ধ্যান-লোকে মুক্তি দেয় না, একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে এই কালে কবিকে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল মানসীর মধ্যে তাহারও পরিচয় আছে।

প্রেম যেখানে আসক্তি মাত্র সেখানে মানুষ বৃহৎ বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া কেবল প্রেমের পাত্রকেই একান্ত করিয়া তুলিতে চায়। ইহাতে সমগ্র চেতনা অশ্রুমুখীন হইয়া বিশ্বের সকল আলো নিভাইয়া দিয়া ধ্যানে ওই মূর্ত্তি আবেষ্টন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে চায়। কেবল এক মোহময় প্রসুপ্তি।

"যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষ বার—" (ভৈরবী)

আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে কবি তখন জীবনের মহত্তর প্রেরণা আশ্রয় করিতে চাহিয়াছেন।

"যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার পথ তরিয়া
যত মানবের গুরু মহৎ জনের চরণ চিহ্ন ধরিয়া।" (ভৈরবী)

কিন্তু প্রেম বা সৌন্দর্য্য মোহের আবেষ্টন মুক্ত হওয়া তো সহজ নয়। প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তিকে উহা যেন ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিয়া দিতে থাকে।

"হায় উঠিতে চাহিছে পরাণ, তবু ও
পারে না তাহারা উঠিতে।" (ভৈরবী)

কড়ি ও কোমলের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে কবি খণ্ড-রূপের অন্তরালে এমন একটি অখণ্ড তত্ত্ব লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যাহাকে লাভ করিলে জীবনের সকল জিজ্ঞাসা ও ব্যাকুলতার অবসান ঘটে।

মানসী রচনাকালে কবির মধ্যে এমনি একটি বোধ গড়িয়া উঠিয়াছে অমন নিঃশেষ কোন প্রাপ্তি জীবনে সম্ভব নয়। এই যে বিশ্বাস, যে বিশ্বাস আশ্রয় করিয়া কবি আপাততঃ সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহার স্বরূপ

বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। মানসীর কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া আমি কবির এই জাতীয় উপলব্ধির স্বরূপ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিব।

মানবাত্মা জীবন হইতে জীবনে অনন্ত অভিসার করিয়া চলিয়াছে, তাহাকে বেষ্টন করিয়া কালে কালে রূপ হইতে রূপে অনন্ত রহস্য উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, সেই সমগ্র সত্তাকে তাই একটি জন্মের সীমা-বদ্ধ চেতনায় নিঃশেষে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

মানবাত্মার অনন্ত অভিসার তত্ত্ব, অন্তহীন অভিব্যক্তি তত্ত্ব বিজড়িত হইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবন অন্তহীন বিস্ময় বিজড়িত হইয়া গিয়াছে।

এই অভিসার বা বিকাশ অন্তহীন নয়, ইহার একটি সমাপ্তি আছে। জীবনের এই পূর্ণতার ধ্যান রহিয়াছে 'বিশ্ব-জগতের' মধ্যে 'ঈশ্বরে'র মধ্যে। যাঁহাকে বিশ্বাত্মা এবং দিব্য-চেতনা বলা যায়। উহা শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা আশ্রয় না করিবার জন্য কিছুটা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট হইলেও এই তত্ত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না।

"অতি সযতনে
অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুঃখে নিশীথে দিবসে
বিপদে সম্পদে
জীবনে মরণে
শত ঋতু আবর্ত্তনে
বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তবে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—" (নিষ্ফল কামনা)

প্রতি মুহূর্ত্তের বিচিত্র অনুভূতি, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র দোলা, বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্ভোগের ভিতর দিয়া মানুষের যে অক্ষয় সত্তা ধীরে রূপ লাভ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাতে জল-স্থল-আকাশের কোন্ অভিপ্রায় চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে তাহা মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ চেতনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

এই. নিখিল বিস্সৃষ্টি, উহার অনন্ত কোটি প্রাণ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের কোন এক অভিপ্রায় সৃষ্টির আদি কাল হইতে ধীরে ধীরে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে জগৎ ও জীবনের অনন্ত স্বরূপতা বোধ করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার জীবনের সীমাবদ্ধ চেতনাটিকে শাশ্বত নিয়তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। মানবীয় চেতনায় অসীমের কোন উপলব্ধি সম্ভব নয়।

জগৎ ও জীবনের এই আনন্ত্যের (?) বোধ গড়িয়া উঠিয়াছে সীমাবদ্ধ চেতনায়, তাই উহার মধ্যে সর্ব্বত্র রূপের ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহা রূপ হইতে রূপে অন্তহীন কাল ধরিয়া বিহার। অরূপের যোগে নিত্য লীলা। দুই কোন একটি পরিণামে যে এক স্বরূপতা লাভ করে, মানুষ যে সীমার সকল বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, এই দার্শনিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এখনও ঘটে নাই। তাই কবি এমন উক্তি করিয়াছেন,

"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের। (নিষ্ফল কামনা)

লাভ করিতে না পারা গেলেও জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে এক পরম ঐক্য তত্ত্ব রহিয়াছে, এই জগৎ ও জীবন যে সেই পরম সত্যের প্রতিভাস এ সম্পর্কে কবির মনে কোন সংশয় নাই। প্রতিভাস স্বরূপে ছাড়া আর কোন উপায়ে মানুষ পরম সত্য লাভ করিতে পারে না।

"দেখো ওই ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন,
রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস।" (নিষ্ফল প্রয়াস)

কবি এই মানব ভাগ্যকে শাশ্বত নিযতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন—

"বুঝিবার নহে যাহা চাই তাহা বুঝিবাবে"

কিংবা

"এই চিব আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।" (মৌন ভাষা)

মানবীয় চেতনায় উর্দ্ধতর সত্যের যতটুকু আভাস আসিয়া পৌঁছায় তাহাতেই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ইহাই মানব ভাগ্য। তাহার শাশ্বত নিয়তি।

জীবন ও মৃত্যুর উভয় তীর পূর্ণ করিয়া চেতনার এই যে এক আশ্চর্য্য প্রকাশ, ইহার অর্থ কি? ইহা কি কেবল স্বপ্নে সঞ্চরণ করিয়া ফেরা?

কোন্ প্রভাতে আমরা ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিব, কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে? ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া এই জগৎ ও জীবনের তখন কোন্ স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিব? যেমন স্বপ্নে জাগিয়া উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করি, তেমনি আমাদের হৃদয়-লোকে গুহাহিত এক প্রাণী জাগিয়া উঠিবার জন্য নিষ্ফল মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

প্রেমোপলব্ধিতে নর-নারীর অন্তরে যেন একটি আলোক শিখা জ্বলিয়া উঠে, উহারই আলোকে এই জীবন ও জগতের কিছুটা অর্থ চকিতে চেতনায় উদ্‌ভাসিত হইয়া যায়।

একদিকে জীবনের এই উপলব্ধি—

"মায়া কারায় বিভোর প্রায় সকলি" (শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা)

অন্যদিকে ওই আকাঙ্ক্ষা—

"দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি আবরণ।" (শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা)

প্রেম যেখানে পরিণামে নর-নারীকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, সেখানে বিচ্ছেদ বা বিয়োগ বেদনা যত গভীর হোক-না-কেন, তাহা জীবনকে একান্ত বিনষ্ট করিয়া দেয় না।

বিচ্ছেদে জীবনের একেবারে মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত উদ্‌ভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া প্রেমে কবির অন্তরে এত আশঙ্কা জাগিয়া থাকে। নিবিড় আত্মহারা প্রোমোপলব্ধির মধ্যে বারংবার এই আশঙ্কাটাই চকিতে আলোকপাত করিয়া কবির অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত শিহরণ তুলিয়াছে।

প্রেম একটা সীমার মধ্যে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে চায় কোন্ প্রেরণার বশে তাহা আমরা জানি।

"আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি আলো" (আশঙ্কা)

কিংবা

"তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।" (আশঙ্কা)

এই প্রেম-বন্ধন যদি কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে

"চিহ্নসম কেবল রবে
মৃত্যু রেখা কালো।" (আশঙ্কা)

মানবীয় চেতনা যত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে, প্রেম ও সৌন্দর্য্য বোধ তত বিস্তার লাভ করে। একেবারে আত্মিক চেতনায় মানবীয় যে-কোন বোধ, তাহা যতই উন্নত হোক-না-কেন, আর থাকে না। মানস-লোকের

জাগরণটিই এমনই বিরাট ও উদার-প্রশান্ত যাহাতে নিম্নতর চেতনার বিক্ষোভ চাঞ্চল্য প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। মানবীয় চেতনার উর্দ্ধতর কোন অনুভূতির কথা নয়, মানস-লোকের ব্যাপ্তি ও প্রশান্তির কথাই কবি এক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। স্থির আকাশের নিম্নে যেমন মেঘের বিচিত্র লীলা চলে, অথচ আকাশ স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি মানস-লোকে চেতনা যখন একটি স্থির পরিণাম লাভ করে তখন নিম্নতর চেতনার চকিত বিচিত্র প্রকাশ অন্তরকে আর বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

প্রেমের অনুভূতিকে কবি এই স্থির ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে চান। এই আকাঙ্ক্ষাই 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটির মর্ম্ম কথা।

"দুটি প্রাণ তন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।" (আকাঙ্ক্ষা)

স্থির ধ্যানে প্রেমে এক প্রকার মুক্তি ঘটে। নর-নারীর জীবনে তাহা আর বন্ধন স্বরূপ হয় না। উভয়ে উভয়কে তখন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখে। নর-নারীর প্রেম ওই পরিণাম লাভ করিয়া অসীমের জন্য ধ্যান নিমগ্ন হয়। জীবনের এই ব্যাপ্তি যে মানস-লোকে তাহা 'অসীমের সিংহাসন পানে' এই উক্তিটি হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে নানা পথ আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। । তাহারপর এই সীমার বোধটিকে জীবের চিরন্তন নিয়তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

প্রেমকে মানস-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার কবির এই যে সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা তাহা এইকালে কোথাও যে সার্থক হয় নাই তাহা নহে।

মানস-লোকে প্রেম যে কী ব্যাপ্তি লাভ করে এবং এই আসীম ব্যাপ্ত লোকের মধ্যে নর-নারীর হৃদয় কীরূপ ধ্যান নিমগ্ন হইয়া যায় তাহার পরিচয় 'ধ্যান' কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ব বিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি।" (ধ্যান)

ধ্যানে সমগ্র চেতনা যখন অন্তর্মুখীন হইয়া উঠে, তখন বাহিরের সমস্ত কিছু দৃষ্টি সমক্ষ হইতে দূরে সরিয়া যায়, অন্তরে বাহিরে তখন কেবল এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার

স্রোত বহিয়া চলে। তাহার পর ওই অন্ধকার সমুদ্র মথিত করিয়া উভয়ের অন্তরে উভয়ের দিব্য-মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। ধ্যানে এই যে মিলন তাহাতে আর বিচ্ছেদ নাই বিয়োগ নাই।

নারী-হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যকে পুরুষ কখন নিঃশেষ করিয়া লাভ করিতে পারে না।

"নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।" (আমার সুখ)

জীবনে প্রেম এক প্রকার মিস্টিক অনুভূতি। ইহা এক দৈব মুহূর্ত্তে নর-নারীর জীবনে অকস্মাৎ অনুভূত হয়।

"সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয় রাশি
দৈবে পড়ে চোখে—" (আমাব সুখ)

যাহার জীবনে সে আস্বাদ নাই, সে প্রেমের এই অনন্ত স্বরূপতা বোধ করিতে পারে না। এই অনুভূতি যে কী, তাহাকে তাই বুঝাইতে পারা যাইবে কোন্ উপায়ে? হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য একমাত্র প্রেমের আলোকে ধরা পড়ে। যেখানে তাহা নাই, সেখানে প্রেম যাচ্ঞার মত নর-নারীর এমন অসম্মাননা আর কিছু নাই।

ধ্যান-লোকে প্রেমের এই প্রাপ্তির পর প্রত্যক্ষ মিলন-বিচ্ছেদ একান্ত গৌণ হইয়া যায়। অন্তরে অসীম সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোকে নর-নারী চিরকালের জন্য ধ্যান মগ্ন হইয়া যায়। বহির্জীবনে আর যে কোন প্রাপ্তি তখন একান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

"শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি" (আমার সুখ)

'বিদায়' কবিতাটির মধ্যে এই নিত্য করুণ প্রশান্ত মানস আসঙ্গ লাভের পরিচয়।

"সম্মুখে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুব তারা সম—" (বিদায়)

দিনের পরে দিন চলিয়া যায়। ওই প্রেমের স্মৃতি সকল বেদনা-বিক্ষোভের উর্দ্ধে ধ্রুব তারকার মত দিনে দিনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি জানি না, তাহার পর এই অতুলনীয় প্রেমের সম্পদ বক্ষে লইয়া অজ্ঞাত জীবন পথ বাহিয়া একদিন মৃত্যুর মধ্যে চিরান্ধকার লোকে কোথায় হারাইয়া যাইব।

সকল প্রয়োজন, সকল বিস্মৃতির ঊর্দ্ধে ধ্রুব তারকার মত স্থির সেই অশ্রুস্নিগ্ধ মাধুর্য্যময় প্রেমের ধ্যান-লোক।

"সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যা তারকার
বিষণ্ণ আকাব ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি 'পবে—" (বিদায়)

সারাদিন নানা প্রয়োজনে আমরা ব্যাপৃত থাকি। তাহারপর যখন প্রয়োজন ফুরায়, যখন বিশ্রাম রাত্রি ঘনাইয়া আসে তখন মনের মধ্যে পশ্চাতে ফেলিয়া আসা প্রেমের স্মৃতি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্তর মথিত করিয়া বেদনা জাগে,—অলৌকিক আনন্দ আস্বাদের মত আকাঙ্ক্ষিত সে বেদনা। সারারাত ঘুমের ঘোরে আমরা অশ্রুপাত করিয়া চলি। ভোরের শীতল বায়ু স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিয়া মনে হয় যেন কোন আনন্দ-লোক হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছি।

বিচ্ছেদে অন্তহীন ব্যথা-সমুদ্রের ঊর্দ্ধে প্রেমের স্মৃতি ধ্রুব তারকার মত স্থির আনন্দ-কিরণ বিকীর্ণ করে।

কবির প্রেমানুভূতির বিচিত্র পরিচয় লাভ করিতে বসিয়া একটি বিশিষ্ট প্রেমের কবিতা এবং তদাশ্রয়ী কবির বিশিষ্ট একটি তত্ত্বানুভূতির কিছু পরিচয় লাভ প্রযোজন। কারণ এই তত্ত্বটি পরবর্ত্তী কালে কবির দার্শনিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কবিতাটির নাম 'অনন্ত প্রেম'। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার দুই চারিটি পংক্তি সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।" (অনন্ত প্রেম)

বিশ্বের প্রাণ-ধারা প্রেম ও সৌন্দর্য্যানুভূতি আশ্রয় করিয়া নর-নারীর অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া প্রাণ-লোকের, প্রাণ-লোক হইতে মানস-লোকের পূর্ণ জাগরণ ঘটায় এবং এইরূপে পরিণামে মানস-চেতনাকে ছাড়াইয়া যাইতে প্রেরণা দান করে। এই চেতনা বিকাশে ব্যক্তির তাই কোন বিশিষ্ট মূল্য থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এইখানে একটু বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বিশ্বের এই বিকাশ তত্ত্বে তিনি বিশেষের একটি সত্য মূল্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া 'আমার' অন্তরে প্রেম উপজাত হইয়াছে, সেই যে 'তুমি' এবং এই যে 'আমি' ইহার শাশ্বত একটি লীলা তত্ত্ব কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বের বিকাশ ধারায় বিশিষ্ট 'তুমি' এবং বিশিষ্ট 'আমি' যে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া লীলা করিয়া চলিয়াছে, এমনি এক প্রকার বোধ কবি লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের এই 'তুমি' ইন্দ্রিয় চেতনায় একটি বিশিষ্ট বিগ্রহ মাত্র, প্রাণ-চেতনায় প্রাণ-তত্ত্ব, মানস বা ধ্যান-লোকে মানসী।—তাহারই অতুলনীয় রূপরাশি বিশ্বময পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। তদূর্দ্ধ চেতনায় এই তুমি কবির জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতা লোক হইতে লোকান্তরে রূপ হইতে রূপে কবির জীবন গড়িয়া তুলিতেছেন। জীবনের এই ধীর বিকাশের ভিতর দিয়া জীবন-দেবতার এক বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। ইহার ঊর্দ্ধতর চেতনায় এই 'তুমি' বিশ্ব-চেতনা বা ঈশ্বর। —সর্ব্ব জীবের সাধারণ সত্তা রূপে ইনি সকল জীবের নিখিল-বিসৃষ্টির নিয়তি গড়িয়া তুলিতেছেন। আরও ঊর্দ্ধে এই তুমি ব্রহ্ম; যিনি অরূপ, অসীম, চির স্থির শাশ্বত এক অস্তিত্ব মাত্র।

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই 'তুমি' কখন নারী বিগ্রহ, কখন প্রাণ, কখন মন, কখন জীবন-দেবতা, কখন বিশ্বদেবতা বা ঈশ্বর, কখন বা ব্রহ্ম।

প্রেমানুভূতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে কবিকে যেমন প্রবৃত্তির সহিত দুরন্ত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তেমনি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষেত্রে। মানব-জীবনে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি বস্তুতঃ পৃথক নয়। ইন্দ্রিয়-লোকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি যেমন একান্ত সঙ্কীর্ণ, তেমনি অসহনীয় বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী। প্রাণ-চেতনা হইতে ধীরে ধীরে মানস-চেতনায় ওই প্রেম যত গভীরতা লাভ করে, প্রবৃত্তির সহিত ওই দ্বন্দ্বটাও তত হ্রাস পায়। আমরা এ পর্য্যন্ত তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করিলাম।

প্রাণের স্তর হইতে সৌন্দর্য্যানুভূতিকে মানস-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে কবিকে যে কী দুর্ব্বার সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল 'মানসী' হইতে এখন তাহার কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। প্রারম্ভে 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটির আশ্রয়

লইতেছি। কবিতাটির মধ্যে এই সংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আছে। ইন্দ্রিয় চেতনাশ্রয়ী কবির সেই সৌন্দর্য্যবোধ—

"ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্ত্তি
পশেছে জীবন মূলে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

ইন্দ্রিয় চেতনায় অনুভূত কবির এই সৌন্দর্য্যানুভূতি কবির জীবনে কী বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় এই কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

কবি যেন অন্তহীন অতল গহ্বর নিয়ত বিক্ষুব্ধ সৌন্দর্য্য-সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাই স্থির কোন একটি লোক লাভের জন্য এমন অধীরতা। 'সোনার তরী'র মধ্যে কবির সৌন্দর্য্য-লোক যেমন আরও সমৃদ্ধ হইয়াছে তেমনি সকল রূপের অতীত এই শাশ্বত চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হইয়াছে।

মানস-লোকে চেতনার সমুন্নতির সঙ্গে নিম্নতর চেতনা সকল অধিকতর সামর্থ্য লাভ করে। সেইজন্য মানস-লোকে ইন্দ্রিয়-প্রাণের পিপাসা, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি আশ্চর্য্য প্রসারতা লাভ করে।

আবার মানস-লোকে উর্দ্ধতর-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাধিক তীব্রতা লাভ করে। তখন এই মানস-বিহার পরিহার করিতে হয়। তখন বিশিষ্ট কোন রূপ আশ্রয় করিয়া মন ধীরে ধীরে ধ্যান মগ্ন হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্য-লোকে কবির সেই উদ্বেল ভাসমান অবস্থা—

"আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ
সর্ব্ব শরীরে পশে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্বের সৌন্দর্য্য সহস্র ধারায় কবি-চিত্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। কে যেন সকল ইন্দ্রিয় দ্বারে সৌন্দর্য্যের অগ্নি শিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে, তাহারই অসহনীয় উত্তাপে কবি-প্রাণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সেই দগ্ধ চিত্তের হাহাকার কবিতাটির মর্ম্ম মূলে ধ্বনিত হইয়াছে। কবি তাই এই সৌন্দর্য্যানুভূতিকে প্রাণ-লোক হইতে চিরস্থির ধ্যান-

লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রেও কবির এই একই প্রয়াস আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

"শান্তি রূপিনী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

সৃষ্টি-প্রেরণা ইন্দ্রিয় বা প্রাণের প্রেরণা নয় তাহা ধ্যান বা মানস-লোকের সামগ্রী। ধ্যানে বস্তুর পূর্ণ স্বরূপের প্রকাশ ঘটে। নিম্নতর চেতনায় রূপ বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। শিল্পী অন্তরের স্থির ধ্যান-লোকটিকে বাহিরে নানা ভাবে রূপায়িত করেন।

"চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে এক পরম সৌন্দর্য্যের স্থিরলোক, কবি এখন সেই লোকটিকে লাভ করিতে চান। সেই একের সন্ধান লাভ ঘটিলে কবি বুঝিবেন এই বৈচিত্র্য যেমন সত্য, তেমনি এক'ও সত্য। এই একের সন্ধান লাভ জীবনে যতদিন না ঘটে, ততদিন এই বিচিত্র বোধ জীবনে অসহায় বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। দুইয়ের যোগে যে সাক্ষাৎকার, তাহাই পূর্ণ সাক্ষাৎকার।

মানস-লোকে সৌন্দর্য্যবোধ অসামান্য ব্যাপ্তি লাভ করে। অন্তর্লোকে যেমন একটি স্থির সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া উঠে, তেমনি উহারই যোগে বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য্যও অপার হইয়া উঠে।

"সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।" (আত্ম সমর্পণ)

মানস-লোকের এই স্থির সৌন্দর্য্য-লোকটিকেই কবি বিচিত্র ভাব-ভাবনার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

কবির আকাঙ্ক্ষা অন্তরের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-লোকটিকে বাহিরে ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রত্যক্ষ করিবার। অথচ তাহাকে বাহিরে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। ওই ধ্যানের সামগ্রীকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে তাহা একান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়ে। কবি জানেন সৌন্দর্য্য কেবল ধ্যান-লোকের সামগ্রী।

"শুধু ফুটন্ত ফুল মাঝে
দেবী, তোমার চরণ সাজে"

একদিকে ধ্যানের অন্তহীন রূপলোক, অন্যদিকে বাস্তব-জীবনের রূঢ়তা ও মালিন্য। এই দুইয়ের মাঝে হয়ত কোন মিল আছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহা কবির অজ্ঞাত। দিব্য-চেতনা ও বিসৃষ্টি, অরূপ ও রূপের মধ্যে যেমন, তেমনি দেহ ও আত্মা, ধ্যানের সৌন্দর্য্য ও প্রেম, আদর্শ-লোক এবং বাস্তব মালিন্য ও তুচ্ছতার মধ্যে কবি সমস্ত জীবন ধরিয়া সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া তিনি সামঞ্জস্য তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মানসার মধ্যে এমন দুই একটি নিসর্গ কবিতা আছে, যেগুলির মধ্যে কবি আপনার জীবনে প্রকৃতি প্রভাবের গভীরতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

মানব-জীবনে যেমন একটি ঊর্দ্ধাভিমুখী প্রেরণা আছে, তেমনি একটি নিম্নাভিমুখী প্রেরণা আছে, যাহার ফলে সে প্রতিনিয়ত নিম্নতর চৈতনার দিকে, ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। বিশ্ব-প্রকৃতি মানব-জীবনের সকল নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত ঊর্দ্ধাভিমুখী করিয়া উন্নততর চেতনা-লোকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা এবং কাব্য-সাধনা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৃথক ছিল না। প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের নিবিড় যোগের কথা তাই তিনি নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক চিন্তাপূর্ণ এবং বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে 'শান্তি নিকেতনে' 'তপোবন' প্রবন্ধটির মধ্যে।

প্রকৃতিকে স্বীকার করিবার জন্য ভারতীয় সাধনধারা এবং সংস্কৃতি ইউরোপীয় সাধনধারা ও সংস্কৃতি হইতে কতকটা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতির মাঝখানে মানুষের প্রবৃত্তি যে-কোন সময়ে খুব বেশি উদ্দামতা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু উহাকে ব্যাপকতর লোকে ছড়াইয়া দিয়া শান্ত করিয়া দেয়। প্রকৃতি মানব-জীবনকে যে-কোন বিশিষ্ট ভাবাতিরেক হইতে রক্ষা করিয়া যে সামঞ্জস্য দান করিতে পারে, তাহা তিনি এ দেশীয় সাহিত্য বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্য বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন।

অন্যদিকে প্রকৃতি হইতে মানব-জীবন যেখানে দূরে সরিয়া আসিয়াছে, সেখানে এক একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তির ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক-গুলির মধ্যে প্রবৃত্তির এই আশ্চর্য্য উদ্দামতার পরিচয় লাভ করা যায়।

আমি কবির এই বোধের পরিচয় লাভ করিতে 'মানসী'র দুটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

জগৎ ও জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে 'কুহুধ্বনি' যেন নিত্য কাল ধরিয়া একটি পরিপূর্ণ সুষমার জগৎ গড়িয়া তুলিতেছে।

"জটিল সে ঝঙ্কনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে।" (কুহুধ্বনি)

জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে একটি পূর্ণ সুষমা-লোক রহিয়াছে কুহুধ্বনি যেন আমাদের চেতনায় সেই পূর্ণতার আভাস দান করে। ওই ধ্বনির ছিদ্র পথ দিয়া আমাদের বিক্ষুব্ধ অন্তরে কোন সীমাহীন সমুদ্র-কূলের বাতাস আসিয়া পোঁছায়। বাস্তব-জীবনের সকল দাহ মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া যায়।

প্রকৃর্তির সৌন্দর্য্য ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কবির অন্তর যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাস্তব জীবনের মালিন্য মুক্ত হইয়া যাইত, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

"প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলি ম্লান পাপ তাপ ধারা।" (জীবন-মধ্যাহ্ন)

মানসীর মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির যে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার পরিচয় লাভ করা যায় পরিশেষে তাহারই সামান্য উল্লেখ করিতেছি।

জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে পূর্ণ ঐক্যতত্ত্ব, তাহার সহিত মানবীয় চেতনা যতদিন না যোগযুক্ত অবস্থা লাভ করে ততদিন এই সংশয় ব্যাকুল জিজ্ঞাসা থাকিবেই। এই সাক্ষাৎকার না থাকিলে জগৎকে এক চেতনা শূণ্য জড় প্রবাহ মাত্র বলিয়া মনে হয়; এই প্রবাহে চেতনা-পূর্ণ মানব হৃদয় অসহায়ভাবে দলিত হইতেছে। মনে হয় মানব-হৃদয় ও জড়-জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী, বিরুদ্ধ স্বভাব। একটির সহিত অপরটির স্বরূপ ও ধর্ম্মগত এতটুকু মিল নাই। একটির মধ্যে চেতনার সীমাহীন প্রসার, আশ্চর্য্য অনুভূতি, অপরূপ সৌন্দর্য্য ও সুষমা, দিব্য-জীবনের আভাস, অন্যটির মধ্যে ইহাদের কিছুমাত্র প্রকাশ নাই—প্রাণের অনুভূতি নাই, চেতনার বিকাশ তো আরও পরের কথা।

মনুষ্য-চেতনার ধর্ম্ম এতদূর বিপরীত যে তাহাকে মর্ত্ত্যের কোন পরিণাম

বলিয়া মনে হয় না। তাহা যেন কোন্ নন্দনের তটতরু হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই জাতীয় বিচিত্র জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মিলন তত্ত্বটিকে চিরকাল অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন।

"হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব-হৃদয়
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?" (নিষ্ঠুর সৃষ্টি)

এই নিখিল বিশ্বকে তখন কোন এক অস্তিত্বের উপর মায়ার প্রকাশ বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে কোথাও নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। ইহা এক অর্থহীন সৃষ্টি-প্রবাহ মাত্র।

"সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙ্গে গড়ে মিথ্যা যত কুহক-কল্পনা।"

এই জাতীয় সাক্ষাৎকারের পরিচয় অধ্যাত্ম-সাধনায় আছে। সেখানে মানবীয় চেতনা ওই স্থির একেকে লাভ করিয়া বৈচিত্র্যকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া বোধ করে। এই একের উপলব্ধি গভীরতর হইলে বুঝা যায় যে ওই একই এমন অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। রূপ-সৃষ্টি তখন আর কুহক কল্পনা বলিয়া বোধ হয় না।

একদিকে অন্তহীন প্রেম ব্যাকুলতা, প্রেমে অবিরাম সৃষ্টি, অন্যদিকে নির্ম্মম বিনষ্টি। এই উভয়ের মধ্যে মিল কোথায় ? সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া নিখিল বিশ্বের কোন্ অভিপ্রায় সার্থক হইয়া উঠিতেছে ?

"এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব।
* * *
পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে দয়া নাই
বিষম সংশয়।" (সিন্ধু তরঙ্গ)

যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া আমরা ভালবাসি, সে যখন এই জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যায়, তখন আমাদের মর্ম্মের সমস্ত গ্রন্থি মুহূর্ত্তে শিথিল হইয়া পড়ে। যে আমাদের প্রেমে এত সত্য ছিল, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জীবনের সকল আনন্দ-বেদনা রূপ পাইত, মৃত্যুতে সে জীবনকে এমন অর্থহীন করিয়া দিয়া কোথায় যায় ? কে ইহার উত্তর দিবে ? ইহা সৃষ্টির আদিমতম প্রশ্ন।

"কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য একি নাথ ?"

পরম একের যোগেই জগৎ ও জীবনের সমস্ত কিছু অর্থান্বিত হইয়া যায়। সেই পরম এককে লাভ করিবার জন্য কবির এমন ব্যাকুলতা।

"কত দেখা শোনা করে আনাগোনা
চারিদিকে অবিরত,
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত!" (মায়া)

আজ কবির নিকট জগৎ ও জীবনের সকল স্বরূপ অজ্ঞাত। এই অনন্ত গ্রহ তারকার মাঝখানে এই আশ্চর্য্য পৃথিবীতে, ততোধিক আশ্চর্য্য মানবীয় চেতনার প্রকাশ। মানব প্রেমের এই যে বিস্ময়কর অধীরতা ও মুগ্ধতা, বিরহে শূণ্য প্রাণের যে কাতরতা—ইহার অর্থ কি? জীবনে কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া মানুষ মৃত্যুতে আবার হারাইয়া যায়? কোন দিব্য-চেতনায় কোথাও কি এই জীবনের অভিপ্রায় নিহিত আছে?

"আমি কেঁদেছি হেসেছি ভালো যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সবে
কী জানি কিসের ঘোরে।" (উচ্ছৃঙ্খল)

সোনার তরী

'সোনার তরী'র মধ্যে বিশ্বের সহিত কবি-প্রাণের যোগ যেমন গভীরতর হইয়াছে, তেমনি মানুষকে তিনি আরও নিকট হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইরূপে একদিকে জগৎ অন্যদিকে জীবনের যোগে বিশ্ব-প্রাণের সহিত কবি-প্রাণের যোগ আরও গভীর, আরও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। 'সোনার তরী'র মূল প্রেরণার পরিচয় দান করিতে গিয়া ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত এই দিকটির উল্লেখ করিযাছেন।

একদিকে বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য—

"পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের তুলি।"

অন্যদিকে সুখ-দুঃখ-ক্ষুব্ধ মানব জীবনের বিচিত্র প্রয়াস—

"অহরহ সুখ দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবন ধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।"

আর এই দুইয়ের যোগে বিশ্ব-প্রাণের সহিত কবি-প্রাণের যোগ গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল।

"আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্ত্তনা, বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব লোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্ত্তনা।"

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি কবির জীবনে যত গভীর যত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বসত্তার সহিত কবির যোগ তত গভীর, উভয়ের সামঞ্জস্য তত সম্পূর্ণ হইয়াছে ; কিংবা বলা যায়, বিশ্ব-সত্তার সহিত ব্যক্তি-সত্তার যোগ যত গভীর যত সত্য হইয়াছে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি তত গভীর হইয়াছে। চেতনা বিকাশে ব্যক্তি ও বিশ্ব পরস্পর নির্ভরশীল। সৌন্দর্য্য ও প্রেম বিচ্ছিন্ন সত্তার সেতুবন্ধন স্বরূপ। উভয়ের যোগে সৃষ্ট এক আশ্চর্য্য প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের মুক্তি তত্ত্বে জগৎ ও জীবন পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিয়া যে পূর্ণতার সাধনা তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট শূণ্যতার সাধনা মাত্র। উহাতে কেবল বঞ্চনাই লাভ করিতে হয়। তাঁহার এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে 'পরশ পাথর' এবং 'আকাশের চাঁদ' কবিতার মধ্যে। জগৎ ও জীবন বিবিক্ত কোন পরম তত্ত্বোপলব্ধি, যাহা লাভ করিলে জগৎ ও জীবনের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, এমন কোন দার্শনিক মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ এইকালে সম্পূর্ণ-রূপে অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্য-চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব কবির জীবনে কোনকালেই ঘুচে নাই।

নিখিল বিশ্ব যে-পরম সত্যের প্রতিভাস স্বরূপ, মর্ত্ত্যের রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহারই আভাস আসিয়া পৌঁছায় ; কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

রূপ বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে এক, অখণ্ড সত্তা, তাহা লাভ করিতে হইলে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিতে হয়। এই বৈচিত্র্যই ক্ষণে ক্ষণে ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার মিলন ঘটায়। সীমা বা রূপ এইরূপে মুহূর্ত্তে অসীম বা অরূপের আভাস দান করে। 'পরশ পাথরে'র সন্ন্যাসী এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

এইকালে তাঁহার অন্তরে এমনি একপ্রকার স্থির বিশ্বাস গড়িয়া উঠে যে সীমা বা রূপের বোধ আশ্রয় করিয়া অমর্ত্ত্য-চেতনার যে আভাস জাগে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে

লাভ করিবার কোন উপায় নাই। ওই আভাসমাত্র রূপে তাহাকে লাভ করিতে হয়। মনের সীমাকেও অতিক্রম করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার যে সাধনা তাহাতে এই কালে তাঁহার সংশয় ছিল। এইকালে কবির এমনি এক প্রকার বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে মনের সীমা অতিক্রম করিবার চেষ্টা মনুষ্য প্রকৃতি বিরোধী, তাহা মানুষের চেষ্টার অসাধ্য।

'মানসী'র মধ্যে এমনি একপ্রকার বিশ্বাসবোধ প্রথম গড়িয়া উঠে। আমি প্রসঙ্গতঃ তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিশ্বাসই সোনারতরীর মধ্যে আরও গভীর হইয়া আপনার অনুকূল করিয়া জীবন ও জগতের একটি দার্শনিক-রূপ গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইযাছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দার্শনিক যুক্তিকে এই ভাবে উপস্থাপিত করিযাছেন। দেশ-কালের উর্দ্ধতর যে অতি চেতনালোক, তাহা লাভ করিলে হযত মানুষ সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়; জীবনকে বিশ্বের সমস্ত কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্র ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নিরন্তর ধ্যানের ভিতর দিয়া হয়ত চকিতের জন্য তাহার আভাস লাভ করা যায়; কিন্তু জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া যে সাধনা, যে সাধনায় জাগতিক এবং মানবীয় সকল বোধকে লোপ করিয়া দিতে হয়, তাহাতে মানুষের কি প্রয়োজন? মানুষের জীবনে সে ফল লাভের মূল্য কতটুকু?

জগৎ ও জীবন পূর্ণ করিয়া এই যে অপার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লীলা, যাহা মানুষের চেতনাকে মুহূর্ত্তে এই প্রাত্যহিক জগতের উর্দ্ধে বা গভীরে অন্তহীন রহস্য নিকেতনে পৌঁছাইয়া দেয, সন্ন্যাসী ইহ-জীবনে তাহা কিছুমাত্র বোধ করিয়া গেল না।

একদিকে অমর্ত্ত্য-চেতনা, যাহাকে লাভ করিলে দেশ-কালের পরিসীমায় মর্ত্ত্য-চেতনা লুপ্ত হইয়া যায, অন্যদিকে মানবীয় চেতনা। এইকালে রবীন্দ্রনাথ দুটি চেতনাকে স্পষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত বলিয়া বোধ করিয়াছেন।

মানস-চেতনার সসীম প্রকাশটিকে (উহার উন্নততর পরিণাম থাকিতে পারে কিন্তু উহাকে ছাড়াইয়া অর্থাৎ সীমার বোধ উত্তীর্ণ হইয়া নয়) জীবের একমাত্র নিযতি বা স্বরূপ বলিয়া বোধ করিবার ফলে, রবীন্দ্রনাথ রূপের বোধটিকে অনিবার্য্য রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

মানবীয় চেতনা লোক হইতে লোকান্তরে জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। রূপ বা সীমায় এই বিকাশ ঘটিতেছে অরূপ বা অসীমের যোগে। উভয়ের যোগে, চকিত আভাস লাভের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনা গভীরতর ও ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কোন একটা পরিণামে যে এই মানবীয় চেতনা আনন্ত্য স্বরূপতা লাভ করিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে অরূপের যোগে রূপের অন্তহীন লীলাকে জীবের একমাত্র নিয়তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

অন্যদিকে আর একটি সাধনা আছে, যেক্ষেত্রে মানুষ মানবীয় চেতনা বা সীমার সকল ধর্ম্মকে আদৌ পরিহার করিয়া অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া মানুষ ওই অসীমকে লাভ করিবার জন্য ধ্যান মগ্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে এই জাতীয় সাধনায় অরূপকে কোন কালে লাভ করিতে পারা যায় না, কারণ মানুষ সীমার সকল ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, অথচ সীমা-লোক বা মানবীয় চেতনা আশ্রয় করিয়া অরূপের যে আভাস লাভ করিতে পারা যাইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

একদিকে রূপকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া অরূপ লাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে রূপ আশ্রয় করিয়া উহারই যোগে অরূপের আভাস লাভ;—রবীন্দ্রনাথ এই শেষ পন্থাটিকে আশ্রয় করিয়াছেন।

একদিকে কেবল অরূপ, অন্যদিকে কেবল রূপ (যে স্বরূপেই হোক-না-কেন) ইহাদের কোন একটি পূর্ণতার সাধনা নয়। পূর্ণতার সাধনায় রূপ ও অরূপ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত।

অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে হইবে সীমা বা রূপকে আশ্রয় করিয়া। সীমা বা রূপকে আদৌ পরিহার করিলে, সেইসঙ্গে অসীম বা অরূপকে পরিহার করা হয়। আমরা যাহা কিছু লাভ করিতে পারি তাহা সীমা বা রূপকে আশ্রয় করিয়া।

"কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।" (পরশ পাথর)

এই রূপের সাগর মন্থন করিয়া অরূপ বা অপরূপকে লাভ করিতে হয়, সৌন্দর্য্য-লক্ষীর প্রকাশ ঘটে। পুরাণ কাহিনীটির মধ্যে যেন মানব জীবনের এই পরম সত্যটি উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

অজ্ঞাত ভাবে হইলেও প্রকৃতি তাহার রূপকে নিয়ত মানব অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।—যে রূপের বোধ আশ্রয় করিয়া চকিতে সম্পূর্ণতার আস্বাদ নামিয়া জন্ম জন্মান্তরকে ধন্য করিয়া দেয়।

মানুষ যখন এই সত্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হয় তখন হয়ত দুর্লভ জীবন অবসিত হইতে চলিয়াছে, তখন হয়ত জীবনকে আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া লাভ করিবার উপায় থাকে না। সন্ন্যাসী অবশ্য কোন পরিণামে এই সত্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয় নাই ; ভ্রান্তি হইতে ভ্রান্তিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একদিন তাহার জীবন অবসিত হইয়া যাইবে।

'আকাশের চাঁদ' কবিতাটির মধ্যে মানুষ যখন জীবনের দুর্লভতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে, যখন বোধ করিয়াছে জগৎ কি অশ্চর্য্য সুন্দর, সেখানে তুচ্ছতা বলিয়া কিছু নাই, তখন তাহার জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। অশ্রুসজল দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত কিছু ঝাপসা, একাকার হইয়া গিয়াছে। মানুষের এই বেদনার কি পার আছে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি বিশ্ব-প্রাণের যোগে সৃষ্ট। এই যোগ যত সম্পূর্ণ হইয়াছে কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ তত উন্নত হইয়াছে। কবির চেতনা বিশ্ব-চেতনা হইতে যখন দূরে সরিয়া গিয়াছে তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান-লোকটিও মুহূর্ত্তে বিশুষ্ক বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কবি তখন চেতনাকে বেদনায় নিপীড়িত করিয়া বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ যোগ স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছেন। কবির সত্তা কোথাও বিশ্ব-সত্তা হইতে যথেষ্ট দূরে সরিয়া আসিয়াছে, কোথাও বা আরও কিছুটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান-লোক বিশ্ব-প্রাণের যোগে সৃষ্ট। ওই যোগ যত সম্পূর্ণ হইয়াছে, কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান তত সমৃদ্ধ হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের প্রাণধারা হইতে কবি যখন দূরে সরিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তা যখন একান্ত হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে, তখন ওই সৌন্দর্য্যও কেবলই ভাঙ্গিয়া

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই উপলব্ধি মুহূর্তে কবি সচেষ্ট হইয়াছেন বিশ্ব-প্রাণের সহিত আপন প্রাণের সংযোগ স্থাপন করিতে।

'দেউল' ও 'ঝুলন' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি যেমন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছেন, তেমনি ওই সৌন্দর্য্য-লোকটিকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতে তিনি বিশ্ব-প্রাণের সংযোগ কামনা করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কেবল ব্যক্তি-সত্তায় অন্তরের সৌন্দর্য্য-ধ্যানকে কোন প্রকারেই সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না।

"অতল স্বপ্ন সাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।" (ঝুলন)

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে কবি তাই বিশ্ব-প্রাণের সহিত আপন প্রাণের যোগ সাধন করিতে চাহিযাছেন।

"ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে
ভাসাই ভেলা।" (ঝুলন)

'ভব তরঙ্গ', নিখিল বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-স্পন্দন। পরিণামে বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির প্রাণ জাগ্রত হইয়াছে।

"নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখে
হৃদয় নাচে—" (ঝুলন)।

এই একই ভাব কিছু বিশিষ্টতার সহিত 'দেউল' কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির মানস-জাগরণ যত সম্পূর্ণ হইতেছে, বিশ্ব-চেতনা লাভের জন্য গূঢ় প্রেরণা কবির অন্তরে তত গভীর করিয়া অনুভূত হইয়াছে। বিশ্ব-প্রাণ-ধারা এইরূপে মানস-চেতনার পূর্ণ জাগরণ ঘটাইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভের জন্য অন্তরে অসহনীয় বেগ সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

মানসী কাব্যে 'অহল্যার প্রতি' কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত মিলাইয়া তুলনামূলকভাবে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এইকালে কবির মানস-জাগরণ যেমন আরও সম্পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি এই একই কারণে বিশ্ব-চেতনার সহিত গূঢ়

মিলন অনুভূতি আরও দুর্ব্বার এবং এইরূপে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভের প্রেরণা অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। আমি এক্ষেত্রে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু এই বিরাট জঠরে
অজ্ঞাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃ হৃদয়ের অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়।" (সমুদ্রের প্রতি)

এই মানসিক অবস্থাটিকে কবি অন্যত্র কয়েকটি পত্রের মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাহার সামান্য একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্য কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোম কূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্ব্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম—তখন শরৎ সূর্য্যালোক—আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ রস, একটি জীবনী-শক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব এ-যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য্য সনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্য ক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারিকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্ করে কাঁপছে।—" (ছিন্নপত্র)

এই অন্তহীন প্রাণ-স্পন্দ নক্ষত্রে নক্ষত্রে, গ্রহে-উপগ্রহে, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে, অনন্ত কোটি জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক প্রাণ স্পন্দনে সমস্ত কিছু বিধৃত। প্রাণ বা শক্তির এক একটি বিশিষ্ট ছন্দের ভিতর দিয়া এক একটি রূপ-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার সকল রূপ, সকল ছন্দ, এক আদি ছন্দে সামঞ্জস্যীভূত।

অনন্ত জ্যোতিষ্কলোকে যে প্রাণ চাঞ্চল্য—

"গ্রহ মণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চির চঞ্চল—" (বিশ্ব-নৃত্য)

সেই এক প্রাণ স্পন্দন বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে—

"দুলিয়া দুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্র শির নাগিনী।

* * * *

ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে,
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কী গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে
মর্ম্মরে দিন যামিনী।" (বিশ্ব-নৃত্য)

প্রাণীলোকের মধ্যে তাহারই প্রকাশ—

"পশু বিহঙ্গ কীট পতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে—" (বিশ্ব-নৃত্য)

জড়, প্রাণ, মন এবং তদূর্দ্ধ চেতন জগৎ সমূহের মধ্যে প্রাণ সাধারণ ধর্ম্ম। এক প্রাণ-স্পন্দে সকল লোক বিধৃত।

জীবন ঘিরিয়া যে অপার রহস্য তাহার সন্ধান মানুষ যুগ যুগান্তরের সাধনার ভিতর দিয়া কতটুকুই বা লাভ করিয়াছে। এই অন্তহীন প্রাণের শাসনে প্রাণের প্রকাশ। এই প্রাণের উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রন নাই। প্রাণের প্রকাশের উপর মানুষের যেমন হাত ছিল না, তাহার বিনষ্টিতেও তেমনি মানুষের কোন হাত নাই। মানুষ এমনি অসহায়!

"মহান-মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।" (বিশ্ব-নৃত্য)

ব্যক্তিপ্রাণ বিশ্ব-প্রাণকে যত বেশি লাভ করিতে পারে ততই তাহার মধ্যে সৃষ্টি প্রেরণা গভীরভাবে অনুভূত হয়। 'দেউল' 'ঝুলন' ইত্যাদি কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। কবি বিশ্ব-প্রাণের গভীর হইতে গভীরে নিমজ্জিত হইতেছেন, যেখানে তাহা ব্যাহত হইয়াছে সেখানে সৃষ্টিপ্রেরণাও নিরুদ্ধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-মানব-তত্ত্ব এই বিশ্ব-প্রাণ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব-প্রাণের যোগে কেবল ব্যক্তি-প্রাণের মুক্তি নয়; সকল প্রাণের মধ্যে এক শাশ্বত প্রাণের প্রকাশ বলিয়া অথবা নিখিল প্রাণের যোগে সকল প্রাণের প্রকাশ বলিয়া বিশ্ব-প্রাণের অনুভূতির গভীরতা এবং প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে আত্মীয়তাবোধও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্যের উপর সামগ্রিক দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যে কবির মধ্যে সামঞ্জস্যবোধ (অর্থাৎ বিশ্ব-প্রাণ ও মনের সহিত ব্যক্তি-প্রাণ ও মনের যোগ) যতই গভীর হইতেছে, ততই কবির সৃষ্টি-প্রেরণা যেমন, তেমনি আন্তর্জ্জাতীয়তা বা বিশ্ব-মানববোধ বাড়িয়া চলিয়াছে।

মূল যে তত্ত্ব আশ্রয় করিযা বিশ্ব-মানববোধ গড়িয়া উঠিয়াছে, সে তত্ত্বে জাতীয়তা-বোধ কোনকালেই খুব প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না। বেশী পূর্ব্বের কথা নয় 'মানসী'র মধ্যেই কবির বিশ্ব-মানববোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই বোধই 'সোনার তরী'র মধ্যে গভীরতর হইয়া উঠিযাছে।

"জগৎ মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে।" (বিশ্ব-নৃত্য)

বিশ্ব-প্রাণের যোগে কেবল কবিই নন, বিশ্বের অনন্ত কোটি নর-নারী মিলন-মুক্তি লাভ করিবে। বিশ্ব-প্রাণের যোগে আজ কবি যেমন, তেমনি বিশ্বের অগণিত নর-নারী যে সৃষ্টি প্রেরণা লাভ করিবে তাহাতে বিশ্বে যে নব রূপ, যে নূতন ছন্দের প্রকাশ ঘটিবে তাহার কোন পরিচয় আজিকার মানুষের নাই। তাই কবি ব্যক্তি-চেতনা মুক্ত হইয়া বিশ্ব-চেতনা লাভের জন্য নর-নারীকে আহ্বান করিয়াছেন।

"উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।" (বিশ্ব-নৃত্য)

পুরস্কার কবিতাটির মধ্যে বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দ এবং তাহার সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত অনন্ত প্রাণের এই নিত্য স্পন্দকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ছন্দ আখ্যা দান করিয়াছেন।

সঙ্গীতের এই তত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে কবি এই বিশ্ব স্পন্দকে নিরাধার নিরলম্ব এক অন্ধ শক্তির লীলারূপে প্রত্যক্ষ করেন নাই। বিশ্বের এই শক্তি স্পন্দ যদি এক অখণ্ড রাগিণী হইয়াই থাকে, তবে তাহারও পশ্চাতে, তাহার আধার স্বরূপ কোন এক দিব্য-চেতনা নিশ্চয়ই রহিয়াছেন, এই বিশ্ব স্পন্দন যাঁহার আনন্দেচ্ছার প্রকাশ।

"যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্ব তন্ত্রী হতে।" (পুরস্কার)

ব্যক্তি-প্রাণ-স্পন্দ সেই অনন্ত প্রাণ-স্পন্দের একটি ক্ষুদ্র বিচি বিভঙ্গ মাত্র।

"যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়া
চিত্ত কুহরে উঠে কুহরিয়া—" (পুরস্কার)

দেশ-কালব্যাপী প্রাণ-ধারার বক্ষে অনন্ত কোটি প্রাণ বুদ্বুদের মত মুহূর্তে মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিয়া আবার প্রাণেই লয় পাইতেছে।

"কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়।" (পুরস্কার)

এই আনন্ত্যের আভাস যে মুহূর্তের জন্য লাভ করিয়াছে, সে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। সীমার এই সকল মূল্যবোধ তখন মিথ্যা হইয়া যায়।

"যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়াছে হৃদয় তরণী
জানে না আপনা জানে না ধরণী।" (পুরস্কার)

যে আদি প্রাণ-তত্ত্বে বিশ্বের সকল মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপ-পুণ্য, সুন্দর-অসুন্দর বিধৃত হইয়া আছে, সেই আদি প্রাণ-ধারায় কবি আপনার প্রাণ ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপ-পুণ্য, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বৈতবোধ মনুষ্য-চেতনার সামগ্রী। বিশ্ব-চেতনায় দ্বৈতবোধ থাকে না।

বিশ্ব-চেতনায় মানবীয় সকল চেতনা, সেই হেতু মানুষের সকল বেদনাবোধ এতদূর ব্যাপ্তি লাভ করে, যে পরিণামে বেদনার এই স্বরূপ আর থাকে না। তাহা লৌকিক আনন্দে রূপান্তরিত হইয়া যায় না। তাহা এমন এক অপরূপ পরিণাম, যাহা লৌকিক আনন্দ নহে, বেদনাও নহে। তাহা অসহনীয় সুখোচ্ছ্বাসের মত বোধ হয়।

"সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল।" (পুরস্কার)

কবির সৃষ্টি-প্রেরণার স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার সংযোগ তত্ত্বটির উল্লেখ করিয়াছিলাম। কবির জীবনে বিশ্ব-চেতনাবোধ যত গভীর হইয়াছে, সৃষ্টি-প্রেরণাও তত অফুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরস্কার কবিতাটির মধ্যে সে পরিচয়ও লাভ করা যায়।

দেশ-কাল পূর্ণ করিয়া প্রাণের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই বক্ষে অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্রের সংখ্যাতীত তরঙ্গ জাগিয়া আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

"স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূণ্যে উদ্দেশ হারা।" (পুরস্কার)

গ্রহ-নক্ষত্রের এক একটি বিচ্ছিন্ন সুরের ভিতর দিয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীত সৃষ্টি হইতেছে। এই অনাদ্যন্ত অখণ্ড সঙ্গীত সৃষ্টির আবার উদ্দেশ্য কি? সকল সৃষ্টির আনন্দের মত এই সৃষ্টির আনন্দও অহেতুক।

অন্যদিকে ব্যক্তি-চেতনায় তাহারই নিগূঢ় যোগ। এই যোগেই কবির কাব্য সৃষ্টি।

"সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।" (পুরস্কার)

সকল সৃষ্টি-প্রেরণার মধ্যে এই একই যোগের তত্ত্ব নিহিত। এই সম্পর্কে অনেক পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, আমি এই প্রসঙ্গে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পার, তাহলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়, আলো থেকেই আলো জ্বলে। * * *

বিশ্ব-প্রবাহের-প্রবাহিনীর মধ্যে গলা ডুবিয়ে তারই কলধ্বনি থেকে প্রকাশের মন্ত্র অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করো, তারই ধারার ছন্দ তোমার রক্তের স্রোতে আপন তাল বেঁধে দেবে।"

তিনি অন্যত্র এই কথা আরো বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন—

"আলোক তরঙ্গ, উত্তাপ তরঙ্গ, ধ্বনি তরঙ্গ, স্নায়ু তরঙ্গ, প্রভৃতি সকল প্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটি আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এই জন্য বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্পনের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার স্নায়ু দোলায় দোল দিয়া যায়, আলোক রশ্মি আসিয়া তাহার স্নায়ু তন্ত্রীতে অলৌকিক অঙ্গুলি আঘাত করে। তাহার চির কম্পিত স্নায়ুজাল তাহাকে জগতের সমুদয় স্পন্দনের ছন্দে নানা সূত্রে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

কেবল সঙ্গীত কেন, সন্ধ্যাকাশের সূর্য্যাস্তচ্ছটাও কতবার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব-জগতের হৃৎস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে একটি অনির্ব্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখ দুঃখের কোন যোগ নাই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত এবং সূর্য্যাস্ত কেন, যখন কোন প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তরের সহিত যুক্ত কবিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

* * * বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্য্য যোগে যখন আমাদেব হৃদয়েব মধ্যে সঞ্চারিত হয় তখন আমবা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলেব প্রত্যেক কম্পমান পরমাণুর সহিত এক দলে মিশিয়া অনিবার্য্য আবেগে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

* * * অনন্ত আকাশ জুড়িয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা তালে তালে নৃত্য কবিয়া চলিয়াছে। তাহাব বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্গীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়।" (গদ্য ও পদ্যঃ পঞ্চভূত)

'বসুন্ধরা' কবিতাটির মধ্যে বিশ্ব-প্রাণ-প্রবাহের সহিত মিলিত হইবার এই ব্যাকুলতার পরিচয় যে অংশে রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে কেবল তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। কবি-প্রাণের যে অপর একটি বিশিষ্ট প্রেরণার পরিচয় ইহার মধ্যে আছে, তাহা অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব।

"ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দেব মতো।" (বসুন্ধরা)

বিশ্ব-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষার ভারে কবি-চিত্ত মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিয়াছে।

"আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে সঞ্চারিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে।" (বসুন্ধরা)

জীবন ও জগৎকে কেবল শক্তি-স্পন্দ রূপে দেখা সম্পূর্ণ দেখা নয়। ইহার একটি স্থির আধার নিশ্চয় আছে। মানবীয় চেতনা এই স্পন্দন-সীমা অনুবিদ্ধ করিয়া স্থির চেতনা-লোক লাভ করিতে পারে। ওই পরিণাম লাভ করিলে মনুষ্য-চেতনা একদিকে যেমন পরম স্থৈর্য্য লাভ করে, তেমনি অন্যদিকে উহারই যোগে তাহার সৃষ্টি-প্রেরণা অশেষ হইয়া উঠে।

জগৎ ও জীবনের সকল অর্থ যে ওই পরিণাম লাভ করিলে মিলিতে পারে, এমনি একপ্রকার বোধও কবির অন্তরে ছিল। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে যে বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসার সহিত বিজড়িত হইয়া কবির অন্তরে এই অধ্যাত্ম পরিণাম লাভের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

সীমার বোধটিকে জীবের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি জীবনের যে নিয়তি-রূপ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু উহা জীবনের নিয়তি নয় বলিয়াই সকল তত্ত্ব উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া কবির অন্তর বারংবার উর্দ্ধ পরিণাম লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল বুদ্ধি ও হৃদয়বোধ দিয়া জগৎ ও জীবনের স্পন্দন রূপটি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথও জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে জীবনের সকল পিপাসা মিটে না, অনেক উত্তর নিরুত্তর রহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসা এক্ষেত্রে তাই কোন উত্তর লাভ করিতে পারে নাই।

কখন তিনি সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, উর্দ্ধ পরিণাম লাভের সকল প্রেরণা নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া একমাত্র রূপের জগৎটিকে স্বীকার করিয়া লইযাছেন। আমরা সে পরিচযও পাইয়াছি। সোনার তরীর মধ্যে কবির এই বিশিষ্ট প্রেরণার দিকটিও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

ইহা অরূপের যোগে রূপ আস্বাদের পিপাসাও নয। ইহা জীবন বা রূপের নিঃশেষ সমাপ্তি স্বীকার করিযা লইয়াই তাহাকে হৃদয়ের রক্ত রাগে, অনুরাগে রঞ্জিত করিয়া দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের এমনি একপ্রকার আশঙ্কা ছিল, যে অরূপের আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অরূপকে লাভ করিলে রূপ লুপ্ত হইয়া যায়।

বৌদ্ধ-দর্শন সীমার বোধটিকে জীবের শাশ্বত নিযতি, তাহার একমাত্র স্বরূপ বলিযা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জীবন ও জগতের এই স্পন্দ-রূপটি সে ক্ষেত্রে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সীমাকে জীবের স্বরূপ বলিযা মানিলে অসীম শূন্য হইয়া উঠিবেই। বস্তুতঃ অসীম বা অরূপ ওই সীমা বা রূপকেই পূর্ণ মহিমা দান করে, উহার পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে। বস্তুতঃ ওই রূপই অসীমতা বা অরূপতা লাভ করে। ভেদ দৃষ্টিতে হয় জগৎ ও জীবন একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয, নতুবা মিথ্যা বা মায়া হইয়া উঠে। অভেদ দৃষ্টিতে রূপ অরূপে, চেতনা বিশ্ব-চেতনায় পরিণাম লাভ করে। পৃথক বোধ থাকে না বলিয়া রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম, সৃষ্টি ও বিনষ্টির সকল জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

সোনার তরীর সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব মূলক কয়েকটি কবিতার পরিচয় লাভের পূর্ব্বে একটি বিষয় আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মানস-লোকে রূপের বোধ যতই গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করুক-না-কেন, তাহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয় বোধের উপর বলিয়া সীমাধর্ম্মী। সীমা বোধে মানব মনের তৃপ্তি নাই। কবি অতৃপ্তির জ্বালা বক্ষে লইয়া রূপ হইতে রূপে বিশ্বময় বিহার করিয়া ফিরিয়াছেন।—রূপের পর রূপ কেবলই যোজনা করিয়াছেন।

কবি-চেতনা যেমন রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরিয়াছে, তেমনি বিশ্বময় ব্যাপ্ত রূপকে কোন একটি নারী-বিগ্রহের মধ্যে সমাশ্রিত করিয়া সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছে। বিশ্ব-চেতনা বলিতে কবি যে অখণ্ড রূপ-তত্ত্বটি বুঝিতেন তাহা বস্তুতঃ মানব-চেতনায় সীমারূপের বিকল্প স্বরূপে গড়িয়া তোলা। অখণ্ড ও রূপ পরস্পব বিরোধী তত্ত্ব। তাহা ওই তিলোত্তমার ধ্যান। বিশ্বের সকল খণ্ড সৌন্দর্য্য দিয়া তাহার রূপ সৃষ্টি।

মানসীর 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি' কবিতা দুইটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে কবি বিশ্বাত্মা বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রূপ বা সীমা-লোকই। তাহা বিশ্বের সকল বিচ্ছিন্ন রূপ দিয়া গড়িয়া তোলা। বিশ্বের যোগে কবির মন-লোকের যেমন বিকাশ ঘটিতেছে, তেমনি বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তী সৌন্দর্য্য-লোক, বিশ্ব-মনও ক্রমিক বিকাশ লাভ করিতেছে। নানা চেতনা পর্য্যায়ে এই অপর সত্তাকে তিনি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার নানা স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সোনার তরীর মধ্যে কবি-মনের পূর্ণ বিকাশ যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি বিশ্ব-মনের পূর্ণ রূপটিও ধরা পড়িয়াছে। 'মানস সুন্দরী'র মধ্যে ইহারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সত্তাটিই চিত্রায় 'উর্ব্বশী' 'বিজয়িনী' প্রভৃতি কবিতায় একটু ভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, এই মানসী বা মানস-প্রতিমা বা মানস-সুন্দরী প্রভৃতির মধ্যে 'তুমি' রূপে অভিহিত যে অপর সত্তা তাহা আর একটু উন্নততর চেতনা-পর্য্যায়ে জীবন দেবতা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই জীবন-দেবতা পর্য্যন্ত কবির মনোধর্ম্মাশ্রয়ী রূপের বিচিত্র তত্ত্ব বিস্তারিত। ইহার ঊর্দ্ধে ব্যক্তি-আত্মা বা

বিশ্বাত্মা। এই তত্ত্ব-লোকে ব্যক্তি ও বিশ্বে আর পৃথক বোধ থাকে না। দার্শনিক জিজ্ঞাসায় এমন কি এই লোকেও রূপের অবশেষ থাকে। অজ্ঞানতার সর্ব্বশেষ আবরণ! একমাত্র ব্রহ্মই অসীম বা অরূপ, অজ্ঞানতার সকল আবরণ মুক্ত।

কবির সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্পর্কে এই যে মন্তব্য করিলাম কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। প্রারম্ভে 'মানস-সুন্দরী'র কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহ ভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণ মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনা বেদনা বন্ধ—" (মানস-সুন্দরী)

কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যান গভীরতা লাভ করিতে করিতে এই রূপ একটি অবস্থায় মুহূর্ত্তের জন্য মানবীয় চেতনার সীমা ছাড়াইয়া যায়। ইহা কবি-চেতনার অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী একটি অবস্থা মাত্র। কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ইহাই সর্ব্বোত্তম পরিণাম।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণের প্রকাশ বলিয়া শৈশবে একান্ত অপরিচিত এই বিপুল বিশ্বকে ভালো করিয়া চিনিবার পূর্ব্বেই বিশ্বানুভবের বা বিশ্বাত্মভাবের একটি অতি ক্ষীণ আভাস মানুষের অন্তরে থাকে, তাহার পর বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগ যতই বাড়িতে থাকে ততই এই পৃথিবী পরিচিত হইয়া উঠে। বিশ্ব-চেতনায় পরিণাম লাভে বিশ্ব এবং ব্যক্তি-চেতনা একাকার হইয়া যায়। তখন দুইয়ের বোধটা কোন স্বরূপে থাকে না বলিয়া লীলার এই তত্ত্বটি আর থাকে না।

'সন্ধ্যা সঙ্গীত' হইতে 'সোনার তরী' পর্য্যন্ত কবি-চেতনার ধীর জাগরণের সহিত সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধীর বিকাশ, এবং বিশ্ব-চেতনার সহিত ক্রমিক সামঞ্জস্য লাভের যে ইঙ্গিত করিয়াছি, সেই সমগ্র পরিণামের এক অপরূপ রূপময় পরিচয় কবি 'মানস-সুন্দরী'র মধ্যে দান করিয়াছেন। শৈশবে ও কৈশোরে এই নিখিল বিশ্ব সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও অন্তর্লোকে উহার জন্য এক আশ্চর্য্য অতি নিগূঢ় আকর্ষণ বোধ থাকে। এই বিরাট বিশ্ব তখন বিস্ময় ও ভীতি উদ্রেক করিলেও অন্তরের মধ্যে এক আশ্চর্য্য নির্ভরতা দান করে।

মহাশূন্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক-লোকের কক্ষাবর্ত্তন, আর মর্ত্ত্যে প্রকৃতির কঠোরে-কোমলে, ভয়ালে-সুন্দরে আদি অন্তহীন এক বিস্ময়কর প্রকাশ। তাহার মধ্যে কতটুকু এই মানব শিশু। অথচ মাতৃ-ক্রোড়ের মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তাহার দিন কাটিয়া যায়। এই নির্ভরতা সে কোথা হইতে কেমন করিয়া লাভ করে?

যৌবনে জাগ্রত প্রাণ আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। চেতনার এই ধীর বিকাশ ঘটে বিশ্বের সহিত যোগের ভিতর দিয়া। বিপরীত দিক হইতেও একথা সত্য, অর্থাৎ বিশ্বের সহিত মিলন যত গভীর হয় মানবীয় চেতনা তত বিকাশ লাভ করে। এই মিলনের ভিতর দিয়া বিশ্ব ক্রমাগত অপরূপ হইয়া উঠিতে থাকে।

বিশ্বের সহিত কবির মিলন আজ শৈশবের মত কেবল ইন্দ্রিয় বা প্রাণ-চেতনায় নয়, সে মিলন স্থাপিত হইয়াছে মানস-লোকে।

শৈশবের সেই অপরিচয়ের ভীতি আর নাই, আজ বিশ্বের যোগে কবির অন্তর্লোকে সৌন্দর্য্য ও প্রেম একেবারে সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

> "ছিলে খেলার সঙ্গিনী
> এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গেহিনী,
> জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।" (মানস-সুন্দরী)

চেতনা বিকাশের একটি বিশিষ্ট পরিণামের পর হইতে কবির মনে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা জাগিতে সুরু করিয়াছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সোনার তরীর মধ্যে কবির মানস-জাগরণ যেমন সম্পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি বিচিত্র অধ্যাত্ম ব্যাকুল জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়া কবিকে চিরকালের জন্য অশ্রুমুখীন নিদ্রাবিহীন করিয়া দিয়াছে।

এই যে বেদনা ইহার স্বরূপ কি? কোন্ ভাষায় এই অলৌকিক বেদনাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিতে পারা যায়? কিসের জন্য এই অতৃপ্তি? কী লাভ করিলে অন্তরের এই অতৃপ্তি ঘুচে? এই যে রূপ হইতে রূপে অন্তহীন বিহার ইহার কি কোন স্থির পরিণাম আছে? এই রূপ-লোকের অন্তরালে কি স্থায়ী কোন চেতনা-লোক আছে? এই রূপ-জগৎ অনুবিদ্ধ করিয়া উহার সীমা অতিক্রম করিয়া

মানবীয় চেতনা কি কখন উহা লাভ করিতে পারে ? অন্তরের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন কোন দূর সমুদ্রকূল হইতে অস্ফুট ধ্বনি ভাসিয়া আসে,—সকরুণ মিনতি বিজড়িত। সেই সুরে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা হইয়া পড়ে। এই আহ্বান কোথা হইতে আসে ?

"এই যে বেদনা
এর কোন ভাষা আছে ? এই যে বাসনা
এর কোন তৃপ্তি আছে ? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ? (মানস সুন্দরী)

কবির মন রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। কবি তাই একটি ধ্রুব-লোক লাভ করিতে চাহিয়াছেন ; ইহা সেই বিশ্ব-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা, যেখানে সকল রূপ-বৈচিত্র্য পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে। বিশ্ব-চেতনায় মানবীয় চেতনার অসীম বিস্তার। চেতনার সেই সীমাহীন ব্যাপ্ত পরিণাম লাভে মানুষের সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার অবসান ঘটে।

"শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীত ভরে।" (মানস সুন্দরী)

একদিকে বিশ্ব-প্রাণের মধ্যে ব্যক্তি-প্রাণকে একাকার করিয়া দিবার জন্য সকল সীমার বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে আবার ওই বিশ্ব-সত্তাকে একটি রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবার সুতীব্র ব্যাকুলতা। অসীম বা অরূপকে ইন্দ্রিয়দ্বারে সীমারূপে প্রত্যক্ষ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা হইতে কবির 'অখণ্ড রূপ'-তত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

যে 'তুমি'র খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত—

"এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্ত্য ভূমি
করিছ বিহার ;—" (মানস সুন্দরী)

তাহাকে আবার তিনি একটি নারী-বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছেন,

“সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধবা। এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ কবিবে বাঙা চবণেব তলে ?
অন্তবে বাহিবে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সব্ব ঠাঁই হতে সর্ব্বময়ী আপনাবে
কবিয়া হবণ, ধবণীর এক ধাবে
ধবিবে কি একখানি মধুব মুরতি।” (মানস সুন্দরী)

কিংবা

“কখনো কি বক্ষ ভবি
নিবিড় বন্ধনে তোমারে, হৃদয়েশ্ববী,
পাবিব বাঁধিতে। পবশে পবশে দোঁহে
কবি বিনিময় মরিব মধুব মোহে
দেহের দুয়ারে ?” (মানস সুন্দরী)

এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপা নারী-মূর্ত্তীকে তিনি গৃহের মধ্যে কল্যাণময়ী বধূ রূপে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এই নারীর মধ্যে তাই রূপের সম্পূর্ণতা, কল্যাণের সম্পূর্ণতাও ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ আদর্শ নারীর মধ্যে তিনি আদর্শ রূপ ও কল্যাণকে একত্রে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন।

“জীবনেব প্রতিদিন
তোমার আলোক-পাবে বিচ্ছেদ বিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার, বাজিবে তোমাব সুব
সর্ব্ব দেহে মনে ? জীবনেব প্রতি সুখে
পড়িবে তোমাব শুভ্র-হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রু জল। প্রতি কাজে
ববে তব শুভ হস্ত-দুটি। গৃহ মাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।” (মানস সুন্দরী)

সকল সম্পর্ক-বন্ধন মুক্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রূপকে পুরুষ যেমন একটি নারী

বিগ্রহের মধ্যে লাভ করিতে চায়, তেমনি বিশ্ব-সংসার পরিব্যাপ্ত স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকেও একটি নারীর মধ্যে লাভ করিয়া ধন্য হইতে চায়। পুরুষের অন্তরে এই উভয় জাতীয় পিপাসা আছে, কোন একটিকে পরিহার করিলে তাহার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার নিরসন ঘটে না।

পরবর্ত্তী কাব্য-গ্রন্থ চিত্রায় এই উভয় জাতীয় প্রেরণাকে তিনি যেমন পৃথক পৃথক ভাবে রূপায়িত করিযাছেন, একদিকে 'উর্ব্বশী' ও 'বিজয়িনী' অন্যদিকে 'স্বর্গ হইতে বিদায়', তেমনি উভয়কে একত্র লাভ করিবার জন্য সদা উৎসুক ও অতন্দ্রিত হইয়াছেন। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার অন্তর্গত 'বিশ্ব-প্রিযার' মধ্যে এই উভয় প্রেরণার সীমাহীন ব্যাপ্তি যেমন, তেমনি পরিপূর্ণ মিলন ঘটিয়াছে। এই 'বিশ্ব-প্রিযা'রই অসম্পূর্ণ প্রকাশ 'মানস-সুন্দরী'।

মানসী কাব্যের মধ্যে যাঁহাকে তিনি ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা বলিযাছেন, মানস-সুন্দরীর ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রিয়ার মধ্যে তাহার পূর্ণ পরিণাম ঘটিয়াছে। ইহাই কবির ঈশ্বরীয তত্ত্ব বা বিশ্ব-চেতনা। তাঁহার মধ্যে নিখিল বিশ্বের সকল রূপ, সকল প্রেম, সকল ভাব ও সকল সুর সমাশ্রিত।

এই অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার একটি দার্শনিক কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী চিত্রা কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত পরিচয লাভ করিতে পারা যাইবে। এক্ষেত্রে তাহার সামান্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া কেবল মানবীয চেতনার ধীর বিকাশ ঘটিতেছে না, দেহ-রূপেরও ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিতেছে। এই ভাবে মর্ত্ত্য-লোকে একদিন দেব-প্রতিম রূপের প্রকাশ ঘটিবে। মর্ত্ত্যের নর-নারী কেবল ভাবের জগতেই নয়, দেব-রূপেও দেব-সম হইয়া উঠিবে। এই মানব-সংসার হইবে দেব-ভূমি। স্বর্গের পরিকল্পনা একদিন এই জগতে সার্থক হইবে। সত্যযুগ তো অতীতে কোথাও ছিল না, তাহা আছে ভবিষ্যতে। মানব-সংসার তাহাকেই ধীরে লাভ করিতেছে। এমনি একটি স্থির বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল।

এই বিশ্ব-সংসারকে তিনি প্রেমে রূপায়িত করিযাছেন। রূপের আকাঙ্ক্ষা প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। এই রূপ ভাবে আবার বিলীন হইয়া যায়। অনন্ত শূন্যে আবার তিনি প্রেমের মন্ত্র জপ করিতে বসেন। সে মন্ত্রে শূন্য-লোক-পূর্ণ করিয়া আবার রূপ ফুটিয়া

উঠে,—দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত জ্যোতির্ম্ময় শতদল। এমনি অন্তহীন কাল ধরিয়া তাঁহার ভাব ও রূপের লীলা চলিতেছে।

"এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।" (মানস সুন্দরী)

মানবজীবনের এই একই লীলা। তাহার প্রেমের আকর্ষণে বিশ্বের সকল রূপ একটি নারী-রূপের মধ্যে অলৌকিক ভাবে আকার পরিগ্রহ করে, কিংবা আকার-বদ্ধ রূপ বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে কেমন করিয়া কোন্ রহস্যের বশে বিকীর্ণ হইয়া যায়।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির মধ্যেও কবির এই রূপাভিসারের পরিচয় লাভ করা যায়। এইকালে কবির অন্তরে যে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা জাগে কেবল তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

এই যে বিবশ আত্মকর্তৃত্ব শূন্য হইয়া রূপ হইতে রূপে চেতনার নিত্য সঞ্চরণ, জীবনে ইহার ফল লাভ কি? কবির নিকট আজ তাহা অজ্ঞাত হইলেও এই রূপ-পিপাসার একটা দার্শনিক কারণ নিশ্চয়ই আছে।

"কী আছে হোথায় চলেছি কিসের
অন্বেষণে?" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

এই রূপ-বিহারে আজ কবি ক্লান্ত, তাই একটা স্থির কোন চেতনা-লোক লাভ করিবার জন্য এমন ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা। পরিণামে এই স্থির চেতনা-লোকে কি কবি পৌঁছাইয়া যাইবেন?

এখন কেবল অন্তহীন সৌন্দর্য্য-সাগরে অসহায় হইয়া কেবল ভাসিয়া যাওয়া—

"সংশয়ময় ঘন নীল নীর
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর;
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

তাই স্থির কোন চেতনা-লোক লাভের অনিবার্য্য কামনায় কবি-চিত্ত আর্ত্তনাদ তুলিয়াছে।

"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

অথচ জীবের নিয়তি সম্পর্কেও কবি সচেতন। অর্থাৎ মানুষ যে-কোন পরিণামে ওই শাশ্বত চেতনা লাভ করিতে পারে না।

"কহিবে না কথা দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট উপলব্ধি তাহা সোনার তরীর মধ্যে এক প্রকার সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে ইহারই বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

যে একটি মাত্র কবিতায় প্রেমানুভূতির প্রথম প্রকাশ হইতে চূড়ান্ত অধ্যাত্ম পরিণাম পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পর্য্যায়ের পরিচয় কবি অপূর্ব্ব কুশলতার সহিত দান করিয়াছেন আমি সর্ব্বাগ্রে সেই কবিতাটির উল্লেখ করিব।

নর-নারীর জীবনে প্রেমের সাধারণ যে প্রকাশ তাহা সাংসারিক ও সামাজিক প্রয়োজনবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কলসীর জলে সমুদ্রের সেই সীমাহীন বিস্তার সেই নিয়ত অন্তহীন ব্যাকুলতা, সেই অপার রহস্যময়তার লেশ মাত্র পরিচয় নাই। বাতাস লাগিয়া কলসীর জলে যে ছল্ ছল্ শব্দ উঠে তাহাতে বুঝি সমুদ্রের সেই আদিম ব্যাকুলতার আভাস থাকে। যে শুনিতে জানে সে বুঝি শুনিতে পায়। একান্ত বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে প্রেম, তাহার মধ্যেও মাঝে মাঝে অনন্তের ক্ষীণ আভাস আসিয়া পৌঁছায়, মুগ্ধ নর-নারী তাহা শুনিতে পায় না।

অতলের এই কান্না তাহার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায় না। বাস্তব জীবনের সহস্র প্রয়োজন, সহস্র তুচ্ছতার ভিতর দিয়া তাহার দিন কেমন করিয়া একভাবে কাটিয়া যায়। এ প্রেমে হৃদয়ের চঞ্চলতা লোপ পায় না।

"তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।"

অতলের এই কান্না তাহার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায় না। বাস্তব জীবনের সহস্র প্রয়োজন, সহস্র তুচ্ছতার ভিতর দিয়া তাহার দিন কেমন করিয়া একভাবে কাটিয়া যায়। এ প্রেমে হৃদয়ের চঞ্চলতা লোপ পায় না।

"নূপুর ঝিনিকিঝিনি কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।"

এই চঞ্চল প্রেম কিছু গভীর হইলে নর-নারী ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হইয়া পড়ে। কোন কাজে আর মন বসে না। এতদিনের সকল প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া

বোধ হয়। উহা হৃদয়ের এমন একপ্রকার অভাব বোধ যাহাকে জাগতিক কোন কিছুর দ্বারা পূর্ণ করিতে পারা যায় না। জীবনের বিচিত্র প্রয়াস, কর্ম্ম চাঞ্চল্য মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। অন্তরের মধ্যে একটি নিভৃত-লোক গড়িয়া উঠে। উহারই ধ্যানে নর-নারী ক্ষণে ক্ষণে তটস্থ হইয়া পড়ে।

"দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।"

এই উপলব্ধি আরও গভীরতা লাভ করিয়া নর-নারীর জীবনে কোথাও দিব্যোন্মাদ অবস্থার সৃষ্টি করে। সমগ্র দেহ-প্রাণ-মন শত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া নর-নারীর জীবনে এক অপার জ্বালা-হর্ষের সঞ্চার করে। "ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে।"

এই পরিণাম লাভেও জাগতিক চেতনা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া যায় না। তীরে বসন পরিহার করিয়া জলে স্নান করিতে নামিলে জল লজ্জা ঢাকিয়া দেয় বটে, কিন্তু মন হইতে তো লজ্জা যায় না। স্নান শেষে তটে উঠিয়া আবার বসনে ভূষণে দেহ আবরিত করিতে হয়। অর্থাৎ এই অধ্যাত্ম পরিণামেও যেমন জাগতিক বোধ সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হয় না, তেমনি ওই অবস্থা হইতে নর-নারী স্বাভাবিক বোধে স্খলিত হইতে পারে।

এই অনুভূতি যখন চূড়ান্ত পরিণাম লাভ করে, তখন মানবীয় চেতনা দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর অনন্ত সত্তায় একাকার হইয়া হারাইয়া যায়।

"স্নিগ্ধ, শান্ত সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর
মৃত্যু সম নীল নীর স্থির বিরাজে।"

জাগতিক প্রেমই ক্রমাগত গভীরতা লাভ করিতে করিতে পরিশোধিত হইয়া চূড়ান্ত অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করে। জাগতিক প্রেম এবং ঈশ্বরীয় ভক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা প্রকৃতিগত নহে, পরিণাম গত। মানব প্রেম বিশ্বমুখীনতা লাভ করিলে ভক্তি-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব-মুখীন এই প্রেম বা ভক্তি যখন নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয় তখন নর-নারী যাহা পায় তাহাই মুক্তি।

কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনা জাগতিক প্রেম এবং ঈশ্বরীয় ভক্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছে। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-লীলা-ক্ষেত্র এই মর্ত্ত্য-জগৎ নহে, তাহা সম্পূর্ণ অলৌকিক এক দিব্য-জগৎ, তাহা বৃন্দাবন-ধাম।

'পঞ্চ ভূতে'র মধ্যে একস্থলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, "যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে।"

বস্তুতঃ প্রেম সাধন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট উপলব্ধি এই জাতীয় উক্তির মধ্যে তাহারই পরিচয় লাভ করা যায়। বৈষ্ণব-সাধনাও এই জগৎ ও জীবনকে মায়া বলিয়া পরিহার করিয়াছে। বৃন্দাবন ধাম তো ইহলোকই নহে।

এই বিশিষ্ট সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে নর-নারী সূক্ষ্ম, সিদ্ধ-দেহে ওই অলৌকিক জগৎ বৃন্দাবন ধামে গমন করে। অবশ্য জীবাত্মা ওই লোকে গিয়াও ঈশ্বরীয় নিত্য প্রেমের পঞ্চাঙ্গিক লীলায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আপন আপন সাধন অনুগ রস-লীলাটিকে তাঁহারা নিত্যকাল ধরিয়া প্রত্যক্ষ করেন। ইহাই বৈষ্ণব-দর্শন, বৈষ্ণব-সাধনা। ইহাতে দিব্য ও জাগতিক দুটি সত্তার স্বরূপতঃ পার্থক্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা এই ভাবে চেতনাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক এই দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে চেতনার এমন একান্ত বিভেদ অসম্ভব। বস্তুতঃ একেরই এই বিচিত্র পরিণাম।

মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে এই জগৎ ও জীবন তত সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। সীমা ও অসীম একই চেতনার প্রসার বলিয়া ভূমামুখীন এই প্রেমই নর-নারীর জীবনকে এমন রসসিক্ত, মর্ত্ত্য-ভূমিকে এমন সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া দেয়।

মানবীয় চেতনা যত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে, এই জগৎ ও জীবন তত সুন্দর হইয়া উঠে। পরিণামে এই জগৎ ও জীবনই ভূমা বা অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। মানবীয় চেতনায় দুইয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক সত্তা অমন ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে।

"হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।"

* * *

এত প্রেম কথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।" (বৈষ্ণব কবিতা)

প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উপলব্ধি এবং দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নের কয়েকটি পংক্তির মধ্যে।

"এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নব নারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।" (বৈষ্ণব কবিতা)

অসীমের জন্য ব্যাকুলতাকে মানব অনুভূতির ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিতে হয়। অসীম বা ভূমা সম্পর্কে আমাদের যে উপলব্ধি তাহাও মানবিক বোধের মাধ্যমে। অসীম বা ভূমা মানবীয় চেতনার উন্নততর পরিণাম। মানবীয় চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া যে ভূমা লাভের সাধনা তাহা শূণ্যতার সাধনা। মানবীয় অনুভূতিই কোথাও অসীমের জন্য ব্যাকুলতারূপে প্রকাশ পায়, কোথাও বা সীমা-লোক আবেষ্টন করিয়া ধন্য হইতে চায়। তাই জাগ্রত চেতনায় মানুষ সীমার মধ্যে অন্তহীন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সন্ধান পায়।

নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া পুরুষের অধ্যাত্ম জাগরণ ঘটে। অধ্যাত্ম জাগরণ কি, না অসীমের জন্য বিরহ। নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে যে ধ্যানলোক গড়িয়া উঠে, তাহাতে অসীমের আভাস পড়িয়া আর এক অপরূপতা লাভ করে। ইহাই জড়-রূপের অধ্যাত্মীকরণ।

নারীর এই রাজ রাজেশ্বরী, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী প্রকাশ বাহিরে কোথাও নাই, আছে পুরুষের ধ্যান-লোকে। পুরুষের ধ্যান-রূপের মধ্যে আপনার সম্পূর্ণ রূপটি খুঁজিয়া পায় না বলিয়া নারীর হৃদয় অমন করুণ-কোমল, অমন সদা অশ্রুমুখী হইয়া থাকে। বেদনার একটি শ্যাম-ছায়া তাহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। অন্তহীন ধ্যানের সমুদ্র পার হইয়া সে কেমন করিয়া পুরুষকে লাভ করিবে। পুরুষের ধ্যান-লোক নারীর অগম্য। তাই পুরুষের বক্ষ লগ্ন হইয়াও তাহার অশ্রুপাতের শেষ নাই।

পুরুষের ধ্যান-লোক নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও তাহা ঠিক বাস্তব বিগ্রহ নয়, তাহার রূপান্তরীকরণ ঘটে।

"এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী
এ তবু তোমার রাজধানী।" (দুর্ব্বোধ)

এই নিঃসীম ধ্যান-লোকে পুরুষের মন নিত্য কাল অভিসার করিয়া চলে। এইরূপে ধ্যানের ভিতর দিয়া অরূপ-লোকের কত যে কী আভাস আসিয়া পৌঁছায় তাহার স্বরূপ পুরুষ নিজে বুঝিতে পারে না, নারীকে বুঝাইবে কি! সে সঙ্গীতে সে কেবল আত্মহারা হইয়া পড়ে।

"গভীর হৃদয় মাঝে নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সঙ্গীতে।" (দুর্ব্বোধ)

পুরুষের প্রেমকে নারী যদি নিঃশেষে বুঝিয়া লইতে না পারে, তাহাতে ক্ষতি কি? পুরুষের এই অন্তহীন প্রেমকে নারী আপনার মত নিত্য নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। এই নিত্য নূতন উপলব্ধির ভিতর দিয়া নারীর প্রেম সদা জাগ্রত ও উন্মুখ হইয়া থাকে।

"চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।" (দুর্ব্বোধ)

পুরুষের ধ্যানের মধ্যে নারীর যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, তাহাকে বাস্তব নারীর মধ্যে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নারীও তাহা জানে। তাই সে আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া অগোচরতা ও দূরত্বের আভাস সৃষ্টি করে। এই ব্যবধানকে পুরুষ আপনার সৌন্দর্য্য-ধ্যান দ্বারা ক্রমাগত ভরাইয়া তুলে।

এক্ষেত্রে নারী আপনার এই সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্য সম্পর্কে কেবল সচেতন নয়, সে ওই প্রেমকেই জাগ্রত করিতে চায় নাই। তাই সে পুরুষের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

পুরুষ আপনার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে নারী তাই আত্মগোপন করে, কারণ সে জানে বাস্তব মিলনে তাহার সৌন্দর্য্য-ধ্যান ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অপূর্ণতাবোধের পীড়া তাহাকে একদিন নারীর নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইবে। সেদিন নারী আপনার জীবনের এতবড় বঞ্চনা ও শূণ্যতাকে আর কোন কিছু দিয়া তো পূর্ণ করিতে পারিবে না।

"মনের কথা রেখেছি মনে যতনে,
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই রতনে।"

পুরুষের প্রেম-পিপাসা বাস্তবে তাই চরিতার্থ হইতে পারে না। তাহার ধ্যান-লোকে নারীর যে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, বাস্তব নারীর মধ্যে তাহার ক্ষীণতম আভাসও বুঝি নাই। নারী তাই অমন পুরুষের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে।

প্রেমে বিশ্ব-প্রাণের সহিত প্রাণ যুক্ত হইয়া যায়। প্রেমে তাই প্রাণ বিসর্জ্জন সহজ হইয়া উঠে। প্রেমের ধ্যানে পুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। পুরুষের প্রেমকে নারী যদি অন্তরে বরণ করিয়া লয়, তবে তাহারও অন্তরে প্রাণের প্রকাশ ঘটে বলিয়া সেই সঙ্গে অপার দুঃখকেও বরণ করিয়া লইতে হয়। এখানে নারী সে দুঃখ ভার বহন করিতে চাহে নাই। প্রাণ দিয়া প্রাণের মূল্য পরিশোধ করিতে হয়।

"এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কী আছে হেন, কোথায় পাই,
জনম তবে বিকাতে হবে আপনা।"

পুরুষের প্রেম আদিতে নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া জাগ্রত হইলেও পরিণামে আনন্ত্যের পিপাসায় পর্য্যবসিত হয়—তাহারও পূর্ব্বে ধ্যানের ওই লীলা বিলাস তো আছেই। নারী সেই আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া পূর্ণ করিবে?

"যে সুর তুমি ভবেছ তব বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে।"

এই সমস্ত উক্তি এমন একজন নারীর যে আপনার অন্তরে প্রেম জাগ্রত করিতে চাহে নাই। তাহার "নিবায়ে দীপ জীবন-নিশি যাপনা"। এই দীপ নারীর অন্তরের প্রেম। উহা নিভাইয়া দেওয়ার অর্থ যে কী তাহা বোধ হয় আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

নারী পুরুষের এই স্বরূপ জানে, তাই আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া অমন অগোচরতার সৃষ্টি করে। এই অগোচরতাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া পুরুষের সৌন্দর্য্য-ধ্যান অটুট থাকে। এই যে আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আড়াল রচনার চেষ্টা, ইহা নারী প্রাণের গরজে শিক্ষা করিয়াছে। নহিলে পুরুষের সহিত যে তাহার মিলন হয় না। কত দীর্ঘকাল হইতে নারী এমন আচরণ করিয়া আসিতেছে উহা আজ তাই প্রাণের আবেগের মত অনিবার্য্য। প্রাণ থাকিতে নারী লজ্জা পরিহার করিতে পারে না।

নারীর সৌন্দর্য্য পুরুষের ধ্যান-লোকে। বাস্তবে তাহাকে তাই লাভ করিবার কোন উপায় নাই। যে পুরুষ নারীর আবরণ ও অগোচরতা লোপ করিয়া দিতে চায়, সে যেমন নিজের সর্ব্বনাশ করে তেমনি নারীরও। নারীর অন্তরাল ঘুচাইয়া দিলে পুরুষের সৌন্দর্য্য-ধ্যান বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া পুরুষ স্বধর্ম্মচ্যুত হয়। অন্যদিকে

নারী আপনার আবরণ লুপ্ত করিয়া দিলে পুরুষের পিপাসা চরিতার্থ হয় না বলিয়া লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়।

পুরুষের চিত্তে নারীর যে অপার সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয় তাহা ধ্যানের সৃষ্টি। তাহাকে তাই বাস্তবে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নারীকে পুরুষের একান্ত নিকটে থাকিতে হয় বলিয়া নারীকে বাধ্য হইয়া আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া অমন অগোচরতা সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা না হইলে পুরুষের সৌন্দর্য্য-ধ্যান, তাহার সৃজন প্রতিভা অধিক দিন জাগ্রত থাকে না। এই ভাবটিই 'নারীর উক্তি'র মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

"সে টুকুতে ভর করি
এমন মাধুরী ধরি
তোমা পানে আছি আমি ফুটিয়া।" (লজ্জা)

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে এই কালে দুটি বিরুদ্ধ চেতনার প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে দেশকালের ঊর্দ্ধতর অমর্ত্ত্য-চেতনা, অন্যদিকে দেশ-কালের অন্তর্গত মর্ত্ত্য-চেতনা। দেশ-কালের ঊর্দ্ধে মানুষ যখন দিব্য-চেতনা লাভ করে, তখন দেশ-কালের চেতনা লুপ্ত হয়। দেশ-কালের চেতনাকে তাই বলা হইয়াছে মায়া। রবীন্দ্রনাথের যে অধ্যাত্ম দ্বন্দ্ব, তাহা এই মুক্তির সহিত মায়ার, পূর্ণতার সহিত অপূর্ণতার।

মুক্তি বা দিব্য-চেতনা-লোক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা তাহারই প্রকাশ—

"সৃজনের পর প্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈব বশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে।" (প্রতীক্ষা)

উপনিষদে বলা হইয়াছে—

"এই স্বর্গের ঊর্দ্ধে, সকলের ঊর্দ্ধে, সমস্ত কিছুর ঊর্দ্ধে, যাহার ঊর্দ্ধে আর কিছু নাই, সেই ঊর্দ্ধতম লোকে যে আলোক জ্বলিতেছে, সেই এক আলোক এই পুরুষের অন্তরে।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ)

কিংবা

"আত্মা সেতু, এই লোক-সমূহকে বিচ্ছিন্ন করিবার (ব্যবধান-) সীমা। দিবারাত্রি, জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃতি-দুষ্কৃতি, এই সেতু পার হইতে পারে না। ব্রহ্ম-লোক পাপ মুক্ত বলিয়া সকল পাপ এখান হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ)

মৃত্যুর পর মানবাত্মা কি পৃথিবীর কোন স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া যায় না?—কোন স্নেহ, কোন প্রীতি, কোন শোভা? মর্ত্ত্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াই কি মানুষকে ওই মুক্তি-লোক লাভ করিতে হয়?

"ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড় খানি
তৃণ পত্রে গাঁথা,
এ আনন্দ সূর্য্যালোক, এই স্নেহ গেহ,
এই পুষ্প পাতা।" (প্রতীক্ষা)

মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যের মধ্যে যদি কোন যোগ না থাকে, মুক্তি ও বন্ধন যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তত্ত্ব হয়, তবে জগৎ ও জীবন আশ্রয় করিয়া এমন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লীলা শুধু মিথ্যা বা স্বপ্ন সঞ্চরণ মাত্র। যদি তাহাই হয় তবে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার পূর্ব্বে কবি এই জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে ভালবাসিয়া লইবেন। দুইয়ের মধ্যে কোন নিগূঢ় যোগ আছে কি-না সে সত্য সন্ধান রবীন্দ্রনাথ আপাতত করিতে চান নাই। মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া জীবনের অমন নিঃশেষ অবসানকে নিয়তি বা মানব-ভাগ্যের অনতিক্রমনীয় লীলা বলিয়া মানিয়া লইয়াই কবি উহাকে ভালোবাসিতে চাহিযাছেন।

এই জাতীয় অধ্যাত্ম দ্বন্দ্বে জীবনে দুটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া জাগিতে পারে। একটির বশে মানুষ জগৎ-জীবনকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়া বসে, অন্যদিকে মানুষ জীবনের অবসান স্বীকার করিয়া লইয়া জগৎ ও জীবনকে আকুল আগ্রহে নিকটে টানিয়া লয়। ওই নিঃশেষ অবসানের বোধ মানব প্রেমকে দুর্ব্বার করিয়া তুলে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে শেষোক্ত প্রেরণাটি জয়ী হইয়াছে। মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য চেতনার মধ্যে যোগ আছে নিশ্চয়ই। উভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই মিলন তত্ত্বটির সন্ধান লাভের মধ্যেই জ্ঞান যোগের সার্থকতা।

উভয়ের মধ্যে সংযোগ কোথায়, সংযোগের স্বরূপ কি, সেই রহস্য কোন ধর্ম্ম ও দর্শন আজ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। রাধাকৃষ্ণণের সেই স্পষ্টোক্তি স্মরণে পড়িতেছে, জগতের যে-কোন ধর্ম্ম ও দর্শন যদি সত্য ও সাহসী হয় তাহা হইলে একথা স্বীকার করিবে যে দিব্য-চেতনা কেমন করিয়া বিসৃষ্টি রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ অসীম কেমন করিয়া সীমা-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারা পারা যায় না। বস্তুতঃ জগতের সকল ধর্ম্ম ও দর্শন এই অসামর্থ্য, মানব জ্ঞানের এই সীমাকে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্র আমাদের এই পর্য্যন্ত বলে যে এক কোন-একটা-উপায়ে বহু রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই কোন-একটা-উপায়কে বলে মায়া।

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন ধরিয়া এই সংযোগ-সূত্রের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। সকল জীবন্ত ধর্ম্ম ও দর্শনের মত তিনিও এই ব্যর্থতা ও অসামর্থ্যকে পরিণামে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই আকাঙ্ক্ষার বশেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া মর্ত্ত্য-চেতনার স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। মর্ত্ত্য-চেতনাই কবির সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার ভিত্তি স্বরূপ। এই বোধটিকে কবি কখনও কোন কারণে বিচলিত হইতে দেন নাই।

মর্ত্ত্য-চেতনার এই চূড়ান্ত স্বীকৃতির ভিতর দিয়াই কবি একটি সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সংগ্রামের একটি রূপ নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"এ যদি সত্যই হয়   মৃত্তিকার পৃথ্বি পরে
মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখি   এই সব দেখা শোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালোবাসা   সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে   তারপর দণ্ড দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,
তুমি শুধু চিরস্থায়ী,   তুমি শুধু সীমা শূণ্য
মহা পরিণাম,
যত আশা যত প্রেম,   তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু, দূরে যাও,   এখনি দিয়ো না ভেঙ্গে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব করো,   .আমার দুদিন হতে
করিয়ো না চুরি।" (প্রতীক্ষা)

শূণ্যতার ভিতর হইতে তো কোন কিছু সৃষ্টি হইতে পারে না। এক সৎ স্বরূপ হইতে এই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ। তাই এই জগৎ ও জীবনও সত্য। একটিকে

স্বীকার করিলে তাই অন্যটি অস্বীকৃত হইয়া যায় না। এক্ষেত্রে দুটি চেতনা স্পষ্ট বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে। একটি যেন অপরটির কোন পরিণাম নয়, একটির সহিত অপরটির যেন কোন সংযোগ নাই।

সীমার বোধ লইয়া সমস্যাটি সমাধান করিতে চাহিলে একটিকে সত্য, আর একটিকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে। রূপ যখন সত্য, তখন অরূপ মিথ্যা, আবার অরূপ যখন সত্য তখন রূপ মিথ্যা হইয়া পড়ে। ইহা সীমা বোধের যুক্তি।

বস্তুতঃ এই সমস্ত তত্ত্ব আমরা আমাদের জাগতিক বোধ দ্বারা গড়িয়া তুলি। অরূপের বোধে রূপ মিথ্যা হইয়া যায় না, উহার অর্থের কেবল পরিবর্ত্তন ঘটে। মানবীয় চেতনাও লুপ্ত হয় না, উহা ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে, জগৎ ও জীবনের এক ভিন্ন স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

একের সহিত একের এই যে মিলন, এই যে 'প্রাণপণ ভালবাসা', 'যত আশা,' 'যত প্রেম'-কোন কিছুই মিথ্যা হইয়া যায় না, তবে উহার এই স্বরূপটি আর থাকে না।

জীবনের অলঙ্ঘ্য নিয়তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া জীবন ও জগৎকে পরিপূর্ণ রূপে ভালোবাসিবার এই আকাঙ্ক্ষা কেবল এই কবিতাটির মধ্যে নয় অন্যত্রও নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যুতে এই জগৎ ও জীবনের সকল বন্ধন কি ছিন্ন হইয়া যায়?

"ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগ যুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে?" (বসুন্ধরার প্রতি)

কিংবা

"ঘরে ঘরে
কত শত নর নারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসার খেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি?" (বসুন্ধরা)

ইহাই যদি নিয়তি হয় তবে তাহার পূর্ব্বে কবি এই জগৎ ও জীবনের প্রীতি-প্রেম-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া লইবেন। একদিন জগৎ হইতে নিঃশেষে বিদায়

লইতে হইবে, এই বোধটি অন্তরের অন্তরে আছে বলিয়াই কবির প্রেম অমন দুর্ব্বার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

"যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্য রস সুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।" (বসুন্ধরার প্রতি)

দেশ-কালের মধ্যে মর্ত্ত্য-প্রেমের এই স্বরূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

"ম্লান মুখ, অশ্রু আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'।" (যেতে নাহি দিব)

মুহূর্ত্তে কত প্রেম, কত প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, তবু অনন্ত প্রেমের অথবা অনন্ত প্রাণের ধারা বিনষ্ট হইতেছে না। মুহূর্ত্তে নূতন প্রেম, নূতন প্রাণ জাগিয়া সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে মানব-হৃদয় সান্ত্বনা পায় না। নূতন প্রেম, নূতন প্রাণ, নিত্যকাল ধরিয়া মনুষ্য-সমাজকে পরিপূর্ণ চির নবীন করিয়া রাখিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু মানুষের সান্ত্বনা তো এখানে নাই। যে প্রেম ঝরিয়া গেল, ব্যক্তি গত ভাবে মানুষ তাহাকেই যে লাভ করিতে চায়! এই বিশিষ্ট রূপ ছাড়া আর কোন রূপে তাহার প্রাণের ক্ষুধা মেটে না।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি-বিনষ্টির কোন তত্ত্বই পূর্ণ সাক্ষাৎকারের তত্ত্ব নয়। যে তত্ত্বে এই দুই বিধৃত, সৃষ্টি-বিনষ্টি যেখানে সমার্থক, সেইখানে চেতনার পূর্ণ প্রসারে মানুষের সত্য সাক্ষাৎকার। মর্ত্ত্য-চেতনায় কবি মানব-জীবনের এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সীমার বোধে একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে বিনষ্টির এই দ্বন্দ্বটাই একমাত্র সত্য হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ যে সাধনা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা পরিপূর্ণ জীবনের অথবা মনুষ্যত্বের সাধনা। যে সাধনা জীবনকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কোন কালেই সমর্থন করেন নাই। জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার না করিলে পূর্ণ

মনুষ্যত্ব লাভ ঘটে না। "হোক খেলা এ খেলায় যোগ দিতে হবে," কারণ, "কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা।" ইহাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনও তো মৃত্যুতে বিনষ্ট হইয়া যায়। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, যে জীবনের যদি এই পরিণাম হয়, তবে তাহাকে মানিয়া লইয়াও বলা যায় যে ক্ষণিকের মধ্যে জীবনের যে অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, জীবনে যে আনন্দের আস্বাদ ঘটে তাহার তুলনা নাই।

জীবন ও জগৎকে একান্ত রূপে পরিহার করিয়া যাহাকে লাভ করিতে হয়, তাহার মূল্য আর যাহাই হোক, তাহা জীবনের ফল লাভ নহে। লক্ষ্য করিতে পারা যায়, মন ও বুদ্ধির সহায়তায় জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে যত প্রকার তত্ত্ব আশ্রয় করা সম্ভব কবি তাহাই করিতেছেন।

জীবন-সাগর মথিত করিয়া কাহারও ভাগ্যে অমৃত উঠে, কাহারও ভাগ্যে বা বিষ। জীবনের স্বরূপ এই। অন্তহীন প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে অগণিত সৃষ্টি ভাসিয়া, আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, হাসি ও ক্রন্দনের অবিচ্ছিন্ন মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া। সৃষ্টির এই লীলা অস্বীকার করিয়া একক মুক্তি সন্ধানে লাভ কি? জীবনের নিয়তি-লীলাকে কবি মানিয়া লইয়াছেন।

"জানি আমি সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন।"

কবি মর্ত্ত্য-জীবনের সকল বন্ধন সকল অসম্পূর্ণতা মানিয়া লইয়াছেন।

"চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্ব ব্যাপী ডোর,
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।" (গতি)

কিংবা

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে।" (মুক্তি)

জীবনের এই নিয়তি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মায়াবাদীরা ইহার ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহিয়াছেন। এই সৃষ্টি ধারা চিরন্তন। মানুষ সাধনা করিয়া কেবল একক মুক্তি লাভ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একক মুক্তিকে তত্ত্বতঃ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার সে উক্তি আমি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য-লোকের মধ্যে যে যোগ রহিয়াছে, সেই মিলন রহস্যটি সকল অধ্যাত্মবাদীদের মত রবীন্দ্রনাথও উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। এক্ষেত্রে মায়াবাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা কবির জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মর্ত্ত্য-চেতনাকে কবি যে-কোন-পরিণামে বিচলিত হইতে দেন নাই। মর্ত্ত্য-চেতনাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিয়া তাহাকে ভিত্তি করিয়া কবির চেতনা উর্দ্ধগামী হইয়াছে। এই কালে কবির জীবন-জিজ্ঞাসা যে পরিণাম লাভ করে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

কবিও জানেন যে মর্ত্ত্যে জীবনের সব ক্ষুধা মেটে না। মানব অন্তরে অসীম বা পূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা তো এই অপূর্ণতা বোধ হইতেই জাগে। তবু কবি এই জগৎ ও জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ। যে-কোন ফল লাভের আশায় এই জগৎ ও জীবনকে তিনি পরিহার করিবেন না।

> "সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
> তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক।" (অক্ষমা)

কিংবা

> "মানব-আত্মার গর্ব্ব আর নাহি মোর,
> চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখ পানে,
> ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর।" (আত্ম-সমর্পণ)

মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য-চেতনাকে স্পষ্ট দ্বিধা করিয়া তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে পিপাসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, এবং এইরূপে যে বিশিষ্ট জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, আমি তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিযাছি।

জীবনে এই পৃথক বোধ সত্য নয়। এই জীবন সাক্ষাৎকার ও জীবন-রস পিপাসা একটি অপূর্ণ অনুভূতি আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই পিপাসাও সত্য অধ্যাত্ম-পিপাসা। ইহাও পূর্ণতা লাভের প্রেরণা জাত। এই প্রেরণার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনের, এই নিখিল বিসৃষ্টির ক্রমিক বিরাটতর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়াছেন। এই পিপাসাই পরিণামে রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের সকল পার্থক্য লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

প্রারম্ভের 'সোনারতরী' কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির অন্তরে অফুরন্ত সৃষ্টি-প্রেরণা অনুভূত হয়। প্রাণের বক্ষে মুহূর্ত্তে কত সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া আবার প্রাণেই বিলীন হইতেছে। এই সৃষ্টি ও বিনষ্টির মধ্যে তো আসক্তির কোন চিহ্ন নাই। অন্তহীন প্রাণ-লীলায় কী নির্ম্মম নিরাসক্তি!

আসক্তি কেবল মানুষের মধ্যে। তাহার সৃষ্টির মধ্যে তাই আসক্তি বিজড়িত থাকে। সেই আসক্তি কি, না আমার সৃষ্টির মধ্য দিয়া আমিও (এই দেহ-প্রাণ-মন লইয়া, এই নাম-রূপে!) বাঁচিয়া থাকিব।

বিশ্ব-প্রাণের প্রেরণাই আমি বা ব্যক্তি-চেতনা আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি-রূপে অভিব্যক্ত হয়। বাঁশির সীমার পীড়নে বাতাস সুরে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু সুরের মধ্যে বাঁশির সীমার কোন পরিচয় নাই। বাঁশি যদি বাতাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দিত তবে সুর জাগিত না।

ব্যক্তি বা আমি চেতনা হইতেছে এই সীমা, উহাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ অমন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই সৃষ্টির মধ্যে আমির কোন পরিচয় বিজড়িত করিয়া দিতে পারা যায় না। সৃষ্টির কোন্ প্রভাতে কাল হইতে অনন্ত কোটি 'আমি'র চেতনা আশ্রয় করিয়া কত সৃষ্টি হইয়াছে, আজও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; এবং সমস্ত সৃষ্টি-ধারাকে ক্রমাগত পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবে, কিন্তু ওই ধারায় 'আমি'র কোন চিহ্ন নাই। একথা সত্য, তাই জীবের মর্ম্মভেদী হাহাকারও চিরন্তন; কারণ তাহার আসক্তির তো কোন সান্ত্বনা নাই।

চিত্রা

আমি কাব্য আলোচনার প্রারম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তার ধীর জাগরণের পরিচয় দানের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। চিত্রার মধ্যে এবং ইতিপূর্ব্বেও কবির জীবনে জাগতিক বোধের সীমা অতিক্রম করিয়া অমর্ত্ত্য-চেতনায় সীমাহীন প্রসার

লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইযাছে। রূপাভিসারের অনিবার্য্য যে পরিণাম অর্থাৎ অতৃপ্তি, তাহার ভিতর দিযা কবি-চিত্তে অমর্ত্ত্য-চেতনা লোভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইযাছে। পরবর্ত্তীকালে কবি সচেতন ভাবে এই চেষ্টা করিযাছেন। 'খেয়া' হইতে 'গীতিমাল্য' পর্য্যন্ত কবি-জীবনের যে পর্য্যায তাহাতে এই চেষ্টাটিই মুখ্য হইয়া উঠিযাছে।

এক চেতনা পরিণাম-ছন্দে পর্ব্বে পর্ব্বে মন প্রাণ ও জড়রূপে প্রকাশ লাভ করিযাছে। বস্তুতঃ জড়ের মধ্যে সুপ্ত পূর্ণ চেতনা আপনার মুক্ত স্বরূপ ফিরিযা লাভ করিতে চায, এই আকাঙ্ক্ষা-প্রেরণায জড়ের মধ্যে ক্রমিক উন্নততর পরিণামে প্রাণ ও মনের প্রকাশ। এই প্রেরণার ভিতর দিযা চেতনা একদিন মানস-লোকের সীমাকেও অতিক্রম করিয়া আপনার পূর্ণ স্বরূপ ফিরিযা লাভ করিবে।

চিত্রা কাব্যের ভূমিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটির এক প্রকার আভাস দানের চেষ্টা করিযাছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায যে ইতিমধ্যে তিনি সৃষ্টির স্বরূপ এবং জীবের নিযতি সম্পর্কে একপ্রকার নিঃসংশয হইয়াছেন। সেই অংশটি এইরূপ :

"মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাজ্যাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওযা গেছে। আঙ্গারিক যুগের শ্রীহীন গাছগুলো কেন টিকিতে পারল না। আজ পরবর্ত্তী গাছ গুলিতে সমস্ত পৃথিবীকে দিযেছে শোভা। কোন শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হযেছিল, মাথা নেড়েছিল, হাতের কাজ নিষ্ঠুর ভাবে মুছতে মুছতে সংস্কার সাধন করেছে একথাই যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দুই সত্তার মিলন চেষ্টা স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই চেষ্টা কী নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে জয যুক্ত করিতে চায় মানুষের ইতিহাসে বারবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

আমাদের আদর্শ প্রেরণা যত উন্নত হয, আমাদের অন্তর্লোক তত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। বিপরীত দিক হইতে বলা যায, আমাদের অন্তর্লোক যতই সমৃদ্ধ হইযা উঠিতে থাকে, আমাদের আদর্শ প্রেরণা তত উন্নত হয়। আবার অন্তর্লোক এবং আদর্শ প্রেরণা দুইই সমৃদ্ধি লাভ করে উন্নততর চেতনার প্রেরণায় দিব্য-চেতনা, ভাব-লোক বা অন্তর্জ্জগৎ এবং আদর্শ-প্রেরণাকে ক্রমিক পরিণাম বা বিপরিণাম রূপে দেখা সম্ভব। দিব্য-চেতনার যোগে ভাব-লোক বা অন্তর্জ্জগৎ এবং

এই রূপে আদর্শ প্রেরণা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে সেই সঙ্গে বাস্তব জগৎ ও জীবন অর্থাৎ বহির্লোক তত সুন্দর হইয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভাব-লোক বা অন্তর্জগৎকে একটি সত্তা এবং বহির্জগৎকে অপর একটি সত্তারূপে এবং এইরূপে জীবনের বিকাশকে যুগ্ম সত্তার লীলা রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই বিকাশ ধারার পূর্ণ পরিণামে দিব্য-চেতনা, ভাব বা অন্তর্জগৎ এবং বহিঃসত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। তখন এই সকল সত্তার মধ্যে একটি অনায়াস এবং সচেতন যোগ স্থাপিত হইবে। বর্ত্তমানে এমনি একপ্রকার যোগ যে আছে তাহা অনুভব করা যায়, কিন্তু ওই দিব্য-চেতনাকে আমরা স্থায়ীভাবে সচেতন হইয়া লাভ করিতে পারি না। তাই কোন চেতনার উপর আমাদের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নাই।

ব্যাখ্যা স্বরূপে উপরে যে মন্তব্য করিয়াছি উহাকেই একটি নির্দ্দিষ্ট দার্শনিক পদ্ধতি-বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের এই যুগ্ম-তত্ত্বটির স্বরূপ উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

পূর্ণ চেতনায় কোন দ্বৈত বোধ নাই, দ্বৈতবোধ দেশ-কালের সীমার মধ্যে। দ্বৈতবোধের মধ্যে একটি ধ্রুব-তত্ত্ব আর একটি গতিতত্ত্ব। (ইহাকে কেহ বলিয়াছেন 'শক্তি', কেহ বলিয়াছেন 'মায়া', কেহ বা অন্য কিছু। কেহ এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে এক পূর্ণ সত্তার দুটি রূপ প্রত্যক্ষ করেন, কেহ ইহাদের পৃথক স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন।)

দেশ-কালের সীমার মধ্যে চেতনার নানা ক্রম পরিণাম আছে, মন হইতে জড়-লোকপর্য্যন্ত। প্রত্যেক চেতনা পর্য্যায়ে আবার দুটি তত্ত্বের যুগল প্রকাশ। একটি ধ্রুব, আর একটি পরিবর্ত্তনশীল। ধ্রুব তত্ত্বটি চেতনার সকল উর্দ্ধ বা নিম্ন পর্য্যায়ে বিদ্যমান, এমন কি দেশ-কালের উর্দ্ধে দিব্য-চেতনালোকেও। চেতনার যে ক্রম উর্দ্ধ বা নিম্ন পরিণাম আমরা বোধ করি তাহা কেবল গতি তত্ত্বের দিক হইতে। ধ্রুব তত্ত্বের সহিত এই তত্ত্বটি জড়িত বলিয়া একই চেতনা ভিন্ন চেতনারূপে অনুভূত হয়। এই গতি তত্ত্বটি স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া ধ্রুব বা পূর্ণ তত্ত্বকে যতই আচ্ছন্ন করে ততই উহা চেতনার ক্রম নিম্ন পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। বিপরীত দিক হইতে বলা যায়, এই গতি তত্ত্বটি যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে ততই চেতনার

উর্দ্ধতর পরিণাম বোধ জাগে। দেশ-কালের সীমার উর্দ্ধে এই গতি তত্ত্বটি আর থাকে না, কিংবা কেবল বীজাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চেতনার সকল পর্ব্বে এই যে যুগ্ম তত্ত্বের উল্লেখ করিলাম, প্রত্যেক পর্য্যায়ের গতির দিক হইতে এই ধ্রুব তত্ত্ব সেই অনুপাতে অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে।

এমনি করিয়া ধীরে মায়া-(অদ্বৈতবাদীদের শব্দটি ব্যবহার করিলে) মুক্তির ভিতর দিয়া চেতনা ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করে। এই উন্নততর চেতনা লাভে চেতনা আর এক অসম্পূর্ণতা ও পূর্ণতার আর এক আভাস লাভ করে। এমনি করিয়া সৃষ্টির ক্রম বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে।

পূর্ণতা লাভের জন্য বিশ্ব-প্রকৃতির এই যে ধীর বিবর্ত্তন, 'সন্ধ্যা' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি সুন্দর পরিচয় দান করিয়াছেন। কবিতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন নিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তারপরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তারপরে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণা লয়ে
জীব ধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব, কত দুঃখ কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।" (সন্ধ্যা)

মানস-লোকে পৌঁছাইয়া এবং ওই চেতনাশ্রয়ী সৃষ্টি-প্রেরণায় বিশ্বের বিবর্ত্তন আজও শেষ হইয়া যায় নাই। এই বিবর্ত্তনের শেষ কোথায়, কোথায় তাহার পথ চলার অবসান মানুষ তাহা জানে না।

উন্নতর চেতনা লাভের এক একটি পর্য্যায়ে সৃষ্টির এক একটি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেছে। মানস-চেতনায় সৃষ্টির আজ যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার উর্দ্ধতর পরিণাম লাভে সৃষ্টির আর এক স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে। সেই পূর্ণ চেতনাধিষ্ঠিত

হইয়া মানুষ এই জগৎ ও জীবনকে দিব্য-জগৎ ও জীবনে রূপান্তরিত করিবে। বর্ত্তমানে মনুষ্য-সমাজে তাহার বুঝি ক্ষীণতম প্রকাশও নাই। একদিকে বাস্তব জীবনে এমনি অপূর্ণতা ও অসামর্থ্য, মনুষ্যত্বের এমনি লাঞ্ছনা ;—

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূণ্য বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।" (এবার ফিরাও মোরে)

এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-ক্ষুধা-হতাশা পরিপূর্ণ জীবনে দিব্য-জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা তখনই সার্থক হইবে, যখন মানুষ আপনার সীমাবোধ অতিক্রম করিয়া দিব্য-চেতনার উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিবে।

একদিকে শোক-ব্যাধি-জরা-মরণ-হতাশা, জীবনের সংখ্যাতীত দীনতা ও হীনতা, অন্যদিকে অনন্ত আনন্দ ও অমৃত, অভ্রান্তি ও অসংশয়। অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে তাই কোন-না-কোন-রূপে এক প্রকার জীবন বিমুখতা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস মর্ত্ত্য-লোকে অমর-লোকের আভাস লাভের চেষ্টা দুশ্চেষ্টা মাত্র, দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত করা তো দূরের কথা।

রবীন্দ্রনাথ এই উভয় লোকের সংযোগ স্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন মুক্ত দৃষ্টির সহায়তায় এই জগৎ ও জীবনকে এমনকি উহার স্থূল আধার পর্য্যন্তকে দিব্য-আধারে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

সৃষ্টির মধ্যে এই ধীর পরিণাম ঘটিয়া চলিয়াছে। মানুষ সাধনা এবং সচেতন চেষ্টার ভিতর দিয়া এই অনিবার্য্য পরিণামকে দ্রুততর করিয়া তুলিতেছে।

সীমাবদ্ধ চেতনায় মানুষের সংস্কার সাধনের যে-কোন-চেষ্টা ত্রুটি শূন্য হইতে পারে না। মানবীয় চেতনায় জীব-সমস্যার পূর্ণ সমাধান তাই একপ্রকার অসম্ভব।

রবীন্দ্র-কাব্য সমালোচকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন, যে কবি বাস্তব দীনতা লক্ষ্য করিয়া আবার অত্যুচ্চ ভাব-কল্পনায় ডুবিয়া গিয়াছেন। বাস্তব জীবনকে তিনি কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মূল ভাব প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে তাঁহারা কখনই এইরূপ মন্তব্য করিতেন না।

অবশ্য এক্ষেত্রেও মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য-চেতনা স্পষ্ট দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে অনিবার্য্য যোগ আছে এবং উন্নততর চেতনালোকে জীবনের পূর্ণ

ছন্দ ও সুষমা যে ফুটিয়া উঠিবে, এই সম্পর্কে কবির নিঃসংশয় অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। কবি তাই সমগ্র জীবন ধরিয়া এই উভয় চেতনার যোগের রহস্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যাঁহারা কোন-না-কোন প্রকার সংস্কার সাধন করিযাছেন এবং এইরূপে বিকাশের ধারাটিকে ক্রমাগত পরিপুষ্ট করিয়া চলিযাছেন, এই প্রেরণাকে সকলের উপর জয়ী করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে এই এক পূর্ণতার অনুপ্রেরণা।

"যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি।" (এবার ফিরাও মোরে)

এই মরণ ভয় জর্জ্জরিত জীবনকে দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত করিবার জন্য কবি তাই মুক্ত-চেতনার অনন্ত প্রেরণা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বোক্ত সমালোচক বর্গের অভিমত অনুসারে জীবনের অস্বীকৃতি নয়।

"মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুব তারা।" (এবার ফিরাও মোরে)

ব্যক্তি ও বিশ্বের অন্তরালে একটি পূর্ণতার আদর্শ আছে। মানুষ এই পূর্ণতা-ভিখীন হইযা উহাকে ক্রমাগত লাভ করিতে করিতে চলিয়াছে। সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে তাহারই আভাস দানের চেষ্টা। এই চেষ্টার ভিতর দিয়া মানুষ ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে।

যাহাকে সে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা ওই আদর্শের অনুপ্রেরণায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকাশের মধ্যে মানুষ অপূর্ণতা বোধ করে। মানুষের সৃষ্টির মধ্যে তাই একদিকে পূর্ণতার আভাস লাভের আনন্দ-প্রেরণা, অন্যদিকে অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতা-বোধের পীড়া।

চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শও ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ণতার আদর্শ ধ্রুব, শাশ্বত, উন্নততর চেতনা লাভের ভিতর দিয়া মানুষ উহার অধিকতর আভাস লাভ করিয়া চলে।

কোন একটা বিশেষ পর্য্যায়ে বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে ধ্যানের রূপের সহিত বাস্তব রূপের হয়ত মিলন ঘটে,—সার্থক রূপায়ণে এই মিলন ঘটেও। সৃষ্টির আনন্দ তো এই মিলন সাক্ষাৎকারে। তাহারপর মানুষ ওই পর্য্যায় ছাড়াইয়া উঠে, তাহার আদর্শ আরও উন্নত আরও উদার ও বিস্তৃত হয়। মানুষকে তাই বর্ত্তমান সৃষ্টিকে নির্ম্মম ভাবে দলিত করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার ইতিহাস ইহারই পরিচয় দান করে।

যেখানে মানুষ অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে রূপায়িত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রকাশ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনার সৃষ্টিকেও ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য, যে আদর্শকে সে বাহিরে রূপায়িত করিতে পারিল না তাহাকেই বারংবার লাভ করিবার জন্য সাধনায় রত সেখানে মানুষের প্রকাশ যে আরও বড় ইহাও সত্য।

"যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন
দিতেছি চরণে আনি
অকৃতকার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।"

কবি তাই আপনার শ্রেষ্ঠ ধন বলিতে 'অকৃত কার্য্য', 'অকথিত বাণী' 'অগীত গান', 'বিফল বাসনা রাশি'কে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ কবি আপনার সেই উন্নততর সত্তার কথাই বলিতে চাহিয়াছেন, যাহাকে তিনি ভাষায় রূপায়িত করিতে পারেন নাই। কবি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যে কাজ করিয়াছেন, যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার যে সকল আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে চরিতার্থ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা তাঁহার জীবনে যে কাজ সফল হয় নাই, যে বাণী অনুচ্চারিত, যে সঙ্গীত অগীত, যে বাসনা অচরিতার্থ তাহা অনেক বড়।—কারণ অলব্ধ ও অপ্রকাশের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা। মানুষের উহা অসীমের দিক।

পূর্ণতার এই প্রেরণা অমোঘ বলিয়া মানবীয় চেতনাকে উহা ক্রমাগত ঊর্দ্ধতর লোকে আকর্ষণ করে। এই প্রেরণায় যদি মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট আধারটি ভাঙ্গিয়াও যায়, তবুও উহা ক্ষণকালের জন্য আপনাকে নিরুদ্ধ করে না। সাধক বর্গের জীবনেই শুধু নয়, সকল শ্রেণীর স্রষ্টার জীবনে ইহার কত-না পরিচয় লাভ করা যায়। এই

প্রয়াসে তাঁহাদের দেহাধার জীর্ণ, শতধা হইয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা বিশ্রাম মানেন নাই।

"মনে যে গানের আছিল আভাস
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস
ছিঁড়িল তার।"

এমনি করিয়া সৃষ্টির ভিতর দিয়া কবি ক্রমাগত সৃষ্টিকে ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া উঠিতেছেন, ক্রমাগত ওই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

বিশ্ব ব্যক্তি-চেতনা আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভের সাধনা করিতেছে। সংখ্যাতীত মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া বিশ্ব-প্রাণের যোগে অবিরাম সৃষ্টি করিতেছে, আবার হারাইয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া কোন সুদূর অতীত কাল হইতে সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল ধরিয়া এই সৃষ্টি-ক্রিয়ার ভিতর দিয়া জীব ও জগৎ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতেছে। এই সাধনায় তাই বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির উহার আসক্তি ও নাম-রূপের কোন মূল্য নাই।

কবির জীবন আশ্রয় করিয়া তাঁহার সৃষ্টির ভিতর দিয়া সেই বিশ্ব-চেতনা কোন এক নিগূঢ় অভিপ্রায় সার্থক করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সৃষ্টি-কার্য্যের চতুর্দ্দিকে নাম-রূপ খোদাই করিয়া আমার বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রয়াস যেমন করুণ, তেমনি নিস্ফল। বিশ্ব-প্রাণের যোগে যাহা সৃষ্ট তাহা বিশ্ব-প্রাণকে অনাসক্ত ভাবে ফিরাইয়া দিয়া মুক্তি লাভ করিতে হয়।

"বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে।"

চিত্রার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে জীবন দেবতা, অন্তর্য্যামী, চিত্রা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন, এখন তাহার স্বরূপ কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। কবির এই জীবন দেবতার স্বরূপ কি? জীবন দেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা ভূমিকায়ও করিয়াছি। এক্ষেত্রেও সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

নির্ব্বিশেষ রস স্বরূপ যিনি, তিনি যে পর্য্যায়ে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, সেই পর্য্যায়ের কোন একটি চেতনা-লোককে কবি অমন নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেশ-কালের সীমার মধ্যে নির্ব্বিশেষ চেতনা যেখানে আমির বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ইহা সেই বিশেষের একটি বিশিষ্ট পর্য্যায়। ইহার স্বরূপ উপলব্ধির পর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতার স্বরূপ যে ভাবে বুঝাইযাছেন, তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

"আমার একটি যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলাম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল।

পরম দেবতার পূজা (ইহাই দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর নির্ব্বিশেষ দিব্য-চেতনা) যুগ্ম সত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায বাহিরে কর্ম্মযোগে তার প্রকাশ।"

অন্যত্র—

"চিত্রায় জীবন রঙ্গ ভুমিতে যে মিলন নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোন নায়ক নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।"

রবীন্দ্রনাথের আরও দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"মানুষ যে দ্বিজ ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ, আর এক জাযগায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্য তাকে চতুর্দ্দিকে কত সংগ্রহ, কত সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই করে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জ্জন করছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সর্ব্বদিক থেকেই তার সুর নেমে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে গোপনের দিকে গভীরতার দিকে মানুষ চেষ্টাকে যখন টানে তখনি মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে, ভুমার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি মানুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে।"

"সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তার সঙ্গেই কারবার করে

সেই তার, আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক ; সেই খানেই তার স্থিতি, তার গতি।

এই গভীর সত্তাটিই কবির জীবন দেবতা। নির্ব্বিশেষ দিব্য-চেতনা ('বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত') দেশ-কালের সীমার মধ্যে যেখানে আপনাকে নিগূঢ় করিয়া 'আমি'-রূপে প্রকাশিত কবির 'জীবন-দেবতা' সেই চেতনা-পর্য্যায় ছাড়া আর কিছু নহে।

জীবন দেবতার স্বরূপ বিভিন্ন দিক হইতে কবি যে ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিলাম। কবির ধারণা উহার মধ্যেই এক প্রকার পরিস্ফুট হইয়াছে। কবির এই উপলব্ধিকে সামগ্রিক ভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান বলে আমাদের সচেতন মন এক বিরাট অন্তর্জগতের অতি ক্ষীণ প্রকাশ মাত্র। এই অন্তর্জগৎকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন নির্জ্ঞান মন বা অধিমানস বা অব-মানস-লোক।

আমাদের সচেতন মনের সকল প্রেরণা এই অধিমানস চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অধিমানস-লোকের উপর সচেতন মনের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। কবি মানস-লোকে অধিমানসের প্রবল প্রেরণা বোধ করিতেন। কবির জীবন-দেবতা এই অধি-মানস-লোক।

বিশ্ব-প্রকৃতি সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধ আশ্রয় করিয়া মানব অন্তরে আপনার প্রাণ-স্পন্দ প্রতিনিয়ত সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। এই প্রাণ সঞ্চারের ভিতর দিয়া অন্তরে ধীরে ধীরে একটি ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। সকল বহিরিন্দ্রিয় যখন অন্তরাবৃত্ত বা অন্তর্মুখীন হইয়া ধ্যান-লোক আশ্রয় করে, তখন উহারই চূড়ান্ত ধ্যান তন্ময় অবস্থায় মানবীয় চেতনা মানবিক উপলব্ধির সীমা ছাড়াইয়া যায়।

কবির জীবন-দেবতা এই ধ্যান-লোক। ধ্যান-লোকে ঊর্দ্ধতর প্রেরণা সর্ব্বাধিক অনুভূত হয়। ঊর্দ্ধতর চেতনাও মানবীয় চেতনাকে ঊর্দ্ধ পরিণামের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। মানুষের ধ্যান-লোকে অমর্ত্ত্য-চেতনা আপনার অফুরন্ত প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

মানবাত্মার সহিত ব্যক্তির যে যোগ তাহা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ,—পর্ব্বে

পর্ব্বে পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপতা ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া।

ইন্দ্রিয় হইতে মানস-লোক (ধ্যান-লোক) পর্য্যন্ত চেতনার যে আবৃত্ত, আমিত্ব বলিতে মোটামুটি এই চেতনাবৃত্তটিকে বুঝায়।

মৃত্যুতে সূক্ষ্ম একটি ভাব-দেহে জীবের সমস্ত সংস্কার বীজ রূপে অবস্থান করে। ভিন্নদেহ আশ্রয় করিয়া উহার পুনঃ প্রকাশ ঘটে। এই বীজ হইল বাসনা-লোক ইহা আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মের ফল স্বরূপ। জীব দেহ হইতে দেহান্তরে এই সুপ্ত বাসনা-লোক, এই কর্ম্মফল বহন করিয়া লইয়া যায়।

এই সূক্ষ্ম বাসনা-লোকটি নিশ্চয়ই এই জীবনেই আমাদের অন্তরে কোন একটি স্বরূপে অবস্থান করে, অথচ তাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। আমাদের চেতন-জগৎ তাহার ক্ষুদ্রতম একটি অংশমাত্র।

এই লোক নিশ্চয়ই উর্দ্ধতর কোন চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাসনারও কোন স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম প্রেরণা নাই। কে এই বাসনা-লোকটিকে রূপ হইতে রূপান্তরে লইযা যায়। শাস্ত্রে ইহাকে বলে জীবাত্মা। বিশেষের সীমা এই জীবাত্মা পর্য্যন্ত। এই জীবাত্মা আবার পরমাত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

জীবাত্মা এবং মানস-লোকের মধ্যে এই রূপে সূক্ষ্ম বাসনা-লোক তাহারও নিম্নে ধ্যান-লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সূক্ষ্ম বাসনা-লোকটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এই বাসনা-লোকের উর্দ্ধতর পর্য্যায় কবির জীবন-দেবতা।

দিব্য চেতনা বা পরমাত্মার প্রেরণা আসে জীবাত্মায়। জীবাত্মার এই প্রেরণা জীবন দেবতাকে অনুপ্রাণিত করে। এই প্রেরণা আরও নিম্নে বাসনালোকে, আরও নিম্নে ধ্যান-লোকে আসিয়া পৌঁছায়। মানুষ এই ধ্যানের প্রকাশটিকে বাহিরে রূপায়িত করে। সাধনার ভিতর দিয়া মানুষ একের পর এক উন্নততর পরিণাম লাভ করে। আমি যখন ধ্যান স্বরূপ তখন 'তুমি' জীবন দেবতা বা বাসনা-লোক, আমি যখন জীবন দেবতা তখন 'তুমি' জীবাত্মা। আমি যখন জীবন দেবতা তখন 'তুমি' দিব্য-চেতনা। ইহাই রবীন্দ্রনাথের লীলা তত্ত্ব।

এখন কবির জীবন-দেবতা পর্য্যায়ের কয়েকটি কবিতা আলোচনা করা যাইতে পারে। এক দিব্য-চেতনাই দেশ-কালের সীমার মধ্যে অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।" (চিত্রা)

দেশ-কালের মধ্যে যিনি রূপে রূপে বহু রূপে বিরাজমান, দেশ-কালের উর্দ্ধে তিনিই আবার নির্ব্বিশেষ এক।

"নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি
তুমি অচপল দামিনী।" (চিত্রা)

অন্তরে ধ্যান-লোকেই নির্ব্বিশেষ দিব্য-চেতনার সহিত মিলন ঘটে। এখানে 'ভক্ত' কবির ধ্যান-লোক। ধ্যান-লোকে দিব্য-চেতনার প্রেরণা সর্ব্বাধিক অনুভূত হয় বলিয়া সৃষ্টি-প্রেরণা আর বিরাম মানে না, একেবারে সহস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া পড়িতে চায়।

সৃষ্টি-প্রেরণার পশ্চাতে উর্দ্ধতর চেতনার লীলা থাকে বলিয়া নিম্নতর চেতনায় তাহার কোন অর্থই প্রতীত হয় না।

মানুষের সচেতন মন উর্দ্ধতর অনন্ত জ্যোতি প্রবাহের একটি বিন্দুমাত্র। আমাদের বুদ্ধি অনন্ত চেতনা-সমুদ্রের একটি চঞ্চল বীচিবিক্ষেপ। কবির ধ্যান-লোক অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া উর্দ্ধতর চেতনা-লোক হইতে অফুরন্ত সৃষ্টি-ধারার বন্যা নিম্নে নামিয়া আসিতেছে।

সীমাবদ্ধ, একান্ত খণ্ডিত বোধ দিয়া মানুষ উহার কোন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। স্থায়ী ভাবে উর্দ্ধতর চেতনা-লোক লাভ করিলে এই সৃষ্টি-প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মানুষ তখন এই সৃষ্টি-প্রেরণার উপর পূর্ণ নিযন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে বলিয়া উহা আর অবশ প্রেরণা মাত্র থাকে না। তখন মানুষ জীবন আশ্রয় করিয়াও সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া চলে।

"এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ।"

কবি যে ক্ষেত্রে বলিতেছেন—

"আমার অর্থ তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি।"

সে ক্ষেত্রে 'তুমি, হইতেছে সেই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক, যে-লোকে নির্ব্বিশেষ দিব্য-চেতনা বিশেষ পরিণাম লাভ করিয়াছে। আর 'আমি', দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট মানবিক চেতনা।

দিব্য-চেতনা অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক আশ্রয় করিযা, ধ্যান-লোক আবার মন ও বুদ্ধি (দেহ-প্রাণ-মন) আশ্রয় করিয়া এই যে লীলা করিতেছে, মৃত্যুতে তো এই লীলার অবসান ঘটে। জাগতিক চেতনা মুক্ত উর্দ্ধতর সত্তা বা বাসনা-লোকের সেই পরিচয়ই বা কিরূপ? দেহান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে উহা কোন্ স্বরূপে অবস্থান করে? কেমন করিয়া উহা আবার নূতন দেহ পরিগ্রহ করে? এই 'আমি'র (দেহ-প্রাণ-মন) সহিত সেই 'আমি'র যোগ কোথায়?

"হবে যবে তব লীলা অবসান
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রযাণ
তব রহস্য পুর?" (অন্তর্য্যামী)

অনন্তের কোন্ উদ্দেশ্য সার্থক হইযা উঠিতেছে, তাহা জাগতিক চেতনায় বুঝিবার কোন উপায় নাই। তাই কবির অন্তরে এমন জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে।

"জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার" (অন্তর্য্যামী)

অন্তর্য্যামী কবির বাসনা-লোক। অন্তর্য্যামী বা বাসনা-লোক আবার দিব্য-চেতনার উপর আশ্রিত। উহাই সেই পরম দেবতা। দেহ-প্রাণ-মন ও বাসনা-লোক অর্থাৎ আমি, এবং 'তুমি' এই উভযের যোগে মানুষ জীবন ও জগতের অনন্ত রহস্যের ক্ষীণতম আভাস লাভ করে।

প্রত্যেকটি চেতনা-লোক এক দিব্য-চেতনার পরিণাম বা পর্য্যায় মাত্র, এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বোধ কবির মধ্যে আজও গড়িয়া উঠে নাই। এই কারণেও যেমন, তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টির উর্দ্ধ পরিণাম লাভের তত্ত্বটিও একটি পরিপূর্ণ দার্শনিক বোধরূপে কবির জীবনে তখনও উপলব্ধ হয় নাই বলিয়াও জীবনে এই গূঢ় প্রেরণার স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে এমন জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে।

কিন্তু এই জাতীয় উপলব্ধি এবং জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া কবির দার্শনিক বোধটি যে পরিপূর্ণ রূপ লইয়া প্রায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

"আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে
ফিরিতে হবে না খুঁজি।" (অন্তর্যামী)

যে অধ্যাত্ম-সত্তা দেহ-প্রাণ-মন আশ্রয় করিয়া আপনাকে সক্রিয় করে, তাহা বিশিষ্ট বলিয়া যত সূক্ষ্ম হোক-না-কেন, রূপ শূণ্য নহে। সেই অধ্যাত্ম-সত্তা জন্ম হইতে জন্মান্তরে বিচিত্র বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে। সেই অধ্যাত্ম-সত্তারও স্বরূপ আমরা জানি না, অথচ উহারই যোগে আমাদের সকল অস্তিত্ব সর্ব্ববিধ প্রকাশ। তাহার সহিত মানুষ নিত্য যুক্ত, তাহা মানুষের পরম প্রকাশ। নিবিড় অনুভূতির ভিতর দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষ তাহার আভাস লাভ করে, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারিতেছে না।

"জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।" (অন্তর্যামী)

জীবের উর্দ্ধ পরিণাম তত্ত্ব বুঝিলে মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মনুষ্য চেতনা আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির যে উর্দ্ধ পরিণাম লাভের সাধনা, তাহা তো এক জীবনে একটি বিগ্রহে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া সে আবার নূতন বিগ্রহ গড়িয়া তুলে, অবশ্য পূর্ব্ব জীবনের সাধন-ফলটিকে সেই সঙ্গে লইয়া আসে। এই রূপে জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া সে তাহার সাধনাকে ধীরে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

অধ্যাত্ম-সত্তায় দিব্য-চেতনার যতটুকু আভাস আসিয়া পৌঁছায়, যতটুকু প্রেরণা লাভ করিতে পারা যায় কবি তাহাতেই পরিতৃপ্ত। ইহাকে কবি একটি বিশিষ্ট দর্শন-রূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'জীবন দেবতা' কবিতাটির মধ্যে এই যুগ্ম লীলার আরও কিছু পরিচয় লাভ করা যায়। এই জীবন দেবতা যে কবির অধ্যাত্ম-সত্তা, দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট 'আমি' যে এই অধ্যাত্ম সত্তার লীলাভূমি কবির সেই এক উপলব্ধির পরিচয় এক্ষেত্রেও লাভ করিতে পারা যায়।

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।"

এই জীবনে এই দেহরূপে লীলার যদি আজ অবসান ঘটে তবে এই অধ্যাত্ম-চেতনা আবার নবরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে। অধ্যাত্ম সত্তায় আত্মার সৃষ্টি-প্রেরণা অসীম। রূপের সীমা আছে, তাই বিনষ্টি আছে। তাই অসীমের সহিত লীলার জন্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে হয়। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই লীলা চলিতেছে এবং চলিতে থাকিবে।

"ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা" (জীবন দেবতা)

এই 'নব রূপ' 'নব শোভা' 'নূতন বিবাহ' 'নবীন জীবনে'র অর্থ কি তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোকে চেতনা যতই প্রসার লাভ করুক তাহা সীমার লোক বলিয়া মানুষ কিছুতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সকল জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটে, সংশয় লোপ পায়, সেই সঙ্গে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ ঘটে সীমার বোধ ছাড়াইয়া গেলে। লীলা-তত্ত্বটিকে স্বীকার করিয়াও কবি-চিত্তে তাই অমন উৎকণ্ঠা, অমন নিত্য অপরিতৃপ্তি।

"আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত।" (জোৎস্না রাত্রে)

কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মের পশ্চাতে এই উন্নততর চেতনা লাভের প্রয়াস, উহারই গূঢ় প্রেরণা। এই আকাঙ্ক্ষা, এই প্রাবেগকে রবীন্দ্রনাথ কত রূপে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অরূপতার এতটুকু আভাস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কী প্রাণপণ প্রয়াস।

অন্তহীন সে প্রেরণা, আর কবির অবিরাম প্রাণপণ প্রয়াস উহাকে রূপ-লোকে ধরিয়া রাখিবার। অসীমের প্রেরণা অন্তহীন হইলে কী হইবে, মানুষের শক্তি

সীমাবদ্ধ। মনে হয় হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন ছিন্ন হইয়া যাইবে, মনে হয় এই দেহাধার বুঝি শতধা হইয়া যাইবে।

আজ আর রূপের জগতে অরূপের আভাস ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা নয়, এই প্রেরণা সহস্র স্রোত-ধারায় কবির সকল রূপের ধ্যান ডুবাইয়া অরূপে একাকার হইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে।

অধ্যাত্ম প্রেরণা যখন চরমে গিয়া পৌঁছায়, তখন উহা সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া রূপের সকল তত্ত্বকে পুড়াইয়া দিয়া অরূপের জন্য লেলিহান হইয়া উঠে।

কবি তাই রূপের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া ওই দিব্য-চেতনা-লোক লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

"আজি ছিন্ন করে ফেলো ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।" (জ্যোৎস্না রাত্রে)

কিংবা

"ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূণ্যময়
গানের তানের মতো।" (জ্যোৎস্না রাত্রে)

ইহার আরও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়—

"কোন মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।" (জ্যোৎস্না রাত্রে)

বিশ্ব-চেতনা সম্পর্কে কবির যে বোধ—

"সেথায় বিরাজে
একটি কুসুম শয্যা, রত্ন দীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্ব সোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ম্ময়ী বালা।"

মানসীর 'মেঘদূত' এবং সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী' ইত্যাদি কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে কবির অখণ্ড সৌন্দর্য্য বোধ এবং তজ্জাত পিপাসার দার্শনিক স্বরূপ বিচার করিয়াছিলাম। সেই একই বোধের পরিচয় এক্ষেত্রেও লাভ করিতে পারা যায়।

সেই বিচারে আমরা এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, কবির অন্তরে খণ্ড সৌন্দর্য্যের জন্য যে পিপাসা অথচ খণ্ড সৌন্দর্য্য বলিয়া যে অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তির ভিতর দিয়া খণ্ড সৌন্দর্য্যের বিকল্প স্বরূপে কবি এমনি একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব গড়িয়া তুলেন।

অখণ্ড সৌন্দর্য্য বোধের পশ্চাৎ প্রেরণা যে বিশ্ব-চেতনায় পরম ব্যাপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রসূত তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে বিশ্ব-চেতনার স্বরূপ বুঝাইতে তিনি অখণ্ড সৌন্দর্য্যের যে তত্ত্ব গড়িয়া তুলেন, বস্তুতঃ তাহা খণ্ড সৌন্দর্য্য বোধের একটি রস পরিণাম ছাড়া আর কিছু নয়।

বিশ্ব-চেতনা জীবনে যতদিন না সত্য হইয়া উঠে, ততদিন উহার স্বরূপ সম্পর্কে এমনি একটি বোধ আমাদের থাকে। মন ও বুদ্ধির সহায়তায় গড়িয়া তোলা বোধ বলিয়া রূপের ধর্ম্মই কোন-না-কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। চিত্রায় এই জাতীয় অখণ্ড সৌন্দর্য্য বোধের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে।

বিশ্ব-চেতনা সম্পর্কে কবির যে ধারণা, কবির অন্তরে তাহার যে ধ্যান, তাহা বিচার্য্য হইলেও আমাদের এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কবির রূপের বোধটিকে ছাড়াইয়া উঠিবার বিচিত্র চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ মানবীয় চেতনাকে মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটি তাহার জীব-সত্তা, অপরটি তাহার অধ্যাত্ম-সত্তা। অধ্যাত্ম-সত্তার ভিতর দিয়াই মানুষ উর্দ্ধতর চেতনার আভাস, তাহার চকিত স্পর্শ লাভ করে। অন্তরের পথ তাহার অসীমের পথ। বাহিরের সকল দীপ নিভাইয়া দিয়া অন্তরের অন্ধকার লোকে তাহাকে অভিসার করিতে হয়, বিশ্বাসের দীপ হস্তে লইয়া। এই পথেই তাহার মুক্তি, তাহার আনন্দ, তাহার সৃষ্টি।

একদিকে মানুষের জীব-সত্তার প্রকাশ,

"পরপারে
তব রাজ্য কর্ম্ম যশ ধন জন ভারে
অসীম বিস্তৃত।"

অন্যদিকে তাহার অধ্যাত্ম-লোক। ইহা কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছে, এই পরিণামে বিশ্ব-চেতনা কোন্ স্বরূপে প্রকাশ পায়, তাহার সূক্ষ্ম বিচার তুলিয়া লাভ

নাই। ইহা যে অন্তর্জগৎ মানুষের ধ্যান-লোক এক্ষেত্রে মোটামুটি ইহাই বুঝিলে চলিবে।

"এ পারে নির্জ্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্দ্ধে উচ্চ গিরি শিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষার ধবল
তোমার প্রাসাদ সৌধ, অনিন্দ্য নির্ম্মল
চন্দ্রকান্ত মণিময়।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং এইরূপে তাঁহার সকল সৃষ্টি-কর্ম্মের একমাত্র প্রেরণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

"অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যা শিরোদেশে
সারা সুপ্ত নিশি, সুর নর স্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রী-অঙ্গ পানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি সে প্রদীপ খানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধ তৈল আনি।"

যে নিষ্কম্প দীপ-শিখার কথা কবি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে কবির ধ্যান-লোক, তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। এই ধ্যান-লোকে অমর্ত্ত্য-চেতনার সহিত কবির নিত্য মিলন। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ 'সুর নর স্বপ্নাতীত নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই "শ্রীঅঙ্গের"র কিছু আভাস লাভ করিয়াছেন।

এই প্রদীপ জ্বালাইয়া ধরিবার অর্থই হইল ধ্যান-লোকে নিত্য অবস্থান করা। ধ্যানলোকে অসীমের সহিত যোগ ও লীলার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'গন্ধ তৈল' কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যান। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান-তন্ময় অবস্থায় কবি কত চকিত মুহূর্ত্তে অমর্ত্ত্য-লোকের আভাস লাভ করিয়াছেন।

কবির সেই ধ্যান-লোক—

"এ যে দুজনের দেশ
নিখিলের সব শেষ

অনন্ত ভবন।”

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া কবি যে বাস্তব দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বিস্মৃত হইতেন আমরা সে পরিচয় লাভ করিয়াছি।

“নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা।”

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান-তন্ময় অবস্থায় কবি যেখানে পরিপূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, মানবীয় চেতনা যেখানে সম্পূর্ণ রূপে স্তম্ভিত হইয়া যায় সেইখানেই কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যানের চরম পরিণাম।

“প্রদীপ নিবায়ে দিব
বক্ষে মাথা তুলি নিব—”

একদিকে দেশ-কালের ঊর্দ্ধে অমর্ত্ত্য-লোকের অনন্ত প্রসার,

“অনশ্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্য্য ধ্যানে দিবস যামিনী
তপস্যা মগনা।”

অন্যদিকে দেশ-কালের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়া ক্রমাগত বিবর্ত্তিত হইয়া চালিযাছে।

“মহাকাল পদতলে
মুগ্ধ নেত্রে ঊর্দ্ধমুখে রাত্রি দিন বলে
‘কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে’।”

মানুষের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে রবীন্দ্রনাথ দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক জাতীয় সৌন্দর্য্য-বোধ পুরুষকে একটি মঙ্গলময় পরিণাম দান করে। ইহা পুরুষের প্রেম। পুরুষের অপর সৌন্দর্য্য-পিপাসায় পরিতৃপ্তি ঘটে না, ইহা পুরুষের সৌন্দর্য্য মোহ।

ভারতীয় সাধনা পুরুষের এই জাতীয় ক্ষুধাকে কাম আখ্যা দিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছে। ভারতীয় সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে তাই পুরুষের এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-পিপাসার কোন পরিচয় মিলিবে না।

ভারতীয় চিন্তাধারার একদিকে সৌন্দর্য্য-মোহ বা কাম, অন্যদিকে প্রেম ও কল্যাণাশ্রয়ী সৌন্দর্য্য-বোধ। ইউরোপীয় সাহিত্যে এই উভয়ের যে যুগপৎ লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা এই কারণে ভারতীয় সাহিত্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে না।

আত্মার যে প্রেরণা দেহাধিষ্ঠানে লীলা করিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি বোধকে অসীম ব্যাপ্তি দান করে সেই ব্যাপ্ত চেতনার কোন সাক্ষাৎকার ভারতীয় সাহিত্যে নাই। ইন্দ্রিয়ের এই পিপাসা বা ক্ষুধা কাম মাত্র নহে। নিছক কাম বা ভোগেরও একটা সীমা আছে। প্রাণ-মন এমনকি তদূর্দ্ধ চেতনার জাগরণ যত সম্পূর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে তাহার প্রেরণা তত অধিক সক্রিয় হইয়া তাহাকে অমন ব্যাপ্তি দান করে।

ইউরোপীয় জীবন-দর্শনের এই সাক্ষাৎকারকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার উপন্যাসের প্রত্যেকটি নায়ক চরিত্রের মধ্যে এই উভয় জাতীয় সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যে এক সর্ব্বনাশা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একদিকে কল্যাণ ও প্রেম, অন্যদিকে অপরিতৃপ্ত সৌন্দর্য্য-পিপাসা।

এই দুই চেতনা কোন এক পরম বোধে বিধৃত কি-না, বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র সাহিত্য জীবন দিয়া এই রহস্যের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন, পরিশেষে ব্যর্থ হইয়া ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীদের ন্যায় ইহাকে পরিহার করিয়াছেন। পরিহার করিলেও সৌন্দর্য্য মোহের রহস্য তাঁহার মনকে চিরকাল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে পুরুষের জীবন আশ্রয় করিয়া এই যে উভয় প্রেরণার দ্বন্দ্ব সাক্ষাৎকারের চেষ্টা তাহার দার্শনিক স্বরূপ কি? উহার ভিতর দিয়া ইউরোপীয় জীবন-দর্শন কি লাভ করিতে চাহিয়াছে?

পুরুষের প্রাণ ও মনের জাগরণ যত সম্পূর্ণ হয়, সৌন্দর্য্য বা প্রেম বোধ তত অধিক পরিমানে অনুভূত হয়। এই উভয়বোধের পশ্চাতে ক্রিয়া করে জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্ত্তী আদি প্রাণ-শক্তি। যে পুরুষের পৌরুষ যত অধিক তাহার বিনষ্টিও তত ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে। আর এই বিনষ্টির ভিতর দিয়া আদি অপরিমেয় প্রাণ-শক্তির একটা আভাস মাত্র লাভ করিয়া মানবীয় চেতনা স্তম্ভিত হইয়া যায়।

এই জাতীয় সাক্ষাৎকারও তাই একপ্রকার অধ্যাত্ম-প্রেরণা প্রসূত। ইহার পশ্চাতে সম্পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টি রহিয়াছে। পৌরুষের ব্যর্থতার ভিতর দিয়া আদি চৈতন্যের লীলা সাক্ষাৎকার।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-পিপাসা যে এই শ্রেণীর নয়, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতীয় অধ্যাত্ম বাদীদের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য সাধনায় কামের কোন স্পর্শ নাই। দেহ-দশামুক্ত তাঁহার প্রেম,—অন্ততঃ ওই পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছে।

বস্তুতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যে সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের একটা দ্বন্দ্ব ক্ষীণভাবে সর্ব্বত্র রহিয়া গিয়াছে। তবে এই দ্বন্দ্ব কোথাও একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নহে, তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়-প্রাণের চেতনা অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই এমন একটি পরিণাম লাভ করেন, যে পরিণামে ইন্দ্রিয়ের পীড়া খুব তীব্র হইয়া উঠিতে পারে না।

'উর্ব্বশী' কবিতাটি বিশ্লেষণ করিলে কবির এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-প্রেরণার স্বরূপ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

পুরুষের সেই মোহ মুগ্ধ সৌন্দর্য্য-পিপাসা। যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষ চিত্ত এই অপরিতৃপ্ত সৌন্দর্য্য-পিপাসা বক্ষে লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

"শুধু জেনো, একখানি বহ্নিসম শিখা
তপ্ত বাসনার তুলি আমার সম্বল।" (আলেয়া)

যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান পুরুষ চিত্তে কেবল অন্তহীন অপরিতৃপ্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়, 'আলেয়ার' ওই কয়েকটি পংক্তির মধ্যে তাহার পরিচয় লাভ করা যায়।

উর্ব্বশী হইতে এই জাতীয় কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোনিমা—
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।"

পুরুষের আর এক সৌন্দর্য্য-প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'সুধা'। 'সুধা, বলিয়াছেন এই কারণে যে ওই জাতীয় সৌন্দর্য্য-সাধানায় পুরুষকে ইন্দ্রিয়ের পীড়া

সহ্য করিতে হয় না। উর্ব্বশী হইতে কবির ওই জাতীয় কয়েকটি উক্তি পরপর উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী"
"উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা।"
"বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি"
"কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা"
"অকলঙ্কহাস্যমুখে প্রবালপালঙ্কে ঘুমাইতে।"

উদ্ধৃত প্রত্যেকটি উক্তির ভিতর দিয়া কবি প্রাণপণে সেই সৌন্দর্য্য বোধেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যে-সৌন্দর্য্য-বোধ মর্ত্ত্য বা মানবিক বোধ মুক্ত। ভারতীয় সৌন্দর্য্য-সাধনা এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছে। অপরটি মানবীয় চেতনা লব্ধ ইন্দ্রিয় বোধাশ্রয়ী সৌন্দর্য্য-বোধ ; ইহাতে মোহ বিজড়িত থাকিবেই।

দেশ-কালের ঊর্দ্ধে দিব্য-চেতনা এবং দেশ-কালের মধ্যে মানবীয় বা মর্ত্ত্য-চেতনার মধ্যে পরম কোন যোগের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ এই কালে না লাভ করিতে পারিলেও উভয়ের মধ্যে যে কোন যোগ রহিয়াছে এই সম্পর্কে তাঁহার স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল।

একদিকে দেশ-কালের সীমার মধ্যে বিভক্ত সৌন্দর্য্য-লোক যাহার সহিত মানব দেহ-দশা বিজড়িত, অন্যদিকে দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর সৌন্দর্য-লোক, উভয়ের মধ্যে যোগের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশীর মধ্যে দান করিতে চাহিলেও দুটি চেতনা বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে।

দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর অনন্ত সৌন্দর্য্য-লোকটিকে রবীন্দ্রনাথ আবার দেশ-কালের সীমার মধ্যে একটি নারী বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া বাহু বন্ধনে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এখানেও সেই উভয় পিপাসার দ্বন্দ্ব।

"অতল অকূল হতে সিক্ত কেশে উঠিবে আবার ?"

মানবীয় চেতনায় যে-কোন বোধে এই উভয়মুখীনতা থাকে। একটির প্রেরণায় তাহার সৌন্দর্য্য-ধ্যান চূড়ান্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়া পরিণামে রূপের অতীত লোকে অরূপে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ; অপর প্রেরণা নিম্নাভিমুখী হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রাণকে অসামান্য সামর্থ্য দান করিয়া ওই রূপ বা বিগ্রহ-পিপাসাকে চূড়ান্ত পরিণাম দান করে।

সৌন্দর্য্য-বোধের এই যে দ্বন্দ্ব—

"ডান হাতে সুধা পাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বামকরে।" (উর্ব্বশী)

তাহা মানবীয় চেতনার সামগ্রী। অমর্ত্ত্য চেতনায় এই দ্বন্দ্ব থাকে না, কারণ রূপের ধর্ম্ম তখন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়।

তখন সৌন্দর্য্যের যে বোধ তাহা 'বিষ'ও নয়, 'সুধা'ও নয়। তাহা ব্যাখ্যাতীত এক অনুভূতি, তাহা চেতনার অনন্ত প্রসার, তাহা পরম অস্তিত্বের জ্যোতি বিস্তার, তাহা অবিক্ষুব্ধ শান্তি।

প্রকৃতি অথবা নারীকে আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনায় এই যে প্রেম ও সৌন্দর্য্য মোহের প্রকাশ ঘটে এমন দুই পৃথক সত্তার অস্তিত্ব নারী বা প্রকৃতির মধ্যে নাই। বস্তুতঃ এক প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন চেতনালোকে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হয়।

'রাত্রে ও প্রভাতে'র মধ্যে নারীকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ আপনারই দুটি সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নারীর এই উভয় সত্তার প্রকাশ নিশ্চয়ই কোন এক চেতনা-বৃন্তে বিধৃত। এই চেতনা-বৃন্তের পরিচয় না থাকিলে দুটি চেতনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 'রাত্রে ও প্রভাতে'র মধ্যে তাহাই হইয়াছে।

রাত্রে যে নারীর প্রেয়সী মূর্ত্তি—

"কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।" (রাত্রে ও প্রভাতে)

প্রভাতে সেই নারীর আর এক প্রকাশ।—মূর্ত্তিময়া কল্যাণ ও ভক্তি।

"একি মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা। (রাত্রে ও প্রভাতে)

যে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে কাম ও প্রেমের বিষামৃত লীলা, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-সাধনা ঠিক সেই জাতীয় নহে। যে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে কাম সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জ্জিত, যাহাতে ইন্দ্রিয় নিপীড়নের ক্ষীণতম আভাস নাই, সেই সৌন্দর্য্য-ধ্যানই রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। কবির সৌন্দর্য্য-সাধনা যে অন্ততঃ ওই পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই।

'বিজয়িনী'র সৌন্দর্য্য-ধ্যানই রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সৌন্দর্য্য-প্রেরণা। সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

> "জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
> সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
> সেপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী;
> স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
> অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
> লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
> বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে
> পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
> উরু-'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
> বাহুযুগে সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
> ঝলকে ঝলকে।"

এই সৌন্দর্য্য-দেবীর পদতলে মদন তাঁহার ত্রিভুবনজয়ী ফুলশর সংন্যস্ত করিয়াছে। ধ্যানের এই সৌন্দর্য্য বোধের সহিত অমর্ত্ত্য-চেতনার লীলা-বিস্তার বিজড়িত করিয়া তুলিবার চেষ্টা না থাকিবার ফলে উহা 'উর্ব্বশী'র মত বিরোধাভাস সৃষ্টি করে নাই।

বিশ্বের সৌন্দর্য্য তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিয়া আমরা ধ্যানে যাহার অপরূপ রূপ সৃষ্টি করি, বাস্তবে তাহাকে কোথাও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। বাস্তবে তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে এতখানি ব্যবধান।

প্রেমে সেই দুর্লভ রূপের যদি কোথাও প্রকাশ ঘটেও তাহাকে চিরকাল বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। ধ্যানের সামগ্রী হারাইয়া যায়, ধ্যান বিশুষ্ক হইয়া উঠে; আর্ত্তনাদে আমরাও কোথায় হারাইয়া যাই। ইহাই মানব ভাগ্য, সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধের এই অসহায় পরিণাম!

এখন কবির সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব মূলক উপলব্ধিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

মানবীয় চেতনার যে-কোন পরিণামে সৌন্দর্য্যের যে বোধ, তাহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয় বোধের উপর বলিয়া সীমার বোধ। মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া উঠিলে এই সীমার বোধ লুপ্ত হইয়া যায়।

এই কালে কবির মনের বিকাশ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই পরিণামে সৌন্দর্য্য-বোধ যত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, যতদূর প্রসারতা লাভ করিতে পারে তাঁহার সৌন্দর্য্য-ধ্যান তত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান কোথাও চকিতের জন্য অমর্ত্ত্য-চেতনার আভাস লাভ করিয়াছে। মানবীয় চেতনায় সৌন্দর্য্য-বোধ যে পরিণাম লাভ করুক-না-কেন, তাহা সীমার বোধ বলিয়া কবির অন্তরে ওই অতৃপ্তি কিছুতেই ঘুচিতেছে না।

এই অপরিতৃপ্তি দূর করিবার জন্য কবি সৌন্দর্য্য-বোধকে তখন দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটি মানুষকে মঙ্গলময় পরিণাম দান করে, অপরটি তাহার বক্ষে নিত্য অতৃপ্তির অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া দেয়।

মঙ্গলময় যে অখণ্ড সৌন্দর্য্যের ধ্যান কবি করিয়াছেন, তাহা যে মানবীয় চেতনায় খণ্ড সৌন্দর্য্য-পিপাসার একটি বিশিষ্ট পরিণাম ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা ওই সীমাবোধ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

কবি অপর যে সৌন্দর্য্য-পিপাসার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নতর চেতনার প্রসার। এই চেতনালোকে সীমা-বোধ একান্ত হইয়া উঠিবার ফলে চিত্তের বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠে।

তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, একটি সৌন্দর্য্য কবির ধ্যান-লোকের সামগ্রী, অপর সৌন্দর্য্য বোধ নিম্নতর চেতনাশ্রয়ী। এই উভয় সৌন্দর্য্যই মূলতঃ রূপাশ্রয়ী।

বাহিরে যে সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য্য কবি নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য অন্তরে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হইয়া অমন মানসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

অখণ্ড, মঙ্গল পরিণামী সৌন্দর্য্য বোধ বলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালের উর্দ্ধতর অমর্ত্ত্য-চেতনা-লোকটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। দেশ-কালের অন্তর্গত মানবীয় চেতনায় যে সৌন্দর্য্য-বোধ তাহাকে তিনি অন্তহীন খণ্ড সৌন্দর্য্যের বোধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দেশ-কালের উর্দ্ধে যিনি অরূপ, তিনিই আবার দেশ-কালের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত।

মানবীয় চেতনার উর্দ্ধে সৌন্দর্য্যের (সীমার) কোন বোধই থাকিতে পারে না। যেখানে সৌন্দর্য্যের সীমা-বোধ আছে, সেখানে অমন 'বিষ' বা 'সুধার', অমন ভাল বা মন্দের বোধ জাগে। যেখানে সীমার বোধ বিগলিত হইয়া যায় সেখানে 'বিষ' ও 'সুধার' দ্বন্দ্ব বোধের কোন প্রশ্নই উঠে না।

'বিজয়িনী'র মধ্যে কবির কাম মুক্ত যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহা কবির ধ্যান-লোকের সামগ্রী, তাহার ভিত্তি ইন্দ্রিয় বোধের উপর। তবে ধ্যান-লোকে ইন্দ্রিয়ের নিপীড়ন অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে অনুভূত হয়, অথবা সুপ্ত ভাবে থাকে। কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যান এই কালে অমনি একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে।

বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবং নরনারীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে যাহার আভাস মাত্র লাভ করা যায়, সেই সকল সৌন্দর্য্যের প্রকাশকে একত্রে এক ঠাঁই একটি নারী-রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার সেই অকাঙ্ক্ষা। ইহা তাই অসীম বা অরূপের কোন আকাঙ্ক্ষা নয়। যে রূপের মধ্যে সকল রূপের সম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে, সেই রূপকে প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা।

এই রূপকে লাভ করিবার জন্য যুগে যুগে মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, যুগে যুগে শিল্পী তাহার শিল্পের ভিতর দিয়া ইহারই আভাস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে; সে চেষ্টায় তাহার দেহাধার জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিযা পড়িয়াছে। সাহিত্যে ও শিল্পে এই পূর্ণ রূপের কত না ধ্যান।

ব্যর্থতায় মানুষ স্বর্গ-লোক কল্পনা করিযাছে। যাহাকে বাস্তবে সে লাভ করিতে পারিতেছে না, মর্ত্ত্যে ক্ষণে ক্ষণে যাহার চকিত আভাস মাত্র লাভ করা যায়, তাহাকে স্বর্গ-লোকে বুঝি চিরস্থায়ী রূপে লাভ করিতে পারা যায়।

উর্ব্বশী ও বিজয়িনীর মধ্যে সেই রূপের ধ্যান। এই রূপ তাই দেহাশ্রয়ী। ইহা নারী সৌন্দর্য্যই, যে নারীর মধ্যে এই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা।

রূপের এই জাতীয় পিপাসা কি কেবল ইন্দ্রিয় বোধ প্রসূত? ইহার পশ্চাতে কি সত্যকারের কোন গভীর অধ্যাত্ম প্রেরণা নাই? রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন রূপ দেহাশ্রয়ী হইলেও তাহাকে সম্পূর্ণ বাসনা মুক্ত করিয়া দেখা সম্ভব। বস্তুতঃ এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে একটি গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা আছে।

অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া এই শ্রীহীন বিশ্ব, বিশ্বের তরুলতা, প্রাণী মনুষ্য-সমাজ আজ অপূর্ব্ব শ্রী লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-স্রষ্টার এই শিল্পায়ণ আজও শেষ হইয়া যায় নাই। তাঁহার নির্ম্মম, নিরাসক্ত এই বিশ্ব-রচনার লেখা ও মোছার ভিতর দিয়া নর-নারীর মধ্যে পূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিবে।

সে স্বর্গে যাহাকে কল্পনায় অধিষ্ঠিত করিযাছে, মর্ত্ত্যে ধ্যানের মধ্যে যাহাকে লাভ করিযাছে, তাহাকে একদিন এই মর্ত্ত্যেই বিগ্রহ রূপে লাভ করিবে। অভিব্যক্তির ভিতর দিযা কেবল ভাবের ধীর সম্পূর্ণতা নয, রূপেরও ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিযা চলিয়াছে। একদিন এই মর্ত্ত্যে পূর্ণ ভাব ও পূর্ণ রূপের মিলন ঘটিবে।

অসীমের অন্তরে যে পূর্ণতার ধ্যান রহিযাছে, যাহাকে তিনি বিশ্ব রচনার ভিতর দিয়া ধীরে ফুটাইযা তুলিতেছেন, তাহা একদিন সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

মানসী কাব্যের ‘অহল্যার প্রতি’, ‘মেঘদূত’, প্রভৃতি কবিতার মধ্যে যে পূর্ণতার ধ্যান, সেই ধ্যান সোনার তরী কাব্যের ‘মানস সুন্দরী’র মধ্যে রূপ লাভ করিযাছে, তাহা যে অ্যাবস্‌ট্রাক্ট কোন তত্ত্ব নয, অসীম বা অরূপ কোন তত্ত্ব নয, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিযাছিলাম। তাহা তিলোত্তমার ধ্যান। নারী দেহাশ্রয়ী রূপের চরমোৎকর্ষের ধ্যান।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে মন্তব্য করিয়াছেন, এক্ষেত্রে পরিশেষে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ উর্ব্বশী তারই প্রতীক। * * * হোক-না সে দেহের সৌন্দর্য্য কিন্তু সেই তো সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপ সৌন্দর্য্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানব রূপের চরমতাই স্বর্গীয। সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয, তবুও তা অনির্ব্বচনীয। উর্ব্বশীতে সেই অনির্ব্বচনীযতা দেহ ধারণ করেছে, সুতরাং তা অ্যাবস্‌ট্রাক্ট নয়।

মানুষ সত্যযুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্ত ভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায় সে যে অ্যাবস্‌ট্রাক্ট ভাবে কেবল মাত্র তার ধ্যানেই আছে, কোনখানেই তা বিষয়ীকৃত হয় নি, একথা মানতে তার ভালো লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গ-লোকের অবতারণা। যা আমাদের ভাবে রয়েছে অ্যাবস্‌ট্রাক্ট,

স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ। যেমন, যে কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে প্রত্যহ দেখতে পাই নে, অথচ যা আছে আমাদের ভাবে, সত্যযুগে মানুষের মধ্যে তাই ছিল বাস্তব রূপে এই কথা মনে করে তৃপ্তি পাই। তেমনি এই কথা মনে করে আমাদের তৃপ্তি যে, নারী রূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্ব্বশী-মেনকা-তিলোত্তমায়। সেই বিগ্রহিনী নারী মূর্ত্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্ব্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।"

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যে কবির মনের বিকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতেছে, অন্তরে রূপের ধ্যান ততই সম্পূর্ণ হইতেছে। অন্তরে সৌন্দর্য্যও প্রেমের ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে বহির্বিশ্বের যোগে। চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সহিত যোগ যতই গভীরভাবে অনুভূত হইতে থাকে, ততই আবার বহির্বিশ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সুষমা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সুষমাই সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য-লোকের ধীর সম্পূর্ণতা একযোগে ব্যক্তি-সত্তা ও বিশ্ব-সত্তায় ঘটিয়া চলে। বিশ্বের সহিত ব্যক্তির যোগ যতই গভীর হইতেছে, ব্যক্তি ও বিশ্ব-সত্তায় সৌন্দর্য্য যতই সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে, উহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ততই তীব্র হইতেছে। এই সকল ক্রিয়া যুগপৎ চলিতে থাকে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় বিশেষ করিয়া মধ্যযুগে (পৌরাণিক) জীবনের এই অখণ্ড দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়। জীবন ও জগৎ একদিকে মায়া বা মিথ্যা হইয়া উঠে, অন্যদিকে কেবলমাত্র অসীম বা অরূপ সত্য হইয়া উঠে। ফলে বিশ্বের যোগে জীবনের ধীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য যে সদা জাগ্রত চেষ্টা তাহাও অস্বীকৃত হইয়া যায়। কারণ মানবিক সত্তায় ইন্দ্রিয় হইতে মন পর্য্যন্ত সমগ্র চেতনা-বৃত্তিটিই অবিদ্যা বা মায়া। এই সকল বৃত্তির অনুশীলন মোক্ষলাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় বলিয়া জগৎও সেই সঙ্গে অস্বীকৃত হইয়া যায়। কারণ একমাত্র বহিঃবিশ্বের যোগে এই সকল বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা, ইহাতে অসীম ও সীমার সকল বোধ পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। তাই এই জাতীয় রূপ-জিজ্ঞাসা ও রূপ-সৃষ্টি তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁহার সমগ্র সত্তা, ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন মথিত করিয়া এই পরিপূর্ণ রূপের প্রকাশ ঘটিয়াছে।—তাহার যে-নামই দেওয়া যাক-না-কেন।

পূর্ণ রূপ লাভের এই আকাঙ্ক্ষা পাশ্চাত্ত্য শিল্পে, বিশেষ করিয়া গ্রীক শিল্পে লক্ষ্য করা যায়। ইহা সম্ভব হইয়াছে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের পূর্ণ বিকাশ ও স্বীকৃতির ফলে। তাহার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাধনার সকল দিক ইহারই পরিচয় বহন করিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই মনের সীমা-লোককেও ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, রূপের সহিত অরূপের, সীমার সহিত অসীমের সংযোগ সাধনের জন্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাধনা এখানে আসিয়া যেমন মিলিত হইয়াছে, তেমনি একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে।

গ্রীক জীবন-সাধনার মত পূর্ণ জীবন-সাধনা প্রাচীন ভারতবর্ষেও যে সত্য ছিল তাহা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য অরূপ বা অসীমকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রূপের আকাঙ্ক্ষাও অনিবার্য্যরূপে আসিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের উষা, রাত্রি, প্রভাত প্রভৃতির বন্দনা বা সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উষা সূক্তগুলির মধ্যে নিখিল পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যকে একটি নারী-বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া সাক্ষাৎ করিবার প্রয়াসটিই সবিশেষ লক্ষণীয়। আর এই নিত্য চঞ্চলা পলাতকা সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে বাহুবেষ্টনে লাভ করিবার জন্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আদিত্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। নিখিল মানব-হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষা সেই পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

যেন কাহার আগমনের জন্য পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের স্তরে স্তরে এক নিঃসাড় সমারোহ চলিতে থাকে। আকাশের পূর্ব্বদিকে একেবারে শেষ প্রান্তে একটি ক্ষীণ স্বর্ণসূত্রের মত রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহার কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তিম গোলাপের মত একটি চাপা দ্যুতি জাগিয়া উঠিয়া পূর্ব্বদিককে ধীরে আরক্তিম করিয়া তুলে। তাহার পর সেই স্বর্ণময় আভা ছড়াইয়া পড়ে সর্ব্বত্র, প্রান্ত হইতে প্রান্তভাগে। ধরিত্রী ও আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া এ কোন্ বিস্মিত রূপের আবির্ভাব। অজস্র বারিপাতের মত, বন্ধনমুক্ত জলধারার মত, সহস্র সহস্র নিক্ষিপ্ত তীরের মত আলোর প্লাবন নিম্নে নামিয়া আসিতে থাকে। তমসার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এক একটি সৃষ্টি-রূপ ধীরে উদ্ঘাটিত হইতে থাকে।

কুলায় কুলায় পাখিদের পক্ষ বিধুনন শব্দ, থাকিয়া থাকিয়া কূজন জাগিয়া উঠিতেছে। ওই তো দুই একটি করিয়া পাখি কুলা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছে। গৃহে গৃহে আহুতির জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। সম্মিলিত কণ্ঠে ছন্দে ও সুরে উষার বন্দনা গান সুরু হইয়াছে, —সৃষ্টির চিরবিস্ময় রূপের পদতলে বিস্মিত মানব-হৃদয়ের প্রণতি। সেই প্রণামের সহিত প্রণাম মিলাইয়া চেতন অচেতন বিসৃষ্টির সমস্ত কিছুই নীরবে প্রণাম করিতে থাকে।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতটি কি এমনি ছিল? তাঁহার ধ্যানের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া কি প্রথম এক একটি রূপ-লোক এক একটি পাপড়ি মেলিয়া প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আজিকার উষা কি অতীতের সকল উষার ন্যায় সেই প্রথম সৃষ্টি মুহূর্ত্তটিকে ইঙ্গিতময় করিয়া তুলে? ভবিষ্যতে অনন্তকাল ধরিয়া উষা কি এমনি করিয়া নিত্যদিন তাহাকে ইঙ্গিতময় করিয়া তুলবে? কোন্ বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম উষা উদ্ভাসিত হইয়াছিল?

স্বর্গের দুহিতা উষা, সূর্য্য পত্নী। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যময়ী পতি অনুগতা পত্নী উষা। স্বামীর অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করিবার জন্য সে যেন ঈষৎ হাস্যে আপনার পীনোন্নত শুভ্র স্তন যুগল অনাবৃত করিয়াছে। উষা স্নান নিরতা সন্নতাঙ্গী রূপসী তরুণীর ন্যায়। যেন মাতা কর্ত্তৃক পতির সম্মুখে প্রেরিতা ব্রীড়াবনতা অলঙ্কৃতা বালিকা বধূ। প্রভাতের মাতা উষা। রাত্রি তাহার মিত্র বা ভগ্না। তাহার পিতা স্বর্গ, তাহার মাতা ধরিত্রী। উভয়ের ক্রোড়ে কুমারী উষা সমাসীনা। উষা জীব-ধাত্রী জননী।

তাহার বর্ণ শ্বেত। তাহার আলুলায়িত কেশপাশ স্বর্ণ বর্ণের। তাহার বেশ-বাস ঈষদ্ রক্তিম।

সে সূর্য্যের পথ, দেবগণের পথ ধরিয়া আকাশমার্গে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করে। তাহার অপ্রতিহত, বিরাট, সুবর্ণ রঞ্জিত রথ কপিশ বর্ণের বৃষ বা অশ্ব চালিত। রথের চূড়ায় শ্বেত পতাকা উড়িতেছে।

উষা কেবল মাধুর্য্যময়ী ও ঐশ্বর্য্যময়ী নয়, শক্তিময়ীও। প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যদল যেমন শত্রুদল বিপর্য্যস্ত করে, উষা তেমনি বিরূপা তমসার বক্ষ বিদীর্ণ করে। তাহার আবির্ভাবে শত্রুদল ভীতত্রস্ত হইয়া দূরে পলায়ন করে। সকল জীবের চেতনা সঞ্চারকারিণী, সকল শুভ কর্ম্মের প্রেরণাদাত্রী।

মূর্ত্তিময়ী সত্য, মহতের মহত্ত্ব, প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, দেবগণের দেবত্ব, যশস্বীর যশ। মহাকাল স্বরূপিণী উষা। নিম্নে অন্তহীন কাল ধরিয়া জীব-লোক আবর্ত্তিত হইয়া চলিযাছে।

মধ্যযুগীয় সকল প্রকার প্রবণতা সত্ত্বেও এই রূপের প্রতি দৃষ্টি একান্তরূপে কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই। মধ্যযুগের সাহিত্য হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত লাভ করা যাইতে পারে।

বিরাট রাজমহিষী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর যে বর্ণনা দিয়াছেন সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"তোমার গুল্‌ফভাগ অনুচ্চ, উরুদ্বয় সংহত, নাভিদেশ অতি গভীর, নাসা উন্নত, অপাঙ্গ, কর, চরণ, জিহ্বা ও অধর রক্তিম, বাক্য হংসের ন্যায় গদগদ, কেশকলাপ অতি মনোহর, অঙ্গ শ্যামলবর্ণ, নিতম্ব ও পযোধর নিবিড়তম, পক্ষ্মরাজি কুটিল, মধ্যভাগ ক্ষীণ; গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, শিরা সকল অদৃশ্য এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তুমি কাশ্মীর তুরঙ্গীর ন্যায় এবং পদ্মপলাশ লোচনা লক্ষ্মীর ন্যায় সৌন্দর্য্যময়ী।"

দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা ও মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার বর্ণনা অংশটি পাঠকবর্গের স্মরণে পড়িতে পারে।

ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, অজান্তা ও ইলোরা প্রভৃতির প্রস্তর ও চিত্রশিল্পের নায়িকা ও নটি প্রভৃতি ধর্ম্ম বিবিক্ত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যে আশ্চর্য্য রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে যে একটি সমগ্র জাতির সৌন্দর্য্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা চলে। এ্যাফ্রোডিটি ও ভেনাসের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান যুগে যুগে দেশে দেশে রূপায়িত হইযাছে, তাহার সহিত উষা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, নায়িকা ও নটি প্রভৃতি মূর্ত্তি এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিজযিনী' প্রভৃতি মূর্ত্তির মধ্যে স্বধর্ম্মের কোন পার্থক্য নাই।

প্রকৃত জীবন-পিপাসা মধ্যযুগে সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে জয়যুক্ত হইলেও মধ্য-যুগের জীবন-সাধনায় এই দৃষ্টি যে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায, জাতি যে তাহাতে চিরকালের জন্য লাঞ্ছিত হয, তাহা নিঃসংশযে বলিতে পারা যায।

'উর্ব্বশী' ও 'বিজয়িনী'র মধ্যে একই অনুপ্রেরণার প্রকাশ ঘটিলেও সার্থকতার দিক হইতে দুটি কবিতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

যে রূপ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, মানব-চিত্তে যে রূপের অনিবার্য্য আকর্ষণ, যুগ হইতে যুগে, পুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে যাহা সকল সম্পর্ক বন্ধন, প্রয়োজনবোধ, সীমার সুকল বোধের বাহিরে, যাহা নিছক মাধুর্য্য, যাহা মানুষকে উদাসীন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া সকল কাজ ভুলাইয়া সমাজ ও সংসারের বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, যাহার প্রথম সৃষ্টি নাই, তাই ধীর বিকাশ বা সম্পূর্ণতা নাই, তাই যাহার বিনষ্টি নাই, যাহা আদৌ সম্পূর্ণ, বিশ্বের সকল রূপ যে সম্পূর্ণতাকে আভাসে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বেদনায় বিষাদ বিজড়িত ; যাহাকে তিনি বিশ্বের কোন একস্থানে একটি নারী-রূপের মধ্যে কায়বদ্ধ দেখিবার জন্য উন্মুখ, সেই রূপটির সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে বিজয়িনীর মধ্যে।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার মূল ভাবপ্রেরণা সম্পর্কে কবি মন্তব্য করিয়াছেন,—

"আর একটি Woman পৃথিবীতে থাকেন ; তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালোবাসেন ; তাঁহাকে আমরা কাঁদাই, দুঃখ দিই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারা ধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটুকু উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীটিকে দুইভাগ করিয়া দেখিলে একভাগে The Beautiful, একভাগে The Good পড়ে। উর্ব্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে ; স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।"

তাঁহার অন্তরে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে ধ্যান-লোক ছিল তাহাই কখন নিছক মাধুর্য্যরূপে, কখন নিছক কল্যাণরূপে প্রকাশ লাভ করিলেও এই উভয়কে একত্রে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার ছিল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'মানস সুন্দরী'র মধ্যে এই উভয় জাতীয় প্রেরণার যুগপৎ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এই দুই আপাত বিরুদ্ধ প্রেরণার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে যে একটি অধ্যাত্ম-দ্বন্দ্ব ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যের মধ্যেই শুধু নয়, তাহার অন্যান্য রচনার মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'গৃহ প্রবেশ' নাটকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নায়ক কল্যাণ শূন্য নিছক সৌন্দর্য্য-ধ্যানে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সকল পিপাসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে, পরিণামে ব্যর্থ হইয়া হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে সে আপন পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে।

সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে কল্যাণাশ্রয়ী হইতেই হইবে, নইলে মানুষের অন্তরের ক্ষুধা মিটে না। মাটির শ্যামল, সরস, নিবিড় স্নেহেই ফুল ফোটে।

এই জাতীয় অধ্যাত্ম-দ্বন্দ্বের মধ্যে সেই সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচয় লাভ করা যায়। তাহা কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা যখন পূর্ণতার সাধনা ছিল তখন রূপের এই জাতীয় পিপাসাও অনিবার্য্যরূপে জাগিয়াছে, এই সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইতে রূপের এই আকাঙ্ক্ষাকে মাতৃমূর্ত্তির ধ্যানে ডুবাইয়া সকল অধ্যাত্ম দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান বিশ্ব-মাতায় পরিণাম লাভ করে নাই, বিশ্ব-প্রিয়ায় পরিণাম লাভ করিয়াছে। পুরুষ মাত্রেরই অন্তরে নারীর একটি আদর্শ-রূপ আছে, এই সকল রূপ যে আদর্শ রূপের (arche-type) আভাস তাহাই তো বিশ্ব-প্রিয়া।

যে ধ্যান বা অধ্যাত্ম-সত্তার সহিত ঊর্দ্ধতর চেতনার যোগ ঘটে, সেই অধ্যাত্ম সত্তা বা ধ্যান-লোক,

"সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর অন্তঃপুরে।" (প্রেমের অভিষেক)

অধ্যাত্ম-লোকে উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না, কারণ যে ধীর পরিণামের ফলে মানুষের অন্তরে অধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ ঘটে, সেই পরিণাম ওইখানে আসিয়া থামিয়া যাইতে চাহে না। ওই লোকটিকেও অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রবল প্রেরণা অন্তরে প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়।

"নিত্য শুনা যায়
তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।" (প্রেমের অভিষেক)

বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দ সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধ আশ্রয় করিয়া মানব অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটায়। প্রাণের এই জাগরণের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ওই ধ্যান-লোকটি গড়িয়া উঠে। প্রেমের অভিষেক নাম করণের সার্থকতা এইখানে।

"হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত আলয়ে।" (প্রেমের অভিষেক)

এই অধ্যাত্ম জাগরণ ঘটিলে মন যে অপূর্ব্ব আনন্দে নিত্য নিমগ্ন থাকে রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

"নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্য-বসনে।" (প্রেমের অভিষেক)

অধ্যাত্ম চেতনার জাগরণে যে অন্তহীন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, কবিরা তাহারই ধ্যান নিমগ্ন। তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোকটিকে রূপায়িত করিবার সদা জাগ্রত প্রয়াস।

"নিভৃত সভায়
আমাদের চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি।" (প্রেমের অভিষেক)

যে-কোন ফল লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করিতে অর্থাৎ মানবীয় চেতনা পরিহার করিতে চান নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনা দেশ-কালের মধ্যগত সাধনা। এই সাধানার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ আসক্তি বিজড়িত মানব প্রেম এবং তজ্জাত করুণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনায় একমাত্র মানবীয় চেতনাকে স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণে তাঁহার প্রেমে মোহ আছে, আসক্তি আছে, উৎকণ্ঠা ও আছে। দেশ-কালের সীমার ঊর্দ্ধে মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া গেলে এই মোহ, উৎকণ্ঠা ও বেদনা বোধ থাকে না।

"শোকহীন
হৃদিহীন সুখ স্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে।"

মর্ত্ত্যের সেই উৎকণ্ঠা বিজড়িত মানব প্রেম। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছেন।

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেম ধারা।"

দেশ-কালের সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হোক -না-কেন, তাহার বিচার না তুলিয়াও বলা যায় যে তাহা মানবীয় চেতনায় অনুভূত স্বরূপ বোধ হইতে ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ মর্ত্ত্য-জীবনের এই স্খলন পতন ত্রুটি, এই আসক্তি ও মোহ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সত্য ও অসত্য, পাপ ও পুণ্যের অপরূপ মিলিত প্রকাশটিকেই পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন।

মানবীয় চেতনার ঊর্দ্ধতর পরিণামে জীবনের কোন্ দুর্লভ স্বরূপের প্রকাশ ঘটে তাহা আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের বর্ত্তমান স্বরূপের মধ্যেই এক আশ্চর্য্য দুর্লভতার সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা জাগতিক সকল বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে চাহে নাই, উহাকে অন্তহীন প্রসারতা দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উন্নততর পরিণাম বলিতে ভিন্নতর কোন ধর্ম্ম বা স্বরূপতা বুঝিতেন না, বুঝিতেন এই চেতনারই প্রসার।

এই প্রসারতার ফলে মানব প্রেমই তাঁহার কাব্যে এক আশ্চর্য্য রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; যাহাকে প্রথম দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অভাবিত বলিয়া বোধ হয়।

মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে এই জগৎ ও জীবন তত দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়, সৌন্দর্য্য ও প্রেম তত নিঃসীম হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন আমরা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করি-না-কেন, তাহা কোন কালেই মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া যায় না।

মানবীয় চেতনা যে পরিণাম লাভ করিলে মানবীয় প্রেম ও সৌন্দর্য্য বোধের সর্ব্বোত্তম প্রকাশ ঘটে, রবীন্দ্রনাথের চেতনা এক্ষেত্রে সেই পরিণাম লাভ করিয়াছে। ইহা সীমা ও অসীমের মিলন ভূমি, প্রান্ত-লোক। রবীন্দ্রনাথ এই প্রান্ত-লোক ছাড়াইয়া উঠিতে চান নাই। ছাড়াইয়া উঠিলে এই স্বরূপটি যে হারাইয়া যায়।

মানব বোধের যে অসম্পূর্ণতা মানিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ উহার দুর্লভতায় মুগ্ধ হইয়াছেন, উহা সীমা-ধর্ম্মী বলিয়া এবং মানব-বোধের উপর মানুষের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া উহা আবার নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসিয়া সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোকটিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দেয়। অজ্ঞানতা, মোহ ও আসক্তি একান্ত হইয়া উঠে। এই জন্যই অধ্যাত্মবাদীরা এমন একটি পরিণাম অন্বেষণ করিয়াছেন,

যে পরিণাম লাভের পর মানবীয় চেতনা আর নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসে না।

রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহা মুখ্যতঃ সত্ত্ববোধ জাত দৃষ্টি। মানবীয় চেতনার উহা সর্ব্বোচ্চ ভাগ। ওই বোধে অমর্ত্ত্য-চেতনার যেমন আভাস আসিয়া পৌঁছায় তেমনি মানবীয় প্রেম ও সৌন্দর্য্য-বোধের অপরূপ রূপ ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল এই বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে এই মোহ মুগ্ধ প্রেম-তৃষিত জীবনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যাইবে না।

মোহ মুগ্ধ মানব প্রেমের ললাটে কবি আঁকিয়া দিয়াছেন মহিমার শ্বেত চন্দন তিলক। এই প্রেম তো মিথ্যা নয়, পরন্তু এই অধীর বিচ্ছেদ কাতর অশ্রু কলুষিত প্রেমে স্বর্গ-লোক এমন কি মুক্তিও অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়া যায়। 'আমার বহু বরষের মাতৃক্রোড় সম এই ধরিত্রী। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যদি তোমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া দুর্লভ তোমার প্রেম আস্বাদ করিতে পাই, তবে মুক্তি চাহি না।

মানব-প্রেমের এই অনুভূতির লোকেও অসীমের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। (কারণ মানবীয় যে-কোন বোধ যে ওই পরিণাম লাভ করিতে চায়) তবে এই প্রেমের মধ্যে অসীমের যতটুকু আভাস লাভ করিতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ কেবল তাহাই লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

"মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন সম।"

এই 'স্মরণ' হইল সেই প্রেরণা, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে মানবীয় চেতনার ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে চাহিতেছে। মায়ার আলিঙ্গন পাশে, সৌন্দর্য্য ও প্রেম মোহে আবার ওই স্মরণ বা প্রেরণা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

"মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিত জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর।"

মানবীয় চেতনার এই স্বরূপের কথা বলিয়াছি। উহা একান্ত অসৎ নয়, আবার সৎ নয়, সম্পূর্ণ অজ্ঞান নয়, আবার পূর্ণ জ্ঞান নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় তবে পূর্ণ সত্যও

নয়,—উভয়ের মিলিত এক আশ্চর্য্য প্রকাশ। মর্ত্ত্য-লোকে অজ্ঞানতা, আসক্তি, মোহ, অসম্পূর্ণতা ও ক্রটির মধ্যে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের যতটুকু প্রকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথ তাহাতেই পরিতৃপ্ত।

'দিন শেষে' কবিতাটির মধ্যেও কবির এই একই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

"ভালো নাহি লাগে আর
আসা-যাওয়া বার বার
বহুদূর দুরাশার প্রবাসে।' '(দিন শেষে)

ধরিত্রীর উপর বিনম্র আঁখি পল্লবের মত সন্ধ্যা অতি ধীরে নামিয়া আসিতেছে। বাতাস পড়িয়া আসিতে বহুদূর বিস্তৃত নিস্তরঙ্গ জল অপার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিযাছে। পাতায পাতায আর সাড়া জাগিতেছে না। পাখীর বিচিত্র কাকলী বন্ধ হইযা গিয়াছে। নির্জ্জন গ্রামপথ ধরিয়া কেবল একাকী তরুণী ভরা ঘট কক্ষে লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। বেদনার মত অতি মৃদু জল ছল্ ছল্ এবং কাঁকন বাজিয়া উঠিবার শব্দ থাকিয়া থাকিযা শোনা যাইতেছে। অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি মেঘ প্রান্তে এখনও রক্তিম আভায় বিজড়িত হইযা আছে। দূরে দেবালয়ে দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোন্ দূর অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞাত-লোকে-চলিয়া-যাওযা দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথ বিছাইযা বকুল ঝরিয়া পড়িতেছে। নিত্য দিনের এই একান্ত পরিচিত সৌন্দর্য্য-লোক। কবি ইহারই মধ্যে বাস করিতে চান। আর

"যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লযে কাঁখে তরুণী।"

এই 'ভরা ঘটে'র অর্থ হইল, নারীর হৃদয়ে পরিপূর্ণ প্রেম-সুধা। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোকে কবি প্রয়াস-ক্লান্ত জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিতে চান।

দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর চেতনা-লোকে মানবীয় চেতনা যে পরিণাম লাভ করুক-না-কেন, তাহাতে জগৎ ও জীবনের বিশিষ্ট চেতনাটি তো লুপ্ত হইয়া যায়। মানবীয় এই চেতনাটিই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাধিক কাম্য। এইজন্য জগৎ ও জীবনের প্রতি গভীর মমতা রবীন্দ্র-কাব্যে সকল পর্য্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। কেবল ইহাই নহে, এই মানবীয় চেতনাশ্রয়ী হইয়া থাকিবার ফলে কবির জীবনে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার নিরসন কোন কালে ঘুচে নাই।

আসক্তি লোপ পাইতে পারে তখনই, যখন মানুষ সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠে। যেখানে সীমার বোধ আছে, সেখানে আসক্তিও আছে। জীবনের সীমায় থাকিয়া কেবলমাত্র জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনের পূর্ণ পরিচয় লাভ একপ্রকার অসম্ভব।

জগৎ ও জীবনের সীমা বা দেশকালের পরিবৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ওই মমতা বা করুণা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং মোহবিজড়িত মানব প্রেমই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।

মৃত্যুতে এই জীবনের কোন স্মৃতি কি কবি কোন স্বরূপে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না? জীবন ও জগতের সহিত সেদিন সকল সম্পর্ক কি নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। মৃত্যুতে কবির বিদেহ চেতনা এই জগৎ ও জীবনকে যদি কোন স্বরূপে লাভ করিতে পারেনও তবে এই স্বরূপে তো নয়। মানব প্রেমে এই দেহা-ধারটির মূল্য যে সর্ব্বাধিক। উহাকে আশ্রয় করিয়া তো সকল প্রেমের লীলা। মৃত্যুতে এই আধারটি তো ভাঙ্গিয়া যায়। আর এক রূপ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া 'আমার' অন্তরে প্রেম উপজাত হইয়াছিল, আর তাহার প্রেমের প্রকাশ স্বরূপ তুচ্ছাতিতুচ্ছ সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত কত-না-সামগ্রী, আর মর্ত্ত্য প্রেমের লীলাস্থলী স্বরূপ এই সুন্দরী ধরণী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোন গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়। মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবনের প্রেম ও মাধুর্য্য শিশিরসিক্ত শিরীষ কেশরের মত অশ্রু কোমল হইয়া উঠিয়াছে। কোন তত্ত্ব-প্রেরণা বা অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নয়, জীবনের নিয়তিকে মানব প্রেম যে প্রেরণায় জয় করিয়া উঠিতে চায়। তাহাই কবিতাটির ভাব প্রেরণা—

"শুধু এক ভিক্ষা আছে, যেদিন আসিবে কাছে
জীবনের পথশেষে নয়ন আকুল
সেদিন স্নেহের সাথে তুলে দিও এই হাতে
সেই চাঁপা, সেই বেল ফুল।" (স্নেহ স্মৃতি)

এই জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইবার পূর্ব্বে কবি এই জীবনের প্রীতি ও সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য লাভ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরেই কবি-চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। জীবনের কোন দানকে তো মৃত্যুতে বহিয়া লইয়া যাইবার উপায় নাই। এই বেদনা সংশয়ের সান্ত্বনা কোথায়।

"কে জানে সকল স্মৃতি জীবনের সব প্রীতি
জীবনের অবসানে হবে কি উন্মূল
জানিনে গো এই হাতে নিয়ে যাব কিনা সাথে
সেই চাঁপা সেই বেল ফুল।" (স্নেহ স্মৃতি)

জীবন অতীতে জীবনের কোন অর্থ কবি অন্বেষণ করিতে চান নাই। জীবনের অন্তহীন রহস্যকে কবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, মৃত্যুতে যে এই জগতের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, জীবনের কোন চিহ্ন যে একদিন এই জগতে কোন প্রকারে কোন স্বরূপেই থাকিবে না এই সত্যকেও কবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

"অনন্তের মাঝখানে পরস্পরে আর
দেখা নাহি যায়।" (নববর্ষে)

সেখানে পরিশেষে কবি এই সান্ত্বনাই লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

"একদিন প্রিয় মুখ যত
ভালো করে দেখে লই, আয়।" (নববর্ষে)

হায় এমনি করিয়া কি সাধ মেটে, এমনি করিয়া কি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যায়?

দেশ-কালের সীমাকে একমাত্র বলিয়া মানিয়া লইলেও রবীন্দ্রনাথকে একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে দেশ-কালের সীমার সত্যতা তাহার ঊর্দ্ধে অনন্ত ও অসীমকে স্বীকার করিয়া। মৃত্যুতেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে অনন্ত ও অসীমের পটভূমিকায় জীবন ও জগৎ সত্য। জীবনের সকল সত্য ও মূল্যবোধ তাই আপেক্ষিক। আমাদের বর্ত্তমান জীবন অনন্তের আদি অন্তহীন গূঢ় গোপন উদ্দেশ্যের একটি পর্য্যায় মাত্র। তাই কোন একটা বিশেষ পর্য্যায়ে পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়া কবি-চিত্ত হইতে তাই বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা একেবারে শতধারায় উৎসারিত হইয়াছে।

"কেন এই আনাগোনা
কেন মিছে দেখাশোনা
দু দিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা,
কেন এত ভালোবাসা।" (মৃত্যুর পরে)

এই বোধ রবীন্দ্রনাথের অন্তরে নিঃসংশয়ে জাগিয়াছে যে জীবন অসীমের একটি পর্য্যায় মাত্র। মানবীয় চেতনা জীবনকে যেমন করিয়া জড়াইয়া ধরিতে চা'ক-না-কেন, আসক্তি ও বেদনাবোধ যত প্রবল হোক-না-কেন, অনন্ত ও অসীমকে স্বীকার করিতেই হইবে। মৃত্যু সে স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়।

"পলেক বিচ্ছেদে হায়
অমনি তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।" (মৃত্যুর পরে)

অনন্তকে স্বীকার করিলেই তো জীবনের আসক্তি ঘুচে না। তাই অমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। আসক্তি লোপ পায় তখনই, যখন মানুষ অনন্তকে কেবল স্বীকার করে না অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। তাহা না হইলে জীবনের অনন্ত স্বরূপতা বলিতে জন্ম-জন্মান্তরে রূপ হইতে রূপে বিহার করা বুঝায়। তাই কবির অশান্ত চিত্ত ওই রূপটিকেই ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে।

"ওই দূব দূবান্তবে
অজ্ঞাত ভুবন'পরে
কভু কোনখানে,
আব কি গো দেখা হবে,
আব কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।" (মৃত্যুব পবে)

চৈতালি

চৈতালির একেবারে প্রারম্ভে ছয়টি পংক্তি আছে। কাব্য আলোচনার প্রারম্ভে তাহার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি
তোমাব আনন্দ মূর্ত্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর—"

চিত্রায় কবির ধ্যান-লোকটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। চৈতালির মধ্যে কবির সেই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক আরও উন্নত পরিণাম লাভ

করিয়াছে। এই সমৃদ্ধ সুপরিণত ধ্যান-লোকটিকে কবি চৈতালির মধ্যে নানাভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

এই কাব্যে কবির ধ্যান-লোক কোথাও কোথাও এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে যাহাকে মানস-সীমার অন্তর্ভুক্ত চেতনা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না।

জীবন-দেবতা যে জীব-সত্তার অন্তর্ভুক্ত চেতনা উহা যে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত নয় তাহা রবীন্দ্রনাথ চিত্রার ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতালির ধ্যান-লোক জীবন-দেবতারও উন্নততর পরিণাম অথচ উহা বিশ্ব-চেতনা বা ঈশ্বরও নয়।

রবীন্দ্রনাথ মানস ও বিশ্ব-সত্তার মধ্যবর্ত্তী বিচিত্র চেতনা পর্য্যায়ে বিচরণ করিয়াছেন, কোথাও জীব-সত্তার একান্ত নিকটে কোথাও বা বিশ্বসত্তার। এই বিচিত্র পর্য্যায়ের চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ এক 'তুমি' রূপে সম্বোধন করিয়াছেন, নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই সুপরিণত ধ্যান-লোকটিকেই কবি 'আনন্দ মূর্ত্তি', 'পরাণবল্লভ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অন্তরে কত দুর্লভ মুহূর্ত্তে অসীমের স্পর্শ আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

সাধারণ মানুষের জীবনে এই ধ্যান বা অধ্যাত্ম-লোকটি একপ্রকার সুপ্ত থাকে। তাহাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি আনন্দ-বেদনার সমষ্টি মাত্র।

জাগতিক আনন্দ-বেদনার ঊর্দ্ধে যাঁহাদের অন্তরে ধ্যান-লোকের প্রকাশ ঘটে তাঁহারাই অমরতা লাভ করেন। এই অধ্যাত্ম-সত্তা বা ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের অন্তর অসীমের প্রসাদ লাভ করে। অমরতার স্পর্শ লাভ করিয়া তাঁহারাও অমর হইয়া যান।

কবি যদি ওই ধ্যান-লোকে নিমগ্ন থাকিতে পারেন, যদি তাহার ভিতর দিয়া প্রার্থিত মুহূর্ত্তে অরূপ বা অসীমের আভাস লাভ করিতে পান, তবে জন্ম মৃত্যুর প্রাপ্তি ও বিনষ্টির কোন ভয় তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। ইহারই উপলব্ধির ভিতর দিয়া কবি আপনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবেন, যে পরিচয় সকল জন্ম, সকল মৃত্যুকে ছাড়াইয়া অসীমে পরিব্যাপ্ত। জীবনে ভয় নাই, কারণ অসীমের সহিত

তাঁহার সীমা নিত্য যুক্ত। 'মৃত্যু' বা বিনষ্টিতে ভয় নাই, কারণ অরূপের যোগে যাহার প্রকাশ, অরূপের মধ্যে তাহার বিলয়, আবার ভিন্নরূপে তাহার আবির্ভাব।

এই ধ্যান-লোক অমন পরিপূর্ণ, সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া উহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার একটি প্রবল প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ বোধ করিয়াছেন। সর্ব্বস্ব সমর্পণের এই দুর্নিবার প্রেরণার মধ্যে কোন্ রহস্য নিহিত।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।" (উৎসর্গ)

এই ফল গুলি যে কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহা আমরা জানি, কিন্তু কাহাকে তিনি এই সমস্ত ফল অর্ঘ্য-রূপে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছেন?

যেখানে তিনি বলিতেছেন—

"তব ওষ্ঠে দশন দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।" (উৎসর্গ)

সেখানে এই 'তুমি' কে? ইহারই স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিযাছি।

ঊর্দ্ধতর চেতনার সহিত মিলন যত গভীর করিযা অনুভূত হইয়াছে, কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যান তত সমৃদ্ধ হইয়াছে। অন্যদিক দিযা বলা যায়, ওই সৌন্দর্য্য-ধ্যান যত সমৃদ্ধ হইযাছে, অনন্তের প্রেরণা কবির অন্তরে তত অধিক পরিমাণে অনুভূত হইযাছে। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের সকল ফলকে কবি তাই অনন্তের পদতলে সমর্পণ করিযাছেন। যাহা কিছু অনন্তের প্রেরণা জাত, তাহা অনন্তে বিলীন হইয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

সৌন্দর্য্য-ধ্যান যেখানে কেবল সৌন্দর্য্য-ধ্যান মাত্রেরই রহিয়া যায়, সেখানে মানব মনের মুক্তি ঘটে না। সেই রূপ-ধ্যান সেখানে বন্ধন স্বরূপ। রূপ কেবল নিঃসীম পিপাসার উদ্রেক করে। রূপের ভিতর দিয়া অন্তরে যখন অসীমের প্রসাদ আসিযা পৌঁছায়, পূর্ণ ফলগুলি যখন টুটিয়া যায়, রূপ যখন অরূপে বিগলিত হয়, তখনই রূপ মানুষকে মুক্তি দেয়।

বিশ্বের সবকিছু দিয়াও আমরা অন্তরের শূণ্যতা পূর্ণ করিতে পারি না। ইহাতেই বুঝতে পারি, যে আমাদের নিশ্চয়ই এমন এক সত্তা আছে, যাহা বিশ্বোত্তীর্ণ, যাহা

সকল সীমা অতিক্রম করিয়া অসীম পরিব্যাপ্ত। উহাকে না লাভ করিতে পারিলে আমরা শান্তি পাই না, আমাদের অন্তরের শূণ্যতা অপূর্ণ রহিয়া যায়।

এই শূণ্যতা পূর্ণ করিতে আমরা বিশ্বে অন্বেষণ তৎপর হই। সব পাওয়া যখন ফুরাইয়া যায়, তখন ওই শূণ্যতাবোধেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করি। তখন অন্তর্জ্জগতে আর এক আলোক জ্বলিয়া উঠে, যে আলোকে অনন্তের পথ উদ্‌ভাসিত হইয়া যায়। মানুষ তখন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সব পরিহার করিয়া একাকী অন্তর্লোকে পথ চিনিয়া চলে।

"যদি তারে পাই তবে শুধু চাই
একখানি গৃহ কোন।" (আশার সীমা)

সকল প্রয়োজনের উর্দ্ধে মানুষের আর এক সত্তা আছে, সেই সত্তায় অনন্তের সহিত তাহার নিত্য যোগ। সাহিত্য মানুষের এই সত্তাটির পরিচয় দান করে। মানুষের বাইরের পরিচয় যত বড়ই হোক্-না-কেন, সাহিত্যে তাহা একান্ত গৌণ। খাঁটি সাহিত্য মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনের পরিচয় দান করে না। সীমার দিক হইতে মানুষ সহস্র প্রয়োজনে আবদ্ধ জাগতিক জীবন মাত্র। সে প্রকৃতির দাস, প্রকৃতি পরিচালিত। যে সত্তার ভিতর দিয়া মানুষ অনন্ত বা অসীমের স্পর্শ লাভ করে, তাহা তাহার অসীমের দিক। মানুষ এই সত্তাটিকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছে, তাহার সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান ততই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মধ্যে যেখানে শ্রেয়ের প্রকাশ, যেখানে তাহার স্নেহ ও মাধুর্য্য, যেখানে সে প্রেমে আত্ম ত্যাগ করে, নিম্নতর সকল প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া উঠিতে সংগ্রাম করে, সেখানে সাহিত্য।

'ঋতু সংহার' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-লোকের মধ্যে বিরাজিত দেখিয়াছেন সেই সৌন্দর্য্য-লোকের মধ্যে তিনিও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানে 'ত্রিভুবন, একখানি অন্তঃপুর বাসর ভবনে' পরিণত হইয়া যায়। জীব-জীবনের সকল দুঃখ দুর্দ্দশা ও মালিন্যের পরপারবর্ত্তী এই লোক।

এই সুন্দরী ধরণী, উর্দ্ধে নীলিমাময়ী শূন্যলোকের অপার বিস্তার, দাক্ষিণ্য ভারাবনত ষড় ঋতুর আবর্ত্তন, দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপ্ত আলোর প্রস্রবণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকেও সীমাহীন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে।

চেতনা যে পরিণাম লাভ করিলে, যে দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের অপার সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায় রবীন্দ্রনাথ কেবল সেই পরিণাম, সেই দৃষ্টি লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

যে সাধনা পাপ-পুণ্য, সুন্দর-অসুন্দর, মঙ্গল-অমঙ্গল, সকল দ্বন্দ্ববোধের ঊর্দ্ধে উঠিয়া একই চেতনাকে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখে, যে সাধনা এই উভয় স্বরূপকে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বলিয়া বোধ করে, যে সাধনায় সকল বিরোধাভাস আশ্চর্য্য উপায়ে সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি সেই সাধন ফল নহে। ইহা এক জাতীয় বিশিষ্ট সাধনা যাহাতে জীবনের অসুন্দর ভাগ আদৌ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। জীবনের কেবল এক দিক একান্ত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠে।

মনের সহায়তায় যেখানে জীবনের সমস্যা সমাধান করিতে হয়, সেখানে জগৎ ও জীবনের অখণ্ডতাকে দ্বিধা করিয়া যে-কোন-একটিকে স্বীকার করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কোন দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। ইহাতে অপূর্ণতা থাকিলেও তাঁহার সৃষ্টি একদিক দিয়া আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে জীবনের এক বিশিষ্ট পিপাসা অন্তহীন হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছে। —তাহা মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

ইহা জীবনের পূর্ণতার সাধনা নহে বলিয়া এই লোকের মধ্যে থাকিয়াও কবির অন্তরে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ হয় নাই।

'মানসী', 'নারী', 'প্রিয়া', 'ধ্যান', 'প্রেয়সী', 'কালিদাসের প্রতি', 'মানস-লোক', 'কাব্য' এবং 'প্রার্থনা' ও 'শুশ্রূষা' প্রভৃতি প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কবির এই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোকের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র মধ্য দিয়া ক্রম পরিণাম লাভ করিয়া 'চৈতালি'র মধ্যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

নারীর সৌন্দর্য্য পুরুষ চিত্তে প্রাণের উদ্বোধন ঘটায়। জাগ্রত প্রাণের ভিতর দিয়া পুরুষের অন্তরে ধীরে একটি অধ্যাত্ম-লোক গড়িয়া উঠে। এই অধ্যাত্ম-লোকটি আশ্রয় করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য কল্পনা একেবারে অন্তহীন হইয়া পড়ে। এই অন্তহীন সৌন্দর্য্য-লোকে পুরুষের অভিসার।

পুরুষ নারীকে এই ধ্যান-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে। বাস্তব নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সকল অপূর্ণতা পুরুষ আপনার ধ্যান দ্বারা পূর্ণ করিয়া লয়। পুরুষ চিরকাল ইহাই করিযাছে।

নারীও আপনাকে পুরুষের সৌন্দর্য্য-ধ্যানের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সৌন্দর্য্য-ধ্যান জাগ্রত করিয়া রাখিতে নারী বিচিত্র বিলাস-বিভ্রম, আগোচরতা এবং অন্তরাল সৃষ্টি করিযাছে। তাহা না হইলে বাস্তবের নিত্য সংস্পর্শে যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়।

"পুরুষ গড়েছে তোবে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।" (মানসী)

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-লোকের জন্য পুরুষের অন্তরে নিত্য ক্ষুধা। মর্ত্ত্যের নারীর অপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে অন্তরের প্রতিচ্ছবি রূপে গড়িয়া তুলিতে পুরুষের কত না প্রয়াস। ইহা পুরুষের স্থূল বাসনার পূজা নহে। পুরুষের সৌন্দর্য্য-ধ্যান, তাহার সৃষ্টি-প্রতিভা, মানবীকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতে চায়। এই একই ভাব সামান্য ভিন্ন স্বরূপে পরপর একাধিক কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

'মানসী'র মধ্যে পুরুষের সৌন্দর্য্য-ধ্যানে বাস্তব নারীর মূল্য কিছুটা স্বীকৃত হইলেও 'নারী'র মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকৃত হইয়াছে। যেন পুরুষের ধ্যান-লোক ছাড়া নারীর বাস্তব যে-কোন প্রকাশের কোন সত্য মূল্য নাই। নারী শুধু প্রতীক মাত্র। নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া পুরুষের ধ্যান-লোকের প্রকাশ। তাহার পর সেই সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নারীর বাস্তব পরিচয় ক্রমে গৌণ হইয়া যায়।

"তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।"

ওই ধ্যান-লোকে নারী রূপে যাহার প্রকাশ, তাহা তাহার সম্পূর্ণ ধ্যানের সৃষ্টি। বাহিরে তাহার কোন পরিচয় নাই।

নারীর সৌন্দর্য্য পুরুষের ধ্যানের সামগ্রী, তাই যে-কোন সৌন্দর্য্য-ধ্যানের সহিত উহা একাকার হইয়া যায়।

"মানসী রূপিণী তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য্য সাথে যাও মিলে মিশে।"

ধ্যানে পুরুষের সৌন্দর্য্য-লোক সীমাহীন হইয়া উঠে। পুরুষ বহির্জগতের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়া এই অসীম সৌন্দর্য্য-ধ্যানে ডুবিয়া যায়।

"তারপরে মন গড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।"

সৌন্দর্য্য-ধ্যান হোক, অথবা যে-কোন আদর্শ-প্রেরণা হোক তাহা অধ্যাত্ম স্বরূপ। অধ্যাত্ম-স্বরূপ বলিতে এমন একটি বিশেষ মানস-গঠনের কথা বলিয়াছি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে উর্দ্ধতর চেতনার আভাস নানা স্বরূপে আসিয়া পৌঁছায়। যে-কোন স্বরূপে হোক, এই নিঃসংশয় উপলব্ধি ঘটে বলিয়া মানুষ আপনার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী, অথবা কোন আদর্শ প্রেরণায় প্রাণ দেয়, উহারই জন্য যে-কোন প্রলোভনকে অবহেলায় জয় করিয়া উঠে।

আদর্শ বা সৌন্দর্য্য-প্রেরণা মনগড়া সামগ্রী হইলে মানুষ এমন আশ্চর্য্য বিশ্বাস লাভ করিতে পারিত না। এই বিশ্বাসের বলে তাঁহারা এমনকি সমগ্র জগতের প্রতিকূলতা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। ইহার জন্য নিষ্ঠুরতম নির্য্যাতনকে হাসি মুখে বরণ করিয়া লয়।

ধ্যান বা আদর্শের স্বরূপ বিচার আমরা দুই দিক হইতে করিতে পারি। সীমার দিক হইতে সৌন্দর্য্য-ধ্যান, যে-কোন আদর্শ প্রেরণা, বস্তুরই পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। অসীমের দিক হইতে বোধ হয় অসীমই নিম্নতর চেতনা-লোকে লীলায়িত হইবার জন্য আমাদের প্রকৃতি ও মানস-গঠন অনুযায়ী একটি আদর্শ-লোক গড়িয়া তুলে। বস্তুতঃ এক অনন্ত স্বরূপই উভয় প্রেরণা রূপে অনুভূত হয়। মানুষ যখন আদর্শের জন্য প্রাণ দেয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে উহা কোন-একটা-স্বরূপে অনন্তের আভাস লাভ করিয়াছে। কেবল মন গড়া তত্ত্বে মানুষ এমন বিশ্বাসবোধ লাভ করে না; মৃত্যুটা বড় কথা নয়, তাহার অমন আত্মত্যাগ, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন, অমন নিঃশঙ্কতা। কেবল ইহাই নহে, মন গড়া তত্ত্বে মানুষ কখন তাহার প্রতি-মুহূর্ত্তের জীবনকে উহারই অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিত না। মানস-সৃষ্ট কোন তত্ত্ব এই রূপে সমগ্র জীবনকে ধারণ করিতে পারে না।

নারীর বিশিষ্ট রূপ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের গোপন লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। অর্থাৎ প্রেমে যে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, উহাকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্ব-চেতনার আভাস লাভ করে।

অন্তরে ধ্যান-লোকের প্রকাশ যতদিন না ঘটে ততদিন বিশ্বের অপরূপ রূপও ধরা পড়ে না। নারীর সৌন্দর্য্য পুরুষের অন্তরে ওই ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলে।

"তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।" (প্রিয়া)

বস্তুতঃ প্রেমে এই রূপ বা বিগ্রহ-তত্ত্বটিকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান-তন্ময় মুহূর্ত্তে বহির্বিশ্ব ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া যায়। পুরুষ দেহ বোধ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। এক অনন্ত প্রসারিত জ্যোতি সমুদ্রে ধ্যানের পদ্মটি পূর্ণ বিকশিত হইয়া ভাসিতে থাকে। আর এক চেতানায় পুরুষ ওই দিব্য রূপ প্রত্যক্ষ করে। মনে হয়

"যেন এ জগৎ নাহি, নাহি কিছু আর,
যেন শুধু আছে এক মহা পারাপার।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।"

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া মানুষ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অমর্ত্ত্য-লোকের আভাস লাভ করে, অথবা অমর্ত্ত্য-লোক ধ্যান আশ্রয় করিয়া আপনাকে পুরুষের চিত্তগোচর করে।

"নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম প্রতিরূপ।" (ধ্যান)

যখন ওই জাগ্রত অধ্যাত্ম সত্তার ভিতর দিয়া অনন্তের আনন্দ আস্বাদ জীবনে নামে তখন জগৎ ও জীবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মের ধ্যান-স্বরূপ। বিশ্ব-বিকাশের পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে তাঁহারই ধ্যান একটির পর একটি দল মেলিয়া চলিয়াছে।

ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ। এই বিসৃষ্টি তাঁহার ধ্যান। উহা কখন বীজ রূপে সুপ্ত, আবার কখন বিকশিত পদ্মের মত পূর্ণ বিকশিত। অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া এই সুপ্তি ও জাগরণের লীলা চলিতেছে।

এই ধ্যানে তিনি আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনাকে আপনি দ্বিধা করিয়া লীলা করিতেছেন। মানুষের ধ্যানেরও এই এক স্বরূপ। মানুষ যে ব্রহ্মের বিন্দুরূপে পূর্ণ প্রকাশ।

কবিরা জীবনের মালিন্য ও দুঃখ বোধের উর্দ্ধে এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানে ডুবিয়া থাকেন। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া অনন্তের সহিত তাঁহারা নিত্য যোগ যুক্ত।

সাহিত্যে মানুষের এই অপর সত্তার এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনারও অতীত অনন্ত স্বরূপের যদি প্রকাশ ঘটে তবে সেই সাহিত্য অমর।

কালিদাস এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন তাঁহার কাব্যে তাঁহার এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের প্রকাশ। তাঁহার কালের ঐশ্বর্য্য প্রতাপ বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ধ্যান-লোক, তাঁহার কাব্য অমর হইয়া আছে। কালিদাস যদি তাঁহার কাব্যে জীবনের বিচিত্র পীড়া রূপায়িত করিতেন, তবে তাঁহার কাব্য কোন্ সত্তাকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইত ?

> "আজ মনে হয়
> ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
> অলকার অধিবাসী।"

এই অলকা কবির অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক। এই ধ্যান আশ্রয় করিয়া কবি প্রেম ও সৌন্দর্য্য লীলা সাক্ষাৎ করিতেন। জগৎ পরিপূরিত সৌন্দর্য্য ও প্রেম লীলা সাক্ষাৎকারে কবির চিত্ত যে বিস্ময় বিস্ফারিত হইয়া যাইত, সেই বিস্মিত মুহূর্ত্তে কবির কাব্য সৃষ্টি। "তুমি সেই ক্ষণে গাহিতে বন্দনা গান।" এই লীলা সাক্ষাৎকারের ফল লাভ আর কিছু নয় ওই সৌন্দর্য্যের প্রসাদ লাভ, গৌরীর কর্ণের বর্হ। তাহা জাগতিক কোন ফল লাভ নহে।

মানস-লোক কবিতাটির মধ্যে এই একই ভাব-প্রেরণার প্রকাশ। কবি যে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, সেখানে রোগ, শোক, জরা নাই, মৃত্যু নাই, মানুষের নিত্য ক্ষুব্ধ ঐশ্বর্য্য প্রতাপ ওই লোকটিকে স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না।

চিরস্থির আকাশের নিম্নে খণ্ড খণ্ড কত মেঘ ভাসিয়া চলে। তাহার কত রূপ কত চঞ্চলতা। আকাশের কোথাও তো তাহার চিহ্ন মাত্র থাকে না।

দিব্য-চেতনা লোকে যে মিলন সেখানে বিশেষের কোন রস প্রেরণা নাই। বিশেষের অনুভূতি লোকে মন সর্ব্ববৃহৎ মিলন ভূমি। এই মানস-লোক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-লোক। যেখানে কবি বলিতেছেন, আজিও মানস-ধামে করিছ বসতি,

সেখানে কবি সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল পরিব্যাপ্ত এই মানস-লোকের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

জীব জীবনের সকল দশা কালিদাসকেও যে ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই, তবে সেই জীব-দশার বিষয়কে তিনি কাব্যের বিষয় করেন নাই। তিনি জানিতেন জীবনের এই পরিচয় স্থায়ী নয়, তাই সত্যও নয়। মানুষের ইহা সীমার দিক, তাহার ক্ষুদ্রতার দিক। যে পরিচয়ে সে বৃহৎ, যে পরিচয় সূত্রে সে অসীমের সহিত যুক্ত সাহিত্য সেই পরিচয় দান করিয়া অমরতা লাভ করে।

জীব-জীবনের সকল দশার ঊর্দ্ধে মানুষের শাশ্বত অধ্যাত্ম-বোধের দিকে কালিদাসের স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কালিদাসের কাব্যে এই স্থির অধ্যাত্ম-দৃষ্টির প্রকাশ। সাধারণ জীবনে এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি বিচলিত হইয়া যায়। কালিদাসের কাব্য মানুষের অচঞ্চল ধ্যান-লোকের পরিচয় বহন করিয়া আছে।

"তার কোন ঠাঁই

দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দিনের কোন চিহ্ন নাই।" (কাব্য)

জীবনের সহস্র বঞ্চনা, দারুণতম ক্ষতির মধ্যবর্ত্তী হইয়াও যদি এই ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন তবে কবি ধন্য বোধ করিবেন। এই সৌন্দর্য্য-লোক হইতে ভ্রষ্ট হইবার মত বঞ্চনা মানুষের জীবনে আর কিছু নাই। তাই মানুষ উহাকে লাভ করিতে চাহিয়া, উহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বাধিক লাঞ্ছনা ও দুঃখ ভোগ বরণ করে। এই অধ্যাত্ম-লোকটিকে লাভ করিয়াই কবি আজ নিঃশঙ্ক বোধ করিতেছেন।

আমি 'চৈতালি' কাব্যকে কবির মানস বা ধ্যান-লোকের কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি কবিতার পরিচয় দান করিলাম তাহাতে আশা করি এই অভিমত সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যাইবে।

কবি এতদিন ধ্যান-লোকে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবার সেই ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিয়া সুপরিণত সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে ফসল ফলাইয়াছেন 'চৈতালি'র মধ্যে কবি তাহাকে অঞ্জলি ভরিয়া দান করিয়াছেন। 'চৈতালি' নাম করণের সার্থকতা এইখানে।

সমস্ত কিছু হইতে মুক্ত করিয়া দেশ-কালের সীমাহীন প্রসারের মাঝখানে একটি জীবনের ধীর বিকাশ ও তাহার বিনষ্টির সাক্ষাৎকার যে কী অপার বিস্ময় সৃষ্টি করে

তাহা আমরা জানি না। যেন মৃত্যুর কৃষ্ণ-নীল নিস্তরঙ্গ সায়রের বুকে কমল-কলিকার মত একটির পর একটি সৌন্দর্য্য-দল বিকশিত করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ভরে টলমল করিতে থাকে। তাহার পর আবার একে একে সমস্ত দল ঝরাইয়া দিয়া কোথায় হারাইয়া যায়। সেই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যের লেশ মাত্র কোথাও আর দৃষ্ট হয় না।

যাহা কিছু একান্ত পরিচিত বলিয়া বোধ হয়; যাহা একান্ত সাধারণ, যাহার মধ্যে বিস্ময়ের লেশমাত্র নাই, সাহিত্যে তাহাই কোন্ যাদু স্পর্শে একান্ত নূতন, অপার বিস্ময় রস পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ইহা কবির সেই বোধ জাত, যে বোধ লাভ করিলে অনন্ত দেশ-কালের মাঝখানে একটি জীবনের প্রকাশকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া অখণ্ড রূপে সাক্ষাৎ করা যায়। 'সামান্য লোক' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

মৃত্যুর চেতনা বক্ষে লইয়া জীবন সাক্ষাৎকারের অর্থ আর কিছু নয়, অনন্ত বা অসীমের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন সাক্ষাৎ করা, অসীমের যোগে সীমার লীলা রস সম্ভোগ করা। এই সাক্ষাৎকারে কবির চিত্ত বিস্ময় বিস্ফারিত।

"যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।"

মৃত্যু জীবনের ক্ষণ স্থায়ী বোধ জাগ্রত করে : এই উপলব্ধিতে তাই আমাদের সমগ্র সত্তা (সাধারণ অবস্থায় ইহা স্তিমিত, আচ্ছন্ন থাকে) ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন উন্মুখ হইয়া উঠে। এমনি করিয়া নিদারুণ বিয়োগ-বিচ্ছেদের অগ্নি-দাহে আমাদের চেতনা জাগ্রত করিতে হয়। তখন প্রাত্যহিক জীবন ও জগতের অপরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাস ছিল, যে জীবন উর্দ্ধের অনন্ত রহস্যকে স্বীকার না করিলে জীবনও জগতের অপরূপ সৌন্দর্য্য কোনরূপেই প্রতিভাত হইবে না। মৃত্যুর রহস্য এবং বিস্ময়বোধ না থাকিলে এই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-সাক্ষাৎকার ঘটে না বলিয়া উহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে তিনি কোন কালেই সচেষ্ট ছিলেন না। জীবনের উর্দ্ধতর যে কোন তত্ত্বের প্রতি, তাহার স্বরূপ যেমনই হোক, রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

জীবন ঊর্দ্ধের তত্ত্বকে মানুষ যে স্বরূপে প্রত্যক্ষ করুক-না-কেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, ওই তত্ত্ব দৃষ্টি লাভ করিলে জীবনের আর কোন স্বরূপ হয়ত প্রকাশিত হইবে, কিন্তু অপূর্ণতা বোধে জীবনের যে বিশিষ্ট রস-রূপের প্রকাশ ঘটে, তাহাকে আর লাভ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই রসটিকেই আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন।

জীবন ঊর্দ্ধে তাহার অতীত লোকে জীবনের যে পরিণাম তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছিল। এই জন্য জীবন ও জগৎ তাঁহার নিকট চিরকাল অমন রহস্য মণ্ডিত থাকিয়া যায়।

জীবন তো এক বিচ্ছিন্ন সত্তা মাত্র নয়, তাহার একদিকে অনন্ত অতীত এবং অপর দিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ এই উভয় দিকের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার অসীম পরিচয়। এই মর্ত্ত্য-জীবন সেই অসীম সত্তার ক্ষীণতম প্রকাশ। জীবন এমনি মহাবিস্ময়ের। কেবল কি তাই। জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী বিকাশেরও কতটুকু আভাস আমরা লাভ করি। একটি মানুষের কাছে আর একটি মানুষ অনন্ত বিস্ময় লইয়া প্রতিভাত হয়।

"পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।"

এই অনন্ত বিশ্বে মৃত্যুর পরপারবর্ত্তী অনন্ত জগতে এই প্রিয়জন হারাইয়া গেলে তাহাকে আর ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। জীবন সাক্ষাৎকারের পশ্চাতে এমনি চির অপরিচিত অনন্ত রহস্যময়তার প্রেরণা আছে বলিয়াই জীবন এত সুন্দর, এমনি সুদুর্লভ। ওই অতি তীব্র পিপাসায় জীবনের ঐশ্বর্য্য অফুরন্ত হইয়া ধরা পড়ে।

ক্ষণিকতা বোধ যেমন জীবনের ঐশ্বর্য্যকে সীমাহীন করিয়া দেয়, তেমনি এই বোধই আবার আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনা জাগ্রত করিয়া সান্ত্বনাহীন বিক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়। জীবনের এই স্বরূপ।

"এ ক্ষণ মিলনে তবে ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।" (কাব্য)

বলিয়াছি, জীবনের অতীত ভবিষ্যতের কোন তত্ত্ব কোন স্বরূপেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে চাহেন নাই। জীবন ঘিরিয়া অন্তহীন রহস্যকে তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অন্তরে এই রহস্যকে যত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন, জীবন ও জগৎ

তাহারই পটভূমিকায় তত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের মহাবিস্ময়-রসের সাধনা রবীন্দ্রনাথের সাধনা বলিয়া তত্ত্বকে আর যে কোন ফল লাভের জন্য তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এই প্রেরণায় জীবন ও জগতের যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ঘটে মানুষ কোন দিন তাহাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারিবে না।

জীবনের উর্দ্ধে যাঁহারা উঠিতে চান (ইহা রবীন্দ্রনাথের অভিমত) তাঁহাদের নিকট জীবনের অনন্ত স্বরূপতা ধরা পড়ে নাই। জীবনকে নিঃশেষে লাভ করিতে পারিলে তো জীবনের অতীত সত্তা লাভের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু জীবনকে যে অমন করিয়া শেষ করিয়া দিবার কোন উপায় নাই।

যে তত্ত্বে জীবনকে অনন্ত সৌন্দর্য্য-বিস্ময় বিজড়িত, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মর্ম্মমূলে এই তত্ত্ব রহিয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না।

নীল আকাশের মধ্যস্থলে এই শ্যামলা ধরণী। আকাশ ও মর্ত্ত্য-লোকের মহাশূন্য লোক পূর্ণ করিয়া আলোর বন্যা নিঃশব্দে বহিয়া চলিযাছে। এই সৌন্দর্য্য রহস্যের কি অন্ত আছে! আর তাহার কূল-হারা মহাসমুদ্রের প্রসারিত নীল জলের কী অপার মহিমা।—শত তরঙ্গের বাহু তুলিয়া তটে তটে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া গুমরাইয়া মরিয়া যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া কোন মহা বেদনা ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রে-নক্ষত্রে আলোর স্পন্দন, সুরের সুরধুনী দিক-হারা হইয়া শূন্য হইতে শূন্যে নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিযাছে। মহাশূন্যে সংখ্যাতীত গ্রহ-লোকের কক্ষা-বর্ত্তনের মধ্যে যে নৃত্য স্পন্দ, তাহার মহান রূপের কতটুকু প্রকাশ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এই রূপের সীমা কি মন কখন লাভ করিতে পারে।

"এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্ত যদি মানি
তোমার অতল মাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।" (তত্ত্ব ও সৌন্দর্য)

কিংবা

"যার খুশি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।" (তত্ত্বজ্ঞানহীন)

'যাত্রী' কবিতাটির মধ্যে জীবনের এই অনন্ত স্বরূপতার পরিচয়ই কেবল নয়, কিংবা আনন্ত্যের বোধে জীবন সাক্ষাৎকারও নয় : অসীমের বোধ যদি অন্তরে থাকে তবে যে-কোন ঐকান্তিকতা হইতে জীবনকে যে তুলিয়া ধরিতে পারা যায় কবি সেই ভাবটি বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষণ যেমন সত্য, তেমনি সত্য অনন্ত। একমাত্র ক্ষণকে স্বীকার করিয়া অনন্তকে অস্বীকার করিলে ক্ষণিকের অপরূপ সৌন্দর্য্য দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবল তাহাই নহে, তাহা ক্রমে একান্ত হইয়া জীবনকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।

জীবনের ঊর্দ্ধলোকে জীবনের সকল স্মৃতিই যে হারাইয়া যায় এই বিশ্বাস বোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। এই বিশ্বাস বোধ ছিল বলিয়া জীবনকে তিনি এমন নিবিড় করিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন। আর এই আসক্তি বিজড়িত প্রেমে জীবনের সৌন্দর্য্য অফুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের এমন প্রেম, প্রেমে এমন উৎকণ্ঠা ও অধীরতা যে জীবন শেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে চিরকাল ব্যথা মথিত করিয়াছে। এই বেদনার কী শেষ আছে। মৃত্যুতে--

"কোথায় পশিবে সেথা কলরব তার
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো।" (যাত্রা)

এই আনন্ত্যের বোধ কিন্তু রূপাতীত কোন বোধ নয়। জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া জীবন রূপ হইতে রূপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথ অনন্ত স্বরূপ বলিতে এই জন্ম জন্মান্তরের কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই অনন্ত যাত্রার বোধটি যদি অন্তরে থাকে, তাহা হইলে কোন একটি বেদনা, এ কোন একটি স্খলন, দারুণতম অপরাধও একান্ত হইয়া জীবনকে বিনষ্ট করিয়া দেয় না। তখন এই বোধ থাকে যে সকল ব্যথা-বেদনা, বঞ্চনা, সকল স্খলন অপরাধের চেয়েও এই জীবন অনেক বড়। ইহারা একটি জীবনে যতবড় হইয়া দেখা দিক, অনন্ত জীবন যাত্রায় তাহাদের স্মৃতিমাত্রও একদিন থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিতাটির নাম মৃত্যু মাধুরী। মাধুর্য্য মৃত্যুর নয়। মৃত্যুর বোধ জীবনকে সেই অনন্তের পট ভূমিকায় সাক্ষাৎ করিবার ক্ষমতা দান করে বলিয়া জীবন এমন মাধুর্য্য পরিপূর্ণ

হইয়া উঠে। মৃত্যু বোধ জীবনকে অসীমের সহিত মিলিত করিয়া দেখিতে সহায়তা করে।

> "মনে হয়, যেন তব মিলন বিহনে
> অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্ব ভুবনে।" (মৃত্যুমাধুরী)

অসীমের সহিত মিলাইয়া জীবনের সব কিছুকে আমরা সাক্ষাৎ করিতে পারি না, তাহার কারণ ভীতিবোধ। ভীতিবোধ কিসের জন্য, না আমরা ভাবি যে এই সীমা হারাইয়া যাইবে। অনন্তের বোধ সীমাকে লুপ্ত করিয়া দেয় না তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ করে।

'চৈতালি'র মধ্যে দেখি একদিকে কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যানের সম্পূর্ণতা, এবং উহারই সীমা বোধে জীবন ও জগতের বিশিষ্ট রূপ সাক্ষাৎকার, পরিণামে উহাকে একটি দার্শনিক সত্যরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা।

বিশ্বের সহিত মিলন অনুভূতির পরিচয়ও চৈতালির মধ্যে লাভ করা যায়।

> "আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে,
> ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থানে
> বহুকাল পরে।"

দেশ-কালের উর্দ্ধতর চেতনা বিচিত্র পরিণাম স্বরূপে বহুবিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। তাই মানবীয় চেতনার স্বরূপ যাহাই হোক-না-কেন, তাহা দিব্য-চেতনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। পার্থক্য পরিণাম গত, প্রকৃতি গত নহে। মানবীয় চেতনা একটি পরিণামে দিব্য-চেতনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীদের নিকট কেবল মাত্র দেশ-কালের উর্দ্ধতর চেতনা সত্য। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে বলিয়াছেন, যে-সাধনা জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করে, মনুষ্য-চেতনাকে যে সাধনা স্বীকৃতি দান করে না, সে সাধনা জীবনে কেবল শূন্য পরিণাম আনয়ন করে। মানুষের মুক্তি বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া অনন্তে পরম ব্যাপ্তি লাভ করিবার মধ্যে।

'পুণ্যের হিসাব' কবিতাটির মধ্যে কবি বৈরাগ্যের অর্থাৎ জীবনকে অস্বীকার করিবার চেষ্টার মধ্যে কতবড় বঞ্চনা রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি আপনার জীবনের উপলব্ধ সত্যটিকেও প্রকাশ

করিয়াছেন। "যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।"-অর্থাৎ যে-কোন উন্নত বোধ ও আদর্শ বা ভাব-প্রেরণা আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা একটা পরিণামে অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে।

'বৈরাগ্য' কবিতাটির মধ্যে এই একই ভাব। এই উপলব্ধিটিই সত্য যে অনন্ত প্রেম মানবীয় প্রেমের মধ্যেও অভিব্যক্ত। মানবীয় প্রেমের মধ্যে অনন্ত প্রেম স্বরূপের সাক্ষাৎকারই পূর্ণ দৃষ্টি। বৈরাগ্যে এই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে বলিতেছেন—

"ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।" (ধরাতলে)

সে ক্ষেত্রে জীবনের এই প্রেমে, জগতের এই স্বরূপে সকল পরিণাম অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। পরিণাম স্বরূপে হোক, অথবা একমাত্র স্বরূপে হোক রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগৎকে যে পূর্ণ স্বীকৃতি দান করিয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দেশ-কালের মধ্যে মানবীয় চেতনার অভিব্যক্তি বা বিকাশ যতদূর হোক-না-কেন, তাহা প্রকৃতি তাড়িত। মানুষ পরিপূর্ণ রূপে আত্ম-চৈতন্য স্থিত হইতে পারে না বলিয়া আত্মকর্তৃত্ব শূন্য। মানবীয় চেতনার বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত বলিয়া কতকটা অন্ধকার-লোক।

"অন্ধকারে অভিসার, কোন পথ পানে
কার তরে পান্থ তাহা আপনি না জানে।" (প্রেম)

কোন অনাদিকাল হইতে আমরা চলিতে চলিতে আসিয়াছি। কত জন্ম কত জন্মান্তর কত রূপ-লোকের পর রূপ-লোক অতিক্রম করিয়া শুধু চলিয়াছি। সে চলা আজও শেষ হইয়া যায় নাই। মৃত্যুতে আবার কোন নূতন রূপে নূতন জগতে আমাদের পথ চলা সুরু হইবে। এই অবিরাম পথ চলার উদ্দেশ্য কি? এই চলার ভিতর দিয়া আমরা কি লাভ করিতেছি? এই পথ চলার কোথাও কি শেষ আছে? পথ চলার শেষে আমরা কাহার সহিত মিলিত হইব?

যে চেতনা এই প্রকৃতি-তাড়িত-লোকে মানুষকে উর্দ্ধগামী করিয়া তুলে, নিশ্চিৎ লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করে তাহাই প্রেম। নিম্নাভিমুখী চেতনার ক্রম সঙ্কোচন যেমন সত্য, তেমনি সত্য উর্দ্ধাভিমুখী শক্তির ক্রমবিকাশ। প্রেম এই উর্দ্ধাভিমুখী শক্তির একটি পর্য্যায়ের প্রকাশ।

প্রেমের সাধনা দেশ-কালের মধ্যগত সাধনা বলিয়া ইহাতে জীবন ও জগতের পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটিত হয় না। জীবন ও জগতের পূর্ণ সত্য উপলব্ধি হয় তখনই, যখন মানুষ মানবীয় চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। প্রেম এমনি করিয়া অনন্ত-মুখীন হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়। ভক্তি আবার পরিণামে দিব্য-চেতনায় একাকার হইয়া যায়। ইহাই পূর্ণ স্বরূপ লাভ।

আমাদের চেতনা কেবল একটি সীমা-লোককে উদ্ভাসিত করিতে পারে। এই সীমার বহির্ভূত নিখিল বিশ্বের কোন অস্তিত্বই অমাদের কাছে সত্য নহে।

> "অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে
> জানিতে পারিনে তাহা আছে কিনা আছে।" (প্রেম)

নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে দুটি ধারা রহিয়াছে। একটি রাত্রি, আর একটি দিন। একটির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যেন আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনে, আর একটির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি যেন আপনাকে প্রসারিত করে, যেন সৌন্দর্য্য-শতদল একটির পর একটি দল মেলিয়া দেয়। মানুষের জীবনেও একথা সত্য, অর্থাৎ তাহার মধ্যে যেমনি একটি বিস্তারের দিক আছে, তেমনি একটি সঙ্কোচনেরও দিক আছে। একটি প্রেরণায় তাহার সমগ্র বৃত্তি বহির্মুখীন হইয়া পড়ে, অন্য প্রেরণায় তাহার সমগ্র বহির্মুখী প্রেরণা অন্তর্মুখীন হয়। একটি তাহার কর্ম্মের, অপরটি তাহার ধ্যানের দিক। মানুষের জীবনে এই দুই দিকই সত্য। ইহাদের কোন একটি সত্তায় সে সম্পূর্ণ নয়।

নিখিল বিশ্বের এই তত্ত্ব প্রেমের মধ্যেও অভিব্যক্ত। একটি তাহার ধ্যানের দিক, নিভৃত একের দিক, অপরটি বিশ্ব যোগের দিক। জীবন ও জগতের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা রহিয়াছে। একই তত্ত্বে জীবন ও জগৎ বিধৃত।

যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসে, যখন জল-স্থল-অন্তরীক্ষের উপর কৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত হইয়া সমগ্র বৈচিত্র্য বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তখন নর-নারীর অন্তরে প্রেমের একটি নিভৃত ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। একটি প্রেমের পশ্চাতে সমগ্র বিশ্ব জগতের গূঢ় উদ্দেশ্য এমনি করিয়া সাধিত হয়।

একটি প্রেমের পশ্চাতে সমগ্র বিশ্বের এমনি একপ্রকার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের যোগ থাকে বলিয়া প্রেমোপলব্ধির মুহূর্ত্তে বিশ্ব-বীণায় যেন কম্পন জাগে। প্রেমে

মানবীয় চেতনার ছন্দের সহিত নিখিল বিশ্ব-চেতনার ছন্দ এক হইয়া মিলিয়া যায়।

"সেই ক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জ্জন
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।"

তাহার পর প্রভাত আসে। তখন এই ধ্যান-লোকটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। বিশ্ব-প্রকৃতি আপনাকে দিগ্বিদিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। নর-নারীর জীবনে তখন বিদায়ের লগ্নটি ঘনাইয়া আসে। তখন চেতনার বহির্মুখীনতা, কর্ম্ম, জীব-জীবনের প্রয়াস।

"মহাবনে সিংহদ্বার খুলে দিশ্ব পুরে,
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।" (শেষ চুম্বন)

এমনি নানা ভাবে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মানবীয় চেতনাশ্রয়ী বলিয়া জীবনের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়াই উপলব্ধি করুন-না-কেন তাহাতে সংশয় থাকিয়া যাইবে। 'চৈতালি'র মধ্যেও কবির সেই সংশয় বিজড়িত অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার পরিচয় রহিয়াছে। সেই চির পুরাতন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা—

"আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি।" (অজ্ঞাত বিশ্ব)

মৃত্যুর সকল রহস্য মুছিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের পরিণামকে কত-না মধুর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যেন তাহার মধ্যে ভয়ঙ্করতা, রহস্যময়তা বলিয়া কিছু নাই। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই অজ্ঞাত বোধ চিরকাল রহিয়া গিয়াছিল।

"আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়নে।" (স্মৃতি)

যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু শোক ভুলিতেন, সেই একই তত্ত্বের পরিচয় 'বিলয়' কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

একটি বিশেষ প্রাণ মৃত্যুতে অনন্ত প্রাণের সহিত মিশিয়া যায়। আবার সেই অনন্ত প্রাণ-ধারা হইতে সংখ্যাতীত নিত্য নূতন রূপের সৃষ্টি হয়। অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাণ-রূপে সেই বিশেষ প্রাণও রহিয়াছে।

ইহা হয়ত সত্য! কিন্তু এই উপলব্ধিতে প্রাণের ক্ষুধা মেটে না। মানুষের হাহাকার যে ওই বিশেষ রূপটির জন্য। মৃত্যুতে আর যে-কোন পরিণামে ওই রূপটিকে তো আর কোন প্রকারে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যাইবে না।

সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার—

"যেন তার আঁখি দুটি নব নীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আসি অসীম আকাশে।" (বিলয়)

প্রাণের যে ক্ষুধায় এই তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া পড়ে—

"শুধু তোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাত বায়ে
অনন্ত জগৎ মাঝে গিয়েছে হারায়ে।" (বিলয়)

একটি কণ্ঠস্বর অনন্ত কণ্ঠস্বরের সহিত হয়ত মিশিয়া রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের প্রেম যে ওই বিশেষ কণ্ঠস্বরটি শুনিতে চায়। প্রেমের এই রূপ-তৃষ্ণা কোন তত্ত্ব কোন দর্শন বুঝি পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।

ধ্যান-লোকটিকে বহির্বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার বিচিত্র চেষ্টা এবং বারংবার ব্যর্থতার যে পরিচয় আমরা এই কাব্যে লাভ করিয়াছি, সেই অধ্যাত্ম সংগ্রামের স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ধ্যানলোকে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ যত ব্যাপ্তি লাভ করুক-না-কেন, তাহা দেশ-কালের পরিসীমার অন্তর্গত বলিয়া সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। আবার সীমার বোধে মানুষের অতৃপ্তি বোধ থাকিবেই।

ধ্যান-লোকের সৌন্দর্য্যও মূলতঃ ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী। তাই কবি যখনই ধ্যান-লোকটিকে বহিঃসৌন্দর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ওই ধ্যান-লোকটিও ধীরে ধীরে বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। বারংবার চেষ্টার পর কবি পরিণামে ওই চেষ্টা পরিহার করিয়াছেন।

এই চেষ্টার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ কোন্ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন? ধ্যান-লোকে থাকিয়াও কবি যে অতৃপ্তি বোধ করিতেন, সেই অতৃপ্তি বোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি মর্ত্ত্যের বন্ধন অমন করিয়া ছিন্ন করিতে চাহিতেন। কবির অন্তরে এমনি একপ্রকার বোধ ছিল যে মর্ত্ত্যের বন্ধন ছিন্ন করিলে ধ্যান-লোকটি একপ্রকার মুক্তি-লোকে পরিণত হইয়া যাইবে।

ধ্যানলোকে সীমার পীড়াবোধ থাকিলেও তাহা সৌন্দর্য্য-বোধের এমন একটি

পরিণাম যেখানে রূপের পীড়া একান্ত ন্যূন হইয়া পড়ে। আবার অন্যদিকে অমর্ত্ত্য-চেতনার আভাস মানবীয় চেতনার এই পর্য্যায়ে সর্ব্বাধিক লাভ করা যায়। কবি যে ধ্যান-লোকটিকে মুক্তি-লোক স্বরূপে আশ্রয় করেন, ইহাই তাহার স্বরূপ।

মানবীয় চেতনা সীমাবদ্ধ বলিয়া নিখিল বিশ্ব এই ব্যক্তি চেতনায় যতটুকু ধরা পড়ে ততটুকুই আমাদের পরিচিত লোক, তাহার বাহিরের আর সমস্ত কিছু আমাদের অনুভব অগম্য বলিয়া অপরিচিত, অজ্ঞেয়, রহস্যাবৃত।

কবি মানবীয় চেতনাশ্রয়ী বলিয়া তাঁহার জীবন ও জগতের চতুর্দ্দিকে অমন চির রহস্য স্তব্ধ হইয়া আছে। ইহা না স্বীকার করিয়া উপায় নাই।

অসীম রহস্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া জীবন ও জগতের যে রূপ সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে, কয়েকটি কবিতায় আমরা তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি।

বিশিষ্ট ওই কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবি যে রস-তত্ত্ব বা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ওই সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য্যের পীড়া বোধ জয় করিয়া তুলিবার অজ্ঞাত চেষ্টা ছিল। সেই তত্ত্বগুলি আমি একে একে উপস্থাপিত করিয়াছি। ওই সমস্ত তত্ত্ব গড়িয়া তুলিবার পশ্চাতে কোন্ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ছিল, এক্ষেত্রে তাহাই বুঝিলে চলিবে।

জীবনের সমস্যা সমাধানের এমনি সহস্র প্রয়াসের পরিচয় কবির কাব্যে লাভ করিতে পারা যায়। এই অধ্যাত্ম প্রেরণার স্বরূপ বুঝিলে অজ্ঞেয়তা বোধের সহিত বিজড়িত হইয়া কবির বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা এবং রূপ বা বিগ্রহের জন্য অমন হাহাহার অমন সান্ত্বনা শূন্য বিক্ষোভের স্বরূপটিও বুঝিতে পারা যাইবে।

কল্পনা

চৈতালির মধ্যে কবির মানস-ধর্ম্মের তজ্জাত বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি, কল্পনার মধ্যে তাহারই বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

উর্দ্ধতর প্রেরণা লাভের জন্য কবির অন্তরে যে গূঢ়তর প্রেরণা ছিল, তাহা কোথাও একান্ত হইয়া কবিকে আকর্ষণ করিয়া ওই লোকে অনেকদূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

(ঊর্দ্ধতর চেতনালোকে যাত্রা বলিতে যে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া লইবার কোন উপায় নাই। কারণ ওই লোকের গতি-প্রকৃতি, উহার সকল ধর্ম্ম আমাদের মানস-ধর্ম্মের আমাদের বোধ ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত বলা যাইতে পারে।)

যে কালে জাগতিক চেতনার দীপ নিভিয়া গিয়াছে অথচ অমর্ত্ত্য-লোকের অম্লান জ্যোতি অন্তশ্চেতনায় তখনও উদ্ভাসিত হয় নাই এই পর্য্যায়ের একটি পরিচয় লাভ করা যায় 'দুঃসময়' কবিতাটির মধ্যে। জীবন পরিবর্ত্তনের পর্য্যায় যে কী দুঃসহ বেদনার তাহার কোন বোধই আমাদের নাই। এই বোধের জগৎকে পরিহার করা যে কতখানি, তাহা যে অন্তরকে কতদূর শূন্যময় করিয়া তুলে তাহার কোন পরিমাপ আমাদের জীবনে নাই। আমাদের জীবনে সে প্রেম কোথায়, যে প্রেমে এই জগৎ ও জীবন দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়, যে প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিয়া উঠিতে চায়। আবার সেই অমর্ত্ত্যের গূঢ়তর পিপাসার স্বরূপ কি যাহা এমন দুর্লভ জীবন ও জগৎকে এমন বেদনায়ও পরিহার করিয়া যায়। আমাদের জীবনে সেই সত্য প্রেম বা আসক্তি নাই, সে বৈরাগ্যও তাই অনুভূত হয় না। বস্তুতঃ উভয়েরই পশ্চাতে ক্রিয়া করে এক আদি প্রাণের প্রেরণা। আমাদের জীবনে সেই আদি প্রাণের প্রেরণা ক্ষীণ বলিয়া আসক্তি যেমন, অনাসক্তিও তেমনি ক্ষীণভাবে অনুভূত হয়।

মর্ত্ত্য-প্রেম সত্য ও সম্পূর্ণ না হইলে অমর্ত্ত্যের পিপাসা সত্য করিয়া জাগে না। এই পিপাসা আবার ওই প্রেমকে জয় করিয়া উঠে। সাধারণ মানুষের জীবনে মর্ত্ত্য-প্রেমের প্রকাশ যেমন, অমর্ত্ত্য-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষাও তেমনি অত্যন্ত ক্ষীণ।

জাগতিক সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধ যতদূর সমৃদ্ধি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইতিপূর্ব্বেই তাহা ঘটিয়াছে। এই পরিণামেও অন্তরের শূন্যতা বোধ অপূর্ণ রহিয়া যাইতে তিনি এই সমস্ত কিছু ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য অমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। যাহারা ওই পরিণাম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা জগতে একান্ত মুষ্টিমেয়, অধিকাংশই গত শক্তি হইয়া আবার সীমা-লোকে ফিরিয়া আসেন। অবশ্য এই অধিকাংশের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য।

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,—"

ইহা সেই মুহূর্ত্তের পরিচয় যে মুহূর্ত্তে মন ও বুদ্ধির দীপ নিভিয়া যায়। ইহাকেই কবি সব সঙ্গীতের নীরবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রূপের বৈচিত্র্যবোধ থাকে মানস-লোকে, এই চেতনা ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টার মুহূর্ত্তে সকল বৈচিত্র্যের উপর যেন এক ঘন কৃষ্ণ যবনিকা টানা হইয়া যায়।

এই অন্ধকার লোকে মানবীয় চেতনা পরম আশ্রয় লাভের নিঃসংশয় বিশ্বাস বক্ষে লইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়,—এক প্রকার অন্ধ আবেগের মত। ইহাকেই বলে ভক্তি। এই ভক্তির ভিতর দিয়া অন্তরের অন্ধকার-লোকে অনুসন্ধান চলিতে থাকে। কোথায় সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্য-লোক, মানুষের সকল সৌন্দর্য্য-পিপাসা যেখানে চরিতার্থ হইয়া যায়? সেই পরম আশ্রয়-লোক, যেখানে চেতনার পরম পরিণতি, পূর্ণ বিশ্রাম?

"কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয় শাখা!"

এই সর্ব্বব্যাপ্ত অন্ধকার লোকে চেতনা ঊর্দ্ধগামী হয় কেমন করিয়া? পথের ইঙ্গিত সে কেমন করিয়া লাভ করে? এই অন্ধকার লোকে মানুষ যে বিচিত্র নির্দ্দেশ বা ইঙ্গিত লাভ করে তাহার স্বরূপ ওই সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তেমনি একটি অধ্যাত্ম ইঙ্গিতকে কবি এমনি একটি রূপকের সহায়তায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দূর দিগন্তে বন শীর্ষের কৃষ্ণ রেখার ঊর্দ্ধে অবসন্ন ম্লান হাসির মত জাগিয়া উঠা একখণ্ড চাঁদ। যেন কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া অকূল অন্ধকার সাগর পার হইয়া উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধ চেতনা-লোকে ক্লান্ত ওই দীর্ঘ অভিসার এবং মাঝে মাঝে অবসন্ন চেতনায় প্রত্যয়ের বিদ্যুৎ স্ফুরণ,—তাহারই ব্যঞ্জনা।

"সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।"

বহিশ্চেতনা যখন স্তম্ভিত হইয়া যায় তখন অন্তঃস্থিত চেতনা আপনা আপনি ধীর পরিণাম লাভ করিয়া চলে। চিত্তের গভীরতম লোক হইতে যেন কার সকরুণ আহ্বান ধ্বনি সমুত্থিত হইতে থাকে।

"বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।"

যে স্বরূপেই হোক-না-কেন একদিন কবি মোহ ও আসক্তি বিজড়িত মর্ত্যের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকেই জীবনে পরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ অমর্ত্য-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা সত্য হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কিছু আরোপিত সকল মূল্যের সহিত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া মর্ত্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে, সকল আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে হয়। ঊর্দ্ধতর পরিণাম লাভ করিতে কবিকে যে আসক্তির সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহা নিশ্চিৎ। এই সংগ্রাম এবং তজ্জাত বেদনার আভাস—।

"ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।"

চেতনা যখন ঊর্দ্ধগামী হয়, তখন নিম্নতর লোকের অনুভূতি লোপ পায়; উহা তাই তখন মিথ্যা হইয়া উঠে। এমনি করিয়া চেতনা যতই ঊর্দ্ধতর লোক লাভ করিতে থাকে, ততই নিম্নতর চেতনার জগৎ মিথ্যা হইয়া উঠে।

"পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার।" (বিদায়)

কবি যখন মুহূর্ত্তের জন্য অমর্ত্য-লোকের আভাস লাভ করিয়াছেন, তখন আমিত্বের সকল মূল্যবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধতর চেতনায় ব্যক্তি আপনাকেই অনন্ত ব্যাপ্ত দেখে। বিশ্বে আপনাকে লীলায়িত দেখিলে জাগতিক সীমা বোধ, এই 'নীড়' বা 'আমি'র মুল্য বোধ আর থাকে না। শক্তির অপ্রমেয় লীলার দিক হইতে মর্ত্যের এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জীবন, তাহার বহুবিচিত্র প্রয়াস কত তুচ্ছ।

"বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!" (বিদায়)

আমরা ইতিপূর্ব্বে কবির দিব্য-চেতনা লাভের পরিচয় লাভ করিয়াছি। ইহার স্বরূপ বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, যে উহা প্রকৃত দিব্য-চেতনা নহে, মনের এক বিশিষ্ট ভাব পরিণাম। উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির মধ্যে যে লোকে কবি ওই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা যে প্রকৃত দিব্য-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে সংশয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে মিলন বোধের প্রত্যেক স্থলে রূপের বোধ এতটুকু আচ্ছন্ন হয় নাই।

এই একমাত্র ধর্ম্ম হইতে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়, যে ইহা মানস-লোকেরই এক বিশিষ্ট পরিণাম। দিব্য-চেতনায় রূপের বোধ থাকে না।

কল্পনার মধ্যে 'বিদায়' নামে আরও একটি কবিতা আছে। কবিতা দুইটির মধ্যে কেবল নাম সাম্যনয, ভাব সাম্যও লক্ষিত হয়।

মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য-লোকের মধ্যে একটি অলৌকিক অন্ধকারের পর্য্যায় আছে। 'দুঃসময' কবিতাটির মধ্যে কবি তাহারই পরিচয দান করিয়াছেন।

এই মানস-অভিসার প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। কবি সেই জ্যোতির্লোকের উপান্তে উপনীত হইযাছেন। এই উভয় লোকের সংযোগ সীমার উপর দাঁড়াইয়া তিনি এক দিকে মর্ত্ত্য এবং অন্যদিকে দিব্য-চেতনা এই উভয় লোকের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার পরিচয বর্ত্তমান কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের নিকট মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য-চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক নয, একটি অপরটির অনিবার্য্য স্বাভাবিক পরিণাম। যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার মধ্যে এই পরিণামের স্বরূপ নির্দ্দেশের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

"মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদেব ভয়—
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হতে গাতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলা শ্রান্তি'
বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।" (বিদায়)

আমাদের কোন কর্ম্ম, কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-ভাবনা নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায় না। ওই সমস্ত কিছু সূক্ষ্ম ভাব রূপে অন্তরে থাকিয়া যায়। প্রাণের সকল অনুভূতি এই রূপে ধ্যানে ভাব স্বরূপতা লাভ করে। প্রত্যক্ষ আনন্দবোধ ধ্যানে ভাব-সম্ভোগে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষ বেদনা ওই লোকে অলৌকিক বেদনায় রূপান্তরিত হয়। নিম্নতর চেতনার বিচিত্র বাসনা বিক্ষোভ ধ্যান-লোকে শান্ত হইয়া যায়।

সৃষ্টি প্রত্যক্ষ আনন্দ বা বেদনা বোধ জাত নহে। প্রাণের বিক্ষোভ হইতেও সৃষ্টি হয় না। প্রত্যক্ষ আনন্দ-বেদনা, বাসনা-বিক্ষোভকে মানুষ যখন ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে তখনই মানুষ সৃষ্টি-প্রেরণা বোধ করে। সৃষ্টির জন্য যে সামগ্রিক, অনাসক্ত দৃষ্টি প্রয়োজন তাহা নিম্নতর চেতনা-লোকে লাভ করা অসম্ভব।

যদি আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল বাসনা ধ্যান-লোকে ভাবরূপে বিরাজ করে, তবে একথাও সেই সঙ্গে সত্য হইয়া উঠে যে মৃত্যুতে আমাদের সমগ্র সত্তা সূক্ষ্মতর কোন ভাব রূপে বিরাজ করে। এমনি করিয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আশ্রয় করিয়া মানুষ লীলা করিয়া চলে; এক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সাধনা সব কিছু অন্য জীবনে বহিয়া লইয়া যায়।

প্রাণ-লোক হইতে ধ্যানে যেমন একটি ধীর পরিণাম আছে, ধ্যান-লোক হইতে বাসনা-লোকে তেমনি একটি ধীর পরিণাম আছে। এই বাসনা-লোক জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করে। দিব্য-চেতনা কি এই বাসনা-লোকের সূক্ষ্মতর উন্নততর কোন পরিণাম ?

ধ্যান-লোক বা তাহার উর্দ্ধতর সূক্ষ্ম বাসনা-লোক যে-কোন স্বরূপে রূপ-লোক বলিযাই জন্ম হইতে জন্মান্তরে রূপ পরিগ্রহ করে। দিব্য-চেতনা রূপের যে-কোন বোধ বহির্ভূত চেতনা, উহা বাসনা-লোকের সূক্ষ্মতর পরিণাম নহে। বাসনা-লোকের সহিত দিব্য-চেতনার একটা মিল কোন-না-কোন স্বরূপে আছেই। তবে উহা একটির উন্নততর বা নিম্নতর পরিণাম নহে। ইহা মায়াবাদীদের মত। উভয়ের সম্পর্কে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অরূপ বা অসীম কোন একটি উপায়ে রূপে রূপে অনন্ত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।

উর্দ্ধাভিসারের পরিচয় 'অসময়' কবিতাটির মধ্যেও লাভ করা যায়। যে পথ আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনাকে উর্দ্ধাভিসার করিতে হয়, তাহা অন্তরের পথ বলিয়া তাহার যে-কোন পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। আমরা পথ অন্বেষণ করি বুদ্ধির আলোকে। এখানে সেই আলোক নিভিয়া যায়।

এই লোকে যাঁহারা পথ চলেন, তাঁহারা এমন কতকগুলি নিঃসংশয় নির্দ্দেশ লাভ করেন, যাহার ফলে ওই যাত্রা সম্পর্কে তাঁহাদের আর দ্বিধা থাকে না। ইহা তো

বুদ্ধি লব্ধ তত্ত্ব নহে, যোগের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার, মানুষের ভাবে বা ভাষায় তাই ইহাকে বুঝিয়া লইবার কোন উপায় নাই।

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি ইঙ্গিত ভাসিয়া উঠে, কবি সেই ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া পথ চলেন। ওই ইঙ্গিত স্থলে পৌঁছাইয়া কবির বোধ হয় বুঝি তাহার অভীষ্ট লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে আর এক পথ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, যাত্রার আর একটি ইঙ্গিত। অসীম এই যাত্রা পথ।

"ফুরালো কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি?" (অসময়)

কবি বারংবার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন, বারংবার তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়।

"ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে? (অসময়)

মর্ত্ত্য-লোক অতিক্রম করিয়া কবির এই যে ক্রমিক উর্দ্ধাভিসার, তাহার জন্য কবিকে কি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে সংগ্রাম করিতে হয় নাই।

বস্তুতঃ কবি যে জীবন ও জগৎকে তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে উর্দ্ধস্থিত সকল চেতনার লীলাভূমি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এক্ষেত্রে ওই উর্দ্ধ পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়া কবি এই জীবন ও জগতের সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছেন। উহা এমনি অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছে।

"বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,
যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া।" (অসময়)

'দুঃসময়', 'বিদায়' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে আমরা কবি-চেতনার উর্দ্ধাভিসার লক্ষ্য করিয়াছি।

কবির যে অধ্যাত্ম বা ধ্যানের জগৎ অমর্ত্ত্যের চেতনা স্পর্শে প্রায় বিগলিত হইয়া যাইতেছিল, সেই অধ্যাত্ম জগতের এবং ওই ভাবাবস্থার একটি অস্পষ্ট আভাস নিম্নের পংক্তি কয়েকটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

"গাঢ় সে তিমিরে তলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।" (অশেষ)

ধ্যানের অন্ধকার লোক বিদীর্ণ করিয়া তখনও জ্যোতির কুসুম ফুটিয়া উঠে নাই। হয়ত আসন্ন প্রভাতের একটা নিঃসাড় আয়োজন অন্ধকারের বক্ষে নিঃশব্দে চলিতেছিল।

তখন একটি অতি প্রবল নিম্নাভিমুখী ইচ্ছা-শক্তির আকর্ষণে তিনি ধ্যানাসন পরিহার করিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন।

"বহিল বহিল তবে আমাব আপন সবে
আমাব নিবালা।
* * *
বাত্রি মোর, শান্তি মোব, বহিল স্বপ্নেব ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ—।" (অশেষ)

'দুঃসময়' 'বিদায', 'অসময', 'অশেষ' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি-জীবনের স্পষ্ট দুটি পর্য্যায় লক্ষ্য করা যায। এই দুটি পর্য্যাযকে আমি দুটি চেতনার (ঊর্দ্ধতর ও নিম্নতর) সঙ্ঘাত রূপে ব্যাখ্যা করিযাছি। নিম্নতর চেতনা পর্য্যাযকে অতিক্রম করিয়া কবি তাহার ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এই দুটি পর্য্যায়েব কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দ্দেশেরও চেষ্টা করিযাছি। কবি স্বয়ং এই দুটি পর্য্যায়ের কতকটা ভিন্ন স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মাধুর্য্য-লোক হইতে বাস্তব জগৎ ও জীবনের শক্তির বিচিত্র নিরাভরণ প্রকাশ-লোকে উত্তরণ।

'আমার ধর্ম্ম' প্রবন্ধে 'অশেষ' ও 'বর্ষশেষ' কবিতা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

"এর ('এবার ফিরাও মোরে' রচনার) পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সঙ্ঘাত যে কেবল আরামের কেবল মাধুর্য্যের তা নয। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয। * * * এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্ম্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রস সম্ভোগের কুঞ্জ কাননে নয।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্ম্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য্য আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিছিন্ন করে বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানব লোকে রুদ্র বেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার

'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।" (সবুজ পত্র। আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৫)

একদিকে ব্যক্তি-সত্তা 'আছি', আর অন্যদিকে বিশ্ব-সত্তা 'আছে'। এই উভয়ের সহিত মিলন যতই গভীর, এই রূপে দুটি সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য যতই সাধিত হইতে থাকে; অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার যতই বিকাশ, ব্যক্তি-চেতনা যতই উন্নতর পরিণাম লাভ করিতে থাকে সৃষ্টি-প্রেরণা ততই গভীর ভাবে অনুভূত হয়। বিশ্ব-সত্তাকে অখণ্ড সঙ্গীত, বাণী, রূপ বা আকার, ভাব বা শক্তির স্পন্দন রূপে বোধ করা যায়। কবি বিশ্বসত্তাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছেন, কবির সৃষ্টির মধ্যে এই প্রত্যেকটি দিকের প্রকাশই শুধু নয়, ওই সকল প্রকাশ আবার ধীরে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সঙ্গীত বা ছন্দ, বাণী, রূপ বা আকার, ভাব-ভাবনা শক্তি স্পন্দন আবার অলৌকিক ভাবে অখণ্ডতা লাভ করিতেছে। যে রহস্যে নিখিল বিশ্বে বিরোধ নাই, সেই রহস্যে কবির সৃষ্টির মধ্যে সকল বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে।

এই বিশ্ব-সত্তার বোধ কবি-জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে এক একটি বিশিষ্ট দিক আশ্রয় করিয়া একান্ত রূপে প্রকাশ লাভ করিলেও অন্যান্য দিকগুলিরও অনিবার্য্য রূপে প্রকাশ ঘটিয়াছে। কারণ বিশ্ব-সত্তায় কোন বোধের মধ্যে একান্ত বিচ্ছেদ নাই।

এক্ষেত্রে তাই কবি-জীবনের দুটি পর্য্যায়কে নিম্নতর হইতে উর্দ্ধতর চেতনায় বিশ্ব-সত্তার গভীর হইতে গভীরতর লোকে নিমজ্জন বা উত্তরণ বলিয়া বোধ করিলে তবেই সামগ্রিক ভাবে কবির কাব্য বিচার করা সম্ভব হইবে।

আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি, যে অমর্ত্ত্য-চেতনা লাভের জন্য কবি যতই, যতরূপে চেষ্টা করুন-না-কেন, তিনি জাগতিক বোধকে কোন রূপে বিচলিত হইতে দেন নাই। অমর্ত্ত্য চেতনা লাভের সাধনায় যখনই মর্ত্ত্য-চেতনা কিছুমাত্র বিচলিত হইতে চলিয়াছে, তখনই তিনি ওই পথ পরিহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-কাব্যের একেবারে আদি হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, অমর্ত্ত্য-চেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কোনদিন ক্ষীণতম ভাবেও সংশয় জাগে নাই।

রবীন্দ্র-মানসে একদিকে এই অমর্ত্ত্য-চেতনা সম্পর্কে নিঃসংশয় বোধ, অন্যদিকে জগৎ ও জীবনের পূর্ণ স্বীকৃতি,—এই উভয় ধারা একত্রে মিলিত হইয়া আছে।

উভয়ের মধ্যে যে একটি মিলন তত্ত্ব আছে, এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। এই বিশ্বাসও কোন মুহূর্তে বিচলিত হয় নাই। এই মিলন তত্ত্বে স্থির বিশ্বাস রাখিয়া (রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই ভক্তি স্বরূপতা লাভ করিয়াছে) রবীন্দ্রনাথ জীবনও জগৎকে সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—

"জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে।" (পরিণাম)

জীবন ও জগতের ঊর্দ্ধতর চেতনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু উহার স্বরূপ সাক্ষাৎকারের কোন অনুসন্ধিৎসা তাঁহার ছিল না। এই দিক দিয়া তিনি ছিলেন ভক্তিবাদী প্রেমিক। দুইয়ের বোধ না থাকিলে যে প্রেম হয় না। তাই তিনি এমন করিয়া দুইয়ের বিরোধটিকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমের পরিণাম যেখানে সেখানে এই দুই একটি রস-তত্ত্বে বিধৃত। এই রসের মিলন ভূমি না থাকিলে আবার প্রেম হয় না।

মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য-চেতনার মধ্যে এই মিলনকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বতঃ স্বীকার করিযাছেন, কিন্তু তৎ-স্বরূপতা লাভের সাধনাকে তিনি আপনার জীবনে গ্রহণ করেন নাই।

ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের জন্য কবির এই প্রয়াসের কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রধানতঃ যে লোকে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন তাহা ধ্যান বা মানস-লোক। এই এক অধ্যাত্ম-সত্তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। কবির সমগ্র কাব্য-জগৎ যে ঐক্য তত্ত্বে বিধৃত তাহা মানস বা ধ্যান-তত্ত্ব। তাহার রূপান্তরের গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার কোন উপায় আমাদের নাই ; কারণ অধ্যাত্ম-লোকের রূপান্তর লাভের মূলে যে চেতনার লীলা, তাহা দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর চেতনা। এক অধ্যাত্ম সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণ কাব্য-রূপের মধ্যেও বারংবার পার্থক্য ঘটাইয়াছে।

কবির মধ্যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে ধ্যান ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার নানা রূপের পরিচয় লাভ করিয়াছি। কবি আপনার ধ্যান-লোকের অন্তহীন মাধুর্য্যে নিমগ্ন থাকিতেন। কখন কখন উহা চূড়ান্ত সমৃদ্ধি লাভ করিয়া কবির নিকট বিছিন্ন সত্তা রূপে অনুভূত হইয়াছে।

উহাকে বাহু বেষ্টনে লাভ করিবার জন্য তিনি স্বপ্নে তন্দ্রাবিজড়িত বিস্ফারিত

নেত্রে ছুটিয়া চলিযাছেন। সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী রহস্য ভরা মূর্ত্তি তাঁহাকে হাতছানি দিয়া বাস্তব জগৎ হইতে কতবার দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

ইহা একজাতীয় বিশিষ্ট জীবন-সাধনা। এখানে সাধক আপনার ধ্যান-লোকটিকে সমগ্র সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিযা আপনাকেই দ্বিধা করিয়া ভাব বিনিময করেন। ওই অনিন্দ্য মূর্ত্তি এবং মানস-লোক পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একটি শাশ্বত লীলার জগৎ সৃষ্টি করে। দুর্ব্বার কাল-প্রবাহ এই লীলা-লোক বেষ্টন করিয়া ভাঙ্গনের কলোচ্ছ্বাস তুলিয়া ছুটিয়া চলে, উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"ছায়ার মতন মিলায় ধবণী,
কূল নাহি পায় আশাব তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।" (কাল্পনিক)

সীমাহীন মানস-আকাশে ওই মূর্ত্তি আসন্ন সন্ধ্যায় অস্পষ্ট হইযা উঠা একখণ্ড মেঘের মত। উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, কিন্তু উহার সহিত মিলিত হইতে পারি না, উহা কত দূরের কোন্ দূর কালের সামগ্রী। মানুষের একদিকে দেহের বন্ধন, অন্য দিকে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে কি অপার মুক্তি।

"তুমি সন্ধ্যাব মেঘ শান্ত সুদূব
আমাব সাধের সাধনা,
মম শূন্য-গগন-বিহারী।" (মানসপ্রতিমা)

এই সৌন্দর্য্য-লোক কবির মনের সৃষ্টি। একদিকে এই আদর্শ-প্রেরণা, অন্য দিকে তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রাণপণ প্রয়াস। এই প্রয়াসের ভিতর দিয়া ওই সৌন্দর্য্য ও আদর্শ-লোক ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে, কবির কাব্য-রূপও উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে চাহিয়া ক্রমাগত অপরূপ হইয়া উঠিতেছে।

"আমি আপন মনেব মাধুবী মিশায়ে
তোমাবে করেছি বচনা।" (মানস প্রতিমা)

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বা সৌন্দর্য্য-সত্তা যে-অসীমের জন্য বিরহ বোধ করিত তাহা তাঁহার নিকট অখণ্ড সত্তা রূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের প্রথম হইতে যে একটি সুস্পষ্ট পরিণাম ধারা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই ধারাকে কবির প্রাণ-লোক হইতে ধ্যান বা মানস-

লোকের ধীর জাগরণ বলিযা উল্লেখ করিয়াছি। ইহাকেই আবার একদিক দিয়া ক্রমিক সামঞ্জস্য বা সৌন্দর্য্য বোধের ধীর বিকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিযাছি। মুখ্যত: সৌন্দর্য্য বোধ আশ্রয় করিয়া কবি-চেতনা ধীর বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া উহা আবার সৌন্দর্য্য-লোকেরই ধীর পরিণাম।

মানসীর 'অপেক্ষা' 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতা, সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী', প্রভৃতি কবিতা, চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার 'নিরুপমা সৌন্দর্য্য প্রতিমা'-তত্ত্ব ;—এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া এই এক সৌন্দর্য্য-ধ্যানের বিচিত্র রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। কোথাও ইহা সৌন্দর্য্য-ধ্যান মাত্রেই রহিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ইহা আরও উদ্ধ্বর্তর লোকে বিগলিত হইয়া গিযাছে।

কবির এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের একটি সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'স্বপ্ন' কবিতাটির মধ্যে। ইহা সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এক অপরূপ সম্ভোগ লীলা। কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহার ধীর তন্ময়তার নানা রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিযাছি।

জন্মান্তরীণ সৌন্দর্য্য-লোক বলিয়া উল্লেখ করিবার পশ্চাতে কবির আকাঙ্ক্ষা ছিল ইহাকে সর্ব্ব-দেশ-কালের সৌন্দর্য্য-ধ্যানের সহিত একাকার করিয়া দিবার।

সৌন্দর্য্য-প্রেমের একটি পূর্ণতার আদর্শ কোথাও আছে। সৃষ্টির আদি কাল হইতে শিল্প-কলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির ভিতর দিযা মানুষ উহাকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিতেছে।

ব্যক্তি-চেতনার ক্রমবিকাশের দিক হইতেও ইহা সত্য। অর্থাৎ 'আমি'র একটি বিশেষ সত্তা জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সৌন্দর্য্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া রূপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আর এই রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে।

পূর্ব্ব জন্মে সকল আনন্দ-বেদনা দিয়া, হৃদয় নিঙড়াইয়া যে ধ্যান-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম তাহা আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ, আমাদের সকল সৃষ্টি যাহার রূপ-ধ্যান, ইহজন্মে তাহার সহিত আর কি মিলিত হইতে পারি না ?—ভাবে, স্বপ্নে বা ধ্যানে, কোন একটা উপায়ে ? ইহজন্মের সৌন্দর্য্য-ধ্যানের সহিত তাহার কোন যোগ কোন স্বরূপে কি থাকে না ? ইহ জন্মে কি তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় ?

অখণ্ড সৌন্দর্য্য-লোক এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্য-সমাজের সৌন্দর্য্য-ধ্যানের একটি ক্রম বিকাশ যেমন আছে, তেমনি একটি বিকাশ ব্যক্তি জীবনেও

ঘটিয়া চলিতেছে। সকল সৌন্দর্য্য-ধ্যানের পশ্চাতে এক আদর্শ প্রেরণা আছে বলিয়া সকল যুগের রূপ সৃষ্টির মধ্যে তাই একপ্রকার আশ্চর্য্য মিল লক্ষ্য করা যায়।

এই মূল উপলব্ধিটিকে রবীন্দ্রনাথ নানা দার্শনিক বোধের সহিত নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সমস্ত ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া বলা যায়, যে কবি তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান-লোকটিকে আরও দূর কালের সামগ্রী করিয়া তুলিয়া উহাকে আরও রহস্য নিবিড় আরও মায়াময়ী আরও অপ্রাপনীয়া করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা তাই কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান এবং তাহারই ধীর তন্ময় পরিণামই বটে।

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানে কবি-চিত্ত ধীরে ধীরে কেমন তন্ময় হইয়া উঠিতেছে। পরিণামে ওই সৌন্দর্য্য-সত্তার সহিত কবি-সত্তা একাকার হইয়া গিয়াছে। এই রূপে সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবির চেতনা উন্নততর চেতনা স্পর্শে ধীরে ধীরে আবিষ্ট হইয়া পড়ে।

"নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমাব দক্ষিণ কবে কুলায় প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো, মুখখানি তার
নতবৃন্তপদ্মসম এ বক্ষে আমাব
নমিয়া পড়িল ধীবে, ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।
রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকাব।" (স্বপ্ন)

কবি-চেতনা পরিণামে কেমন সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'রজনীর অন্ধকার' সেই আবিষ্ট মুহূর্ত্তের পরিচয় বহন করে। তখন রূপের আর কোন বোধ থাকে না, উজ্জয়িনী অর্থাৎ রূপ-লোক অন্ধকারে একাকার হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইন্দ্রিয়-লোকে প্রেমের প্রথম জাগরণ হইতে মানস-লোকে তাহার অতি প্রশান্ত করুণ গভীর পরিণাম পর্য্যন্ত প্রেমের এই সমগ্র প্রকাশটিকে রবীন্দ্রনাথ 'মদন ভস্মের পূর্ব্বে' এবং 'মদন ভস্মের পরে' কবিতা দুইটির মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। দুটি বিচ্ছিন্ন কবিতা হইলেও একটি ভাবের আদি ও অন্ত পরিণাম।

প্রেমের সেই প্রথম অনুভূতি। অন্তরের মধ্যে কেমন যেন এক অজানা পুলকের সঞ্চার। গোপনে দুয়ার রুদ্ধ করিয়া ওই বোধটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সাক্ষাৎ করিবার মধ্যে সে কী রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল। তাহার আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, কিন্তু গোপনতা ভাঙ্গিয়া গেলে কোথা হইতে বিশ্বগ্রাসী লজ্জা আসিয়া তাহাকে অধোনমিত করিয়া দেয়। তাহা যেমন আকাঙ্ক্ষিত তেমনি লজ্জার।

"পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরখ ছলে খেলিত যুবতী।" (মদন ভস্মের পূর্ব্বে)

প্রেমের এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ সঞ্চারিত হইয়া যায়। এই বেদনার সহিত বিজড়িত হইয়া অপর এক বিরহ জাগে। এই বেদনার পথ বাহিয়া নর-নারী ইহলোক হইতে আর কোন লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

"যমুনা কূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি আকুল নয়নে।" (মদন ভস্মের পূর্ব্বে)

তখনও প্রেমের অগ্নি-শিখায় হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাই। তাহার পর ওই প্রেম মানস বা ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া চিত্ত-চিতার ভস্ম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছে।

নিখিল বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তী অনন্ত বেদনা প্রবাহের প্রাণ-কেন্দ্রে যেন ব্যক্তি-প্রাণ যুক্ত হইয়া যায়। এই অনন্ত বেদনার ধারা প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়-তটে আছড়াইয়া পড়িয়া যে সুর জাগাইয়া তুলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া নর-নারীর মন কোন্ সীমাশূন্য লোকে প্রয়াণ করে তাহার নির্দ্দেশ কে দান করিবে।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।" (মদন ভস্মের পর)

তুষার স্তূপের উপর সূর্য্য কিরণ পড়িয়া প্রথমে তাহা দীপ্তিতে ঝলমল করে, মুহূর্ত্তে শত বর্ণালীর প্রকাশ ঘটে। তাহার পর উহা ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া ধারায় ধারায় নামিয়া আসিয়া করুণ কল্লোল জাগাইয়া তুলিয়া কোন্ সাগর-বল্লভের পানে ছুটিয়া চলে।

পুরুষের প্রেমে নারী ধন্য হইতে চায়। নারীর সার্থকতম প্রকাশ যে পুরুষের প্রেম মহিমায়। পুরুষের সকল অধ্যাত্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিবার প্রয়াসের ভিতর দিয়া নারীর রাজ রাজেশ্বরী রাজেন্দ্রাণীর প্রকাশ ঘটে। শিবের ক্ষুধিত প্রার্থনা

পূর্ণ করিবার জন্যই দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি। পুরুষের প্রার্থনা আছে বলিয়া নারীর ঐশ্বর্য্য। পুরুষের তৃষিত প্রার্থনা বঞ্চিত নারী বন্ধ্যা। পুরুষের প্রেম লাভের জন্য তাই নারীর অমন ব্যাকুলতা।

"মোর উতলা হৃদয় তিলেক পাবি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখ ঢাকি, তুমি কর মোরে করুণা," (মার্জ্জনা)

এই প্রার্থনায় নারীর প্রেম যদি লাঞ্ছিত হয় তবে তাহার বেদনার আর সীমা থাকে না। হৃদয়-বৃন্তে প্রেমের অনির্ব্বাণ শিখা আর আলোক দান না করিয়া দেহ-প্রাণ-মনকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া দেয়। যদি তাহাই ঘটে, অর্থাৎ পুরুষ যদি নারীর প্রেমকে জীবনে স্বীকার না করিতে পারে, তবে সে ওই প্রেমকে যেন পরিহাস না করে। প্রেম যে নর-নারীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। মর্ত্ত্যে প্রেমে ঈশ্বরীয় বোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

প্রেমে তো অভিযোগ চলে না। প্রেম এমনি অসহায়। প্রত্যাখ্যানকেই তাই নীরবে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রত্যাশিত প্রেমের বেদনা ভারে হৃদয় যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে তাহারও একটা সান্ত্বনা কোন-না-কোন রূপে লাভ করা যায়। কিন্তু সকল গৌরব লুটাইয়া দিয়া পুরুষের কৃপা কটাক্ষ যাচ্ঞায় নারীব ইহকাল পরকাল দুইই যায়।

"আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুত চরণে"

নারীর এই প্রেমকে পুরুষ যদি অন্তরে বরণ করিয়া লয়, তবে তাহা পুরুষের সকল অধ্যাত্ম পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটাইতে পারে। নারী প্রেমে এমন নিঃসীমতা আছে যাহাকে পুরুষ কোন দিন নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না। পুরুষের হৃদয়-লোকে নারী প্রেম এমনি অন্তহীন ধ্যানের লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

"যবে রাণীব মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমাব বাসনা,—"

প্রেমে নারীর যেমন শ্রেষ্ঠ স্বরূপের প্রকাশ ঘটে, তেমনি প্রেমের মধ্য দিয়া পুরুষের জীবনে সকল অধ্যাত্ম সম্পদ লাভ ঘটে বলিয়া তাহা পুরুষের জীবনকেও ধন্য করিয়া দেয়।

নারী প্রেম পুরুষের অন্তরে যে অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, তাহাতে অনন্তের ছায়াপাত হয়। নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া এইরূপে পুরুষ-

চিত্তে অমর্ত্ত্য-লোকের আভাস আসিয়া পৌঁছায়। যে পুরুষের পৌরুষ যত অধিক তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম জাগরণ তত সম্পূর্ণ হয়, অন্তরে তত অধিক পরিমানে উর্দ্ধতর চেতনার ঢল নামে।

নারী-বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া এইরূপে মহামায়ার লীলা সাক্ষাৎকার ঘটে বলিয়া নারীকে মহামায়ার অংশ বলা হয়। যে মহাশক্তির প্রতিভাস স্বরূপ এই নিখিল বিশ্ব, সাধনার ভিতর দিয়া তাহাকে যেমন .প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি নারী-প্রেম (নারী সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সংহত প্রকাশ বলিয়া) আশ্রয় করিয়াও সেই মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটে। এই জাতীয় সাধনায় নারী তাই শক্তির প্রতীক। নারীর প্রেমে পুরুষের গূঢ়তম চৈতন্য-লোকের জাগরণ ঘটে। আর সেই লেলিহান অগ্নি-শিখায় অমর্ত্ত্য-লোকের ক্ষণে ক্ষণে ছায়াপাত ঘটিয়া যায়।

প্রেমে নর নারীর মিলন পথে যদি এমন কোন বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাকে উভয়ের মিলিত চেষ্টাতেও অপসারিত করা সম্ভব নয়, তখন ওই চৈতন্যের অসহনীয় প্রকাশে সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত শুষ্ক দারু খণ্ডের মত মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিয়া ছাই হইয়া যায়।

অধ্যাত্ম-চেতনায় নারী-বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া পুরুষের এই যে দিব্য-রূপ-সাক্ষাৎকার তাহার কোন পরিচয় নারীর ওই কয়েকটি রেখা-বন্ধনে কোথাও মিলিতে পারে না। পুরুষের অধ্যাত্ম-সত্তায় নারী আপনার এই দিব্য- রূপ সাক্ষাৎ করিয়া তাই এমন বিস্মিয স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। 'চার-অধ্যায়ে'র এলা ও অতীনের উক্তি স্মরণে পড়িতেছে।

"এলা—জানিনে আমার এমন কি শক্তি ছিল।

"অতীন—তুমি কি করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়; মহামায়ার"।

নারীর এই বিস্ময় স্তম্ভিত জিজ্ঞাসার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে 'প্রণয়-প্রশ্ন' কবিতাটির মধ্যে।

"কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
জীবনমরণ-বাঁধন বাহুতে মোর বাঁধা রে,

ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,

*　　*　　*

মোর সুকুমার ললাট ফলকে
　　লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত,
　　এ কি সত্য ?"　　(প্রণয় প্রশ্ন)

পুরুষের প্রেম সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন মাত্র। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানটিকে সে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে চায় একটি বিগ্রহের মধ্যে। নারী একথা জানে। জানে বলিয়া সে আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া মায়ার আবরণ টানে। ওই মায়াকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া পুরুষ সৌন্দর্য্য-জাল বুনিয়া চলে। ইহাই পুরুষের সৃষ্টি।

পুরুষের প্রেম একটি আইডিয়া মাত্র। নারী আপনার মাধুর্য্যে প্রেমে পুরুষের আইডিয়াকে বাস্তবের সহিত যুক্ত করিয়া রাখে।

'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতাটির মধ্যে পুরুষ যে কালে প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে তাহা প্রভাত কাল। দিনের প্রখর আলোকে নারী পুরুষের চক্ষে মায়ার অঞ্জন মাখাইয়া দিতে পারে না। তখন তাহার প্রসাধনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পুরুষের স্বপ্ন লোক বাস্তব সংস্পর্শে যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। নারী তাই পুরুষের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারে নাই। এমনি করিয়া পুরুষের বারংবার পিপাসিত প্রার্থনা সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

তাহার পর দিন শেষে চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া অন্ধকার নামিয়াছে। নির্জন গৃহে নিষ্কম্প দীপ-শিখার ক্ষীণ আলোকে, ধূপের ধোঁয়ায়, অগুরুর গন্ধে বাতাস কেমন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকের পরিবেশ কেমন মায়াময়। এই আবেষ্টনীর মধ্যে নারী পুরুষের প্রেমের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য 'দূর্ব্বা শ্যামল অঞ্চল বক্ষে টানিয়া' উৎসুক প্রতীক্ষারত।

কিন্তু সেই পুরুষকে তো আর ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। ব্যর্থ প্রেমের ভার বহিয়া নারীকে তখন সমস্ত জীবন প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দিতে হয়।

তাহা ছাড়া পুরুষ যে কালে নারীর প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে, সে কালে নারীর অন্তরে প্রেমের অনুভূতি জাগে নাই। তখনি পুরুষের প্রেম পূর্ণ করিয়া দিবার মত

কোন অধ্যাত্ম সম্পদ তাহার ছিল না। অন্তরের এই ঐশ্বর্য্য দীনতার জন্য সে পুরুষের প্রেম প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে নাই। একান্ত প্রার্থিত যে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে নারীর তাই সঙ্কোচ ও সাধ্বসের সীমা ছিল না। পরে নারী প্রেমের ঐশ্বর্য্যে মহিমময়ী হইয়া সেই সঙ্কোচ পরিহার করিয়াছে। নারী আপনার সামর্থ্য সম্পর্কে আজ সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু প্রেমের লগ্ন জীবনে একবারই আসে। সেই লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া গেলে তাহাকে আর ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। নারীর জীবন তাহার পর হইতে অন্তহীন প্রতীক্ষায় পরিণত হয়। সে বেদনার বুঝি পার নাই।

"রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়ন তলে রয়েছি ধূলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি'!" (ভ্রষ্ট লগ্ন)

মুখ্যতঃ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঊর্দ্ধতর চেতনার আভাস লাভ করিতেন বলিয়া দিব্য-চেতনা উহারই এক প্রকার সীমাহীন প্রসার রূপে অনুভূত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য-সাধনায় ইহা সত্য হইলেও এক সৎ স্বরূপ যে ধ্যান-লোকে নানা স্বরূপে উপলব্ধ হয় এই সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। উপলব্ধির স্বরূপ সাধকের বিশিষ্ট মানস-গঠন, প্রকৃতি ও সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

জীবনের সকল আদর্শ-প্রেরণার পশ্চাতে যে এক আদি চেতনা ক্রিয়া করে, ইহা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'এবার ফিরাও মোরে' কাবতাটি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে সে পরিচয় লাভ করিয়াছি। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে কবির বিশিষ্ট সাধনা অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান-লোকটি অলক্ষ্যে মুখ্য হইয়া দিব্য-চেতনাকে নিরুপমা সৌন্দর্য্য প্রতিমা রূপে উপলব্ধি করিয়াছে। বিশ্ব-সত্তা বলিতে রবীন্দ্রনাথ যে এই অখণ্ড সৌন্দর্য্য-তত্ত্বটিকে বুঝিতেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ণ মনুষ্যত্বে সকল প্রেরণাই সত্য, কিন্তু তাহার একটি বিশেষের দিক আছে।

এই সৎ স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের নিকট কোথাও অচিন্তনীয় শক্তির প্রবাহরূপে অনুভূত হইয়াছে। সেই সঙ্গে জীবন ও জগতের সকল পর্য্যায়, এই সমস্ত কিছু

শক্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কল্পনার মধ্যে অন্ততঃ দুটি কবিতায় ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

যে শক্তি জীবনের সকল 'দুঃখ সুখের' সকল 'তাপ-পরিতাপ', 'কর্ম্ম লজ্জা ভয়ে'র অর্থাৎ মানবিক সকল বোধ মুক্ত—

"শুধু তাহা সদ্যঃস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।" (বর্ষশেষ)

সেই এক শক্তি বিশ্বে সংখ্যাতীত রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে, সকল বোধের মধ্যে প্রকাশমান।

বিশ্ব-শক্তির যোগে ব্যক্তি-চেতনার প্রকাশ, তাই উহারই যোগে ব্যক্তি-চেতনার ধীর প্রসার ঘটে। পরিণামে ব্যক্তি ও বিশ্ব একাকার হইয়া যায়। ব্যক্তির সীমাবদ্ধ শক্তি বিশ্বের যোগে ধীর বিকাশ লাভ করিয়া পরিণামে সীমাহীন হইয়া পড়ে। কবি জীবনে সেই সীমাহীন শক্তির পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে চান।

"তোমার ইঙ্গিতে যেন ঘন গূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ু গর্জ্জে আসে।" (বর্ষশেষ)

কবির অন্তরে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে ধ্যান-লোক ছিল, যে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া তিনি বাস্তব জীবনের ব্যথা-বেদনা, রূঢ়তা, মালিন্য, বঞ্চনা ও তুচ্ছতা বিস্মৃত হইতেন সেই ধ্যান-লোকটিই আজ শক্তির আধারে পরিণত হইয়াছে।

আজ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান নিমগ্ন হইয়া নয়, শক্তির পরুষ স্পর্শে তাঁহার অন্তরের সকল অতৃপ্তি দূরীভূত হইয়া যাইবে। অখণ্ড সৌন্দর্য্য তত্ত্ব নয়, আজ অপ্রমেয় বীর্য্য কবির অন্তরে ধ্যানের পরিব্যাপ্ত পরম গম্ভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা দান করিবে।

"তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে—
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।" (বর্ষশেষ)

একদিন কবি সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া সেই পরম তত্ত্বের আভাস লাভ

করিতেন, কিংবা ওই অখণ্ড সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সৌন্দর্য্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া কবির অন্তরে অনুভূত হইত।

"এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,-" (বর্ষশেষ)

'এবার আসনি' এই স্বীকৃতির মধ্যেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে পূর্ব্বে ওই স্বরূপে তিনি কবির সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন।

দেশ-কালের উভয় তট পূর্ণ করিয়া শক্তির অবিরাম প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। এই সংখ্যাতীত সৃষ্টি, অনন্ত লোক সেই স্রোতে বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। শক্তির এই অনাদ্যন্ত লীলাটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন।

"যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের।" (বর্ষশেষ)

এই অনন্ত শক্তিকে কবি নিম্নতর চেতনা-লোকে প্লাবিত হইতে দেখিতে চাহিতেছেন, কারণ উহার স্পর্শে নিম্নতর সকল চেতনা বা বোধ রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

"উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে
যাক্ নদী পার হয়ে, যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।" (বৈশাখ)

সৌন্দর্য্য-তত্ত্বকে কবি একদিন ব্যক্তিগত সাধনার অঙ্গ স্বরূপেই শুধু নয়, সমগ্র মানব-জীবনে এই সাধনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে কবি পূর্ণ জীবন সাধনার অঙ্গ স্বরূপে সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের পরিবর্ত্তে শক্তি-তত্ত্ব আশ্রয় করিতেছেন। একদিকে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা অন্যদিকে 'বর্ষশেষ' 'বৈশাখ' প্রভৃতি কবিতা। সামগ্রিক জীবনকে দুটি তত্ত্বের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা। একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের দিক হইতে, অন্যটি শক্তি-তত্ত্বের দিক হইতে।

"তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে. বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু, ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল। (বৈশাখ)

জীবনের সমস্যা এক, অর্থাৎ "জরা মৃত্যু, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও চিন্তার বিকল লক্ষ কোটি নর নারী'কে মুক্তি দেওয়া, এক দিব্য-সমাজে, দিব্য-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। ইহার জন্য সমাধানের পথও এক, অর্থাৎ জাগতিক বোধ ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম বোধে প্রতিষ্ঠা লাভ। মানুষের সকল উন্নততর প্রয়াস, সকল আদর্শ প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের সাধনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সৎ স্বরূপ যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব রূপে অনুভূত হইয়াছে, সেখানে উহার যে-কোন প্রকাশ, উহাকে লাভ করিবার যে-কোন সাধনা, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ও সৌন্দর্য্য-সাধনা হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে উহা শক্তি-তত্ত্ব রূপে অনুভূত হইয়াছে, সেখানে জীবনে ও জগতে উহার সকল প্রকাশ শক্তির প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে।

মানব জীবনের গভীরতর দুঃখ, সান্ত্বনাহীন ক্ষোভ এই যে তাহাকে একদিন স্নেহ-প্রীতি পরিপূর্ণ মর্ত্ত্য-লোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হয়। যাহাদের প্রাণের অধিক ভালবাসিয়া এই জীবন ও জগৎ অপরূপ, পরম দুর্লভ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, একে একে তাহারাই বা কোথায় হারাইয়া যায় আমরাই বা কোথায়।

একটি সম্পূর্ণ জীবনের বিনাশ তো শুধু নয়, এই জীবনের কত দুর্লভতম পর্য্যায়, কত আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত্ত আমরা পার হইয়া আসি, উহাদিগকে চিরকালের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারি না। তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ, তাহার পরিপূর্ণ যৌবন, যাহা এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধকে একপ্রকার সীমাহীন ব্যাপ্তি দান দরে, তাহার জীবন-গ্রন্থের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। মহাকাল জীবন-গ্রন্থের এক একটি পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া উহাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কাল-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতেছেন, উহারা স্রোতে মুহূর্ত্তের জন্য আবির্ভূত হইয়া হারাইয়া যাইতেছে।

'বসন্ত' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতার একটি সান্ত্বনা অন্বেষণ করিয়াছেন।

দেশ-কালের বুকে অসীম প্রাণ-ধারায় কত প্রাণ জাগিতেছে, অবার ওই প্রাণ-ধারায় একাকার হইয়া যাইতেছে। তাহাদের অপরিতৃপ্ত আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ

সমস্ত কিছু ওই প্রাণ-লোকে একাকার হইয়া যাইতেছে। তাই প্রাণের উপলব্ধির মধ্যে মানুষ অনন্ত বেদনার নিপীড়ন বোধ করে। শাশ্বত প্রাণ তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ এই রূপে শাশ্বত একটি স্মৃতি বা বেদনা তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রাণের নিত্য নূতন প্রকাশে অতীত সকল স্মৃতি ও বেদনাও নিত্য নূতন রূপে প্রকাশ পায়। এই স্মৃতি বা বেদনা তত্ত্বকে বিশ্ব-প্রাণ-তত্ত্বের সহিত যেমন বিজড়িত করা সম্ভব, তেমনি ব্যক্তি তত্ত্বের সহিত উহাকে বিজড়িত করা সম্ভব, অর্থাৎ মৃত্যুতে এই জীবনের সকল স্মৃতি রহিয়া যায়। পরজন্মে নূতন প্রাণ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই স্মৃতিই আবার ফিরিয়া আসে। নূতন অনুভূতির সহিত অতীত কত-না জীবনের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া চিত্তকে তাই ব্যাকুল করিয়া তুলে। জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া এই স্মৃতি-লোকটি পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। মানব জীবনের সেই চিরন্তন হাহাকার বিজড়িত জিজ্ঞাসা —

> "আমার বসন্তবাতে চাবি চক্ষে জেগে উঠেছিল
> যে-কয়টি কথা,
> তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
> নিয়ে গেল কোথা ?" (বসন্ত)

প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের বিনাশ নাই বলিয়া মানব-জীবনের পরম অনুভূতির এই কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত্তও অবিনশ্বর। প্রাণের সহিত বিজড়িত হইয়া সেই অনুভূতিও যুগে যুগে প্রকাশ লাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে প্রাণ-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া জীবনের সর্ব্বশেষ জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন।

> "ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
> ওগো মধুমাস
> তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
> হইবে প্রকাশ।" (বসন্ত)

একথা হয়ত সত্য, জীবনের হাহাকার তো এই জন্য নয়। প্রাণ এই বিশেষ রূপাধারের বিশেষ অনুভূতিটিকে লাভ করিতে চায়। মৃত্যুতে ওই বিশেষ রূপটি যেমন, উপলব্ধির ওই বিশেষ প্রকাশটিকেও তেমনি ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

যে তত্ত্ব লাভ করিলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান লাভ ঘটে, প্রাণের নিত্য ব্যাকুলতার নিরসন হয়, তাহা লাভ করিতে হয় প্রাণের উর্দ্ধে এমনকি মনের

সীমাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়া। 'বর্ষশেষ' কবিতাটির মধ্যে কবির যে আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কবির জীবনে সে আকাঙ্ক্ষা কোথাও কোথাও চরিতার্থ হইয়াছে।

"জল স্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্য্যামি
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।" (অনবচ্ছিন্ন আমি)

ক্ষণিকা

কল্পনা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কবির মানস-লোকের বহু বিচিত্র বিলাস এবং উহারও উন্নততর পরিণাম লাভের নানা প্রয়াসের পরিচয় লাভ করিয়াছি।

সেই অত্যুচ্চ ভাব-লোক হইতে কবি ক্ষণিকায় একান্ত প্রাণ-লোকে এমনকি আরও নিম্নতর লোকে নামিয়া আসিয়াছেন। জীবনের সর্ব্ববিধ নিয়তি নিয়মের মূলে যে হৃদয়, কবি একেবার সেই হৃদয়কেই উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হৃদয়বোধকে এইরূপে সাময়িক ভাবে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, বিশেষ করিয়া সেই প্রয়াস যদি হয় সচেতন ভাবে লীলা-রস আস্বাদের জন্য। কবি তাহাই করিয়াছেন।

হৃদয়বোধ এবং উহার সহিত বিজড়িত জীবের সকল দশা ও নিয়তি-নিয়মকে অস্বীকার করিয়া কবি এই কালে একটি জীবন-দর্শনও গড়িয়া তুলিয়াছেন। চেতনার যে কোন পর্য্যায়ে তদাশ্রয়ী একটি বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার থাকে। এই সাক্ষাৎকারই জীবন-দর্শন। এই দর্শন-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া মানুষ সমগ্র জীবন ও জগতের মূল্য নিরূপণ ও স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করে।

হৃদয় নিরুদ্ধ অবস্থায় কবি দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে প্রাণ-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে, সেইসঙ্গে অন্তহীন বেদনা-প্রবাহ কবির হৃদয়-তটে আছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বেদনার সমুদ্র পার হইয়া কবি আবার সীমাহীন ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

মানস-লোকে প্রাণের বিক্ষোভ জয় করিয়া উঠিবার সার্থক চেষ্টা কবির জীবনে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার অর্থ হৃদয় নিরুদ্ধ করা নয়, নিয়ন্ত্রণ করা; এবং এই নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া পরিণামে উহার উর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়া।

ক্ষণিকার মধ্যে কবি হৃদয় নিরুদ্ধ করিয়া জীবনের সকল সমস্যাকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন, যেন এমন করিয়া জীবনের সকল সমস্যার সমাধান লাভ ঘটে।

জীবনের এই যে বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার তাহা অত্যুচ্চ ধ্যান-লোক উত্তীর্ণ হইয়া নয়, (সুসমালোচক অজিত চক্রবর্ত্তীর প্রচেষ্টার কথা পাঠক বর্গের স্মরণে পড়িবে। ক্ষণিকার মূল ভাবপ্রেরণা সম্পর্কে তাঁহার অভিমতকে আমি কেন যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছি, তাহার বিস্তারিত পরিচয় এই আলোচনার মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।) পরন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; অর্থাৎ সকল রস পরিণাম শূণ্য, সার্থকতা হীন, হৃদয় নিরুদ্ধ সাক্ষাৎকার।

আমি ক্ষণিকা হইতে সর্ব্বাগ্রে দুই একটি কবিতার উল্লেখ করিব তাহাতে কবির এই জাতীয় সাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ প্রেরণা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

> "ব্যথা পাছে না পাও তুমি
> লুকিয়ে রাখি তাই
> নিজের ব্যথাটাই।" (ভীরুতা)

'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', প্রভৃতি কাব্যে কবি-প্রাণের সেই অফুরন্ত উৎসারণা এবং বিশ্ব-প্রাণধারার সহিত মিলন লাভের বিচিত্র প্রয়াস প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ কবি সেই প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে চান নাই; কারণ যৌবনের যে পূর্ণ বিকশিত, সামর্থ্য যুক্ত ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ওই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং উহার অসহনীয় আনন্দ-বেদনার বিষামৃত লীলা আস্বাদ করিতে পারা যায়, কবির সেই যৌবন প্রায় অবসিত হইতে চলিয়াছে। সেই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশে তাঁহার দেহ আজ জীর্ণ তরীর মত শতধা হইয়া কোন্ অতলে তলাইয়া যাইবে।

অবসিত যৌবনে প্রাণ-ধারা যখন বিশুষ্ক হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য যখন কমিয়া আসে, তখন প্রকৃতির মধ্য হইতেই প্রাণের লীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার একটা আহ্বান আসে।

মানুষকে তখন ধ্যান-লোকটিকেই একান্ত করিয়া আশ্রয় করিতে হয়। এই ধ্যান-লোকটিকেও ছাড়াইয়া মানুষ এমন এক উর্দ্ধতর পরিণাম লাভ করে, যাহার উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার আদৌ ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী নয়। প্রকৃতির ভিতর দিয়া মানুষ এমনি করিয়া প্রকৃতিকে জয় করিয়া উঠে। ধ্যান-লোকটিকেও ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা না করিলে ধ্যান-লোকটিও ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী বলিয়া ইন্দ্রিয় যতই শিথিল হইতে থাকে ওই ধ্যান-লোকটি ততই শ্রীহীন হইয়া পড়ে। পরিণত জীবনে অধ্যাত্ম-শূণ্যতা বোধ এমনি করিয়া জাগে।

ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ওই পরিণাম মুখীন হইয়া চলিয়াছিলেন। উহারই সাময়িক প্রতিক্রিয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ এমন নিম্নতর চেতনা-লোকে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়াছেন। সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সীমা ও 'ক্ষণ'-বোধ জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে। কারণ চেতনা যে স্বরূপ সাক্ষাৎ করে, বুদ্ধি তাহাকে আশ্রয় করিয়া একটি সামগ্রিক দর্শন গড়িয়া তুলে। বুদ্ধির এই কাজ।

যৌবনে প্রাণের দুর্ব্বার প্রেরণায় কবি প্রাণ-সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়া ছিলেন।

"সিন্ধু পানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন বশারশি।" (পরামর্শ)

যৌবনের প্রান্ত সীমায় সেই শক্তি আজ প্রায় নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে।

"এখন কি আর আছে সে বল?
বুকেব তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।" (পরামর্শ)

হৃদয় আসক্তি বোধ করে সত্য, কিন্তু যৌবনের প্রবল প্রাণ-শক্তি আবার ওই আসক্তি জয় করিয়া উঠে। এমনি করিয়া প্রাণের প্রবল আবেগে সে যেমন তীব্র আসক্তি বোধ করে, তেমনি আবার প্রাণের বেগেই আসক্তির সামগ্রীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। এমনি করিয়া তাহার লীলা চলে।

অবসিত যৌবনে আসক্তি একান্ত হইয়া উঠে। বারংবার রূপকে জড়াইয়া আকাঙ্ক্ষার ভারে মানুষ ভাঙ্গিয়া পড়ে, বারংবার তাহার জীর্ণ হৃদয়-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া রক্ত-ধারা অশ্রু-ধারা রূপে বাহির হইয়া আসে। বুকের তলা যে অশ্রুজলে ভরিয়া উঠে তাহা সেচিয়া সে আর জীবন-তরী বাহিতে পারে না। প্রাণের

আন্দোলনে উহা একদিন তলাইয়া যায়। তাই কবি প্রাণ-লোক হইতে সরিয়া আসিয়াছেন।

"এবার তবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী
রাখ্‌ রে আনাগোনা।" (পরামর্শ)

কবি আজ তাই প্রাণ সমুদ্রে নামিয়া বক্ষ পাতিয়া উহার তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে চাহেন নাই, তীরে উহার অতি মৃদু স্পর্শ লাভ করিতে চাহিয়াছেন। প্রাণের যে-কোন আবেগকে কবি আজ গভীর ভাবে অনুভব করিতে অসমর্থ। কবি আজ প্রাণ-সমুদের উত্তাল তরঙ্গ দোলায় দুলিতে নয়, তীরে তাহারই অতি মৃদু আন্দোলন বোধ করিতে, অতি ভীষণ কল্লোল গর্জ্জনে জাগিয়া উঠিয়া বসিতে নয়, তাহার মৃদু ছল্‌ ছল্‌ একটানা শব্দে ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিয়াছেন।

"ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।" (পরামর্শ)

বিশ্বের প্রাণ-লীলা হইতে কবি আজ অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এবং প্রাণ-লোকের মাঝখানে এক স্রোত ধারার ব্যবধান।

ওই লোকে সংখ্যাতীত নর-নারী জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনে ব্যাপৃত। ভালো লাগা মন্দ লাগার ঢেউ তুলিয়া ওখানে কত আবর্ত্ত রচিত হইতেছে। এই তট-সীমায় দাঁড়াইয়া তাহার অতি অস্পষ্ট আভাসমাত্র লাভ করা যায়।

ওখানে

"সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।" (দুই তীরে)

ওখানে যাইতে সাধ যায়, ওই মোহ ও আসক্তি বিজড়িত সৌন্দর্য্য ও প্রেম-লোকে, কিন্তু উহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

কারণ

"তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,—" (দুই তীরে)

জীবন ও জগতের একই স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশ ঘটায়। প্রাণ-লোকে এই জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রতিভাত হয়, ওই লোক হইতে নির্ব্বাসিত হইলে তাহার আর এক অর্থ প্রকাশ পায়।

"তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আর এক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।" (দুই তীরে)

আষাঢ়ে আকাশ পরিব্যাপ্ত বর্ষণ ভারাক্রান্ত মেঘের অপরূপ শ্যামশ্রী দেখিয়া হৃদয় শত ভাবনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়। সেই সকল ভাবনা বেদনাকে প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল হইয়া উঠে। নিত্য দিনের প্রয়োজন-সীমিত জীবনের সকল নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। জীবনের এই সকল প্রয়াস মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। মনে হয়, সার্থকতার অন্য কোন জগৎ কোথাও আছে, যাহাকে লাভ করিবার পথ আমরা জানি না।

একদিকে সমগ্র প্রকৃতি কবির প্রাণ জাগ্রত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে, অন্যদিকে কবি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দুই হস্তে হৃদয় নিপীড়িত করিতেছেন। এই সর্ব্বনাশা প্রাণের জাগরণ তিনি কোন প্রকারেই ঘটিতে দিবেন না। অথচ উহাই যে কবির পরম আকাঙ্ক্ষিত। তাই কবি বারংবার চোখ মেলিয়া বর্ষার অপরূপ রূপ চকিতে চকিতে দেখিয়া লইতেছেন। এমনি করিয়া কবির প্রাণ কবির মন ভুলাইয়াছে। একটি সচেতন, আর একটি অচেতন প্রেরণা।

"ওগো, আজ তোরা যাস নে, ঘরের
বাহিরে।" (আষাঢ়)

এই নিষেধটি সমগ্র কবিতাটির মূল ভাব-প্রেরণা। ইহা প্রাণকে প্রাণপণ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস মাত্র।

প্রাণ-মন নিরুদ্ধ করিয়া জীবনের যে লীলা সাক্ষাৎকার তাহার স্বরূপ কি? একটা তত্ত্ব কবি নিশ্চয়ই এই কালে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার যে পরিচয় এই কাব্য মধ্যে রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করিব। তাহার পূর্ব্বে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানবীয় চেতনার যে কয়েকটি পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছি কবি সেই

প্রত্যেক পর্য্যায়ে অবস্থান কালে এক একটি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছেন। চেতনা বিকাশের তারতম্য হেতু তত্ত্বগুলির মধ্যেও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

সমগ্র কাব্য সৃষ্টির পশ্চাতে কবি-চেতনার ধীর বিকাশ, তাহার পর প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে সচেতন ভাবে অবস্থান করিয়া উহাদের প্রত্যেকের লীলা-রস আস্বাদের প্রেরণাটিকে যদি মূল ভিত্তি স্বরূপ আশ্রয় করা যায় তবে কোন একটি মাত্র তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে না।

ক্ষণকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া কবি জীবনের সকল অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও ব্যাকুলতা নিরুদ্ধ করিয়া দিযাছেন। ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ কবি স্বয়ং সে সম্পর্কে সচেতন। এই চেতনাশ্রয়ী হইয়া কবি সাময়িক একটি লীলা-রস সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছেন।

"আজকে শুধু এক বেলারই তরে,
আমবা দোঁহে অমব, দোঁহে অমর।" (যুগল)

ক্ষণ যে স্থায়ী চেতনা বৃন্তে বিধৃত তাহা প্রাণ। প্রাণের বিকাশ না ঘটিলে এই প্রাণ-তত্ত্বটি অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যায়। কিন্তু এই লোকেও জীবনের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে না। প্রাণ যে গভীরতর, বিস্তৃততর তত্ত্ব লোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহা মন। মানস-লোকেও মানুষের ব্যাকুলতা শান্ত হয় না। মানুষ ইহারও অসম্পূর্ণতা বোধ করে। ইহারও উর্দ্ধতর কোন ভাব-ভূমি লাভের জন্য সে যুগে যুগে কোন অতলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। পরিণামে সে যে পরম ভিত্তির সন্ধান লাভ করিয়াছে তাঁহার নামে বিভিন্নতা থাকিলেও তাহা তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

প্রাণ নিরুদ্ধ দৃষ্টিতে অমনি মুহূর্ত্তকে একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয়। কোন ক্ষণের সহিত যেন কোন ক্ষণের যোগ নাই, যাহা হারাইয়া যাইতেছে তাহা একান্তই হারাইয়া যাইতেছে। জীবন ও জগৎ কতকগুলি মুহূর্ত্তের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে কোন সংযোগ সূত্র নাই। মুহূর্ত্তের অচিন্তনীয় দ্রুত অবসান একটা সমগ্রতার বোধ জাগ্রত করে মাত্র। প্রাণের অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া হৃদয়-রক্ত নিষিক্ত করিয়া তিনি একদিন কত ধ্যান-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেন। এই ধ্যান-মূর্ত্তিই ছিল কবির কাব্য-লোক।

"অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা
রাঙ্গিয়াছি তাহা, হৃদয়-শোণিত-
বরণে।" (উদাসীন)

প্রাণের এই উপলব্ধিকে কবি আজ নিরুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। অথচ সৌন্দর্য্য ও প্রেম সাধনায় প্রাণের বেদনা পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। এই বেদনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া মানস-লোকে ধীরে ধীরে সৌন্দর্য্য ও প্রেম ধ্যান-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বেদনা-সমুদ্রের মাঝখানে তাহা আনন্দ-শতদল। বেদনা স্বীকার না করিলে আনন্দ পরিণাম লাভ করিতে পারা যায় না। দুঃখ ভোগ যেখানে দুঃখভোগ মাত্র সেখানে জীবনের অধ্যাত্ম ফল লাভ কিছু নাই।

পূর্ণতার সাধনায় দুঃখভোগকে জীবনে বরণ করিয়া লইতে হয়। এই আনন্দ পরিণাম যদি না থাকিত তাহা হইলে দুঃখভোগ বা ত্যাগ তো নিরতিশয় বঞ্চনা হইয়া উঠিত। ইহা কেবল আত্মহত্যা, এক জাতীয় প্রমত্ততা। মানুষ ইহাতে উন্মাদ হইয়া যায়। ইহা জীবনের বিকৃতি।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধকে প্রাণ-লোক হইতে হয় ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে হয়, নতুবা উহাকে পরিহার করিতে হয়। প্রাণের অহর্নিশ বিষ জ্বালা মানুষ দীর্ঘকাল বহন করিতে পারে না।

“বুকভাঙ্গা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া—” (উদাসীন)

তাহার পর যখন এই জাতীয় পংক্তি পাঠ করি তখন সংশয় জাগে,—

“দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে—
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি পিছুতে।” (উদাসীন)

শাস্ত্রের সেই তত্ত্বোপলব্ধির কথা মনে পড়িয়া যায়!

“আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্ বৎ।
তদ্ বৎ কামা যং প্রবিশ্রন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম কামী॥”

যে লোকে অধিষ্ঠিত হইলে এই শান্তি লাভ করা যায়, তাহা মনেরও ঊর্দ্ধতর লোক।

রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার ওই জাতীয় হইতে কোন আপত্তি নাই, কোথাও কোথাও এই পরিচয়ও আছে, তবে এক্ষেত্রে সমগ্র কাব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি

ইহাকে ঠিক বিপরীত প্রেরণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইহা সেই তত্ত্ব বিমুক্ত, রস-পরিণামহীন, সর্ব্ব-জিজ্ঞাসা-নিরুদ্ধ সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার। অর্থাৎ প্রাণের বিষ জ্বালা ভুলিতে কবি প্রাণের উর্দ্ধতর চেতনা মানস-লোকে নয়, (ইহারও উর্দ্ধতর পরিণাম তো আরও দূরের কথা) নিম্নে ইন্দ্রিয়-চেতনা-লোকে নামিয়া আসিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ পরিণাম ঘটে বিশেষকে আশ্রয় করিয়া। সাধনার এই স্বরূপ। বিশেষকে আশ্রয় না করিলে নির্ব্বিশেষ রস তত্ত্বে পৌঁছান যায় না। বিশেষকে পরিহার করিয়া এইরূপে একযোগে অনেককে লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু মানস-লোকে ধ্যান-তন্ময়তা লাভের পক্ষে এই জাতীয় প্রেরণা ঘোর বিঘ্নকর।

আসক্তি ও বেদনা প্রাণের ধর্ম্ম বলিয়া কবি বারংবার আসক্তির ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, আবার একটি-না-একটি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া উহাকে জয় করিয়া উঠিয়াছেন। এখানে যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কবি আসক্তি ও বেদনা জয়ের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উর্দ্ধতর কোন চেতনা আশ্রয় করিয়া নয়।

"ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাসনে কো কুড়াতে।" (উদ্বোধন)

কিংবা

"ওরে থাক থাক কাঁদনি
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।" (উদ্বোধন)

আরও

"শুধু অকারণ পুলকে
নদী জলে পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।" (উদ্বোধন)

এই ক্ষণিকতা বোধ এক্ষেত্রে একটি তত্ত্ব-স্বরূপতা লাভ করিয়াছে। ক্ষণ যেখানে জীবন ও জগতের একমাত্র সত্য স্বরূপ সেখানে বেদনার প্রশ্ন উঠে না।

'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশের উক্তির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই রূপ একটি অভিমত প্রকাশ করেন, যে দুটি নর-নারীর বিরহ-মিলনের গণ্ডি পার হইয়া এই জগৎ অসীম বিস্তৃত।

জীবনে প্রেম যদি মিথ্যা হইয়া যায়, তবে অনন্ত ব্যাপ্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় না। প্রেম মানবীয় চেতনার একটি পর্য্যায় মাত্র। তাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ নহে। জীবনে সার্থকতা লাভের গননাতীত পথ আছে।

প্রেম যদি ব্যক্তি-চেতনাকে পরিণামে বিশ্বের সহিত যুক্ত করিয়া না দেয়, তবে বিচ্ছেদ বা বিয়োগে নর-নারীর অন্তর শূন্যময় হইয়া পড়ে। জীবনে সে প্রেমের মূল্য কতটুকু।

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই দৃষ্টির চকিত আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আদৌ এই তত্ত্ব নহে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনায় বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিশেষ পরিণাম লাভ করিতে হয়, আর কোন পথ নাই। কোন বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় না করিয়া নিরুদ্ধ হৃদয়ে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে লীলা আস্বাদ তাহাতে জীবনের কোন অধ্যাত্ম ফল লাভ নাই।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধকে আদৌ স্বীকার না করিয়া জীবনের ভিন্নতর সাধনাও আছে। তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়।

নিখিলেশ এই তত্ত্ব-দৃষ্টির সহায়তায় তাহার প্রেমকে ধ্যানে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, ক্ষণতত্ত্ব আশ্রয় করে নাই। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু এই চেতনা পর্য্যায়ে নয়।

"যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।" (বোঝাপড়া)

প্রাণ-লোকে যে রূপকে মানুষ একান্ত করিয়া আশ্রয় করে, সেই রূপই ক্রমে ধ্যান-লোক উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। ধ্যানে ওই রূপ আর বন্ধন স্বরূপ থাকে না। তাহা শিখা রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া বিশ্ব-সৌন্দর্য্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। রূপ পরিহার করিলে আলো জ্বলে না। রূপ হইল প্রদীপ। প্রদীপ আশ্রয় করিয়াই শিখা জ্বলে।

প্রাণ-মনকে ঘুম পাড়াইয়া যে সৌন্দর্য্য ও প্রেম আস্বাদ, আদৌ যদি তাহা সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ হয়, কাব্য হইতে তাহার পিছু পরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি।

রূপ ও প্রেমকে মানুষ আশ্রয় করে প্রাণের পরিণামে অধ্যাত্ম-লোকের জাগরণ ঘটাইবার জন্য। কিন্তু রূপ এখানে কেবল মাত্র রূপ সম্ভোগ। এই জাতীয় সৌন্দর্য্য ও প্রেম সম্ভোগ মানুষের ঘোরতর বিনষ্টি ঘটায়। সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত, সকল অধ্যাত্ম প্রেরণা শূন্য ইহা এক শূন্য পরিণাম মাত্র।

"চাইনে রে মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।" (অচেনা)

প্রাণের স্তরে প্রেমের অসহনীয় বিষজ্বালা সহ্য করিবার মত শক্তি কবি-প্রাণের আর নাই, অথচ তাহার অমৃতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু প্রাণের বিষ আকণ্ঠ পান না করিলে ধ্যানে অমৃত লাভ করিতে পারা যায় না।

এই চেতনা-লোকে প্রেমের যে অনুভূতি, তাহার পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যেও লাভ করিতে পারা যাইবে। এ প্রেমে প্রাণ নাই, মন তো নাই-ই।

"দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।" (সোজাসুজি)

মানুষের একটি সত্তা বাহিরের আর একটি সত্তা অন্তরের। একটি তাহার জীব-সত্তা অপরটি অধ্যাত্ম-সত্তা। এই অধ্যাত্ম-সত্তায় অনন্তের সহিত তাহার মিলন। জীব-সত্তায় কত সংখ্যাতীত অনুভূতি জীবনে আসে, তাহার কোন চিহ্নই পরবর্ত্তী জীবনে থাকে না।

সাধারণ মানুষের জীবনে এই বাইরের জীবনটাই সত্য। অধ্যাত্ম-সত্তার কোন বিকাশ নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা যায় না। এই সমস্ত মানুষ বিচিত্র বোধ বকে লইয়া বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যায়। ক্ষণিকায় কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেম লীলা এই বাইরের জীবনে।

"যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকতে দিয়ো।
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।" (অসাবধান)

প্রেমে প্রাণের যে অসহনীয় প্রকাশ ঘটে তাহা সহ্য করিবার মত শক্তি আজ কবির দেহ-প্রাণে নাই। আজ অবসিত যৌবনে প্রেম নয়, তাহার অতি ক্ষীণ এক প্রকার আভাস মাত্র লাভ করিয়া কবি ধন্য হইতে চান।

"শান্ত তাবে তাবে তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে।" (স্বপ্নশেষ)

প্রাণ-সমুদ্রে ডুব দিয়া প্রাণের তরঙ্গাঘাত সহ্য করা নয়, দূরে সরিয়া আসিয়া তট প্রান্তের নিশ্চিন্ত সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ করা।

এই মর্ত্ত্য-লোকে আমরা যাহার সহিত মিলিত হই, তাহার সীমাহীন অন্তর্লোকের কতটুকু পরিচয় আমরা জানি। তাহার অতিদূর ক্ষীণ আভাসমাত্র লাভ করিয়া আমাদের পরিতৃপ্ত হইতে হয়। এই জীবনে ওই টুকুই আমাদের প্রাপ্য। তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিতে গেলে বঞ্চনাই হাতে ঠেকে।

নর-নারী আপন আপন হৃদয়-বৃন্তে প্রেমের শিখা জ্বালাইয়া তাহারই স্বল্পালোকে অনন্ত রহস্যপূর্ণ অজ্ঞাত লোকে পথ চিনিয়া চলিয়াছে। ওই দীপ-শিখা যে সঙ্কীর্ণ অংশটুকু আলোকিত করে তাহাই তাহার পরিচিত জগৎ। তাহার বাইরের অসীম জগতের কোন অস্তিত্ব তাহার নিকট নাই। ওই দীপ-শিখার অতি চকিত একটি কিরণ রেখা হয়ত আমাদের হৃদয়ে মুহূর্ত্তে আসিয়া পড়ে। এই সকল নর-নারী সৃষ্টির কোন প্রথম প্রভাতে যাত্রা সুরু করিয়াছিল, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া তাহাদের এই যাত্রার কোথায় অবসান ঘটিবে কে জানে।

আমাদের হৃদয়-পটে তাহাদের কত ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখাপাত ঘটিয়া যায়। তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া তো আমরা লাভ করিতে পারি না। দৃষ্টি-বহির্ভূত-লোকে জীবনের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া যায়, কে জানে। এ জীবনে কিছু দিনের জন্য একত্রে শুধু পথচলা তরী বাওয়া। তাহার পর স্মৃতি মন্থন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। স্বপ্নে মৃত্যুর অন্ধকার-লোক পার হইয়া তাহাদের অশ্রুজলে অন্বেষণ করিয়া ফিরি—জাগরণে নিদ্রায়।

"তুমিও গো ক্ষণেক-তরে
বসবে আমার তরী-'পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা—" (যাত্রী)

যে লোকে কবি নারীকে আহ্বান করিতেছেন, তাহা বহিশ্চেতনার লোক। এই লোকে অনেককে স্থান দান করা যায়। কিন্তু অধ্যাত্ম-লোকে অনেকের স্থান নাই। সেখানে একটি প্রতিমা ঘিরিয়া মন নিত্য আরতি করিয়া চলে। অধ্যাত্ম-লোকেও পরিচিত নর-নারীর অনন্ত সত্তার, তাহার অনন্ত অভিসারের কোন পরিচয় আমরা জানিতে পারি না।

"কোথা তোমার স্থান?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান?" (যাত্রী)

মর্ত্ত্যের প্রেমে অন্তরে যে অধ্যাত্ম-সম্পদ গড়িয়া উঠে তাহাই একটি আঁটি ধান। এই অধ্যাত্ম-সম্পদ বুকে করিয়া নর-নারী এই জীবন ছাড়িয়া কোন্ অজ্ঞাত লোকে অভিসার করে, কোথায় তাহার পরম পরিণাম তাহা আমরা জানি না। তাহাদের ওই বাহিরের পরিচয়ও যখন আমাদের জীবনে থাকে না তখন স্মৃতি-লোকে তাহাদের অন্বেষণ করিয়া ফিরি। জীবনে সে শূণ্যতারও পরিমাপ নাই।

ইহা ঠিক প্রেম নহে, সৌন্দর্য্য-ধ্যানও নহে। জীবনে এই জাতীয় অনুভূতির মূল্য কতটুকু। মানস-লোকের এমন কি প্রাণ-লোকেরও বাইরে এই চেতনার বিচিত্র বিলাস।

"অতি দূরের দেখাদেখি
অতি ক্ষণেক-তরে।" (ক্ষণেক দেখা)

এই ক্ষণিকতা বোধের জন্যই আজ কবির অন্তর শূন্যময়।

"যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রইলে ঢাকা,
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেমনি রইনু ফাঁকা!" (ক্ষণেক দেখা)

আমার অনন্ত সত্তার কোন পরিচয় তুমি জান না, তোমার অনন্ত সত্তার, তোমার অসীম সৌন্দর্য্য ও প্রেমের কোন আস্বাদ আমার জীবনে নাই। তবু আমার স্মৃতি

তোমার সহস্র কর্ম্মের মাঝখানে হয়ত তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনা করিয়া তুলিবে। হয়তো কোন দিন আমার কর্ম্ম ভারাতুর পীড়িত জীবনে তোমার স্মৃতি মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আমার বেদনা সঞ্চিত গুরু ভারকে কিছু ক্ষণের জন্য সহনীয় করিয়া তুলিবে। আমার অন্তরের বেদনা-কৃষ্ণ মেঘের প্রান্তে তোমার মাধুর্য্য অস্তমিত সূর্য্যের আভাস রাঙ্গা স্বর্ণ-রেখার মত।

এই যে কারো স্মৃতি ভাসিয়া উঠিলে আমরা অন্যমনা হইয়া পড়ি, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস অলক্ষ্যে বাহির হইয়া আসে, জীবনে ইহার মূল্য কতটুকু।

যে দুটি বোন ঘাটের পথে জল আনিতে গিয়া সলজ্জ হাস্য ভরে একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাদের অন্তরে তো প্রেম জাগ্রত হয় নাই, যত ক্ষীণ ভাবেই হোক না কেন, তবে এই বোধকে আমরা কি বলিব। অথচ এই অনুভূতি যত ক্ষণ কালের জন্য হোক তাহাদের হৃদয়ে একটি মাধুর্য্যের ক্ষীণ ধারা বহাইয়া দিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশান কোনে অকস্মাৎ ঘন কালো মেঘ উঠে। নিম্নে তমাল বনের সহিত তাহাদের রঙ্গ মিলিয়া যায়। চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া কালো কোমল ছায়া নামে। নির্জন প্রান্তরে এই অপরূপ মুহূর্ত্তে একটি শ্যামাঙ্গিনী কিশোরীর সাক্ষাৎকার। সেও অমনি পরিপূর্ণ শ্যামল মেঘের মত মাধুর্য্য ভারাবনত। ঝড়ের মুখের মেঘের মত অমনি চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত। মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া কোথায় চলিয়া যায়।

"আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।" (কৃষ্ণকলি)

ইহা কি প্রেম, না সৌন্দর্য্য-ধ্যান? যত মুহূর্ত্তের জন্য হোক, একটা খুসির ধারা অন্তরকে প্রভাত কিরণ দীপ্ত শিশির কনার মত অপরূপ মায়াময় মাধুর্য্য পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। এই ক্ষণও তো মিথ্যা নয়। আকাশ শাশ্বত স্থির। মেঘ কোথা হইতে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হয়, আবার কোথায় ভাসিয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ মেঘের অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ তো মেঘকে মিথ্যা বলিতে পারি না। মানুষের

প্রাণে যে বিচিত্র অনুভূতি মুহূর্তে মুহূর্তে আবির্ভূত হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাও সত্য।

"এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।" (কৃষ্ণকলি)

এই প্রসঙ্গে পরিশেষে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিব। কবিতাটির নাম 'ভর্ৎসনা'। কবিতাটির মধ্যে কবির এই মনোভাবটি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি আজ প্রাণ-লোকে নয়, তাহার বহিঃঙ্গনের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জীবনে কবি আজ কেবল ওই টুকুর প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন।

"আমি আমার পথে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ডদুয়ের তরে।" (ভর্ৎসনা)

'তোমার ঘরে' নহে, 'তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে' দণ্ড দুয়ের জন্য কবি স্থান লাভ করিতে চাহিয়াছেন।—অর্থাৎ আজ কবি সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে হৃদয়ে আহ্বান করেন নাই, করিয়াছেন হৃদয় নিরুদ্ধ কোন বহিশ্চেতনা-লোকে।

নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম, এক কথায় প্রাণের কোন সম্পদ আজ কবির আকাঙ্ক্ষিত নয়।

"আমি তোমার ফুল্ল পুষ্প বনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই তো ফল।" (ভর্ৎসনা)

বাস্তব জীবনে কবি যখনই বঞ্চনা লাভ করিয়াছেন, মর্ম্মন্তুদ বেদনার ভারে যখনই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, তুচ্ছতায় দীনতায় যখন অন্তর ভরিয়া ধিক্কার জাগিয়াছে, তখন অন্তরের ধ্যান-লোকে ডুবিয়া গিয়া এই সমস্ত কিছু হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সেদিন নারী-প্রেম ও সৌন্দর্য্য-ধ্যান এক পরম মাধুর্য্য-লোকে কবিকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। আজও কবির জীবনে দারুণতম দুঃখ ব্যথা-বেদনা আছে, কিন্তু প্রাণ-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া ধ্যানের আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ হইবার সে আকাঙ্ক্ষা নাই। নারীর নিকট কবির আজ যে সামান্যতম আকাঙ্ক্ষা তাহা প্রাণের বাহির লোকেই চরিতার্থ হইতে পারে।

'আষাঢ়' কবিতাটির মধ্যে কবি একদিন প্রাণপণ বলে হৃদয় নিরুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। কবির সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রাণধারা উৎসারিত হইয়াছে। তাহার পর বেদনার সমুদ্র মথিত করিয়া পরিণামে ধ্যান-লোকটিও ভাসিয়া উঠিয়াছে। নববর্ষার মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে কবির সেই প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। সেই সঙ্গে বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত কবি আপনার প্রাণের যোগ অনুভব করিয়াছেন।

"নব তৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।" (নববর্ষা)

প্রাণের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কবি-চিত্তে অফুরন্ত ভাব ও ভাবনা জাগ্রত হইয়াছে। সেই সকল ভাব-ভাবনা মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের মত অনন্ত শূন্যে উধাও হইয়া চলিয়াছে, কোন্ আলোক তীর্থের পানে কে জানে। কবি হৃদয়ের এই অসীম ব্যাকুলতা, পরিব্যাপ্ত আনন্দ-বেদনার এমন অসহনীয় প্রকাশ এই কাব্যে ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই।

"শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,—" (নববর্ষা)

প্রাণ-লোকে কবি আবার একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব গড়িয়া তুলিযাছেন। এই তত্ত্ব বুদ্ধি দ্বারা গড়িয়া তোলা নয়, ওই চেতনালোকে অনিবার্য্য রূপে এই সাক্ষাৎকার ঘটে। এই জাতীয় তত্ত্বের পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি। আমি এই প্রসঙ্গে দুই একটি কবিতা উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে এই তত্ত্বটির স্বরূপ আর এক বার বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

"ইচ্ছে করে কোন মতেই সান্ত্বনা আর মানব না রে,
এমন সময় নতুন আঁখি তাকায় আমার গৃহদ্বারে—।" (অনবসর)

যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অন্তরে প্রেম অনুভূত হয় সেই মূর্ত্তিটি যখন হারাইয়া যায় তখন আমাদের হৃদয় শূন্যতায় ভরিয়া উঠে। প্রাণের জাগরণ যত অধিক, শূন্যতা বোধও তত অতল স্পর্শী হইয়া উঠে। তাহার পর এই শূন্যলোক পূর্ণ করিয়া একদিন ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। যেখানে ধ্যানে এই পরিণাম ঘটে না সেখানে নর-নারী শূন্যতার অতল গহ্বরে তলাইয়া যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্যান-লোকের দ্বারা নয়, নূতন প্রাণ স্পর্শে প্রাণের শূন্যতা ভরিয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত প্রাণ-ধারা নর-নারীর চিত্তকে অধিককাল শূন্য থাকিতে দেয় না। প্রাণ জাগ্রত করিয়া তুলিতে প্রকৃতির মধ্যে সদা জাগ্রত অতি নিপুণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

প্রাণ ধর্ম্মকে নর-নারী স্বীকার করে পরিণামে প্রাণকে জয় করিয়া উঠিবার জন্য। নিত্য নূতন প্রাণের প্রকাশে, উহার জন্য নিত্য নূতন আধার পরিবর্ত্তনে মানবীয় চেতনা ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

প্রাণের শূন্যতা ধ্যানে পূর্ণতা লাভ করিলে অন্তরে আবার যে বোধ ফিরিয়া আসে তাহা আনন্দ নহে, বেদনাও নহে, উভয়ের অতীত এক শান্ত পরিণাম।

যে বোধ আশ্রয় করিয়া কবি এখানে প্রাণের শূন্যতা ভরিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে মানুষকে সাধনা করিতে হয় না। এই তত্ত্বের মূল কথা হইল ভিন্ন রূপ ভিন্ন আধরের ভিতর দিয়া একই প্রাণের (প্রেমের) নিত্য নবীন প্রকাশ। বিশিষ্ট রূপের জন্য হাহাকার তুলিয়া লাভ কি, নূতন রূপে নূতন করিয়া তাহাকেই ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ কর। সকল রূপের ভিতর দিয়া এক আদি প্রাণ অনুভূত হয়।

"এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোনে।" (অতিবাদ)

সেই প্রাচীন তত্ত্বটির কথাই উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলাম। ইহা সেই প্রাণ তত্ত্ব। অন্তরে প্রাণের প্রকাশ ঘটাইতে চান কবি। রূপে বা আধারে পার্থক্য যতই থাক, প্রাণেরবোধ সকল ক্ষেত্রে এক। প্রাণের সাধনা যেখানে একমাত্র সত্য সাধনা, সেখানে আধার পরিবর্ত্তনে কোন বাধা থাকিতে পারে না। বিস্মৃতি যদি জীবনে সত্য হয় তবে 'ক্ষমার' প্রশ্ন উঠে কেন? সুন্দরীর পক্ষেও এই বিস্মরণ সত্য। সুন্দরীর স্মৃতি-লোকে চিরন্তন হইয়া থাকিবার এই ব্যাকুলতাই বা কেন।

জীবনে অধ্যাত্ম-পরিণাম লাভ লক্ষ্য বলিয়া প্রেমে আধার পরিবর্ত্তন একপ্রকার অসম্ভব। প্রেম যেখানে আধার পরিবর্ত্তন করে সেখানে নর-নারীর কোন অধ্যাত্ম পরিণাম নাই।

ইহার পরে কবি আজ কোন্ কথা বলিতেছেন—

"ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে
বসি পায়ের পাশে।" (অপটু)

আজ অঙ্গ ঘিরিয়া ক্লান্তি নামে কেন? ওই চেতনা-লোক পরিহার করিয়া কবি কেন একটি নিভৃত-লোক অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন? এই নিভৃত-লোক অবশ্য কবির ধ্যান-লোক। কবি আজ প্রাণের লোক পরিহার করিয়া অন্তরে ধ্যান-লোক অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। প্রাণের বহির্লোকে এক প্রকার লীলা হয়ত করা যায়, কিন্তু তাহাতে দীর্ঘকাল নিমগ্ন থাকা একপ্রকার অসম্ভব। প্রাণ ও মনের ক্ষুধার দুরন্ত নিপীড়নকে দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ করিয়া রাখা মনুষ্য সাধ্যাতীত। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, যাঁহার প্রাণ ও মন এতদূর সমৃদ্ধ।

কোন বিশেষ প্রাণ বিশ্ব পরিব্যাপ্ত প্রাণ-সমুদ্রে হারাইয়া গেলে আমরা বলি মৃত্যু। অন্য কোন রূপ আশ্রয় করিয়া আবার যে প্রাণের প্রকাশ ঘটে তাহাতে বিশ্ব-প্রাণের যোগে সেই বিশেষ প্রাণ আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে। কিন্তু প্রেম যে বিশেষ রূপটিকে ফিরিয়া লাভ করিতে চায়। কোন তত্ত্ব তাই ওই রূপ-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে না। মানুষের সান্ত্বনা শূন্য হাহাকার একটি বিশেষ রূপের সহিত বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রাণের এই জাতীয় পিপাসাকেও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাণের যে কোন অনুভূতির মধ্যে সেই বিশেষ প্রাণও অনুভূত হয়। মৃত্যু নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসা মাত্র। তবু এই বিদায়টিকেও কবি জীবনে একান্ত মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করেন নাই। ক্ষণিকের এই অন্তর্দ্ধানটিও তো সত্য।

"ক্রমে ক্রমে ক্ষণেক-তরে
এনো গো জল আঁখির 'পরে
আকুল স্বরে যখন কব
সময় হল যাবার।" (বিদায় রীতি)

মৃত্যু পূর্ব্বে মানুষের প্রীতি স্পর্শ লাভের সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। মর্ত্ত্যের আসক্তি বিজড়িত ক্ষণস্থায়ী অসহায় প্রেম। এই প্রেম যে কত বার বার জীবনে

অপূর্ব্বতার আস্বাদ দান করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে মর্ত্ত্য-প্রেমের এই অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়া এই জীর্ণ দেহাধারাটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। জীবনের এই নিয়তি।

অথচ ইতিপূর্ব্বে কবি এই অশ্রুপাতকে পরিহাস করিয়াছিলেন. তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা তো দূরের কথা। প্রাণের বহির্লোকে কবি একদিন জীব-জীবনের সকল নিয়তি-নিয়মকে অস্বীকার করিযা বসিয়াছিলেন। এমনি করিয়া উহা আবার জয়ী হইতে চাহিযাছে।

হৃদয়বোধ নিরুদ্ধ করিযা সৌন্দর্য্য ও প্রেম আস্বাদের পশ্চাতে রহিয়াছে জীব-জীবনের নিয়তিকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সহিত অনিবার্য্য রূপে যে বেদনার প্রকাশ ঘটে তাহাকেই নিযতি বলিযাছি। জীবনের এই দশা আশ্রয করিয়া মানুষের সকল নীতি গড়িযা উঠিযাছে। এই বেদনা জয় করিতে পারা যায়, হয় প্রাণের উর্দ্ধে ধ্যান-লোকে উঠিয়া, নতুবা হৃদয় নিরুদ্ধ করিযা, কিংবা হত্যা করিয়া। কবি কোন্ পথ আশ্রয করিয়াছিলেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সে চেষ্টা যে সার্থক হয নাই, অর্থাৎ কবি-চিত্তে যে বেদনা সঞ্চারিত হইযা গিয়াছে তাহা নিম্নের কযেকটি পংক্তির মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

"আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা,—" (স্থায়ী-অস্থায়ী)

এই বেদনা বোধের ভিতর দিয়া বিগত প্রেম ধ্যান-লোকে আর এক আনন্দ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে। এখানেও বেদনা থাকে, কিন্তু এই ব্যথার দোলনে আনন্দ-শতদল একটির পর একটি করিয়া দল মেলিতে থাকে।

কবি এই রূপে ধীরে ধীরে আর একটি নূতনতর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। জীবনও জগৎ যে স্বরূপে, যে অর্থান্বিত হইয়া কবির নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

"এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা," (বিলম্বিত)

কবির হৃদয়-নিরুদ্ধ সৌন্দর্য্য ও প্রেম লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার সহিত তুলনা মূলক ভাবে এই পর্য্যায়ের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের কবিতাগুলি আলোচনা করিলে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। প্রাণের জাগরণ ঘটিলেও ধ্যান-লোকটি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। এই পর্য্যায়ে কবি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেও বিশ্বপ্লুত সেই ধ্যান-তন্ময়তা এখনও দেখা দেয় নাই।

পথের উভয় পার্শ্বে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত দুর্লভ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কবির স্মৃতি-লোক উদ্বেল হইয়া উঠে। অন্যমনা হইয়া কবির আঁখি পাতা বুঝি ভারী হইয়া আসে। ইতিপূর্বে এই বেদনা-লোক বা স্মৃতি-লোকটিকে কবি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

"কয়েক দিন সে ফাগুন-মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে সেই
মনে জাগে।" (পথে)

জন্মান্তর কবিতাটির মধ্যে কবি আপনার অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকটিকে বাস্তবে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের পরিচয় পাওয়া যাইবে 'কূলে' কবিতাটির মধ্যেও। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের স্বরূপ বিচার না করিয়াও বলা যায় সৌন্দর্য্য-পিপাসার এই পরিচয় ইতিপূর্বে ওই ক্ষণতত্ত্বের মধ্যে কোথাও ছিল না।

প্রেম বা সৌন্দর্য্য সম্ভোগের একটি ধীর পরিণাম লাভের সুন্দর ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে 'এক গাঁয়ে' কবিতাটির মধ্যে। একদিকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের প্রারম্ভিক অবস্থা, অন্যদিকে তাহার ধ্যান-তন্ময় অধ্যাত্ম পরিণাম।

"তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।" (এক গাঁয়ে)

নিম্নে যে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে কবি-প্রাণের জাগরণই কেবল নয়, ধ্যান-লোকটিও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একটি রূপের মধ্যে তাই বিশ্ব-রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে। রূপ এইরূপে বিশ্ব যোগে অপরূপ হইয়া উঠে।

"তোমার দুখানি কালো আঁখি 'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণ ডালা।" (অভিনয়)

এমনি করিয়া কবি পরিণামে অধ্যাত্ম-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। এই পর্য্যায়ের কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া কবির সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান-রূপের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবি পরিণামে অসীম বা অরূপের স্পর্শ লাভ করিতেন এবং তাহারই দিব্য স্পর্শে তাহার অন্তর সোনায় পরিণত হইয়াছে। কবির কাব্যে সেই স্বর্ণ রেণুর সন্ধান লাভ করা যায়। ধ্যানের প্রগাঢ়তায় এবং তন্ময়তায় কবি রূপের সীমাটিকে প্রায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

"নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব্ব ধন যত।" (বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ)

অধ্যাত্ম-লোকের গভীর হইতে গভীরে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে কবি চলিয়াছেন। আর সেই অধ্যাত্মোপলব্ধির অপূর্ব্ব ধনকে কবি কাব্য-পুটে সাজাইয়া দিয়াছেন।

সংসারের নিকট হইতে মানুষ যাহা লাভ করে, পরিণামে সংসার তাহার শেষ মূল্য পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লয়। জীবনে এই পরিপূর্ণ করিয়া পাওয়া এবং নিঃশেষ করিয়া হারাণোর ভিতর দিয়া অন্তরে যে অধ্যাত্ম-সত্তা গড়িয়া উঠে মৃত্যুতে তাহাই মানুষের একমাত্র পাথেয়। আর সমস্ত কিছুকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। আর সকল রূপের আলো সেদিন নিভিয়া যায়। কেবল অধ্যাত্ম-সম্পদটি ধ্রুব তারকার মত জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া মানবাত্মার যাত্রাপথ প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলে। বহির্জীবনের বঞ্চনা, লাভ-ক্ষতি মানুষের জীবনে তাই কিছু নয়, যদি তাহার ভিতর দিয়া অন্তরের ধ্যান-লোকটি গড়িয়া উঠে।

"তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখী-সম এলে মোর বুকে—" (কৃতার্থ)

প্রাণের সম্পদকে কবি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু জীবনে তাহাই পরম সম্পদ নয়। ইহার ভিতর দিয়া একদিন অধ্যাত্ম-সত্তার বিকাশ ঘটে। অধ্যাত্ম-সত্তায় অসীমের সহিত মানুষের যোগ। এই সত্তায় জন্ম-মৃত্যুর সীমানা একাকার হইয়া

যায়। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহের ভিতর দিয়া মানুষের অধ্যাত্ম-সত্তা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ইহ জীবনের এই সার্থকতা। এই জীবনের আর সমস্ত কিছু মিথ্যা বা মায়া। এই অধ্যাত্ম-সত্তার ভিতর দিয়া মানুষ পরিণামে অমৃতের আস্বাদ পায়, মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে।

"যদি চরণ পড়ে থাকে কোন একটি বারে
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে সোনাব মৃত্যু-পারে।" (যৌবন বিদায়)

সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে কবি যৌবনে এমনি করিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। আজ অতিক্রান্ত যৌবনে কবি মানব জীবনে উহার মূল্য কতখানি তাহার একটি হিসাব করিতে চাহিয়াছেন 'শেষ হিসাব' কবিতাটির মধ্যে।

ইহাতে যদি কেবল শূন্যতাই হাতে ঠেকে, জীবন একান্ত বঞ্চনা বলিয়া বোধ হয় তবু সামগ্রিক জীবনের মূল্য তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। মর্ত্ত্য জীবন অসীম পরিব্যাপ্ত জীবনের একটি সামান্য পর্য্যায় মাত্র। অনন্ত জীবন যাত্রার পথে ইহ-জীবনের বঞ্চনা যত বড হোক না কেন, একদিন তাহা বিস্মৃতির তলে লীন হইয়া যাইবে। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মোহে নর নারীর একান্ত সীমাবদ্ধ জীবনে জীবন ও জগতের অসীমতা বোধটি থাকে না।

"জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,
তোমাব বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।" (শেষ হিসাব)

মানুষের সার্থকতা তাহার অধ্যাত্ম সত্তায়। মর্ত্ত্য জীবন হইতে মুখ না ফিরাইয়া লইলে অন্তরের ধ্যান গড়িয়া উঠে না।

"তুমি একা জগৎ-মাঝে
প্রাণের মাঝে আরেক একা।" (শেষ হিসাব)

জীবনের সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া অন্তরের মধ্যে আর এক পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে। মানুষের ইহ-জীবনের ইহাই মহত্তম প্রাপ্তি। পরম দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষকে এই সম্পদ লাভ করিতে হয়।

সৌন্দর্য্য-ধ্যান যখন কবি-চিত্তকে তন্ময় করিয়া তুলিয়াছে, তখন রূপ বিগলিত হইয়া আর এক সৌন্দর্য্যের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে।

'মেঘ মুক্ত' টির কবিতা মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বাহিরের সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে কবির ধ্যান-লোকে আর এক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের লোকটিকে তো কবি নানা ভাবে তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। পুরাতন প্রাণের কথাটিকে নিত্য নূতন করিয়া বলিয়াছেন। তাহার পর ওই ধ্যান-লোকে কবি সম্পূর্ণ রূপে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-ধ্যানের সেই ধীর তন্ময়তা।

"কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমিব নিবিড় ঘন ঘোব ঘুমে
স্বপন প্রায়।"

ধ্যানে মানবীয় চেতনা সে অমর্ত্ত্যের আভাস লাভ করে, যে আকস্মিক জ্যোতি প্লাবনে মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যের উভয় তীর প্লাবিত হইযা যায় তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ অসম্ভব। চেতনা দিব্য-ভাবরূপে যেখানে মর্ত্ত্য বা রূপের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, সেই অলৌকিক পরিবর্ত্তনের পর্য্যায় যে কী তাহা আমরা জানি না।

প্রাণের বহির্লোকে কবি যে লীলারস আস্বাদ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই লালার পরিচয়, সেই ক্ষণিকা তত্ত্ব আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। ওই লোকে জীবন ও জগতের যে স্বরূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়।

"সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল
নুয়ে নুয়ে যেত ফুল দল।" (আবির্ভাব)

পরিপূর্ণতার একটা প্রকাশ যেমন অন্তরে আছে, তেমনি বাহিরেও আছে। বহির্বিশ্বের সহিত মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে ততই বিশ্বের মধ্যে যেমন তেমনি আপনার মধ্যে এই অখণ্ডতার বোধ বাড়িয়া যাইতে থাকে। উন্নততর চেতনালোক লাভ করিতে সেই এক বিশ্ব ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

একদিকে বহির্বিশ্বে

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।" (আবির্ভাব)

অন্যদিকে অন্তর্লোকে তাঁহার প্রকাশ

"আকুল করেছ শ্যাম সমরোহে
হৃদয়-সাগর উপকূল।" (আবির্ভাব)

জগৎ ও জীবনের ক্ষণ তত্ত্বে কবি বড় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উর্দ্ধতর প্রেরণার দুর্নিবার প্রাবল্যে সকল বন্ধন কোথায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কবি স্বয়ং বিস্মিত।

"কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি
দূরে করি দিবে ববষণ,
মিলাবে চপল দরশন ?" (আবির্ভাব)

মর্ত্ত্যের প্রেম এখন কেমন অপরিম্লান অচঞ্চল অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিয়াছে। কবি সেই ধ্যান-লোকের পরিচয় দিয়াছেন।

"অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।" (কল্যাণী)

যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের অন্তরে প্রেম জাগে, তাহার অনন্ত স্বরূপের কতটুকু পরিচয় মানুষ জানে। তাহার অনন্ত অভিসারের পথে আকস্মিক কয়েক মুহূর্ত্তের একত্র পথ চলার যে স্মৃতি রহিয়া যায় সেই স্মৃতিই নিত্য তাহার হৃদয়কে আনন্দ নিমগ্ন করিয়া রাখে।

কত লোক হইতে লোকান্তরের ভিতর দিয়া কত রূপ আশ্রয় করিয়া তাহার অনন্ত অভিসার। সেই অনন্ত কোটি রূপ বিবর্ত্তনের কোন পরিচয় মানুষ জনে না। মানুষের প্রেমে তাহার একটি মাত্র রূপ ধ্যান-লোকে অমর হইয়া থাকে।

প্রাণের বিক্ষোভের উর্দ্ধে মানুষ পরিণামে ধ্যানে চির অম্লান সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোকটি লাভ করিয়া ধন্য হয়।

"তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।" (কল্যাণী)

যে লোক আশ্রয় করিয়া মানুষ অসীমের স্পর্শ লাভ করে তাহাই অধ্যাত্ম-লোক। এই অধ্যাত্ম-লোকে কবি অসীমের যে প্রেরণা অনুভব করিতেন, তাহা তাঁহার সৃষ্টি-প্রেরণাও বটে।

"আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে—" (কল্যাণী)

সেই ধ্যান-লোক এবং প্রগাঢ় ধ্যান তন্ময় মুহূর্তে কেমন করিয়া অন্তরে অসীমের ছায়াপাত ঘটে তাহারই পরিচয়।

"সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।" (অন্তরতম)

তারপর

"চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।" (অন্তরতম)

এইরূপে কবি ধীরে ধীরে মর্ত্ত্যের প্রাণ-লীলার ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

"পথে যত দিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।" (সমাপ্তি)

বহির্লোকের বহুবিচিত্র রূপ ধ্যান-লোকে একটি রস-বিগ্রহে পরিণত হয়।

'ক্ষণিকা' র এই অধ্যাত্ম জাগরণ একান্ত আকস্মিক ভাবে কবির এক প্রকার অজ্ঞাতেই ঘটিয়া গিয়াছে। নিয়তির অমোঘ নিয়মের বশে 'ক্ষণ'-চেতনার লোক হইতে শাশ্বত অধ্যাত্ম-লোকে অধিষ্ঠিত হইয়া যাইতে কবি স্বয়ং বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন।

"অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে।" (সমাপ্তি)

কিন্তু জীবনের প্রতি গভীর আসক্তিকে তো সহজে মুছিয়া দেওয়া যায় না কবির পক্ষে তাহা আর ও কষ্টকর। জীবনকে অমন করিয়া ভালবাসিতে কবির মত আর কে পারিয়াছে। আরও পরিণত বয়সে অধ্যাত্ম-পিপাসা যত গভীর হইয়াছে, জীবনের প্রতি মমতা তত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কবির সে এক অত্যাশ্চর্য্য মানসিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের পরিমাপ করিবে কে?

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রু জলের রেখা।" (সমাপ্তি)

নৈবেদ্য

মনকে যতই প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ করা যাক না কেন, তাহা আদৌ সীমার বোধ বলিয়া উহার সহায়তায় অসীমের উপলব্ধি অসম্ভব। মানুষ কেবল এই চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

মন ও বুদ্ধির সহায়তায় জগৎ ও জীবনের স্বরূপ কিংবা অর্থ নিরূপণের যে চেষ্টা তাহা অহং বা আমিত্বের বোধ দ্বারা তাহারই বিচিত্র সংস্কার এবং বাসনার অনুকূল করিয়া গড়িয়া তোলা একটি খণ্ডিত ধারণা মাত্র।

সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী প্রয়াসের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহা নিসংশযে উপলব্ধি করিয়াছেন যে মানবীয় চেতনায় জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ লাভ ঘটে না। নৈবেদ্যের মধ্যে তাই কবির মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া উঠিবার অমন প্রাণপণ প্রয়াস।

"আমি যত দীপ জ্বালি শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালি,—"

মানবীয় চেতনাকে ভিত্তি করিয়া তাহাকেই একমাত্র সত্য-ধৃতি বলিয়া মানিয়া লইয়া জীবন ও জগতের যে স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস তাহা এমনি ব্যর্থ হইয়া যায়। অমর্ত্ত্য-লোক হইতে যখন আলোক নামে তখন আর সংশয় থাকে না।

রুদ্ধ গৃহের অন্ধকার দূর করিতে আমরা প্রদীপ জ্বালি। উহারই ক্ষীণ আলোকে, আভাসে প্রত্যয়ে আমাদের দিন একভাবে কাটিয়া যায়। মনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বুদ্ধি ও কল্পনার আলো জ্বালাইয়া আমরা জীবনের অর্থ নিরূপণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। সে চেষ্টা অমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়।

রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিলে অবারিত আলোর ধারা নামিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত কিছুকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, তেমনি আর কিছু নয়, মানবীয় চেতনার সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, তাহা হইলে মানবীয় চেতনার সকল প্রয়াস স্তম্ভিত হইয়া অনন্ত সত্যের প্রকাশ আপনিই ঘটিবে।

মন ও বুদ্ধির সহায়তায় অসীম বা অরূপের স্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব। ওই লোকে অধিষ্ঠিত হইলে যে সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, যে পূর্ণ জ্ঞানে সমগ্র চেতনা

উদ্ভাসিত হইয়া যায়, দেহ-প্রাণ-মনে যে অলৌকিক আনন্দের শিহরণ জাগে, তাহা মানুষ যদি মুহূর্তের জন্য আভাস স্বরূপেও লাভ করে, তাহা হইলে তাহার এই বুদ্ধি জাত প্রয়াস, এই সকল জ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই বিচিত্র আনন্দ তত্ত্ব একান্ত তুচ্ছ হইয়া উঠে। অনন্ত জ্যোতির প্লাবনে উহারা জীর্ণ পত্রের মত কোথায় ভাসিয়া যায়।

মনুষ্য বুদ্ধি বহু শাখা যুক্ত। এই জীবন ও জগৎ লইয়া উহা তাই অনন্ত তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। মানুষ বুদ্ধি ও বোধের সহায়তায় সৃষ্টির আদিকাল হইতে বিচিত্র তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এইরূপে গড়িয়া তুলিবে। সীমাশ্রয়ী এই সকল তত্ত্বের আদি নাই, অন্ত নাই। এই প্রত্যেকটি তত্ত্বের মধ্যে সত্য কিছু-না-কিছু থাকে, (মানবীয় চেতনার ইহাই স্বরূপ) কিন্তু পূর্ণ সত্যের প্রকাশ ইহাদের মধ্যে নাই।

রাত্রির অন্ধকারে আমরা দীপ জ্বালি, আকাশে নক্ষত্র শ্রেণী শোভা পায়, খদ্যোৎ আলোর মায়া রচনা করে, আলেয়া প্রহেলিকা সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে জ্যোতি-র্ম্ময় সূর্য্যের প্রকাশ কতটুকু। সূর্য্যোদয়ে ওই সমস্ত কিছু মিথ্যা হইয়া যায়। সীমা ও অসীম, মানবীয় ও ঈশ্বরীয় চেতনা তেমনি ভাস্বর সূর্য্যের পার্শ্বে দীপ-শিখা। সীমার বোধ ছাড়াইয়া কবি তাই অসীমের বোধে আপনার চেতনাকে উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছেন।

"পরশ মণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে নিক পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।"

জীবন ও জগৎকে দুটি চেতনায় প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি মানবীয় চেতনায়, অপরটি দিব্য-চেতনায়, একটি সীমার দিক হইতে অপরটি ভূমা বা অসীমের দিক হইতে।

আমরা আমাদের বোধের দ্বারা এবং এই বোধের সহিত অন্বিত করিয়া জীবন ও জগৎকে উপলব্ধি করি। মানবীয় বোধ খণ্ডিত বলিয়া ওই উপলব্ধিও খণ্ডিত। এই আমির বোধ দ্বারা গড়িয়া তোলা সীমার অতীত লোকের অস্তিত্ব আমাদের

চেতনায় থাকিতে পারে না। আমার 'আমি'র এই জগৎ হইতে যখন কিছু স্খলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহা আমাদের বোধের অতীত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে একান্ত বিনষ্টি বা শূন্যতা ছাড়া আর কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমার চেতনায় যাহার অস্তিত্ব, আমার চেতনার বহির্লোকে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

তাই আমির চেতনায় সীমার বোধে এই অনস্তিত্বের অসহনীয় বেদনা আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে লাভ করিতে হয়। মানুষের এই শোকে সান্ত্বনা নাই। সেখানে সমস্ত কিছু মুহূর্ত্তে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ; বুকে যাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি, তাহা হৃদয় শূন্য করিয়া পর মুহূর্ত্তে কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। চক্ষু মুছিয়া আবার আশায় বুক বাঁধিয়া আর কাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছি। সেও একদিন হৃদয়ে দারুণতম শেল বিদ্ধ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। মানব জীবন লইয়া এই এক রক্ত মোক্ষণকারী নিষ্ঠুরতম লীলা চলিতেছে। জীব-জীবনের এই নিয়তি সাক্ষাৎকার।

"নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউ গুলি কোথা ধায়।"

মর্ত্ত্য-চেতনার সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে দিব্য-চেতনা-লোকে মানুষ জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুকেই অনন্ত স্বরূপ বলিয়া বোধ করে। যাহা অনন্ত স্বরূপ অনন্তের প্রকাশ সে কোথায় হারাইয়া যাইবে! অনন্তের বাহিরে তো কিছু থাকিতে পারে না।

"যাহা যায় আর যাহা থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।"

অন্যত্র কবি বলিতেছেন

"বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।"

"বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু" বলিতে এই জাগতিক চেতনায় 'আমি' বা সীমা-বোধের মধ্য দিয়া জগৎ ও জীবনের অর্থ অন্বেষণের চেষ্টার কথাই কবি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

কবি তাই সীমার সকল বোধ ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য উন্মুখ। আসক্তির সকল

বন্ধন ছিন্ন করিয়া তবে অসীমের পথে যাত্রা করিতে হয়। এই দুঃসহ বেদনার কী পার আছে! ইহাতে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন ছিন্ন হইয়া যায়। আর একটি বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষ একদিন এমন বেদনাকেও জয় করিয়া উঠে। এই বোধ একটি বিশেষ মনোভাব, অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে 'আমার' পরিপ্রেক্ষিতে নয়, 'তোমার' পরিপ্রেক্ষিতে দেখা। "এই দেহ-প্রাণ-মন তোমার লীলার আধার, তোমার কর্ম্মের আয়ুধ। আমার জীবনে তোমার সকল দান তোমার কোন নিগূঢ় ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহা চরিতার্থ হইলে তুমি কোন একটা স্বরূপে তাহাদের তোমার মধ্যে আবার সংহত করিয়া লইবে।"

এই মনোভাবটিকে নিয়ত চর্চ্চা করিয়া চিন্তা এবং জীবনকে একান্ত করিয়া তুলিতে হয়। পরিণামে আমিত্ব বোধের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন ও আসক্তির সকল বেদনা দূর হইয়া যায়। এই মনোভাব ব্যতিরিক্ত আসক্তি জয়ের যে চেষ্টা তাহাতে আস্তিক্যের কোন দিক নাই বলিয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। উহা তাই জীবনে ঘোর শূন্যতার সৃষ্টি করে। ইহা আনন্দের সাধনা নয়। এই আনন্দের অভাবে মানুষের দেহ-প্রাণ-মন জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

"তীর সাথে হেরো শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান।
রশি খুলে দেবে কবে মোরে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।"

ইতিপূর্ব্বে জীবন ও জগতের যে স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, কবি তাহার নানা পরিচয় তাঁহার কাব্য মধ্যে দান করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কবি অপূর্ণতার পীড়া বোধ করিয়াছেন। পরিপূর্ণতা কোথায় যেন রহিয়াছে, তাহারই কতকগুলি আভাস ও ইঙ্গিত লইয়া সেই পূর্ণ রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিবার ইহা শুধু ব্যর্থ চেষ্টা।

দিব্য-চেতনা সাক্ষাৎকারে কবির কাব্য সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টির আধারে পরিণত হইবে, ইহা কবি বিশ্বাস করিতেন।

"তারা শুনাক এবার
সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা,
সীমাশূন্য নির্জ্জনের অপূর্ব্ব বারতা।"

সীমার দিক হইতে জীবন ও জগৎকে সাক্ষাৎ করা যায়, জীবনে ইহার একটি বিশিষ্ট রস-প্রেরণা আছে, এই রস মানুষের একটি বিশিষ্ট পিপাসা চরিতার্থ করিয়া থাকে। জীবন ও জগৎকে আবার অসীমের দিক হইতে দেখা যায়। এই সাক্ষাৎকারের একটি বিশিষ্ট রস প্রেরণা আছে। উহা মানুষের আর এক পিপাসা চরিতার্থ করে।

এতকাল কবি সীমার দিক হইতে জীবন ও জগতের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এখন অসীমের দিক হইতে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুল।

অসীম আদৌ সীমা বোধের বিস্তার নয় বলিয়া, অসীমকে লাভ করিতে মানবীয় সকল বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। ইন্দ্রিয় আমাদের সকল উপলব্ধির আশ্রয়। ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বোধকে আমরা এক একটি ভাব-সূত্রে গ্রথিত করিয়া মানস-লোকে নানা তত্ত্ব গড়িয়া তুলি।

অসীমে অধিষ্ঠিত হইতে তাই ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া দিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে চেতনার যে ক্ষীণ দীপ জ্বালাইয়া আমরা এই বিশ্ব-রূপ দর্শন করি, সেই সকল দীপ একে একে নিভাইয়া দিতে হয়। তাহার পর অন্তরে ভাব-লোকে যে বিচিত্র রূপ-লোক ইতিপূর্ব্বে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেও ধীরে ধীরে মুছিয়া দিতে হয়।

> "বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
> ধীরে ধীরে মৃদু হস্তে লও তুমি টানি
> সর্ব্বাঙ্গ হৃদয় হতে, দীপ্ত-দীপাবলি
> ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি
> দাও নিবাইয়া"

কেবল অন্তরের পথে ধ্যান-লোকের ভিতর দিয়া দিব্য-চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করিতে হয়। বাহিরে আর কোন স্বরূপে তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নৈবেদ্যের মধ্যে ইহার যে স্বীকৃতি আছে তাহার পরিচয় লাভ করিতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> "সেথায় সকলি স্থির নির্ব্বাক
> ভাষা পরাস্ত মানি।"

"যখন সূর্য্য ও চন্দ্র অস্তমিত, অগ্নি নির্ব্বাপিত, যখন বাক্ নিরুদ্ধ তখন এখানে মানুষ কোন্ আলোক পায়?' তিনি বললেন, 'তখন বস্তুত আত্মা আলোক হয় * * * ইত্যাদি।" (বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষদ)

যে পরিণাম লাভ করিলে অমর্ত্ত্য-চেতনার আভাস লাভ করা যায়, সে পরিণামে জাগতিক সকল বোধ স্তম্ভিত হইয়া যায়। মানবীয় যে-কোন-চেতনা আশ্রয় করিয়া সে পরিণাম লাভ করিতে পারা যায় না।

অবিক্ষুব্ধ চিত্তের এই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোকের বিচিত্র পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি; নৈবেদ্যের মধ্যেও তাহার পরিচয় মিলিবে।

"স্থির যোগাসনে চির আনন্দ
তাহার নাহিক নাশ।"

ইহা মানুষের সেই অধ্যাত্ম সত্তা, ধ্যান-লোক। বহির্জগতে মানুষ নানা ভাবে বিক্ষুব্ধ নানা চিন্তা ও ভাবনার তরঙ্গে নিয়ত আন্দোলিত। এখানে মানুষের ক্ষতি ও নিন্দা, মৃত্যুও বিচ্ছেদ, হতাশা ও ব্যর্থতা; কিন্তু ধ্যান-লোক অচঞ্চল। ইহা উর্দ্ধতর শাশ্বত চেতনার সহিত যুক্ত। মানুষের সকল পাওয়া ও হারাণো, সকল লাভ ও ক্ষতির উর্দ্ধে এই লোক। মৃত্যুতে আর সব বিনষ্ট হইয়া যায়, ধ্যান-লোকের বিনাশ ঘটে না।

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।"

মানুষ যখন দিব্য চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করে এবং ওই চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া জীবন ও জগৎ প্রত্যক্ষ করে তখন সমস্ত কিছু অসীম বা অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। তখন বিনষ্টি, মৃত্যু বা বিচ্ছেদ এবং তজ্জাত দুঃখ কেবল একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনায় অসীম সত্তার সীমাবদ্ধ রূপ চোখে পড়ে, বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে।

একদিকে এই সৃষ্ট জগৎ, অন্যদিকে মানবীয় চেতনার উর্দ্ধে দিব্য চেতনা-লোক, সেখানে দেশ-কালের বোধ বিশুষ্ক পুষ্প দলের মত কোন শূন্যে ঝরিয়া হারাইয়া যায়। এক প্রান্তে জাগতিক সত্তা, অন্য প্রান্তে দিব্য সত্তা; এই দুই সত্তা কোন্ সূত্রে বিধৃত, সমগ্র জ্ঞান যোগ এই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে।

জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি অন্তরে বারংবার এমন একটি প্রেরণা বোধ করিয়াছিলেন যাহাকে মানবীয় চেতনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা একপ্রকার অসম্ভব।

ঊর্দ্ধতর চেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কোন কালে মুহূর্ত্তের জন্য সংশয় জাগে নাই। এই উভয় সত্তার গূঢ় মিলন তত্ত্ব লাভ করিতে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। নৈবেদ্যের মধ্যে মানবীয় চেতনা আশ্রয় করিয়া কবি কোন্ তত্ত্ব গড়িয়া তুলিযাছেন, কোন্ উপাযে মানবীয চেতনার সহিত উহার এক প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিব।

বলিযাছি, মানস-চেতনায কবি ক্ষণে ক্ষণে দিব্য-চেতনার চকিত স্পর্শ লাভ করিতেন। দিব্য স্বরূপে অবস্থান করা নয় মানস-লোকে তাহার চকিত আভাস লাভ করাই এক্ষেত্রে কবির পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইযা উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে জগৎ ও জীবনের পূর্ণ স্বরূপের পরিচয লাভ করিতে পারা যায না, সকল সমস্যাই যে অমীমাংসিত রহিয়া যায তাহা আমরা জানি। এই কারণে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কবির জীবনে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা রহিযা গিয়াছিল। জীবন ও জগতের দুর্লভ মাধুর্য্যে কবি চিরকাল মুগ্ধ, বিস্মিত, ধন্যবোধ করিলেও উহা তাঁহার নিকট অনন্ত রহস্যাবৃত রহিযা যায়। ধ্যানের নিবিড় তন্ময মুহূর্ত্তে কবি যেখানে দিব্য-চেতনার আভাস লাভ করিয়াছেন, সেই খানেই কবির কাব্য-সাধনার সিদ্ধি। কবির স্মৃতি-লোকে দিব্য আনন্দ আস্বাদের যে কয়েকটি মুহূর্ত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত গুলিই কবির পরম সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে।

"কত মুহূর্ত্তের পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ।"

ওই আনন্দের পথ বাহিয়া যে অসীম কবির অন্তরে আপনার স্পর্শ দান করিয়াছেন। ধ্যান বা মনন-লোকে আনন্দের স্মৃতিগুলি রহিয়া যায। এই প্রত্যেকটি দুর্লভ মুহূর্ত্তে মানুষ আপনাকে সর্ব্বাধিক গভীর করিয়া অনুভব করে। মানুষের আর কোন অনুভূতি এত তীব্র, এত গভীর ভাবে অনুভূত হয় না বলিয়া তাহাদের সব স্মৃতি মুছিয়া যায়। এই আনন্দ মুহূর্ত্তগুলি জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ। ইহা মানুষের অসীম বা অনন্তের দিক। এই পথ দিয়া যে সে ক্ষণে

ক্ষণে অসীম বা অরূপের স্পর্শ লাভ করে। মানুষের আর সব দিক তো সীমার দিক, মৃত্যুর দিক। কেবল সৌন্দর্য্য-ধ্যানই নয়, নর-নারীর প্রেমের বোধও কবিকে ক্ষণে ক্ষণে এই অধ্যাত্ম পরিণাম দান করিয়াছে।

"সকল প্রেমের স্নেহের মাঝারে
আসন সঁপিব হৃদয় রাজারে
অসীম তোমার ভুবনে রহিয়া
ববে মম ভবনে—"

মানবীয় চেতনা, ওই চেতনাশ্রয়ী বিচিত্র বোধের স্বরূপ যেমনই হোক-না-কেন, উহা দিব্যসত্তার স্বরূপ ও ধর্ম্ম হইতে যত পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হোক, একথা সত্য যে মানবীয় কোন বোধই একান্ত মিথ্যা নয়, এই সকল বোধ, এই সমস্ত কিছু দিব্য-চেতনারই পরিণাম।

অধ্যাত্ম-সত্তায় পার্থিব সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান পরিণামে পরম তত্ত্বের যতটুকু আভাস দান করে কবি তাহাতেই তৃপ্ত। জগৎ ও জীবন এই অর্থে কবির অমৃত পাত্র। ওই পাত্র ভরিয়া তিনি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া অমৃত পান করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-সত্তা বা ধ্যান-লোক কবির অমৃত পাত্র। আবার জাগতিক প্রীতি ও সৌন্দর্য্য কবির ওই ধ্যান-লোকটি গড়িয়া তুলিয়াছে। মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া কবির নিকট অসীমের চেতনা শূন্যময় হইয়া পড়ে। কেবল এই চেতনার যোগে অসীমের চেতনা কবির নিকট সত্য। আবার অসীমের যোগেই কবির মানস-চেতনা সত্য। এই দুই কবির নিকট শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব।

"যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে ববে টানিতে।"

কিংবা

"সেই মোর মুগ্ধ মন
"বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ—
তার শত মোহ তন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও, হে নাথ।"

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন ফল লাভ, দিব্য-চেতনার চকিত সাক্ষাৎকার লাভ করাও নয়, সেই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইল ভক্তি। ভক্তি কি, না মানবীয় সকল চেতনা ও

অনুভূতিকে ঈশ্বরমুখান করিয়া দেওয়া, এবং এই বোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করা। মর্ত্ত্য জীবনে ইহার অধিক ফল লাভ আর কিছু নাই। সত্য এই একমাত্র নিরন্তর প্রার্থনা, 'আমার মর্ত্ত্য জীবনের সকল অনুভূতি যেন তোমার অনুভূতি লাভে সহায়তা করে। আমার অনন্ত বোধ তোমার মন্দিরের দিকে যাত্রা করিবার অনন্ত পথ।' বস্তুতঃ যে কোন অনুভূতিই আমাদের থাকুক না কেন, তাহার পশ্চাতে যদি স্বার্থ বা 'আমি'র প্রেরণা না থাকে তাহা হইলে তাহা পরিণামে মুক্তি দেয়।

কবির একটি সুপরিচিত কবিতার উল্লেখ করিব, তাহাতে জীবন ও জীবনাতীত উভয় পিপাসাকে কবি কোন্ তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

জগৎ ও জীবনের অপার সৌন্দর্য্য ও প্রেম কবির অন্তরে ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলিতেছে, এই ধ্যান আশ্রয় করিয়া কবি-চেতনা আবার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনন্তের অমৃত আস্বাদ করিতেছে।

"এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।"

আসক্তি ও মোহ বিজড়িত প্রেম যেখানে অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করে রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহাই ভক্তি, এই অধ্যাত্ম পরিণাম যেখানে অনন্তের চকিত আস্বাদ দান করে রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহাই মুক্তি।

মানবীয় বিচিত্র অনুভূতি আশ্রয় করিয়া পরিণামে অনন্তের স্পর্শ লাভ, ইহাই পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সাধনা হইয়া উঠিয়াছে। দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হওয়া নয়, মানবীয় চেতনায় অনন্তের পিপাসা জাগ্রত করা, মানবীয় সকল অনুভূতিকে অনন্ত মুখীন করিয়া দেওয়া ইহাই রবীন্দ্রনাথের সাধনা।—অনন্তের জন্য যে প্রেরণা মানুষ কোন-না-কোন রূপে বোধ করে সেই প্রেরণাকে সঞ্জীবিত এবং তীব্রতর করিয়া তুলিবার সাধনা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা।

"খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি—আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসঙ্গীত-সাথে চন্দ্রসূর্য্য-মাঝে।"

এক অনন্ত স্বরূপ বিশ্বসৃষ্টির নানা রূপের মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য তারকায় উদ্ভাসিত। এক আনন্দ জীবনের সকল অনুভূতির মধ্যে লীলায়িত। এক ছন্দ অনন্ত লোক পূর্ণ করিয়া জীবন-বীণায় নানা সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

যে স্বরূপে হোক জগৎ ও জীবনকে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন; এবং যে কোন পরিণাম লাভের জন্য তিনি মানবীয় চেতনাকে পরিহার করিতে ইচ্ছুক নন।

মানবীয় চেতনায় জীবন ও জগতের যে স্বরূপ প্রতিভাত হয় তাহা যদি অপূর্ণ ও অজ্ঞানতাও হয়, তবু এই মোহ অজ্ঞানতা জাত যে রস-পিপাসা রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই সমস্ত জীবন ধরিয়া চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন। মানবীয় চেতনার ঊর্দ্ধে উঠিবার অতি প্রবল প্রেরণা কবি মাঝে মাঝে বোধ করিলেও এবং ওই প্রেরণার সহিত জীবনও জগতের এক প্রকার তত্ত্বাশ্রয়ী সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা লক্ষিত হইলেও কবি এই জীবনও জগৎকেই পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া পাঠকবর্গকে এই উভয় চেতনা সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। এই উভয় চেতনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য কবি সমগ্র জীবন ভোর যে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার স্বরূপও বুঝিয়া লইতে হইবে। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের বিচিত্র ধারা এই এক সাগর-সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

একদিকে অজ্ঞানতা ও মোহ বিজড়িত মর্ত্ত্য-প্রেম-পিপাসা, অন্যদিকে অমর্ত্ত্য চেতনা লাভের জন্য খাঁটি অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা;—এই উভয় প্রেরণাই কবির নিকট সত্য। কবির হৃদয়ে এই উভয় প্রেরণা কাল বৈশাখীর ভয়াবহ ঘূর্ণি তুলিয়াছে। আর অতি স্থির দৃষ্টিতে তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

জীবনাবেগ যেখানে সত্য সেখানে উভয় প্রেরণার দ্বন্দ্ব থাকিবেই, কিন্তু সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটিকে তাঁহারা পরিণামে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়াছেন। এই সংগ্রামটি তাই দীর্ঘ স্থায়ী হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাণের আবেগ যেমন অত্যন্ত প্রবল, তেমনি তাহা উভয় প্রেরণার পশ্চাতে ক্রিয়া করিয়া সজ্ঘাতকে যেমন ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় ভারতীয় জীবন সাধনায় একান্ত দুর্লভ।

একদিকে চিরন্তন স্থির চেতনা-লোক, অন্যদিকে দেশ-কালের মধ্যে তাহারই

সংখ্যাতীত বিচিত্র প্রকাশ চাঞ্চল্য। অরূপ কেমন করিয়া কোন্ রহস্যের বশে রূপে রূপে বহুধা হইলেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও এই দুইয়ের মধ্যে কোথাও যে মিল আছে, দুই যে সম্পূর্ণ বিপ্রকৃতিক নয়, একান্ত বিচ্ছিন্ন নয় এই অধ্যাত্ম প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের ছিল।

সীমা ও অসীম শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব। কোন একটিকে অস্বীকার করিয়া আর একটিকে একান্তরূপে লাভ করিবার চেষ্টা করিলে জীবনে পূর্ণতার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে হয় সীমা বা রূপের ভিতর দিয়া। জাগতিক সৌন্দর্য্য ও মানবিক প্রেমের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় সৌন্দর্য্য ও প্রেমে উত্তীর্ণ হইতে হয়। আর কোন পথ নাই। জাগতিক সৌন্দর্য্য ও মানবিক প্রেমকে অস্বীকার করিলে, জীবনে তাহার প্রকাশকে রুদ্ধ করিলে ঈশ্বরীয় প্রেম ও মাধুর্য্যের সহিত সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। নিম্নতর সকল চেতনা-ইন্দ্রিয়-প্রাণ মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটিলে তবেই দিব্য-চেতনা লাভে মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করে। নহিলে জীবনে তাহার কোন ফল লাভ ঘটে না।

সকল চেতনা বিকাশের জন্য ব্যক্তিকে অনিবার্য্যরূপে বিশ্বকে আশ্রয় করিতে হয়; বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও প্রেম। এমনি করিয়া একটি চেতনা বিকাশের ভিতর দিয়া, *অর্থাৎ বিশ্বের সহিত স্বীর মিলন বোধের ভিতর দিয়া মানুষ পরিণামে ঈশ্বরীয় সত্তার* সহিত মিলিত হয়।

ঈশ্বরীয় সত্তার উপলব্ধি কোন একটি স্থানে কোন একটি পরিণামে একান্ত হইয়া নাই। জীবনের সকল পর্য্যায়ে সকল রূপে তাঁহার সহিত মানুষের মিলন ঘটে।

"চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।"

দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর শাশ্বত অনন্ত চেতনাকে যদি গৃহের অন্তঃপুর বলা যায়, তবে অনন্ত সৃষ্টি-লোক যেন তাহার অঙ্গন। প্রাঙ্গনে সমস্ত দিনের ক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া মানব শিশু গৃহের অভ্যন্তরে বিশ্রাম লাভ করিতে যায়। অসীমও সীমা যেন একটি গৃহের অন্তঃপুর ও প্রাঙ্গণ। জীবে এই ঊর্দ্ধ পরিণাম এই ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভ করিয়া চির বিশ্রাম লাভ করে। রূপ-লোক হইতে রূপ-লোকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাহার ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভের পর্য্যায়, অরূপে তাহার চির অবসান।

"খেলিতেছিলাম মোবা অকুণ্ঠিতমনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদেব অনন্ত প্রাঙ্গণে।"

এই উপলব্ধিটিকেই কবি আর এক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মানবীয় সীমাব বোধে এক সত্তার যে স্বরূপেব প্রকাশ ঘটে, তাহার ঊর্দ্ধতর চেতনায় সেই এক সত্তার আর এক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। সীমা যেন ত্রিপার্শ্ব কাঁচ খণ্ড, উহার উপর নিপতিত দিব্য-আলোক রশ্মি ভাবের বহু বর্ণে বিচ্ছুরিত হইয়া যায়। ওই কাঁচখণ্ড সরাইয়া লইলে, কোন একটা উপায়ে সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে দিব্য-চেতনার শুভ্র নিরঞ্জন রূপ প্রকাশ পায়।

মানবীয় চেতনার বিচিত্র লীলা, তাহার অন্তহীন মাধুর্য্য ও প্রেম তো একান্ত মিথ্যা নয়। এই সমস্ত কিছু তাঁহারই বিশিষ্ট প্রকাশ।

"—নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন কবেছে চাবিভিতে।"

আর অন্যদিকে কেবল স্থির চেতনার অপার বিস্তার। সেখানে—

"দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।"

"যেখানে এইরূপ দ্বৈত বোধ আছে সেখানে একে অন্যকে আঘ্রাণ কবিতে পারে, একে অন্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, একে অন্যকে শ্রবণ করিতে পারে, একে অন্যের সহিত কথা বলিতে পারে, সেখানে একে অন্যের চিন্তা কবিতে পাবে, একে অন্যকে উপলব্ধি করিতে পারে। যেখানে সমস্ত কিছু আত্মময় হইয়া যায়, সেখানে কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে, কে কাহাকে শ্রবণ কবিবে, কে কাহার সহিত কথা বলিবে, কে কাহার কথা চিন্তা করিবে, কে কাহাকে উপলব্ধি কবিবে। যাহাব দ্বারা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে কাহার দ্বারা জানিতে পারা যাইবে? কাহার দ্বারা জ্ঞাতকে জ্ঞাত হওয়া যায়।" (বৃহদ্‌ আরণ্যক উপনিষদ)

জীব-জীবনের সকল কর্ম্মকে ঈশ্বরের নিয়োজিত কর্ম্ম স্বরূপে নিরাসক্ত ভাবে সমাধা করাই শ্রেয়। সকল প্রয়াস সকল কর্ম্মের মধ্যে যেন একটি নিরাসক্ত মন থাকে। এই নিরাসক্ত মন যেন সেই ঊর্দ্ধতর চেতনার সহিত নিয়ত যুক্ত থাকে।

"মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ারে রবে তোমারি প্রবেশ তবে।"

এমনি একটি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল যে নানা পরিণামের ভিতর দিয়া একদিন তিনি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন।

জলের গভীরে যেখানে আলোর ক্ষীণতম আভাস নাই, সেখানে যে কমল-কলিকাটি রহিয়াছে, সে কোন্ প্রেরণার বশে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ক্রমাগত দিনের পর দিন রাতের পর রাত নিরন্ধ্র অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পথ চলে? এই আশ্বাস সে কোথা হইতে লাভ করিল, যে একদিন সে আলোক-তীর্থে পৌঁছাইয়া যাইবে? তাহার পর সেই জ্যোতি সমুদ্রে স্নান করিয়া একটির পর একটি দল মেলিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে কমল জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবে? এই অন্ধ আবেগই রবীন্দ্রনাথের জীবনে ভক্তি স্বরূপতা লাভ করিয়াছে।

জীবন হইতে জীবনে লোক হইতে লোকে তাঁহার জীবন-তরী বহিয়া চলিযাছে। যেন এক নিরবচ্ছিন্ন তীর্থ যাত্রা। এক তীর্থ হইতে আর এক তীর্থে তিনি কেবলই চলিযাছেন। দেবতার সাক্ষাৎ লাভের জন্য প্রস্তুতি, উৎকণ্ঠা, পরিশেষে দেবতার সাক্ষাৎলাভ ও মিলনে চরিতার্থতা; তাহারপর আবার নূতন তীর্থ লক্ষ্য করিয়া পথ চলার সুরু।

কোন্ লোকের তীর হইতে পাড়ি দিয়া নিস্তরঙ্গ, নীলিম আকাশ-সমুদ্র পার হইয়া তাঁহার জীবন-তরী এখানে এই মর্ত্ত্যের ঘাটে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তাহা তাঁহার স্মরণে পড়ে না। তবে এই মর্ত্ত্যলোক যে সেই এক পরম দেবতার আবাস স্থল, মন্দির ইহাতে তাঁহার কোন সংশয় নাই।

মানব সংসারে যে নিয়ত প্রয়াস তাহা তো সেই পরম দেবতারই বিচিত্র পূজারতি। এই প্রয়াস তো তাই মিথ্যা নয়, নিরর্থকও নয়, ইহার ভিতর দিয়া মানুষ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, পরিণামে ঈশ্বরীয় বোধকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য। জীব-জীবনের বিচিত্র লীলাকে যখন এই ফল লাভের দিক হইতে সম্পূর্ণ

করিয়া দেখি তখন জীবন পরিপূর্ণ অর্থ লইয়া প্রতিভাত হয়। সেই কবিতাটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"কোথা হতে আসিযাছি নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থ দরশনে
এই বসুন্ধরা তলে; লাগিয়েছে তরী
নীলাকাশ-সমুদ্রের ঘাটের উপরি।
শুনা যায় চারিদিকে দিবস রজনী
বাজিতেছে বিরাট সংসার-শঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবন ফুৎকারে। এত বেলা
যাত্রী নর নারী সাথে করিয়াছি মেলা
পুরী প্রান্তে পান্থ শালা-পরে। স্নানে পানে
অপরাহ্ন হযে এল গল্পে হাসি-গানে
এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জ্জনে চরণ তলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তারপর
নব তীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর।"

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের জন্য একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই চেতনা লাভের জন্য কান্না মাঝে মাঝে সকল তত্ত্ব ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

"ইহা জানি, কিছুই না জানিযা অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।"

'আমি'র বোধটি যেখানে একান্ত হইযা অসীমের বোধটিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয, অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে যখন কেবল 'আমি' বা সীমার দিক হইতে দেখি, তখন মনে হয় মৃত্যুতে সমস্ত কিছু হারাইযা যায়, অনস্তিত্ব হইযা পড়ে।

মৃত্যুর চিন্তায় মুহূর্তে তাই আমরা বিহ্বল হইযা পড়ি। জীবনের এমন অপরূপ প্রকাশ, এত সত্য এত নিবিড় যাহার অনুভূতি, তাহা মুহূর্তে শূন্যময় হইয়া যায়! এত প্রেম, এত মাধুর্য্য, এই অনন্ত কোটি রূপ লোক, জল স্থল অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া এই যে আলোকের, শত বর্ণের, আনন্দের, অমৃতের প্রস্রবণ বহিয়া চলিয়াছে, এই সমস্ত কিছু মিথ্যা হইয়া যায়। জীবনের এই অমোঘ নিয়তি জানিয়াও আমরা তাই ব্যর্থ আসক্তিতে এই জগৎ ও জীবনকে প্রাণপণ বলে দুই বাহু দিয়া আঁকড়াইয়া

ধরি, যদিও জানি সমুদ্রের প্রবল স্রোতের টানে ঐ আসক্তির বন্ধন বালুতটে তৃণ গুচ্ছের অবলম্বনের মত মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া যায়।

"মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।"

আমার বর্ত্তমান চেতনা গড়িয়া উঠিয়াছে কোন অজ্ঞাত চেতনার ইচ্ছায়। এই মর্ত্ত্য-লোকে যেমন আমার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তেমনি অবসানও ঘটিবে তাঁহারই ইচ্ছায়। যাহা আমার ইচ্ছায় গড়িয়া উঠে নাই, তাহাকে আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার এই ব্যর্থ চেষ্টা কেন। যিনি এই জীবনকে গড়িয়া তুলিয়া এই জীবন ও জগৎকে ভাল লাগাইয়াছেন, মৃত্যুতে আমার জীবন আশ্রয় করিয়া তাঁহার ইচ্ছাই আর কোন রূপে সার্থক হইবে। এই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু ভয় জয় করিয়া উঠিয়াছেন।

"মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মতো।"

এই জীবনে কোন দুঃখ শোক, কোন তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা মানুষকে লেশমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না যদি অন্তরের মধ্যে মানুষ উর্দ্ধতর সত্তার সহিত নিয়ত যোগ যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে যোগ যুক্ত কর্ম্ম।

"সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজকরে
রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া।
*　　*　　*
সে দুয়ার খুলি আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে দুয়ার খানি খুলিয়া।"

নৈবেদ্যের মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে, যাহার মধ্যে কবি বিশ্বসৃষ্টির প্রাণ-ধারার সহিত আপন প্রাণের পূর্ণ মিলন বোধ করিয়াছেন।

মর্ত্ত্যের অণুপরমাণু হইতে মহাশূন্যে অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই অচিন্তনীয় বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে স্পন্দিত হইতেছে, তাহারই মাঝখানে একটি মানবিক সত্তা! তাহার আবির্ভাব ও বিলয় কত ক্ষণিক! তবু কোন রহস্যের ফলে

আবার, অপরিচিত ভয়ঙ্কর বিশ্ব-লোক তাহার কাছে মাতৃ-ক্রোড়ের পরম শান্তি, নিশ্চিন্ত নির্ভরতা দান করে। বিশ্বে প্রাণের যে অন্তহীন লীলা চলিয়াছে সেই এক প্রাণই যে আমার চেতনায় 'আমি' রূপে প্রকাশিত মানুষ কোন একটি উপায়ে যখন ইহা বোধ করিতে পারে, তখন আর অনিশ্চিতের ভয় থাকে না। সকল প্রাণের যোগে চির অস্তিত্বের অনুভূতি-মুহূর্তে এই জগৎ ও জীবনকে পরম সুন্দর, একান্ত আপনার করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলব্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন—

"রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী মুরতি।"

একদিকে দিব্য-চেতনা-লোক, অন্যদিকে অনন্ত রূপ-লোক। একটি আত্মস্থিত চির স্তব্ধতার দিক, অপরটি চির চঞ্চল, নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই উভয় চেতনার মধ্যে যোগ কোথাও রহিয়াছে। সেই পূর্ণ মিলন ভূমি লাভ করিলে এই বোধ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। যে এক দিব্য-সত্তাই আপনাকে রূপে রূপে অনন্ত বৈচিত্র্য দান করিয়াছেন। তখন জীব এক প্রান্তে অসীমে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্য প্রান্তে অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনাকেই লীলায়িত হইতে দেখে।

"তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে বোমে বোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্য কাল ধ'রে
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।"

একদিকে দিব্য-চেতনার অচঞ্চল লোক, ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ 'তোমার আসন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যদিকে নিয়ত চঞ্চল সৃষ্টি-লোক।

রবীন্দ্রনাথ মিলন বোধ করিয়াছেন এই সৃষ্টি-লোকে বিশ্ব-সত্তায়। প্রাণের যে আবেগে অন্তহীন সৃষ্টির বন্যা নিত্যকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই অন্তহীন প্রাণ-ধারার সহিত কবি আপনার প্রাণের পূর্ণ যোগ উপলব্ধি করিয়াছেন।

অনন্ত প্রাণ-ধারার সহিত প্রাণের পূর্ণ যোগের পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যেও লাভ করিতে পারা যাইবে। কবির অন্তরে যে প্রাণ-স্পন্দন,

"সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্‌বিজয়ে;
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে,—"

বিশ্ব-প্রাণের যোগেই এমন অপার বিস্ময় বোধ জাগে। সৃষ্ট জগৎ মাত্রেই, তাহা যত ক্ষুদ্র হোক-না-কেন, অনন্ত প্রাণের সহিত যুক্ত বলিয়া বিশ্ব-সত্তা লাভে অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। কবি আপনার দেহ-প্রাণ-মনে সমগ্র বিশ্ব-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া অমন বিস্ময় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

"দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।"

পূর্ণতা লাভের জন্য একদিকে তিনি যেমন ঈশ্বরের নিকট নিঃশেষে আত্ম সমর্পণ করিতে চাহিয়াছেন এবং এইরূপে একের পর এক বন্ধন মোচন করিয়া চলিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম জীবনে জাতি যে বিচিত্র বন্ধন সৃষ্টি করিয়া আপনাকে পাকে পাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, সেই সকল বন্ধন মোচনের জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু একটি পরিণাম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া বোধ করেন যে মুক্তি সকলের সহিত যুক্ত হইয়া। সকলের মুক্তির সহিত একের মুক্তি জড়াইয়া রহিয়াছে। তাই জাতির সকল প্রকার অপরাধ ক্ষালনের জন্য তিনি নিরলস চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সেই মনুষ্যত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, যে মনুষ্যত্ব ঈশ্বরীর বোধকে একমাত্র সত্যবোধ রূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শাসনকে একমাত্র অমোঘ শাসন রূপে মানিয়া লইয়া পার্থিব সকল ভয়কে জয় করিয়া উঠিয়াছে।—জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে পূর্ণ বিকশিত মনুষ্যত্ব।

তিনি সেই সমাজ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন যে সমাজে নিষ্প্রাণ কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ বিচিত্র সংস্কার পদে পদে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় না।

সেই দেশকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন, যে দেশ মনুষ্যত্বের চিরন্তন শ্রেষ্ঠ আদর্শের সজীব অনুপ্রেরণায় এক অখণ্ডত্ব লাভ করিয়াছে, এবং নব নব সৃষ্টি কার্য্য ও বিচিত্র কর্ম্ম প্রয়াসের ভিতর দিয়া সেই আদর্শকেই ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছে।

একমাত্র এই মানুষ, এই সমাজ ও দেশ বিশ্বের সকল দেশের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্ব মানবের কর্ত্তব্যভার মস্তকে তুলিয়া লইতে পারে। ৪৫ সংখ্যক কবিতা হইতে ৯৬ সংখ্যক কবিতা পর্যন্ত ৫২টি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে কবির এই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

স্মরণ

'স্মরণের' মধ্যে কবি জাগতিক বোধে সম্পূর্ণ রূপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসক্তি ও মোহ বিজড়িত প্রেমের এই দুর্লভ রূপের প্রকাশ ঘটে কেবল সীমাবদ্ধ চেতনায়। প্রাণের যে পিপাসা ওই রূপ গড়িয়া তুলিয়া চরিতার্থতা অন্বেষণ করে, ঊর্দ্ধতর চেতনায় এই পিপাসা আর থাকে না। মানবীয় চেতনায় প্রেমে দ্বৈত বোধ থাকে। তাহার ঊর্দ্ধে দ্বৈতের সকল লীলা এক পরম রস সমতায় অবসান লাভ করে।

মানস-চেতনায় কেবল খণ্ড বা সীমার বোধ। এই সীমা বোধ আছে বলিয়া মানুষের প্রেমে মোহ আছে, বেদনা বোধ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই মোহ ও আসক্তি বিজড়িত মানব প্রেমের বিশিষ্ট রস আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন।

মনুষ্য-চেতনা একটি বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া একান্ত তাহারই মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করে। এই বন্ধন স্বীকার করিয়াই তাহার প্রাণের বিকাশ ঘটে। সেইজন্য ওই সীমারূপ হারাইয়া গেলে প্রাণের সকল প্রেরণা মুহূর্ত্তে নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

প্রাণের প্রকাশ, উহারই অসহনীয় জ্বালা-হর্ষের ভিতর দিয়া যখন অধ্যাত্ম-সত্তা গড়িয়া উঠে, তখন রূপ আর বন্ধন সৃষ্টি করে না। জড়-রূপ এই রূপে ভাব-রূপে মুক্তি লাভ করে। এই ভাব-রূপের সহিত তখন মানুষের ভাবের যোগে বিচিত্র লীলা চলে।

বিচ্ছেদ ও বিযোগ প্রাণ-চেতনায় সত্তার পরিপূর্ণ অনস্তিত্ব বোধ জাগ্রত করে। অবশ্য প্রাণ-লোকেও জড়-রূপ কতকটা মুক্তি লাভ করে বলিয়া প্রাণের বিচিত্র বোধে দেহ-রূপটিই বিজড়িত থাকিয়া এক প্রকার লীলার আভাস দান করে।

অধ্যাত্ম-লোকে জড়-রূপ সম্পূর্ণ ভাবময় পরিণাম লাভ করে। ইহাতে দেহ-রূপটি হারাইয়া গেলে নর-নারী তাহারই ভাব-রূপের সহিত ভাব-লোকে শাশ্বত মিলন লাভ করিতে পারে। বিগ্রহের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব পাওয়া ও হারাণো তখন একান্ত গৌণ হইয়া যায়।

ভাবরূপ ও অধ্যাত্ম-সত্তার স্বরূপ যেমনই হোক-না-কেন তাহা স-সীম লোক। অধ্যাত্ম-সত্তায় তাই জড়ের চিন্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিলেও বেদনা বোধ সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত

হয় না। বেদনা বোধ সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠা যায় সীমা বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যে কবি সীমার লোক পার হইয়া দিব্য-চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন। ইহার স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দিব্য-চেতনার চকিত যে আভাস রবীন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছিলেন তাহাকে তিনি সূর্য্য কিরণচ্ছটার সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'স্মরণে' একেবারে প্রারম্ভের কবিতাটির মধ্যে কবির যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা 'করুণ আঁধার'-লোক লাভের জন্য।

"প্রভাতজগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি।"

এই প্রভাত জগৎ ও করুণ আঁধারের স্বরূপ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে সমগ্র 'স্মরণে'র ভাব-প্রেরণা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের জন্য 'উদাস হিয়া' পরিহার করিয়া কবি 'স্নেহ-বাহু-ডোরে' বাঁধা পড়িতে চাহিয়াছেন, মোহ বিজড়িত মানব প্রেমের বিশিষ্ট রস আস্বাদের জন্য। বহির্জগৎকে যতটুকু আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের জগৎ। তাহার বাহিরের সীমাহীন লোক আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জগৎ ও জীবন তাই এমন রহস্য মণ্ডিত, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যুতে এই পরিচিত সীমার জগৎ ছাড়িয়া আমারা কোথায় যাইব কে জানে। তারায় তারায় গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে মানবাত্মা যে জ্যোতিপথ ধরিয়া অভিসার করে তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ। মৃত্যু আসিয়া—

"নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।"

তাহার পর কবি এমনি করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন।

"মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।"

জীবনে প্রেম ও মাধুর্য্যের লীলা সত্য, কিন্তু তাহা জীবনের সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়। এই লীলার পরিধি ছাড়াইয়া মনুষ্য-সত্তা অনন্ত বিস্তৃত। মাধুর্য্যে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। আকস্মিক অতি নিষ্ঠুর আঘাতে এই মাধুর্য্য-লোকটি ভাঙ্গিয়া পড়িলে মানুষ অসীমকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে যে আরেক অতিথির আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই অসীম-লোক হইতে পারে আবার ধ্যান-লোকও হইতে পারে।

মৃত্যুতে দেহ-রূপটি হারাইয়া গেলে হৃদয় মুহূর্ত্তে শূন্যময় হইয়া পড়ে। তাহার পর শূন্যতার অন্ধকার-লোক বিদীর্ণ করিয়া যখন অধ্যাত্ম-সত্তার আবির্ভাব ঘটে, তখন মানুষ ওই লোকে তাহারই ভাব-বিগ্রহ গড়িয়া তুলিয়া আপনার প্রেম-পিপাসা স্বপ্নে চরিতার্থ করে। অধ্যাত্ম-লোকে ওই রূপ ধ্রুব তারকার মত অন্ধকার হৃদয়-আকাশে স্থির স্নিগ্ধ কিরণ সম্পাত করে। বেদনার অন্ধকার-লোক পার হইয়া কবি এই ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

ধ্যান-লোকে এই যে ভাব-রূপের নিত্য লীলা, অধ্যাত্ম সাধনায় কোথাও ইহাকেই চরম রস পরিণাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই 'মুক্তি সাধন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মৃত্যুতে সেই চিরন্তন বিস্ময় স্তম্ভিত জিজ্ঞাসা—

> "মঙ্গলমুরতি সেই চির পরিচিত
> অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!"

সত্তার এমন যে অস্তিত্ব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন পরিপূর্ণ, এমন নিবিড়, মৃত্যুতে তাহা সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইয়া যায়? তাহার পরেই মানব জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোথাও কোথাও কবিকে এই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, পরেও হইতে হইবে।

দিব্য-চেতনা-লোকে সর্ব্ব রস সমতায় পূর্ণ সামঞ্জস্য তত্ত্বে যদি মিলন লাভ ঘটেও তবু মোহ বিজড়িত এই প্রেমের যে বিশিষ্ট রস তাহাকে তো আস্বাদ করা যাইবে না। মর্ত্ত্যে যে রূপ আশ্রয় করিয়া মানুষের সকল প্রেম ও প্রীতি চরিতার্থ হয়, সেই বিশিষ্ট রূপকে তো ওই অমর্ত্ত্য-লোকে লইয়া যাইবার কোন উপায় নাই। মর্ত্ত্য-জীবনের এই বিশিষ্ট লীলাকে আর কোন উপায়ে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের এই যে জিজ্ঞাসা, "গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?"—ইহার ভিতর দিয়া নিজেরই এক গভীর গোপন আকাঙ্ক্ষা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে।—অমর্ত্ত্য-লোকে কোন একটা উপায়ে মর্ত্ত্যের স্নেহ প্রেমকে

হৃদয়ের একান্তে চির জাগরূক রাখিয়া তাহাকে যেন তিনি নিত্য অশ্রুসিক্ত করিতে পারেন।

মৃত্যুর ভিতর দিয়া কবি পরিশেষে এমন একটি লোক লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে দুটি আত্মার চির মিলন, চির বিশ্রাম, যেখানে বিচ্ছেদ নাই, বিয়োগ নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনায় তাহা যে অধ্যাত্ম-লোক, তাহা বলিয়াছি। দিব্য-চেতনালোকে যে-কোন-স্বরূপে রূপের অস্তিত্ব থাকে না।

বহির্জগতে ততটুকুই আমাদের নিকট সত্য, যতটুকুকে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনার জালে আবদ্ধ করিতে পারি। এই চেতনা-বন্ধ হইতে যাহা কিছু স্খলিত হইয়া যায়, তাহা আমাদের নিকট অনস্তিত্ব বা শূন্য বলিয়া বোধ হয়। জীবন ও জগৎকে সীমার দিক হইতে না দেখিয়া অসীমের দিক হইতে দেখিলে আর হারাণোর ভয় থাকে না।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যে একাধিক কবিতায় কবির এই উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিয়াছি। এখানেও তাহার পরিচয় মিলিবে।

"আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।"

জীবন ও জগতের এই রূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। এই জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল সীমাহীন শক্তি স্পন্দ মাত্র। এই স্পন্দনে প্রতি মুহূর্তে কত রূপ ভাসিয়া উঠিযা হারাইয়া যাইতেছে, একে অন্যের সহিত একাকার হইয়া আবার সংখ্যাতীত নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

এই স্পন্দিত জগৎ যেমনই হোক, তাহা নিরাধার বা নিরলম্ব নয়। ইহার একটি অধিষ্ঠান ভূমি নিশ্চয়ই আছে। মানবীয় চেতনা যখন এই স্পন্দিত জগৎ অনুবিদ্ধ করিয়া ওই শাশ্বত স্থির চেতনা-লোক লাভ করে, তখন দেখে জীবনের কোন কিছুই মৃত্যুতে বিনষ্ট হইয়া যায় না।

"কোন মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো—"

মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার অনন্ত স্বরূপের কতটুকু পরিচয় সে জানে। তাহার খণ্ডিত চেতনায় একটি জীবনের অনন্ত ব্যাপ্ত সত্তার অতি সামান্য একটি

অংশের প্রকাশ ঘটে। প্রেমের বোধ যতই গভীর হয়, অধ্যাত্ম বোধ গভীর হইতে গভীরতর লোকে যতই ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে, জীবন-বোধের পরিধি ততই বাড়িয়া যায়।

মানুষ তাহার সমগ্র সত্তার কতটুকু পরিচয় জানে। সে বহির্বিশ্বে যে বিচিত্র কর্ম্ম, বাসনা ও সংস্কারের জাল বুনিয়া চলে সেই জালটাই তাহার আমির পরিচয় বহন করে। মানুষের এই একমাত্র পরিচয়। মানুষ একটি মানুষের এই বহিঃ সত্তারটিরই পরিচয় লাভ করিতে পারে; ওই কর্ম্ম-জালের সীমার বাহিরে মানুষের যে অসীম সত্তা তাহার কোন পরিচয় মানুষ জানে না। প্রিয়জন বিয়োগে ওই জড় দেহ, সেই সঙ্গে কর্ম্মের বিচিত্র বন্ধন লুপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনার সহিত অন্বিত হইয়া মানুষের যে সীমা-রূপ, মৃত্যুতে এই সীমা-রূপটি হারাইয়া যায়। এই সীমারূপটি হারাইয়া গেলে তাহার অসীম সত্তার প্রকাশ ঘটে। তখন এই বোধ জাগে আমার সীমিত চেতনার সহিত অন্বিত হইয়া আমার প্রিয় জনের একমাত্র প্রকাশ নয়, অসীমের যোগে তাহার এক অনন্ত স্বরূপ আছে, যাহার কোন পরিচয় আমরা জানি না। মৃত্যুতে সেই অনন্তে তাহার অবস্থিতি।

> "আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
> পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার।"

ভাব বিগ্রহের সহিত ভাবের যোগে কেবল লীলা নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেমের এই বোধ আরও গভীরতা লাভ করিয়াছে। সেখানে এই ভাব-বিগ্রহ পর্য্যন্ত বিগলিত গিয়াছে।

> "এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
> হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙ্গি অন্তরাল।"

মৃত্যুতে ওই আধারটি যখন হারাইয়া যায়, তখন আমাদের শোক সান্ত্বনা শূন্য হইয়া পড়ে। বহিশ্চেতনাকে অন্তর্মুখীণ করিয়া মানুষ যতই অধ্যাত্ম-লোকের গভীর হইতে গভীরে ডুবিয়া যাইতে থাকে ততই আপনার সমগ্র সত্তার যেমন, তেমনি আপনার প্রিয়জনের পূর্ণ স্বরূপটিকে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। অধ্যাত্ম উপলব্ধির এমন একটি পরিণাম আছে, যেখানে দুয়ের বোধ আর থাকে না।

মনুষ্য চেতনায় শোক অনপনেয় হইয়া উঠে। যে পরিণাম লাভ করিলে আর শোক অনুভূত হয় না, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দান করিয়াছেন।

"আজি এ হৃদয়ে সর্ব্ব ভাবনার নীচে
তোমার আমাব বাণী একত্রে মিলিছে।"

'সর্ব্ব ভাবনার নীচে' বলিতে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম চেতনার ওই পরিণামটিকেই বুঝাইতে চাহিযাছেন। বেদনা-সমুদ্রের বুকে অধ্যাত্ম-লোকে প্রিয়জনের ভাব-রূপ যেন কমল-কলিকার মত জাগিয়া থাকে। তাহারপর ওই বিন্ময় কমল কোরক একটির পর একটি মাধুর্য্যের দল মেলিতে থাকে।

"মৃত্যুব নেপথ্য হতে আরবাব এলে তুমি ফিবে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহমন্দিবে
নিঃশব্দ চরণপাতে।"

একদিকে মর্ত্ত্য-চেতনা বা সীমার জগৎ, অন্যদিকে অমর্ত্ত্য-চেতনা বা অসীম-লোক। এই উভয় লোকের প্রান্ত ভূমিটি অধ্যাত্ম-জগৎ। আধ্যাত্ম-লোকের এক কোটিতে অসীম, অন্য কোটিতে সীমা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগৎ যে এই অধ্যাত্ম-জগৎ তাহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

মোহ বিজড়িত মর্ত্ত্য-প্রেম-পিপাসা রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কত গভীর, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। 'অপূর্ণের মোহে মুগ্ধ ছিনু' এই উপলব্ধি কবির জীবনে যত বড় সত্য ততবড় সত্য ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা, সেই সঙ্গে মর্ত্ত্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রাণপণ প্রয়াস। অধ্যাত্ম সত্তায় রবীন্দ্রনাথ এই দুই কোটিকে মিলিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম-সত্তা মনুষ্য-চেতনার সেই প্রান্ত ভূমি, যে তট-ভূমিকে দিব্য-চেতনার অনন্ত জ্যোতি প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে, অথচ উহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া মানবীয় সত্তাকে সম্পূর্ণ রূপে প্লাবিত করিয়া দিতেছে না।

মানবীয় বিচিত্র বোধকে অধ্যাত্ম-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া উহারই আশ্রয়ে অসীমের চকিত স্পর্শ লাভ, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি।

"জন্মমরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।"

'জন্ম মরণে'র মধ্যবর্ত্তী যে স্থির ভাব-ভূমি, যাহার একপ্রান্তে অমর্ত্ত্য-চেতনা, অন্য প্রান্তে মর্ত্ত্য-চেতনা,—সেই অধ্যাত্ম-লোকে রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রেমকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাহাদের সহিত আমাদের নিবিড় অনুভূতির যোগ, যাহাদের আমরা ভালবাসি, তাহাদের কোন প্রকারে আমরা হারাইতে চাহি না। হারাইতে চাহি না, এই কারণে যে তাহাদের আশ্রয় করিয়া আমাদের অস্তিত্ব বোধ।

প্রেমের সকল স্মৃতি সম্পদকে আমরা ধ্যান বা মানস-লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখি। মৃত্যুতে এই ধ্যান-লোকটিও বিনষ্ট হইয়া যায়। এইখানে মানুষের অন্তরে আর এক জিজ্ঞাসা জাগে। অধ্যাত্ম-লোকের ঊর্দ্ধে, মানবীয় চেতনারও পরপারে চিরস্থির এমন কি কোন ভাব-লোক নাই, সেখানে সমস্ত কিছু সঞ্চিত হইয়া থাকে, যেখানে কোন কিছু কোন কালেই হারাইয়া যায় না? সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় কবি-চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে।

> "তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ,
> তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?"

জাগতিক সকল বন্ধন মুক্ত ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের সেই প্রেরণা নয়, উহারই আলোকে কবির মর্ত্ত্য-প্রেম প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মর্ত্ত্য-প্রেম কবির জীবনে এত গভীর, এত সত্য, যে অমর্ত্ত্য-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষার সহিত বিজড়িত হইয়া মর্ত্ত্য-প্রেমের পিপাসাই নানা উপায়ে চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে।

আমাদের স্নেহ ও প্রীতি যাহার কল্যাণ কামনায় সদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলে যাহার জন্য ভয়ে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, দূরে গেলে মন যাহার নিকট পড়িয়া থাকিত, মৃত্যুতে আর কেহ যদি তাহাকে তেমনি করিয়া স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দান করে, আমাদের মন যদি কোন একটি উপায়ে সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হয় তবে বুঝি হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে।

প্রিয় জন বিয়োগে হৃদয় যখন শূন্যময় হইয়া যায়, সকল তত্ত্ব, সকল সান্ত্বনা যখন নিরর্থক হইয়া পড়ে, কেবল মাত্র তাহাকেই লাভ করিবার জন্য হৃদয় হাহাকার করিয়া ফিরে, তাহার সকল স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত করিয়া স্মৃতির চিতা

জ্বালাইয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া বসিয়া থাকে, সেই কালের সেই অসহনীয় হৃদয় বোধের প্রকাশ।

"কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।"

বেদনার সমুদ্র পার হইয়া কবি আবার ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে চেতনা-লোকে রবীন্দ্রনাথ পরম মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা যে অমর্ত্ত্য কোন লোক, অসীম বা অরূপ নহে, পরন্তু তাহা যে অধ্যাত্ম-লোক নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যেও তাহার নিঃসংশয় পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেখানে নীরবে এসো দ্বার খুলি ধীরে—"

ইহা সেই অধ্যাত্ম-লোক, 'পূজা গৃহ নিভৃত মন্দির'; অসীম এই মন্দিরের দেব-বিগ্রহ। অর্থাৎ এই লোকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হয়।

এই অধ্যাত্ম-লোকটিই কবির আকাঙ্ক্ষিত। মানুষের সকল প্রয়াস ক্ষুব্ধ বাসনার ঊর্দ্ধে যে একটি স্থির ধ্যান-লোক আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই অধ্যাত্ম-লোক বলিয়াছেন। এই লোকে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া কবি বাস্তব জীবনের সর্ব্ববিধ দুঃখ দুর্দ্দশার নিপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ করিতেন। ইহার নানা পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি। কখনও সৌন্দর্য্য বোধ, কখনও বা প্রেম বোধ আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ ওই লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেন।

অধ্যাত্ম-চেতনা-লোকে যে ঐক্য বোধ বা অখণ্ড রস পরিণাম—

"বহুবাক্যব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
বেদনার সুধারসে—সেই প্রেম হতে মোরে প্রিয়া,
রেখো না বঞ্চিত করি"

ধ্যান-লোকে তিমির বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুচ্চমকের মত দিব্য জ্যোতির্ম্ময় লোকের আভাস ফুটিয়া উঠে। তাহারই আনন্দ প্রেরণায় কবি সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই রূপ-সৃষ্টি কবির কাব্য-সৃষ্টি। কবির কাব্য জগৎ এই অর্থে অরূপের রূপক।

"আমার দিনান্ত-মাঝে কঙ্কণের কনক কিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন;"

মানুষের জীবনে একদিকে নিভৃত ধ্যান-লোক, অন্য দিকে বহুবিচিত্র কর্ম্ম প্রেরণা। দিবসের বহু বৈচিত্র্যের উপর রাত্রি যেমন ধীরে একাকারত্বের কৃষ্ণ যবনিক টানিয়া দেয়, তেমনি মানুষও বিচিত্র কর্ম্ম প্রয়াসের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমগ্র বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে আপনার মধ্যে সংহত করিবে। বহির্মুখ বিচিত্র প্রবৃত্তি সংযত করিয়া মানুষ অন্তরের মধ্যে যে ভাব-লোক গড়িয়া তুলে তাহাকে আমরা অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক বলিতে পারি। দুটিকে একযোগে লাভ করিয়া তাহারও ঊর্দ্ধতর চেতনার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিবার সাধনাই পূর্ণতার সাধনা। সাধারণ মনুষ্য জীবনে অধ্যাত্ম-সত্তার কোন প্রকাশ নাই।

"নানা দিক হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।"

তাহা হইলে মানুষের জীবন একান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ধ্যানের দিকটিই মানুষের অসীম সত্তার দিক। বিচিত্র প্রয়াস-ক্ষুব্ধ মানুষের জীবন একান্ত খণ্ডিত, কেবল সীমা বোধেই পর্য্যবসিত।

বিরহে নিভৃত ধ্যান-লোকে ভাব বিগ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে অশ্রুজলে নিত্য অভিষিক্ত করিতে হয়, মর্ত্ত্য-জীবনে প্রেমের ইহাই পরা প্রাপ্তি।

"এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হতে আমার পূজা লহো গো আঁখি সলিলে
আমার স্তবগান।"

ভাব-লোকে যে পরিণামে দুটি সত্তা অখণ্ড একটি বোধে একাকার হইয়া যায়, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি। নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির মধ্যে সে পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।"

'স্মরণে'র মধ্যে আর একটি ধারার কয়েকটি কবিতা আছে, পরিশেষে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি।

অনন্ত প্রাণ-প্রবাহে কত রূপ সৃষ্টি হইতেছে। প্রাণের আন্দোলনে ওই সকল রূপ একটির পর একটি দল মেলিয়া পর্ণতা লাভ করিতেছে, আবার ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রাণ-প্রবাহে তাহার চিহ্ন মাত্র আর থাকে না। প্রাণের এই এক চিরন্তন লীলা। মৃত্যুতে একটি বিশেষ প্রাণ বিনষ্ট হয়, আর সেই শূন্যতা মুহূর্তে পূর্ণ করিয়া ভিন্ন রূপের আবির্ভাব ঘটে। এই তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত শোক ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সেখানে নিত্য প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, আবার নিত্য নূতন প্রাণ আসিয়া সেই সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতেছে। যে সমস্ত প্রাণ হারাইয়া যাইতেছে তাহার বিচিত্র ভাব-ভাবনা যেন অনন্ত-প্রাণ-ধারার সহিত বিজড়িত হইয়া থাকে। বিপুলা ধরণী নিত্য নবীনা হইযাও তাই বক্ষে অনন্ত শোক ভার বহন করিতেছেন।

"দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—"

অসীম সৃষ্টি-লোক জুড়িয়া এই যে প্রাণের প্রকাশ, ইহা অন্ধ-শক্তির লীলা নহে, ইহার পশ্চাতে যে একটি সজ্ঞান অভিপ্রায় সক্রিয়, সে অধ্যাত্ম-বিশ্বাস কবির আছে। যে স্থির পরিণাম লাভের জন্য প্রাণের এই নিত্য চঞ্চলতা তাহাকে কবি এক্ষেত্রে 'স্বর্ণ কূল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহাকে অধ্যাত্ম-লোক বলিয়াছি।

"সম্মুখে অনন্ত লোক
যেতে হবে যেথা হোক
অকূল আকুল শোক দুলে রে,
ধায় কোন্ দুর স্বর্ণকূলে রে।"

বিশেষ একটি প্রাণ যদি বিনষ্ট হয়, তবে অনন্ত শোক বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিয়া লাভ কি?—ওই 'অকূল আকুল শোকের' সমুদ্র পার হইয়া অসীম অধ্যাত্ম-লোকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

"আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে অন্ধ তরণী।"

উৎসর্গ

সীমার জগৎকে যতই একান্ত করিয়া মানিয়া লই না কেন, উহাকে যেমন করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করি না কেন, অন্তরে এমন এক আবেগ আমরা প্রতিনিয়ত বোধ করি, যাহা সকল প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে চায়। তাহা এমন এক উপলব্ধি যাহাকে মানুষ সমগ্র বিশ্বের সংশয় ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও অবিশ্বাস করিতে পারে না। অথচ বহির্জগতের সহিত তাহার ধর্ম্মের মিল এতটুকু নাই।

"এত আঁধার মাঝে তোমার
এতই অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।"

অজ্ঞাত জ্যোতির্ম্ময় লোক হইতে এই আলোক দূতী কেমন করিয়া মানব চিত্তে নামিয়া আসে? যেমন করিয়া আসুক সেই জ্যোতি রেখা কবির অধ্যাত্ম-লোকের একটি প্রান্তকে নিকষে সোণার রেখার মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সমুদ্রের কালো জল যেমন প্রভাত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শে গলিত স্বর্ণের মত সুদূর দিগন্তে স্থির আকাশ তটে আছড়াইয়া পড়িয়া তল্‌তল্‌ ছল্‌ছল্‌ করিতে থাকে, ইহা যেন কতকটা তেমনি।

যে গোপন পথ বাহিয়া অনন্তের প্রেরণা অন্তরে আসিয়া পৌঁছায় তাহা যে সম্পূর্ণ অন্তরের পথ, বাহিরে তাই তাহার কোন পরিচয়, কোন পরিমাপ নাই।

'হঠাৎ তোমার কুলার 'পরে
কেমন করে প্রবেশ করে
আকাশ হতে আঁধার-পথে
আলোর বার্ত্তাবহ।"

বস্তু জীবনের সকল প্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তী হইয়াও মনের মধ্যে অজানিত এক শূন্যতা বোধ জাগে। বাহিরে উপকরণের পর উপকরণ বাড়াইয়া এই শূন্যতাকে কোন

প্রকারে ভরাইয়া তুলিতে পারা যায় না। শূন্যতার এই অসহনীয় বোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই মানুষ অধ্যাত্ম জগতের, অসীমের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

মানুষের এই পিপাসার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধের মধ্যে যে রূপকের আশ্রয় লইযাছেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উৎসর্গের একটি কবিতার মধ্যে কবি মানব মনের এই গোপন প্রেরণার স্বরূপ বুঝাইতে এই এক রূপকের আশ্রয় লইযাছেন। কেবল এক্ষেত্রে নয়, এই উপমা কবির পরবর্ত্তী রচনার মধ্যে একাধিক স্থলে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া 'পূরবী'র 'কাঁকন জোড়া এনে দিলাম যবে' কবিতাটি স্মরণে করিতে পারে।

"আমাদের অন্তর প্রকৃতিব মধ্যে একটি নাবী বয়েছেন। আমবা তাব কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে বাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ প্রবিশ্রম কবে কতদিক থেকে কত কী যে আনছে তাব ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বলছে এই নিয়ে তুমি ঘব বাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘর কন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদেব অন্তবেব তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট কবে বলতে পারছে না যে, এসবে আমাব কোন ফল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব দিয়েও সব পেলুম বলে তাব মন মানছে না। সে ভাবছে হয়ত পাওয়াব পরিমাণটি আবও বাড়াতে হবে টাকা আবও চাই, খ্যাতি আবও দবকাব, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আব ওব শেষ হয় না। বস্তুতঃ সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকবণগুলো যে অমৃত নয় এটি একদিন তাকে বুঝতে হবে। একদিন এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের স্তুপাকাব সঞ্চয়কে একপাশে আবর্জ্জনাব মত ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে 'যে নাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্'।"

"সে কহিল, 'আমি যাবে চাই তাবে
পলকে যদি গো পাই দেখিবাবে,
পুলকে তখনি লব তারে চিনি
চাহি তার মুখ পানে।"

আমরা তাহার স্বরূপ জানি না। তবে জীবনে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার উপলব্ধি ঘটিলে জীবনের সকল অভাব, সকল শূন্যতা যে পূর্ণ হইয়া যাইবে, সকল অতৃপ্তির যে অবসান ঘটিবে, মনের মধ্যে এই সম্পর্কেও কেমন করিয়া একপ্রকার নিঃসংশয় বোধ থাকে। তাহা সমগ্র সত্তা দিয়া সমগ্র সত্তার উপলব্ধি। তাহা জীবনের আংশিক কোন চরিতার্থতা নয়, তাই তাহাতে সংশয় কোথাও থাকে না।

একদিকে মানুষ জীবন ও জগৎকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া মানবীয়

চেতনার ঊর্দ্ধতর সকল প্রেরণাকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদিগণ দিব্য-সত্তাকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া জীবনকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। একদিকে জাগতিক বোধ, অন্যদিকে জাগতিক চেতনার ঊর্দ্ধতর বোধ। এই বিরোধ কি একান্ত সত্য? দুইয়ের মাঝে কোথাও কি কোন যোগ নাই? এক বৃহত্তর সামছন্দে এই দুই লোককে কি স্পন্দিত করিতে পারা যায় না?

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া এই দুইয়ের এক অধিষ্ঠান ভূমি অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার ধারা এই পরম জিজ্ঞাসার সাগর সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কবির বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপ যেমন আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে, তেমনি সমন্বয়ের কোন্ তত্ত্ব তিনি পরিণামে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহারও স্বরূপ উপলব্ধি প্রয়োজন।

মানুষের অন্তরে যে নিত্য অতৃপ্তিবোধ, তাহা ওই ঊর্দ্ধতর চেতনা, আপনার পূর্ণ স্বরূপ লাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। মানবীয় চেতনায় এই নিত্য আবেগ অনুভূতির কোন কারণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, পারা অসম্ভব।

কুঁড়ির বুকে যে অন্ধ আবেগ, যে অসহনীয় বেদনার নিপীড়ন, তাহার কোন স্বরূপ ওই কালে সে বুঝিতে পারে না। পারে তখন যখন সে তাহার দলগুলিকে সূর্য্য কিরণে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া ধরিতে পারে, অর্থাৎ যখন সে আপনার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে।

মানব জীবন সম্পর্কেও একথা সত্য। এই দিব্য-চেতনা, লাভের পর এই নিত্য অতৃপ্তিবোধের স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহার পূর্ব্বে নহে।

ইংরেজ কবি ব্রুকের সহিত রবীন্দ্রনাথের আলোচনা স্মরণে পড়িতেছে। সেক্ষেত্রে ব্রুক এই তত্ত্বটিকেই পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন। জন্ম হইতে জন্মান্তরে রূপ-লোকের ভিতর দিয়া মানুষ কোন্ পরিণাম, কোন্ সার্থকতা লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহার কোন স্বরূপ এই বিকাশ পর্য্যায়ে সে লাভ করিতে পারে না। ইহার অর্থ মানুষ তখনই বোধ করিতে পারে যখন জীবন পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ বিকাশ (ইহার স্বরূপ যেমনই হোক) সম্পূর্ণতা লাভ করে।

"যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সে দিন বুঝিবি—
জমন ব্যর্থ যাবে না।"

বিশ্বের অন্তহীন রূপ-সৃষ্টির মধ্যে আমার সত্তাও একটি সৃষ্টি। বিশ্বের সকল রূপের অন্তরালে যে চেতনা, সেই একই চেতনা আমার মধ্যেও লীলায়িত। এই চেতনার যোগে বিশ্বের সকল রূপের সহিত আমি যুক্ত। অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া বিশ্বের সকল ভাঙ্গা-গড়া, সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া দিব্য-চেতনার যে অভিপ্রায় ধীরে সার্থক হইয়া উঠিতেছে, আমার ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া আমার সকল কর্ম্ম সকল ভাব-ভাবনার ভিতর দিয়া সেই একই অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিতেছে। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির সহিত মিলিত করিয়া ব্যক্তির এই নিয়তি রূপটিকে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন মন অপার বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। তখন আর অনস্তিত্বের ভয় থাকে না। এই বিস্ময় রস প্রেরণাই মহত্তম প্রেরণা। এই প্রেরণায় একদিকে ব্যক্তির অস্তিত্ব যেমন স্বীকৃত তেমনি বিশ্বের অস্তিত্বও স্বীকৃত। আবার ব্যক্তি ও বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া এক পরম অস্তিত্বের লীলা চলিতেছে।

মানুষের সমগ্র সত্তাকে মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, একটি তাহার জীব-সত্তা, অন্যটি তাহার অধ্যাত্ম-সত্তা। জীব-সত্তা মানুষের সীমার দিক। যে সত্তায় সে অসীমের প্রেরণা বোধ করে, সকল সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে চায়, তাহাই তাহার অধ্যাত্ম-সত্তা।

সেই ধ্যান-লোক বা অধ্যাত্ম-সত্তা যে কী, কেমন করিয়া ধ্যান-লোকে অনন্তের ক্ষণে ক্ষণে চকিত স্পর্শ আসিয়া পৌঁছায় তাহার পরিচয় লাভ করিতে এক্ষেত্রে এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি। অন্তরে ধ্যান-লোকের ভিতর দিয়া অসীমের স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা—

"মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে নিভৃত
স্বপনে।"

মানুষের একটি দিক আছে অসীম। একদিকে সে সংসারে সহস্র তুচ্ছ প্রয়োজনে আবদ্ধ অন্যদিকে সে সীমাহীন লোকে স্বপ্ন সঞ্চরণ করিয়া ফিরে, সে স্বপ্ন চারী। এই

সীমাহীন জগৎকে সে ক্রমাগত লাভ করিয়া চলিয়াছে। ইহা মানুষের সকল মনুষ্যত্বের, সকল মহত্বের ও মাধুর্য্যের দিক। অমর্ত্ত্য-চেতনাকে কবি এক্ষেত্রে 'আশার অতীত', 'পরশ চকিত' এবং 'স্বপন বিহারী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম লোকের নিঃসীম উদার আকাশ-পটে ঊর্দ্ধতর চেতনার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিদ্যুদ্দীপ্ত সেই প্রকাশের পরিচয় কবি দান করিতেছেন।

"খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি।"

আমাদের এই বহির্জীবন ও জগৎ যে অনন্ত স্বরূপের একটি প্রতিভাস মাত্র তাহা আমরা জানি না। ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিলে এই প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে আর একটি সীমাহীন জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া যায়। মানুষ ওই ধ্যান-লোকের যতই গভীর গহনে প্রবেশ করে, ততই বিস্তৃততর জগৎ একের পর এক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। অধ্যাত্ম-লোকের পর লোক অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে মানুষের অভিসার।

অধ্যাত্ম-সত্তায় উন্নততর লোকের যে আভাস নামে তাহার অতি সমৃদ্ধ সৌন্দর্য্যে, অলৌকিক আনন্দ আস্বাদে নিম্নতর চেতনা-লোক সমূহ কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া যাইতে পারে। ওই অবস্থায় অন্তরে প্রতিভাসিত অলৌকিক আনন্দ স্বরূপকে বাহিরে লাভ করিবার অবস্থা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। আকস্মিক চেতনা স্ফুরণে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা ঘটে।

ঊর্দ্ধতর চেতনা যখন আকস্মিক ভাবে সমস্ত আবরণ বিদীর্ণ করিয়া মানবীয় চেতনায় বন্যার মত নামিয়া আসে, তখন তাহার অলৌকিক আনন্দ-লোক, অপরূপ সৌন্দর্য্য-লোক লাভের জন্য মানুষ এই জগৎকে অস্বীকার করিয়া বসে।

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগ সম।"

বহির্বিশ্বের সহিত যোগে অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে চেতনার সমুন্নতির সঙ্গে, বহির্বিশ্বের সহিত যোগের প্রসারতা ও গভীরতার সঙ্গে তাহা এতদূর সমৃদ্ধি এমনি স্পষ্টতা লাভ করিতে পারে, যাহাকে একটা

পরিণামে কবি চেতনা বাহিরে কায় বদ্ধ দেখিতে এবং আপনার বাহুবেষ্টনের মধ্যে লাভ করিতে চায়। ইহার নানা পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি। 'চিত্রা' 'চৈতালি' প্রভৃতি কাব্যের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণে পড়িতে পারে। কবি-চিত্তের সেই একই প্রেরণার পরিচয় এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। আমার মনের মধ্যে যে 'নিরুপমা সৌন্দর্য্য প্রতিমা'র প্রতিষ্ঠা তাঁহারই অতুলনীয় রূপের চকিত আভাস যেন পরিচিত সকল রূপের মধ্যে মুহূর্ত্তে বিলসিত হইয়া আবার হারাইয়া যায়। তাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যাই, কিন্তু সেখান হইতে আবার দূরে তাঁহার ছিন্ন মুক্তাহারের এক একটি মুক্তা যেন শ্যামল তৃনে শষ্পে শিশির বিন্দুরূপে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া, নীলাকাশ ব্যাপ্ত তেমনি হাস্যোজ্জ্বল দুটি উদার নয়ন।

> "বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
> আপন বাসনা মম
> ফিরে মরীচিকা সম।
> বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
> বক্ষে ফিরিয়া পাই না।"

এই অধ্যাত্ম লোক আশ্রয় করিয়া কবি যে উন্নততর চেতনা লাভে সমর্থ হইতেন তাহারও পরিচয় আছে।

> "কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুঃখ নাশিয়া
> খাঁচার কোনেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
> ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা সোনার সুধায় মাখি।
> নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে আমরা খাঁচার পাখি।"

যেখানে দিব্য-চেতনা কেবলমাত্র আভাস লব্ধ, কেবলমাত্র চকিতে বিলসিত, সেখানে অন্তরে তাহার প্রেরণা স্থির ও স্থায়ী হয় না। মানুষ যতদিন না ওই চেতনার সহিত নিত্য যোগ যুক্ত হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় ততদিন উহার উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

যখন কবি সকল অধ্যাত্ম প্রেরণা শূন্য এবং সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার লোকের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উর্দ্ধমুখে ক্ষীণতম জ্যোতির আভাস লাভের জন্য অসহনীয় বোধ করিতেন, সেই মুহূর্ত্তের পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আজি পিঞ্জর ভুলাবার কিছু নাহি রে
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি আমরা খাঁচার পাখি।"

জাতীয় পরাধীনতার জন্য তিনি অন্তরের মধ্যে যে স্থায়ী একটি গভীর বেদনা বহন করিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই আত্মাবমাননা হইতে মনকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি আপনার অন্তরে একটি ভাব-লোক সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া বাস্তব দশাকে সাময়িক ভাবে জয় করিয়া উঠিতেন। কিন্তু মনুষ্যত্ব লাঞ্ছনার বিচিত্র দৃষ্টান্তে তিনি বারংবার বিচলিত হইয়া ওই ভাব-লোক হইতে স্খলিত হইয়া আসিতেন, এবং সেই সান্ত্বনাহীন অবস্থায় কবি-চিত্ত ভয়ঙ্কর বিক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িত।

কোন কোন দিন আকাশ ঘিরিয়া মেঘ নামে। বর্ষণ ভারাক্রান্ত কালো মেঘের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বারংবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে থাকে। তাহার ঘন গম্ভীর গর্জ্জন দিক হইতে দিগন্তরে ধ্বনিত হইয়া যায়। বলাকার দল পদ্মপত্রের মালা দোলাইয়া দেখিতে দেখিতে দিক প্রান্তে উধাও হইয়া যায়। এই সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবির অন্তর-আকাশ ঘিরিয়া আর এক মেঘ ঘনাইয়া আসে। সেখানে আর এক দামিনীর চকিত বিদারণ, আর এক জাতীয় বলাকার পক্ষ বিধূনন শব্দ,—এ কোন্ জগৎ! কবির বাক্যে সেই সূক্ষ্মতর অধ্যাত্মজগতের পরিচয় আমরা লাভ করি। এই অধ্যাত্ম জগৎ আশ্রয় করিয়া কবির অন্তরে আরও গভীর, পূর্ণতর অধ্যাত্ম লোকের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

"ওগো তোমার দরশ লাগি
ওগো তোমার পরশ মাগি
গুমরে মোর হিয়া।
রহি রহি পরাণ ব্যেপে
আগুন রেখা কেঁপে কেঁপে
যায় যে ঝলকিয়া।
আমার চিত্ত আকাশ জুড়ে
বলাকা দল যাচ্ছে উড়ে
জানিনে কোন্ দূর সমুদ্র পারে।"

এই অধ্যাত্ম জগৎ লাভ করিয়া মানবীয় চেতনা গহন হইতে গহনতর লোকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর চেতনার জগতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চলিয়াছে। এই অভিযাত্রার একটি পরিণামে 'আমি'র বন্ধন টুটিয়া যায়। ওই বন্ধন বিলোপের মুহূর্ত্তে পরম জ্যোতিঃ সমুদ্রে মানবীয় চেতনা পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ করে। কবি সেই পরিণাম লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত।

"তোমার সাথে যাব অকূল-প'রি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।"

মানবীয় চেতনা 'সকল বাঁধন-বাধা-খোলা' সকল সীমা বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে পূর্ণ পরিণাম লাভ করে।

সীমাবোধ আশ্রয় করিয়া জগৎ ও জীবনের একটা স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আমরা একপ্রকার পরিতৃপ্ত। তাহার পর অসীম অধ্যাত্ম-লোকে যখন আমাদের চেতনা অভিসার করে তখন অপরিচয়ের একটি ভীতি যেমন মনে জাগে তেমনি নূতনতর উপলব্ধির নিবিড় আনন্দও অনুভূত হইতে থাকে। অন্যদিকে আমাদের নিম্নতর সত্তা, জাগতিক বিচিত্র বন্ধন ও বোধ ('তাঁর পিতা' তাঁর মাতা') এই অভিসারকে পরিপূর্ণ বিনষ্টি বলিয়া বোধ করে, কারণ ওই লোকের কোন উপলব্ধি যে তাহার নাই।

অধ্যাত্ম এই উপলব্ধিকে কবি যে রূপক আশ্রয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার রূপক-ধর্ম্ম কাব্যের এক আশ্চর্য্য উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করে।

"শুনি শ্মশান বাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছল ছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জর জর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

যিনি অসীম বা অরূপ, তিনিই আবার রূপের জগতে আপনাকে বহুধা করিয়াছেন। এক স্থির সত্তার বক্ষে অনন্ত রূপ-লোকের নিত্য জাগরণ ও বিলয়। দুইয়ের যোগে এই মিলিত সাক্ষাৎকারই পূর্ণ সাক্ষাৎকার।

রূপ জগতের চির চঞ্চলতার দিকটিকেই একমাত্র সত্য রূপে দেখা যেমন পূর্ণ দৃষ্টি নয়, তেমনি যে সাক্ষাৎকার কেবল সৎ স্বরূপকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া আর সব কিছুকেই স্বপ্ন, বিভ্রম বলিয়া অস্বীকার করিয়া বসে, সে সাক্ষাৎকার ও অপূর্ণ।

"স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে
সেইখান হতে স্বর্ণ কমল
উঠেছে শূন্য পানে।"

এই রূপে দুটি আপাত পৃথক বোধ জাগে। একটি মানবীয় চেতনা, সীমার জগৎ, অপরটি মানবীয় চেতনার অতীত অসীম লোক। দুটি চেতনা বস্তুতঃ পৃথক নয়। সৃষ্টি জড়, প্রাণ ও মন (সীমার জগৎ) অতিক্রম করিয়া আরোহ ক্রমে দিব্য-চেতনায় (অসীমে) পরিণাম লাভ করিতেছে। দিব্য-চেতনা (অসীম) আবার সম্ভূতির ছন্দে অবরোহ ক্রমে মন-প্রাণ-জড় (সীমা) রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এই চলাচলের বিরাম নাই।

জগতের অন্তহীন ভাঙ্গা-গড়া, উঠা-নামাকে আশ্রয় করিয়াই একটি অখণ্ডতার পূর্ণ রূপ নিয়ত ফুটিয়া আছে, চিরস্থির, চির জ্যোতির্ম্ময়। যাঁহারা নিখিল বিশ্বকে এই সমগ্রতার দিক হইতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট জগতের এই পূর্ণ সুষমাটি ধরা পড়ে। সৃষ্টি বা বিনষ্টি কোন একটি দিক হইতে জগৎকে দেখিলে জগৎকে খণ্ড করিয়া দেখা হয়। সে দৃষ্টিতে জগতের সত্য রূপটি ফুটিয়া উঠে না।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।"

"ব্রহ্মের দুটি রূপ আছে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মৃত্যু ও অমৃত, স্থির ও চঞ্চল, তথ্য ও সত্য।" (বৃহদ আরণ্যক উপনিষদ)

মানুষ আপনাকে বিশ্ব-সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। মানুষের বোধ সকল সময় খণ্ডিত। ইন্দ্রিয় লব্ধ সীমাবদ্ধ বা খণ্ডিত রূপকে মন একটি ভাব-রূপ দান করে। তাই মানস-লোকে কোন অখণ্ডের বোধ করিতে গেলে ওই ভাব-রূপগুলি ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া যায়। মানবীয় চেতনা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া তবেই বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ মিলন বোধ করে। এ মিলন বিচ্ছিন্ন রূপের সমাহার নয়, কিংবা বৈচিত্র্য শূন্য একটি অখণ্ড সত্তামাত্রের উপলব্ধিও নয়।

সকল রূপের অন্তরালে যে অবিচ্ছিন্ন প্রাণ, সেই প্রাণের যোগে আপনার সত্তার অস্তিত্ব, এই বোধ যেমন জাগে, তেমনি সকল রূপের মধ্যে মানুষ প্রাণ-রূপে আপনার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। এই সাক্ষাৎকারে রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য যেমন থাকে, তেমনি সকল রূপের অন্তরালে যে নির্বিশেষ প্রাণ তাহা অস্বীকৃত হইয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনে ভাব ও রূপ, সীমা ও অসীম পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের যোগের রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলিয়াছেন, 'মায়ার মন্ত্র', দার্শনিকগণ ইহাকে বলিয়াছেন, অনির্ব্বচনীয় ; এবং মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইহা সত্য।

বিশ্বের আকারহীন অব্যক্ত ভাবনা-স্রোত মানব অন্তরে রূপলাভ করিবার জন্য নিয়ত আঘাত করিয়া ফিরিতেছে। মানব-চেতনা যত উন্নত হয়, মানুষ যতই তাহার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ভাবনা-বেদনাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া বিশ্বের সহিত আপনার চেতনাকে যুক্ত করিতে পারে, ততই বিশ্বের অন্তহীন ভাব-ভাবনা তাহার অন্তরে স্পন্দিত হইয়া যায়। মানুষ তখন এই সকল অব্যক্ত আকার পিয়াসী ভাবনাকে ভাষায় ছন্দে বহুবিধ সৃষ্টি-রূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। এই সকল আকার বদ্ধ ভাব-ভাবনা আবার আপনার সীমাহীন অস্তিত্বের মধ্যে আপনার বিলয় সন্ধান করিয়া ফিরে। এই সকল রূপ যখন কালে জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সেই সঙ্গে ওই সকল ভাব-ভাবনার একান্ত রূপে বিনষ্টি ঘটে না। তাহারা বিশ্বের অব্যক্ত ভাবনা-স্রোতে হারাইয়া যায় মাত্র। আবার কোন মানব-চেতনা আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়।

ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্পর্কে একথা যেমন সত্য। বিশ্ব ও ঈশ্বরের মধ্যেও একথা

তেমনি সত্য। ঈশ্বর তাঁহার অন্তরের ধ্যানকে দেশ-কালের মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই বিসৃষ্টি আবার তাঁহার ধ্যানের মধ্যে সংহৃত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার ধ্যান একবার রূপ লাভ করিতেছে, আবার রূপ-হারা-ধ্যানের মধ্যে বিলীন হইতেছে ; সৃষ্টির এই স্বরূপ।

"আছি আব আছে,'
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কাব কাছে
শুধাইব অর্থ এব !"

আমাদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-চেতনার সহিত মন ও বুদ্ধিবৃত্তির স্পষ্ট যেন একটি বিরোধীতা আছে। দুইয়ের মন্থনে জীবনে যে বিষ উঠে তাহার সীমা নাই। এই অসঙ্গতির মধ্যে কেমন করিয়া সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, সকল বিচ্ছিন্ন সুরকে কেমন করিযা একটি সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত করিযা তুলিতে পারা যায়, ইহাই মানুষের একমাত্র এবণা। অন্তর্জীবনের মধ্যেই তো কেবল সামঞ্জস্য বা সৌষম্য সাধন নয়, বিপুল বহির্বিশ্বের সহিতও তাহাকে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হয়। ততদিন পর্য্যন্ত তাহার শান্তি নাই। তাই নিদ্রাহারা হইযা মানুষ লক্ষ্য দিকে তাহার জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে,—পথ কোথায় ?

মানুষ যখন বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ মিলন বোধ করে, তখন সমগ্র জীবনের মধ্যে একটি পূর্ণ সঙ্গতির সুর ঝঙ্কৃত হইয়া যায়। একটির সহায়তায় আর একটিকে তাই সদা সতর্ক হইয়া শাসন করিতে হয় না। নৈতিক বোধের উদ্ভব এই সতর্কতা হইতে। সেখানে মনের সহিত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের একটি তীব্র সঙ্ঘাত সকল সময় জাগ্রত রহিয়াছে। মানবীয় চেতনায় এই বিরোধ সত্য বলিয়া তাই অমন নীতি তত্ত্ব আমরা সৃষ্টি করিয়াছি। পূর্ণ জীবনে দেহ-প্রাণ-মন ও উন্নততর চেতন-জগৎ বিধৃত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় এই কারণে নৈতিক বোধ কোন ক্ষেত্রেই তীব্র হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথ সকল সময় মানবীয় সত্তায় সঙ্গতির পূর্ণ সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার জন্য সর্ব্বত্রই তিনি মানুষকে উন্নততর উপলব্ধির লোকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

বিশ্ব-প্রাণ-ধারা প্রতিনিয়ত আপনাকে মানব-অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে সৌন্দর্য্য ও প্রেম বোধকে আশ্রয় করিয়া। ব্যক্তি-প্রাণ যত অধিক পরিমাণে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত হয় ব্যক্তির নিকট বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তত গভীর ভাবে অনুভূত হয়।

এমন পরিণাম আছে যখন ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তার সহিত সম্পূর্ণ রূপে একাকার হইয়া যায়। তখন ব্যক্তি-চেতনা, ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্বের সকল চেতনা সকল প্রাণের মধ্যে আপনাকে লীলায়িত হইতে দেখে। আপনার সীমাহীন অস্তিত্ববোধে মানুষ তখন মুক্তির আস্বাদ পায়।

বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির ধীর জাগরণ ঘটে। বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলনবোধে ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ প্রকাশ।

বিশ্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া যে সাধনা তাহাতে ব্যক্তির বিকাশ যেমন স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি তাহার পূর্ণ পরিণাম ক্রমে যে আনন্দের আস্বাদ, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

জীবের এই একমাত্র নিয়তি বলিয়া বহির্বিশ্বের সমস্ত কিছু, প্রতি ধূলি-কণা হইতে মহাশূন্যে অনন্তকোটি গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত মানুষকে এমন নিয়ত আহ্বান করে।

বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধের বিকাশ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির একের পর এক উন্নততর চেতনা পর্য্যায় লাভ, সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধের উন্নততর পরিণাম। চেতনার পূর্ণ বিকাশে, অর্থাৎ ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ যোগে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সীমাহীন প্রসার;—রবীন্দ্র-কাব্যে পূর্ব্বাপর এই একটি ধারার পরিচয় চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

"তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।"

কবি আপনার সাধন ফল সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছেন—

"হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব-সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।"

এই বিশ্বের সহিত যোগের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক পরিণামে মানুষ মুক্তির আস্বাদ পায়। বিশ্বকে পরিহার করিয়া মুক্তি লাভের যে সাধনা তাহা শূন্যতার সাধনা মাত্র। তাহাতে কেবল বঞ্চনাই লাভ করিতে হয়।

"যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন তরণী।"

মনুষ্য-চেতনায় প্রতিভাসিত জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপই সত্য। কারণ জীবন ও জগৎকে আশ্রয় করিয়া পরম সত্যের যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইতে চায় তাহা মানবীয় চেতনায় উপলব্ধি করা অসম্ভব।

"আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।"

সত্য শুধু এই সীমাহীন দেশ-কাল পরিপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি (আসা) ও বিনষ্টির (যাওয়া) অবিরাম অনাদ্যন্ত লীলা। এই জীবনের অপরূপ প্রকাশের যেমন, তেমনি অপ্রকাশের কোথাও কোন অর্থ নাই।

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া এই আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া ব্যক্তি-জীবনের অস্তিত্বের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে পরিণাম লাভ করিলে, রবীন্দ্রনাথ তাহারও পরিচয় দান করিয়াছেন।

"নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।"

অধ্যাত্ম বোধের প্রথম লক্ষ্য বা প্রকাশ সমগ্র বিশ্ব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক বোধের মধ্যে, 'নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়ান'র মধ্যে। উহার পূর্ণ পরিণাম ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ সামঞ্জস্য বা মিলন বোধের মধ্যে। প্রথমে ব্যক্তিত্ব বোধ জাগ্রত করা, তাহার পর বিশ্বের সহিত মিলন বোধ করা। বিশ্বের সহিত মিলন বোধে ব্যক্তিত্বের বিনাশ নয়, পূর্ণ প্রসার। পূর্ণ মিলন বোধে ব্যক্তি-তত্ত্ব বিশ্ব-তত্ত্ব লাভ করে। ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বৃহত্তর ব্যক্তিত্বকে ক্রমাগত লাভ করিয়া চলা।

এখানে 'তুমি' সম্বোধন হইতে লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও বিনষ্টির অন্তরালে স্থির একটি চেতনা সম্পর্কে সচেতন।—আরও সচেতন যে এই বিসৃষ্টি তাঁহারই এক বিশিষ্ট প্রকাশ; কিন্তু এই চেতনা সমগ্র দেশ-কাল জুড়িয়া যে অন্তহীন রূপ-লোক সৃষ্টি করিয়া বিনষ্ট করিতেছে, তাহা যে কেন, তাহার ভিতর দিয়া উর্দ্ধতর চেতনার কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইতেছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত!

"ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কেবা জানে।"

সমুদ্রের বুকে যেমন ঢেউয়ের নিত্য ওঠা ও নামা, তেমনি শাশ্বত নিঃশব্দ চৈতন্যের বক্ষে প্রাণের এই নিত্য জাগরণও বিলয়ের লীলা। মানবীয় চেতনায় কেবল সীমাবোধের ভিতর দিয়া যখন জগৎ ও জীবনকে সাক্ষাৎ করি, তখন মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিনষ্টি বলিয়া বোধ হয়; কারণ যাহা কিছু আমাদের চেতনার বাহিরে তাহাই আমাদের নিকট অনস্তিত্ব।

সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে বোধ করা যায়, যে এক পরম অধিষ্ঠান ভূমির উপর সকল রূপের সকল সীমার সকল চেতনার প্রতিষ্ঠান। জীবন ও জগৎকে যখন আনন্ত্যের দিক হইতে দেখি তখন সকল সমস্যার অবসান ঘটে।

"আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।"

রূপের জগৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রতিভাস স্বরূপে সত্য। যে সাক্ষ্যি-চৈতন্যের বক্ষে অনন্ত এই রূপ-লীলা, তাহার সহিত মিলাইয়া না দেখিলে আমাদের সাক্ষাৎকার অপূর্ণ রহিয়া যায়।

যে তত্ত্ব বা ভাব-ভূমির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ এই চিরন্তনতা বোধ করিয়াছেন, তাহা যে পূর্ণ তত্ত্ব দৃষ্টি নয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই চিরন্তন বোধ মন ও বুদ্ধি দিয়া লাভ করা সম্ভব। সেখানে দেখি একটি বিশেষ আনন্দ রূপ নষ্ট হয়, তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া অন্য আনন্দ-রূপের প্রকাশ ঘটে। মানব সংসার পূর্ণ করিয়া যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া সংখ্যাতীত নর-নারীর আনন্দ-বেদনার লীলা নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে, কোথাও ছেদ নাই।

নিখিল বিসৃষ্টি জুড়িয়া ইহা যদি একই স্বরূপের ফিরিয়া আসাও হয়, তবু এই সাক্ষাৎকারে মানুষের অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা শান্ত হইতে পারে না। সে যে এই সমগ্র বিসৃষ্টির নিত্য সৃজন প্রলয়ের অর্থ লাভ করিতে চায়। চিরকাল ধরিয়া 'যাওয়া' ও 'আসা'কে মানুষ শুধু বা অকারণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না

আমাদের এই জগৎটিতো একমাত্র রূপের জগৎ নয়, ইহার উর্দ্ধে কত সূক্ষ্ম জগৎ, অপূর্ব্ব সম্পদ ও সৌন্দর্য্যান্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই জগতের যেমন, তেমনি অন্যান্য সূক্ষ্ম জগতের পৃথক পৃথক ভাবে একত্রে সকল জগতের তিনি সাক্ষ্যি স্বরূপে অধিষ্ঠিত। সকল রূপ-লোক আশ্রয় করিয়া তাঁহারই আনন্দ বিচ্ছুরিত, এই সমস্ত জগতের একমাত্র সম্ভোগ কর্ত্তা সেই পরম শাশ্বত সৎ স্বরূপ।

এই রূপ জগতের অন্তরালে ওই যে সকল সূক্ষ্ম চেতন-জগৎ রহিয়াছে, তাহাদের একে একে অতিক্রম করিয়া ওই চিরস্থির অনির্ব্বাণ জ্যোতিলোকটিকে লাভ করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ওই অধ্যাত্ম-লোকে যেমন যাত্রা সুরু করিয়াছেন, তেমনি ওই সমস্ত জগতের অলৌকিক অনুভূতিকে মর্ত্ত্য জগতের সীমাবদ্ধ রূপ এবং ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মর্ত্ত্য-রূপ তাহা কেবল আধার রূপে সত্য, তাহা ভুলিয়া অর্থাৎ ওই রূপের আভাসে কবির অধ্যাত্ম অনুভূতির যে জগৎ তাহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া যদি ওই রূপটিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া তাহাকেই বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে বসি, তবে তাহার

ভিতর দিয়া আর যে প্রাপ্তিই ঘটুক, তাহাতে কবির অধ্যাত্ম-লোকের কোন পরিচয় মিলিবে না।

কবি স্বয়ং সে কথা বুঝাইয়াছেন। কেবল এক্ষেত্রেই নয়, ইতিপূর্ব্বে যেমন আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি, তেমনি পরবর্ত্তী কাব্য গ্রন্থ সমূহে ইহার পরিচয় বারংবার লাভ করিব।

"যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে।"

জগৎ যে প্রতিভাস স্বরূপে সত্য, এই জগতের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধলোক রহিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা লাভ করি তখনই, যখন ওই সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ করিবার মত অধ্যাত্ম চেতনার ক্রমিক বিকাশ ঘটে।

কবির কাব্য পাঠের ভিতর দিয়া বিস্মিত অলৌকিক সৌন্দর্য্য অনুধ্যানের ভিতর দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য অধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণ মুহূর্ত্তে আমাদের দৃষ্টি সমক্ষের সমস্ত দৃশ্যপট যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অভাবিত সৌন্দর্য্যের মুখামুখি দাঁড়াইয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই,—এই কি আমাদের চির পরিচিত জগৎ!

"বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।"

এই জগতের ঊর্দ্ধে কত অনির্ব্বচনীয় রূপ-লোক রহিয়াছে। এই সমস্ত জগৎ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, এক অখণ্ড সৎ স্বরূপ। তাঁহারই আনন্দে পরিপূর্ণ সুষমায় বিরাজিত এই গননাতীত জগৎ। মানবীয় চেতনায় ওই ঊর্দ্ধতর জগৎ সমূহের সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। এই চেতনার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যেমন বিশ্ব-সত্তার সহিত একাত্মতা বোধ করিতে পারা যায়, তেমনি ক্রমাগত ঊর্দ্ধ উত্তরণের ফলে যে সূক্ষ্মতর জগৎ সমূহের একের পর এক সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারা যায়, তাহাদের সহিত এমনি পূর্ণ যোগের উপলব্ধি সম্ভব।

বিশ্ব-সত্তার সহিত সহিত মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় কবির বিচিত্র কাব্য

সৃষ্টি। ওই সূক্ষ্মতর লোকান্তর সমূহের সাক্ষাৎকারে এবং তাহাদের সহিত একাত্মতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই মর্ত্ত্যভূমিকে অস্বীকার করিবার ঐকান্তিকতা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

পূর্ণ সামঞ্জস্য তত্ত্বে এই জগতের সহিত উর্দ্ধতর সকল জগৎ সমাশ্রিত। কেবল তাহাই নহে, উর্দ্ধতর সকল চেতনার অধিষ্ঠান ভূমি এই মর্ত্ত্য-লোক। তাহারই পূর্ণ ছন্দে এই মর্ত্ত্যকে রূপায়িত করিতে হইবে।

কবির চেতনা যত উর্দ্ধতর লোক লাভ করুক-না-কেন, ওই চেতনার আশ্রয় স্থল রূপে তিনি এই মর্ত্ত্য-ভূমিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। ক্রমিক উন্নততর চেতনা লাভে মর্ত্ত্যের সাক্ষাৎকারটিই ক্রমাগত অপরূপ হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্র-নাথের সমগ্র চেতনার অধিষ্ঠান ভূমি এই মর্ত্ত্য-লোক। আমির চেতনা মুক্ত হইয়া কবি যতই বিশ্ব-চেতনার সহিত একাত্মতা বোধ করিতেছেন কবির কাব্য-প্রেরণাও ততই বাধা-বন্ধ-হারা হইয়া উঠিতেছে।

পরিশেষে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

এই জগৎ পরিহার করিবার পূর্ব্বে কবি এই মর্ত্ত্য-ভূমির শেষ স্পর্শ লাভ করিতে চান। মানবীয় চেতনাশ্রয়ী জগৎ ও জীবনের এই সাক্ষাৎকারও সত্য, তাহা চুড়ান্ত সত্য না হইতে পারে। এই আসক্তি ও অজ্ঞানতা বিজড়িত জীবনের প্রতি একটি গভীর মমতা কবির অন্তরে সকল সময় রহিয়া যায়। অমর্ত্ত্য-লোক সাক্ষাৎকারে জীবন ও জগতের যে রূপ প্রতিভাত হোক, যে অর্থ আভাসিত হইয়া উঠুক, একথা তো সত্য, যে এই আসক্তি ও মোহ বিজড়িত মানব প্রেমের স্বরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

নারী মর্ত্ত্য-প্রেমের বিগ্রহ স্বরূপিনী। তাই কবি আসন্ন বিদায় মুহূর্ত্তে নারীকে সন্নিকটে আহ্বান করিয়াছেন।

> "এবারের মতো দিন হল গত
> এল বিদায়ের বেলা।
> তুমি এস এস নারী,
> আনো গো অশ্রুবারি।"

নারী প্রেম যে আমাদের চিত্তে অধ্যাত্ম-লোকের জাগরণ ঘটায় একথা রবীন্দ্রনাথ

নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে নারী প্রেমের সীমা এই পর্য্যন্ত। মানবীয় চেতনা এই অধ্যাত্ম সীমা অতিক্রম করিয়া কোন্ অসীম লোকে উর্দ্ধগামী হইয়া যায়। প্রেমের বেদনার সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যথিত বক্ষ অবারিত করিয়া 'হৃদয়ের গোপন কক্ষ,' অর্থাৎ ধ্যান বা অধ্যাত্ম-লোক অতিক্রম করিয়া আনন্দময় উত্তর-ধামে চেতনার অভিসার। মর্ত্ত্য-প্রেমের প্রয়োজন পরিণামে মর্ত্ত্যকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য।

"অবারিত কবি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়েব গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজাব বাতি।"

খেয়া

বিশ্ব-সত্তা লাভের অভীপ্সা যে কী, উহার অতি তীব্র প্রেরণায় কবি অধ্যাত্ম-চেতনার কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি জীবের কোন্ নিয়তি-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহারই সামান্য পরিচয় লাভ করিয়াছি।

খেয়ার মধ্যেও এই ত্রিধারারই পরিচয় লাভ করা যায়। সর্ব্বাগ্রে খেয়া সম্পর্কে কাব্যের উৎসর্গের মধ্যে কবি স্বয়ং যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

কোন্ সুদূর পারে প্রভাস্বর সূর্য্য। তাহার সহিত মর্ত্ত্যের একান্ত কুণ্ঠিত লজ্জাবতী লতার অন্তরের নিবিড় যোগ! আলোর অ-দৃষ্ট ইশারাকে সে আপনার পত্র পুটে লুকাইয়া রাখে, উহা তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্য, তাঁহার পরম সম্পদ। ওই আলোক যখন দৃষ্টি-পথ হইতে সরিয়া যায়, যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন নিঃসীম রাত্রির সহিত নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে সেও তাহার দিননাথের জন্য ধ্যানে প্রহর গননা করিয়া চলে। তখন কি সে ওই অন্ধকারের স্তরে স্তরে আলোকের অ-দৃষ্ট ইশারা ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পায়।

গোপন পথ বহিয়া অন্তরে উর্দ্ধলোক হইতে কত যে অপূর্ব্ব অনুভূতি নামিয়া আসে, তাহা স্পষ্ট করিয়া মানুষ ব্যক্ত করিতে পারে না। মনে হয় ওই চকিত আভাস ওই অতি ক্ষীণ উপলব্ধিটিই জীবনে একমাত্র সত্য। আমাদের সমগ্র সত্তা ওই অ-দৃষ্ট লোকের আনন্দ সুধা পান করিয়া নিত্য সঞ্জীবিত।

কোন এক আশ্চর্য্য দুর্লভ মুহূর্ত্তে মানুষ যখন এই অনুভূতি লাভ করে, তাহার পর হইতে উহাকে স্থায়ীরূপে লাভ করিবার আশায় সে বিনিদ্র রজনী যাপন করে, সেই দুর্লভ আনন্দ মুহূর্ত্তটিকে নিত্য কাল অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া আনন্দ-বেদনার জাল বুনিয়া চলে।

"ফুল গুলি সব নীল নয়নে
চুপি চুপি আকাশ পানে
তাবার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ খেয়ানে বতা।"

খেয়ায় কবি মানবীয় চেতনারও অগম পারে অনন্ত প্রসারিত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে চকিত মৃদু তরঙ্গের আবর্ত্তন তুলিয়া ডুব দিযাছেন, জ্যোতি সম্পদ তুলিয়া আনিবার জন্য। অসীমের কিছু সম্পদ বক্ষে জড়াইয়া লইযা মর্ত্ত্য-কূলে তিনি আবার ভাসিয়া উঠিয়াছেন। উহার কণামাত্র যে জীবনে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কি আর ঘুম আসে। তাহার পর হইতে তাহার নিত্য জাগরণের পালা। সমগ্র জগৎকে একান্তে রাখিয়া অন্তরের মধ্যে তাহারই ধ্যানে মানুষ কাল গণনা করিয়া চলে। খেয়ার মধ্যে কবির এই অসহনীয় অধ্যাত্ম নিপীড়ন, অনন্তের চকিত স্পর্শ লাভ এবং তাহারই নিত্য ধ্যানের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"যত্ন ভবে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে
ভেঙ্গে দিতে হবে যে তাব
নীবব ব্যাকুলতা।"

কবি জীবনও জগতের একেবারে মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া দেখিয়াছেন; যে এখানে হৃদয়ের সব ক্ষুধা মেটেনা। সেই সঙ্গে কবি ইহাও বোধ করিয়াছেন, যে মানবীয় চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া না গেলে সমগ্র জগৎ ও জীবনের অর্থ উপলব্ধি অসম্ভব।

এই লোক লাভ করিতে হয় কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া ? ইহা সেই ধ্যানের পথ, অন্তরের পথ। সকল বহির্মুখী চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিয়া ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে হইবে, আর কোন পথ নাই।

একদিকে বৈচিত্র্যময় জীবনের অপরিতৃপ্তি বোধ, অন্যদিকে উহাকে জয় করিয়া উঠিবার জন্য ধ্যান-লোকে আশ্রয় গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নে উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে।

অসীমের পরিচয় লাভ করিতে এমন একটি আন্তঃবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, যাহা সকল বহিঃবৃত্তি নিরপেক্ষ। উহার স্বরূপ কি, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আপাততঃ ইহাই আমাদের জানিলে চলিবে যে বহিশ্চেতনার দীপটি সম্পূর্ণ রূপে নিভাইযা দিতে পারিলে অন্তরে আর এক আলোক উদ্ভাসিতে হইয়া যায়। সাধক সেই জ্যোতিপথ ধরিয়া মর্ত্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্ত্য-লোকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়া যান।

কবি তাই ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিতে চাহিযাছেন। এই ভাবের কয়েকটি কবিতা খেয়ার মধ্যে আছে। তাহাদের কিছু কিছু অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

> "শ্রান্ত ওবে বেখে দে জাল বোনা,
> গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দ ভালো।
> ফিবিয়ে আনো ছড়িয়ে পড়া মন,
> সকল হোক বে সকল সমাপন।" (সমাপ্তি)

কেবল সীমা বা রূপের মধ্যে আমাদের অতৃপ্তি ঘুচে না। সকল রূপের পশ্চাতে যে অরূপের পূর্ণ ছন্দ নিত্য স্পন্দিত, অকল সীমা যে অসীমের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই যে পরম আশ্রয় স্থল, তাহাকে লাভ করিতে গেলে সীমার বোধ অতিক্রম করিতে হয। মানুষের মধ্যে তাই এমন নিত্য অতৃপ্তির বিক্ষোভ।

> "অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
> *　　　*　　　*
> এমন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।" (পথেব শেষ)

জীবন-পথটিকে পরিক্রমন করিতে হইবে, না হইলে সংশয় ঘুচিয়াও ঘুচিবে না। প্রাণমনের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করিয়া সমগ্র জগৎ ও জীবন মথিত করিয়া যখন

পরিশেষে শূন্যতাই হাতে ঠেকে তখনই ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সার্থক আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

সমগ্র বহিশ্চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিয়া কবি ধ্যান নিমগ্ন হইয়াছেন, অথচ তখনও পর্য্যন্ত দেব-যান উদ্ভাসিত হয় নাই। বাহিরের সকল দীপ নিভিয়া গিয়াছে, অথচ হৃদয় বৃন্তে জ্যোতির শিখা জ্বলিয়া উঠে নাই।

"সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে ?" (প্রতীক্ষা)

কবি চিত্তের এই গভীর ব্যাকুলতা সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির মর্ম্মমূলে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। কবির চিত্ত-লোকে যে প্রদোষ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, যে আবির্ভাবের নিঃশব্দ সমারোহ, যে অদৃষ্ট ইশারার চকিত স্ফুরণ, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির চিত্ত-লোকে যেন সেই প্রদোষ, সেই নিঃশব্দ সমারোহ, সেই অ-দৃষ্ট ইশারা। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি সেই দুর্লভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষার আবেগে কম্পমানা, যেন সেই মুহূর্ত্ত শেষে তাহার মধ্যেও এক আমূল রূপান্তর সাধিত হইয়া যাইবে।

ঠিক এই ভাবটি একটু ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে 'গানশোনা' কবিতাটির মধ্যে। যে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া কবি অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যেন সেই ধ্যান-তন্ময়তা। কবি কি ধ্যানের এই ইঙ্গিত লাভ করিয়াছেন বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট হইতে ? বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহারই আভাস ফুটিয়া উঠে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ধ্যান-নেত্রে জ্যোতির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে ততক্ষণ কবি ধ্যান-লোক ছাড়িয়া উঠিবেন না। অসহনীয় বেদনার ভারে হৃদয়-বীণার প্রতিটি তন্ত্রী যদি টুটিয়া যায় যাক্ তবু সেই পরম রাগিনীকেই ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে।

"তোরা আমায় জাগাসনে কেউ
জাগাবে সে মোরে।" (জাগরণ)

ধ্যানের রাত্রি শেষে কবি ওই অসীম বা অরূপ-লোকে জাগিয়া উঠিবেন।

চূড়ান্ত ধ্যান তন্ময়তায় মানস-লোকের সর্ব্ব শেষ প্রান্ত অগ্নিরাগে আরক্তিম হইয়া প্রায় বিগলিত হইতে চলিয়াছে।

"বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে।" (গোধূলি লগ্ন)

মর্ত্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্ত্য-লোকে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কত আশঙ্কা জাগে, অপরিচয়ের আশঙ্কা। পূর্ণ চেতনার স্বরূপ কি, এই উপলব্ধি ঘটিলে সমগ্র সত্তা (দেহ-প্রাণ-মন) কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তখনকার কর্ম্ম কি, চিন্তা কি, কোন্ ভাব-ভাবনাকে জীব তাহার পর হইতে প্রকাশ করিয়া চলে? এক কথায় দিব্য-জীবনের স্বরূপ কি?

"আমায় কে জানে কি মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে।" (গোধূলি লগ্ন)

সমগ্র ভাবাবেগ অন্তর্মুখীন হইয়া যে কালে এক যোগে একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে সীমার আবরণ উদ্ভিন্ন করিতে ভয়ঙ্কর প্রেরণায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, সেই মুহূর্ত্তের ভাবাবস্থার পরিচয়।

"ওরে আজি বহু দূরের
বহু দিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর ছুটেছে কোন্ খানে" (ঝড়)

প্রবল এক টানা ঝড়ে গাছপালা যেমন একটা দিক্ মুখান হইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তেমনি অধ্যাত্ম-বোধের আকস্মিক প্রেরণায় চিত্তের সকল বহির্মুখী, বিশৃঙ্খল প্রেরণা একমুখীন হইয়া অমন প্রবল শক্তির আবেগ রূপে অনুভূত হইয়াছে।

"আজিকে হঠাৎ কী হল রে তোর
ভেঙ্গে যেতে চায় বুকের পাঁজর,
অকারণে বহে নয়নের লোর
কোথা যেতে চাস ছুটে" (চাঞ্চল্য)

নিশ্চল প্রকৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সেদিন সে সকল নিয়ম শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য অধীর, উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তাহার হৃদয়-লোকে যেন কার আহ্বান আসিয়া পৌঁছায়! সে আহ্বানে তাহার সমগ্র সত্তা একটি সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে আপনাকে হাহাকারে হারাইয়া ফেলিতে একটি অজ্ঞাত লোকে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিতে চায়।

মানব-জীবনে এমনি এক একটি অনুভূতির মুহূর্ত্ত আসে, হৃদয়ে এক দিব্য-রূপের আভাস নামে, অমনি সজল মেঘের মত পরিব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ, অমনি স্নিগ্ধ, অমনি

সকল তাপ বিমোচন কারী, তখন প্রতিদিনের তুচ্ছতার বন্ধন হইতে মানুষ বাহির হইয়া পড়িবার জন্য মাথা কুটিয়া মরে, তখন জীবনের সব কিছু বোঝা বলিয়া বোধ হয়।

"জানি না তো আমি কোথা হতে নামি
কী ঝড়ে আঘাত লেগে
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে।" (চাঞ্চল্য)

এক একটি চেতনা পর্য্যায়ে কবির নিকট বিশ্বের এক একটি রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আজ কবি উন্নতর চেতনা পর্য্যায় লাভের জন্য উন্মুখ, ধ্যান-মগ্ন। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিও যেন কোন দয়িতকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা রত। কবি চিত্তের বৈরাগ্য বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবি সেই একই বিশ্ব-প্রকৃতিকে দেখিতেছেন। তাহার প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বিচিত্র প্রকাশ, বিচিত্রবেশ, ষড়ঋতুর বিচিত্র আবর্ত্তন, কখন সুদিনের প্রসন্নতা, কখন দুর্দ্দিনের ভয়ঙ্করতা ; কিন্তু এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া কবি-চিত্তেরই মত অধীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

কবি একটি জীবন পর্য্যায় সম্পূর্ণ করিয়া আর একটি জীবন পর্য্যাকে লাভ করিতে চলিয়াছেন। ইহা কবি-জীবনের এক পরম গম্ভীর পর্য্যায়। একদিকে অতীত দিনের স্মৃতিভারে মন আমন্থর, অন্যদিকে পরিব্যাপ্ত মহান অজ্ঞেয় লোক লাভের নিঃসাড় সমারোহ। ইহা যেন দিন শেষে রাত্রি আগমনের পূর্ব্বের গোধূলি অবস্থা। যেন পথ পরিক্রমা শেষে, পারের খেয়াতরী লাভের জন্য প্রতীক্ষা। যেন দূর দেশ যাত্রার পূর্ব্বে প্রিয়জনদের নিকট বিদায় গ্রহনের পালা। কবির এই মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করিতে কবিতার নামগুলিই যথেষ্ট। 'শেষ-খেয়া,' 'ঘাটের পথ, 'ঘাটে,' 'গোধূলি লগ্ন,' 'বিদায়,' 'পথের শেষ,' 'সমাপ্তি,' 'বর্ষা সন্ধ্যা,' 'খেয়া' ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি রূপক কবির ওই মানসিক অবস্থাকে প্রকাশময় করিয়া তুলিয়াছে।

এখন কাব্যের একেবারে প্রারম্ভে ও শেষে 'খেয়া' নামে যে দুটি কবিতা আছে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

এই 'খেয়া' মানুষের এমন একটি বৃত্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ মর্ত্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্ত্য-লোক উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ধ্যান-লোকে কবি তাহার আভাস লাভ করিতে পারিলেও এখনও তাহাকে আশ্রয় করিতে পারেন নাই। ওই লোকে কবি বিশ্ব-মানবের ধ্যান-লোকের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। এমন একাত্মতা বোধ যে সম্ভব তাহা কবি নিজের জীবনেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

ওই বৃত্তির খেয়ায় চড়িয়া কত মানুষ সীমার এপার হইাত অসীমের ওপারে যাত্রা করিয়াছে। অমর্ত্ত্য-লোকে মানবাত্মাকে একাকী অভিসার করিতে হয়।

কবি মানস-লোকের উর্দ্ধতম সীমা-লোকে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু সেই বৃত্তির স্ফুরণ কোথায়, সেই খেয়া তরী, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি অসীমের ওপারে পৌঁছাইয়া যাইবেন ?

"ওপাব হতে সোনাব আভা
পবাণ ফেলে ছেয়ে,
ওগো আমার নেয়ে।" (খেয়া)

কেবল অমর্ত্ত্য লোকের একটা আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়, কিন্তু ওই পারে পৌঁছাইবার কি কোন উপায় নাই ?

মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য-চেতনার মধ্যবর্ত্তী যে সীমাহীন অন্ধকার-লোক, তাহাকে পার হইতে হয় কেমন করিয়া, কাহাকেই বা আশ্রয় করিয়া ?

তাহারপর কবি পরিশেষে ওই খেয়াতবী লাভ করিয়াছেন। ওই তরীতে উঠিয়া তিনি মর্ত্ত্যের সকল বন্ধন একে একে খুলিয়া দিয়াছেন।

"শুধু শিকল দিলেন খুলে
শুধু নিশান দিলেম তুলে।" (সমুদ্রে)

কেবল যুক্তি, বিচার ও ভাবনার সহায়তায় অসীমের উপলব্ধি অসম্ভব। অসীমকে লাভ করিবার উপায় সীমা অর্থাৎ ব্যক্তি বা 'আমি'র বোধ বিসর্জ্জন দেওয়া। আমিত্ব বলিতে মর্ত্ত্যের আসক্তির সামগ্রিক প্রকাশটিকে বুঝায়। ইহাই 'শিকল খুলিয়া' দেওয়া। এই বোধ বিসর্জ্জন দিতে মানুষকে অসীমের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এই নির্ভরতাই ভক্তি। এই ভক্তির ভিতর দিয়া (ইহাই নিশান) মানুষ তাঁহারই কৃপার-বাতাসে ভর করিয়া লক্ষ্য স্থলে পৌঁছাইয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে মর্ত্ত্যের আভাস ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে। এই যে ধীর উত্তরণ, ইহার কোন্ পরিচয় কেমন করিয়া মানুষ দান করিবে? ইহা মানুষের সম্পূর্ণ অননুভূত লোক।

"যাক্ না মুছে তটের রেখা
নাই বা কিছু গেল দেখা—।' (সমুদ্রে)

মর্ত্ত্য চেতনার আশ্রয় যখন নষ্ট হয়, চির পরিচিত মর্ত্ত্য-সীমা যখন হারাইয়া যায়, তখন মনের মধ্যে এক অলৌকিক আশঙ্কা জাগে। এই আশঙ্কা জয় করিয়া উঠিতে হয় সর্ব্বস্ব সমর্পণের ব্যাকুলতা, পরিপূর্ণ নির্ভরতা, অর্থাৎ ভক্তির সহায়তায়। তখন এই বোধ থাকে যে, যে-প্রেরণা তাহাকে পরিচিত জগৎ হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে, সেই প্রেরণাই একদিন আকাঙ্ক্ষিত লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

কবির এই সাধনা এই যাত্রা নিষ্ফল হয় নাই। কবির খেয়াতরী পরিণামে অমর্ত্ত্য-লোকের তীরে ভিড়িয়াছে।

"এমন সময় অরুণ তরণী বেয়ে
প্রভাত নামিল গগন পারে।" (সার্থক নৈরাশ্য)

এই অলৌকিক অনুভূতিকেও কবি ভাষা-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা সীমার জগতের সামগ্রী, ইন্দ্রিয় লব্ধ অনুভূতিকে তাহা একটা সুস্পষ্ট ভাবরূপ দান করিতে পারে মাত্র। এই সীমাবদ্ধ ভাষা দিয়া অসীমের অনুভূতিকে তাই প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এই জাতীয় সকল প্রয়াসের মধ্যে তাই লক্ষ্য করা যায়, যে এক অলৌকিক উল্লাসের দিব্যোন্মাদের অস্থিরতা বারংবার সকল রূপ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"আজ নয়ন মেলিয়া এ কী হেরিলাম
বাধা নাই কোন বাধা নাই
আমি বাঁধা নাই।" (মুক্তি, পাশ)

"এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে
আলোক আমার তনুতে-কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে—" (মিলন)

"অন্তর হতে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল মিশা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোথাও না পায় দিশা।" (টিকা)

৩৮৫

অলৌকিক আনন্দ ও সৌন্দর্য্য বোধকে রূপায়িত করিতে কবির রূপক ক্ষমতা যে কত উর্দ্ধে উঠিতে পারে তাহার পরিচয় লাভ করিতে আমি কেবল একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এমন অনেক পরিচয় কাব্য মধ্যে আছে।

"ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে স্বর্গ পুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল মধু চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙ্গেছে চাক সুধার ভারে
সোনার মধু লক্ষ ধারে লাগে ঝুরিতে।" (বর্ষা প্রভাত)

এই সাক্ষাৎকারের পর মানুষের আর কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেই সুধা-রস পানে মর্ত্ত্যের মানুষের সকল পিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়া যায়।

খেয়ার মধ্যে কবির বিচিত্র অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার যে পরিচয় লাভ করা যায় এই প্রসঙ্গে তাহার কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

জগৎ ও জীবনের উর্দ্ধতর চেতনা লাভই যদি পরম পুরুষার্থ হইয়া থাকে, তবে এই জীবনের মূল্য কি, ইহার অর্থই বা কি? একদিকে সীমার বোধ, অন্যদিকে অসীমের বোধ। এই দুয়ের মাঝে যোগ কোথায়, কোন স্বরূপে?

জীবের সেই সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির সত্য মূল্য যদি কোথাও কিছু থাকে, তবে তাহা কেবল অসীমের যোগে। অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সীমা শূন্য হইয়া উঠে। সীমা-রূপ আশ্রয় করিয়া অসীম নিত্য নব রূপ নব ভাব সৃষ্টি করিতেছে' এই সৃজন প্রলয়ের মধ্যে তাঁহার অনন্দের প্রকাশ।

"শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।" (লীলা)

এই লীলা যখন ফুরায় তখন সীমা অনস্তিত্ব হইয়া যায়।

"মেঘের খেলা মিলিয়ে যাবে
জ্যোতি সাগর পারে।" (লীলা)

তিনি আপনার সৃষ্টি বা মায়া-শক্তির দ্বারা মায়া রূপ পরিগ্রহ করিয়া আপনার আনন্দ আপনি সম্ভোগ করিতেছেন। সীমা আশ্রয় করিয়া যে 'নিত্য বিচিত্রতা' সৃষ্টি, তাহাই মায়া। সীমা ও অসীমের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করিতে পারা যায় না

বলিয়া সীমাও শূন্য বা মায়া। সত্য শুধু এক জ্যোতি প্রসার। অদ্বৈতবাদীদের যাহা মায়া তত্ত্ব, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে লীলা-তত্ত্ব রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

একখণ্ড মেঘ আকাশের বুকে বায়ুভরে ভাসিয়া বেড়ায়। প্রতি মুহূর্তে কত রূপ পরিগ্রহ করে, আলোক রশ্মি তাহার বুকে কত রঙের আলিম্পনা আঁকিয়া মুছিয়া দেয়। বৈশাখের ঝড়ের মুখে কখন দুর্ব্বার, মধ্যাহ্নে আমন্থর। তাহার পর এই এক খণ্ড মেঘ কোথায় হারাইয়া যায়। ঊর্দ্ধে কেবল চির স্থির নীল আকাশ হাসিতে থাকে।

ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া বহির্জীবনের সকল প্রলোভন জয় করিয়া উঠিতে না পারিলে দিব্য জীবন লাভ ঘটে না। 'বিচিত্র ছলনা জালকে' যে কাটাইয়া উঠিতে পারে সেই কেবল পরম সত্য লাভ করিয়া ধন্য হয়।

সাংসারিক মানুষ ঐশ্বর্য্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ইহাদিগকে বঞ্চিত বোধ করে, কিন্তু ইহারা যে অনন্ত সম্পদ বক্ষে ধরিয়া মর্ত্ত্য হইতে বিদায় লইয়া যায় তাহার পরিমাপ সাংসারিক মানুষ করিতে পারে না, বুঝিতে পারে না যে তাহারা কতদূর বঞ্চিত ও করুণার পাত্র। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিয়াছি। মর্ত্ত্য হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কবির এই উপলব্ধিই অগ্নি-দীপ্ত-বাণী-বন্ধনে শেষ বারের মত উচ্চারিত হইয়াছে।

"এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।"

যে প্রেরণা একেবারে সামঞ্জস্য বা সৌষম্য লাভ করিতে চায়, তাহা খাঁটি কাব্য প্রেরণা নহে। রূপ বা এই অর্থে অসামঞ্জস্যকে পরিহার করিয়া একেবারে অরূপ বা পূর্ণ সামঞ্জস্যকে রূপায়িত করিবার যে প্রেরণা, তাহা সঙ্গীতের প্রেরণা, খাঁটি কাব্য প্রেরণা নহে। সঙ্গীতের প্রেরণায় অব্যক্ত অনুভূতি আর রূপাশ্রয়ী হইয়া প্রকাশিত হয় না। কিন্তু কাব্যে ওই রূপটি যেমন থাকে, তেমনি ওই রূপ অতিক্রম করিয়া অরূপে উত্তরণের অলৌকিক একটি প্রেরণাও প্রচ্ছন্ন থাকে। খাঁটি কাব্যে

তাই মানুষের উভয় প্রেরণা চরিতার্থ হয়, রূপ-পিপাসা যেমন, অরূপ-পিপাসাও তেমনি।

"সঙ্গীত এই রূপে অন্যান্য শিল্প কর্ম্মের বিপরীত এবং উহা বিশ্ব-ছন্দটিকে অপরোক্ষ ভাবে রূপায়িত করিতে চায় বলিয়া উহার অচেতন অধ্যাত্ম মূল্য আছে।"

(ক্রোচে)

গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতালি পর্ব্বে এই কারণেই কবির অমন অফুরন্ত সঙ্গীত সৃষ্টি। এই সঙ্গীত ধর্ম্মী হইয়া উঠিবার পশ্চাতে যে বিশ্ব-সত্তা বা পূর্ণ সামঞ্জস্যকেই রূপায়িত করিবার প্রেরণা রহিয়াছে তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে।

কবি যেখানে রূপ আশ্রয় করিয়া অরূপ-লোকে ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, সেই খাঁটি কাব্য প্রেরণার পরিচয় খেয়ার মধ্যে যে কয়েকটি কবিতায় রহিয়াছে এখন তাহাদের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রির ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ বর্ষণে সম্মুখের সরোবর কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। অবিশ্রান্ত ধারাপাতে এবং মত্ত বাতাসের তীব্র আলোড়ন-ক্লিষ্ট কমল-কলিকা প্রভাত সূর্য্য কিরণে সকল দল বিকশিত করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। এইটুকু মাত্র রূপ, কিন্তু কোন্ মহাভাবকে কবি এই রূপক আশ্রয় করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

ধ্যানের নিঃসীম অন্ধকার অতিক্রম করিয়া কবির অন্তরে অলৌকিক প্রভা উদ্ভাসিত হইয়াছে। ধ্যান-লোকের সমুদ্রোচ্ছ্বসিত বেদনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দিব্য শতদলের প্রকাশ ঘটে।

এই রূপে বাহিরের রূপ অন্তরে আর এক সরোবর, আর এক বর্ষণ ক্ষুব্ধ রাত্রি, আর এক প্রভাত, আর এক কমল-কলিকার দল বিস্তারে রূপায়িত হইয়া গিয়াছে।

"হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমল কান্তি
কেমনে রাজে।" (প্রভাতে)

কুঁড়ির বক্ষে সৌরভের যে বেদনা তাহা যে পূর্ণতা লাভের জন্য তাহা সে তখনি

বুঝিতে পারে যখন পাপড়ির বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। মানুষের জীবনেও একথা সত্য ;অর্থাৎ মানুষও আপনার অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় পূর্ণ জীবন লাভের ভিতর দিয়া, পরিণামে জীবনের ঊর্দ্ধে উঠিয়া। তাহার পূর্ব্বে জীবন অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ জীবনের সীমায় লাভ করিতে পারা যায় না।

সৌন্দর্য্য-ধ্যান কি, উহার ধ্যান তন্ময় মুহূর্ত্তে উন্নততর চেতনার আভাস কেমন করিয়া অন্তরে আসিয়া পৌঁছায় তাহার সুন্দর পরিচয় লাভ করা যায় 'দিঘি' কবিতাটির মধ্যে।

"শেওলা পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,
ডুবে যাওয়ার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলাম আপন মনে ভেসে গেলাম পারে,
ফিরে এলাম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলাম চলে এলেম যেন
সকল হারা দেশে।" (দিঘি)

এমনি করিয়া সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবি মর্ত্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্ত্য আর এক লোকে, বহির্লোক হইতে সীমাহীন অন্তর্লোকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেন।

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া চেতনা যখন সম্পূর্ণ অন্তরাবৃত্ত হইয়া যায়, তখন তাহা এমন এক অনুভূতি লোকে উত্তীর্ণ হয়, যাহাকে জাগতিক কোন বোধ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না।

"ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ঙ্কর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ
মাটির পিঞ্জর।" (দিঘি)

রাজা নাটকে রাণীর শেষ উক্তি স্মরণে পড়িতেছে। রাজা রাণীকে ডাকিতেছেন আলোক, বিশ্ব-মানবের লীলা ক্ষেত্রের মাঝখানে। আর রাণী সেই আলোকে

বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্ধকার ঘর, আর তাঁহার সেই অন্ধকার ঘরের রাজাকে শেষ প্রণাম করিয়া লইতে চাহিতেছেন।

এই অন্ধকার ঘর কি, না চিত্তের সেই অবস্থা, যে অবস্থায় মানবীয় চেতনা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন, অথচ তখনও পর্যন্ত সেই জ্যোতির্ময় দিব্য-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায় নাই।

"তীরের কর্ম্ম সেরে আমি গায়ের ধূলো নিয়ে,
নামি তোমার মাঝে—
এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছল্ ছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে।" (দিঘি)

কবি বারংবার অন্তরের এই ধ্যান-লোকে আশ্রয় লাভ করিতেন, বাস্তব জীবনের ম্লানতা ও মালিন্য হইতে সাময়িক ভাবে মুক্ত হইবার জন্য। সেই লোক আশ্রয় করিয়া আনন্ত্যের কত-না চকিত আভাস তাঁহার অন্তরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এক অন্তহীন ব্যথা ভরা সুর, এক নিঃসীম ব্যাকুলতা।

কবি চেতনা এই দিব্য পরিণাম লাভ করিয়াছে কেবল সৌন্দর্য্য-ধ্যানের মধ্য দিয়া নয় প্রেমের ধ্যানৈক পরিণামের মধ্য দিয়াও।

দার্শনিক চিন্তায় কোথাও কোথাও দিব্য ও মানবীয় চেতনাকে যেমন সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তেমনি ইহারই প্রভাবে আমরা মানবীয় প্রেম এবং ঈশ্বরীয় ভক্তিকে পৃথক বলিয়া বোধ করি। মানবীয় প্রেম যে একটা বিশেষ পরিণামে ভক্তি স্বরূপতা লাভ করে তাহা এই কারণেই আমরা বুঝিতে পারি না।

নর-নারীর প্রেম যে পরিণামে অহং-এর শাসন অতিক্রম করিয়া বিশ্ব বা আনন্ত্যমুখীন হয় প্রেমের সেই পরিণামকে বলে ভক্তি। দিব্য চেতনায় উহার যে অবসান তাহাই মুক্তি। প্রেমের এক স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন চেতনা-পর্য্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ ও ধর্ম্ম লইয়া প্রতিভাত হয়।

খেয়ায় মধ্যে অধ্যাত্ম বোধাশ্রয়ী প্রেমের যে পরিচয় লাভ করা যায়, এক্ষেত্রে তাহারও কিছু আলোচনা করিতেছি।

নর নারীর প্রেমোপলব্ধিকে যে মিষ্টিক উপলব্ধি বলা হয়, তাহার মূলে এই কারণ রাহিয়াছে। প্রাণের অতি প্রবল স্ফুরণ ধ্যান-লোক বিদীর্ণ করিয়া মুহূর্ত্তের

জন্য জীবনে অলৌকিক সাক্ষাৎকার ঘটায়। তাহার পর নর-নারী ইহাকে একটি বিশিষ্ট রূপাশ্রয়ী করিয়া উহারই স্মৃতির ধ্যানে ডুবিয়া যায়। এইরূপে ধ্যান-লোকটি একান্ত হইয়া উঠিবার ফলে বহির্জীবনের সকল বন্ধন একে একে শিথিল হইয়া যায়।

"ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে সুদূর পারে—" (শুভক্ষণ)

মুহূর্তের এই সাক্ষাৎকার লাভের পর হইতে জাগতিক সকল বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, একটি পরিপূর্ণ বৈরাগ্য বা আত্ম সমর্পণের জীবন সুরু হয়। ইহার পরিচয় কবি 'ত্যাগ' কবিতাটির মধ্যে দান করিয়াছেন।

"ছিঁড়ি মণি হার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে।" (ত্যাগ)

এই সাক্ষাৎকার ঘটে অন্তরে, ধ্যান-লোকে, তাই বাহিরে ইহার কোন পরিচয় নাই, পরিমাপ নাই।

"আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
রহিল ধূলায় ঢাকা।" (ত্যাগ)

'মা' সেই লৌকিক চেতনা, যাহার নিকট অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং ত্যাগের কোন মূল্য বোধ নাই। লৌকিক সত্তা ত্যাগের বেদনাটিকেই কেবল প্রত্যক্ষ করে। এই বেদনার পারে যে আনন্দ-শতদল একটির এর একটি করিয়া দল মেলিয়া চলে, অর্থাৎ ত্যাগের ভিতর দিয়া যে আনন্দ সম্ভোগ তাহার কোন পরিচয় তাহার নাই বলিয়া সে অমন বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া যায়। লৌকিক চেতনায় ত্যাগ শূন্যতা মাত্র। শুদ্ধ আনন্দ প্রেরণায় যে ত্যাগ তাহার কোন উপলব্ধি এই চেতনায় সম্ভব নয়।

নর-নারীর প্রেমে দেহ-প্রাণ-মন ঘিরিয়া যে তীব্র বিক্ষোভ ও জ্বালা তাহা বিশোধিত হইয়া ধ্যান-লোকে কেমন ভঙ্গিতে স্নিগ্ধ, পরিব্যাপ্ত বিষাদে পরিণত হইয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিতে আমি আর একটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি।

যে পুরুষ অজ্ঞাত, রহস্যপূর্ণ জীবনের অনন্ত যাত্রা পথে নারীকে ভালবাসিয়া তাহার উচ্ছলিত হৃদয়-কলসের পরিপূর্ণ প্রেম-সুধা অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছিল

সে আজ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন্ অজ্ঞাত লোকের পর লোক অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছে, তাহার পথ চলার বিরাম নাই। সেই অবিরাম পথ চলায় হয়ত আজিকার এই স্মৃতিটুকু ম্লান হইয়া নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। নারীর তাহাতে অভিমান নাই। ওই দানেই তাহার প্রেম চিরকালের জন্য চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে।

সেই তৃষিত প্রার্থনায় জল দানের পর হইতে নারীর চোখে আর ঘুম আসে না। ইহাকেই প্রাণের অলৌকিক জাগরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সেই সীমাহীন আনন্দ ও বেদনার স্মৃতি বক্ষে লইয়া তাহার প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়া যায়। সে আর ফিরিয়া আসিবে না তাহা জানিয়াও নারী প্রতীক্ষায় প্রহর গননা করে। ফিরিয়া আসা গৌণ, এই উপলব্ধির পর হইতে নারীর জীবন অহর্নিশ জাগরণে পরিণত হইয়া যায়।

"তোমায় দিতে পেরে ছিলাম একটু তৃষার জল
এই কথাটি আমার মনে রহিল সম্বল।" (কুয়ার ধারে)

নর নারীর জাগতিক জীবন যে একান্ত বিনষ্ট নয়, ঈশ্বরীয় বোধ ও জাগতিক বোধ যে একান্ত বিচ্ছিন্ন নয়, মানবিক প্রেমের বিচিত্র লীলার ভিতর দিয়া নর-নারী স্বাভাবিক পরিণামে যে ঈশ্বরীয ভক্তি লাভ করে কবির এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়াছে 'বালিকা বধূ'র মধ্যে। ইহা কবি-জীবনের একটি স্থায়ী উপলব্ধি। এই উপলব্ধিকে তিনি পূর্ব্বাপর নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিশেষে আর এক শ্রেণীর কবিতার কিছু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট একটি রস-প্রেরণার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। বিশিষ্ট একটি রস-প্রেরণাই শুধু নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট একটি সাধনার অধিকারী করিয়াছে। এই জাতীয় কবি-প্রেরণার প্রতি ইঙ্গিত ইতিপূর্ব্বেও যেমন করিয়াছি, পরবর্ত্তী কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহার উল্লেখ করিব। বিশিষ্ট এই রস-প্রেরণাই রবীন্দ্র-কাব্যের সিদ্ধ রস।

কবি জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার একটি পরিচয় তিনি 'ঘাটের পথে' কবিতাটির মধ্যে দান করিয়াছেন।

আমাদের জীবন কেবল প্রয়োজন বোধেই জল লইয়া আসায় সীমাবদ্ধ নয়, সীমাবদ্ধ চেতনায় কত অপরূপতার আভাস লাভ ঘটে, অনন্তের কত বিদ্যুদ্দীপ্তি।

সীমাবদ্ধ বোধ দিয়া অপরিজ্ঞাত জগৎকে আমরা যতটা বেষ্টন করিতে পারি ততটুকই আমাদের পরিচিত জগৎ। এই পরিচিত জগতের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অসীম রহস্য লোকের চির উদ্বেলতা। এই পরিচিত লোকের কেন্দ্র স্থলবর্ত্তী হইয়া অপরিচিত লোকের চিন্তা করিলে অন্তরে যে অপার বিস্ময় বোধ জাগে জীবনে তাহারও একটি বিশিষ্ট রস-প্রেরণা আছে।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি প্রাণের যে লীলা, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে বিচিত্র প্রকাশ তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনে যে অনির্ব্বচনীয়তার আভাস লাভ, কবি তাহার পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন।

> "আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
> শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ,
> দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।" (ঘাটের পথ)

এই জীবনকে এই লীলাকে কবি কত আপনার করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। তাহা কবিকে কী নিশ্চিন্ত নির্ভরতাই না দান করিয়াছিল!

> "যা হোক তা হোক এই ভালোবাসি
> বহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি,
> কতদিন কত বার।" (ঘাটের পথ)

কান্না হাসি, দুঃখ সুখ বিজড়িত এই মানব জীবন। বিশ্ব-প্রাণ স্রোতে সেই নিরুদ্দিষ্ট ভাসিয়া যাওয়া, আনন্দ-বেদনার কী আশ্চর্য্য প্রসার! কেবল প্রাণের আন্দোলন নয় সৌন্দর্য্য-প্রেমের অন্তহীন লীলা বিলাই নয়; ধ্যানে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের যে স্থির অনির্ব্বচনীয় রূপ ফুটিয়া উঠে সেই রূপের নিভৃত আরতি তাহারও কত না পরিচয় আছে কবির কাব্যে।

আর এক অনির্দ্দেশ্য ব্যাকুলতায় চিত্ত সজল হইয়া উঠে। যাহা মানবিক এই সকল বোধকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া কোন্ অসীম লোকে নিত্য উপচাইয়া পড়িতেছে।

"যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা,
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা।
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছল ছলি
জলভরা কলকথা—" (ঘাটের পথ)

বিশ্ব এমনি করিয়া কবির সমগ্র সত্তাকে নানা ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কবিকে কত না নাম ধরিয়া কত খেলায় ডাক দিয়াছে।

"আমি বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে!" (ঘাটের পথ)

আজ কবির জীবনে এই পর্য্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

জীবনের এই রস প্রেরণাকে পরিহার করিয়া কবি আজ পূর্ণ চেতনা লাভের জন্য উৎসুক। এই ঔৎসুক্য বোধের সঙ্গে সঙ্গে কবি আবার মর্ত্ত্য জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন। জীবনে এই অপূর্ণতার পীড়া বোধ আছে বলিয়া তো এত প্রেম, প্রেমে এমন অধীরতা। মর্ত্ত্যের প্রেম এই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য নিত্য উৎকণ্ঠিত।

"কম কিছু মোর থাকে হেথা
পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।" (ঘাটে)

যে রস-প্রেরণা মর্ত্ত্যের এই অপূর্ণতাকেই কল্পলতা বোধে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতে চায়, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই রস-প্রেরণার স্বরূপ বুঝিতে হইবে।

মর্ত্ত্য জীবনের প্রতি গভীর মমতাই অমন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে 'পথিক' কবিতাটি মধ্যে। অন্তরের মধ্যে অলৌকিক প্রেরণা যখন অনুভূত হয়, তখন উহারই অনুপ্রেরণায় মানুষ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া বসে। জীবনের আর কোন কিছুতে তাহার মন বসে না।

অমর্ত্ত্য লোকে অভিসার করিবার পূর্ব্বে মর্ত্ত্যের ব্যাকুল আহ্বান তাহার হৃদয়কে করুণা-রস-সিক্ত করিয়া তুলে না, হায়! মর্ত্ত্য প্রেম এমনি অসহায়! সে যে

বাঁধিয়া রাখিবে এমন শক্তি তো তাহার নাই। সে শুধু মমতায় দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে পারে।

পথিক ওগো মোদের নাহি বল
রয়েছে শুধু আকুল আঁখি জল।" (পথিক)

অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে বিশ্ব প্রকৃতির প্রাণপণ কত না প্রয়াস।

"এ খেলা যদি না লাগে তব ভালো
শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিভিয়ে দিব আলো
বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বসি
ঝিল্লি-রব উঠিবে জেগে বনে,
কৃষ্ণ রাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।" (পথিক)

জাগতিক জীবনে, স্পষ্ট দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি আলোকের, রূপের, বৈচিত্র্যের, চাঞ্চল্যের এবং সম্ভোগের ; আর একটি অন্ধকারের, একাকারের, এবং ত্যাগের। একটিতে মানবীয় চেতনা বহির্মুখী অন্যটিতে অন্তর্মুখীন। মানবীয় চেতনার, জাগতিক বোধের দুটি পর্য্যায়। একটির অপরিতৃপ্তি দূর করিতে তাই জাগতিক চেতনা ছাড়াইয়া উঠিবার কোন প্রয়োজন নাই!

ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে জীবনের এই পর্য্যায় আশ্রয় করিয়া সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিযাছি। সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, যে জীবনের পূর্ণ সমাধান লাভ করিতে মানুষকে জাগতিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। মন ও বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া এই রূপে যত তত্ত্বই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাক্ না-কেন, তাহার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে।

কবি যে অতৃপ্তি বোধ করিতেন, তাহাকে অমর্ত্ত্য কোন চেতনা-লোক লাভ করিয়া নহে, এই জগৎ ও জীবনের একটি ভিন্ন দিক আশ্রয় করিয়া চরিতার্থ করিবার এই রূপ নানা চেষ্টা করিতেন।

এই বিশিষ্ট প্রেরণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'নীড় ও আকাশ' কবিতাটির মধ্যে।

কবি যে অমর্ত্ত্য লোক লাভে অসমর্থ হইয়া অমনি উপায়ে প্রাণ-মনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও নহে।

ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভে যে পূর্ণতা বোধ তাহা কবি লাভ করিয়াছিলেন।

"আপন মনের পাইনে দিশা
ভুলি শঙ্কা হারাই তৃষা,
যখন কবি বাঁধন হারা
এই আনন্দ অমৃত পান।" (নীড় ও আকাশ)

সাধকের জন্ম জন্মান্তরের সাধন লব্ধ এই অমৃত পাত্রকে করায়ত্ত করিয়াও কবি তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অপূর্ণ জীবনের বিশিষ্ট যে রসাস্বাদ তাহার নিকট অমৃতের আস্বাদ বুঝি কটু।

"তবুও এই ভালোবাসি
আলো ছায়ার বিচিত্র গান।" (নীড় ও আকাশ)

এই রস প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট এক সাধন মার্গাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছে। এই রসপ্রেরণার দার্শনিক স্বরূপ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি

সকল রূপ, সকল সীমার ভিতর দিয়া কবি যে অসীম বা অরূপের বারংবার আভাস লাভ করিয়াছেন, যে অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ, মুহূর্ত্তের জন্য চেতনার যে সীমাহীন প্রসার বোধ করিয়াছেন, আজ কবি সেই অসীম বা অরূপকে অব্যবহিত রূপে স্থায়িভাবে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল।

বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে কবি তাঁহারই আভাস লাভ করিতে পারেন, সকল রূপ যেন তাঁহার শরীরী বাণী, যেন তাঁহারই আনন্দময়ী দূতীগুলি নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহারই প্রেম ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। আজ কবি সকল রূপের অতীতে সেই অখণ্ড অপরূপকে সকল আধার মুক্ত করিয়া লাভ করিতে চান। এতদিন তিনি বিশ্বময় রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরিয়াছেন, আজ সকল রূপকে অনুবিদ্ধ করিয়া সকল রূপের অতীত সত্তাকে লাভ করিবার জন্য উন্মুখ।

"রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরি।"

কিংবা

"চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জ বন নিভৃতে
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে
সেইখানে ভাই, করব গমন নিশীথে।"

কবির তাই প্রার্থনা

"তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।"

আবরণ তো অসীমে নাই। তাহা স্বয়ং প্রকাশ। 'আমি'র ছায়া আমাদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। এই আমিকেই বলে 'মায়া', 'হিরন্ময় পাত্র' কবি যাহাকে বলিয়াছেন, 'মুখের ঢাকা', 'মেঘাবরণ'। এখানে সেই করুণার কথা আসে। এই সর্ব্বশেষ 'ওইটুকু' আবরণ ছিন্ন করিয়া দিতে ঈশ্বরের করুণা প্রয়োজন। তাঁহার মায়ার আবরণকে তিনি আপনি সরাইয়া না দিলে মানুষ বুঝি নিজের সাধনায় এই শেষ সিদ্ধি করায়ত্ত করিতে পারে না।

এতদিন কবি বাহিরে রূপের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সুখ-দুঃখ বিজড়িত বিচিত্র মানবিক বোধকে কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, আর ওই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া তাঁহার হৃদয়-লোকে কত বারবার কোন এক অপূর্ব্ব-লোকের প্রসাদ আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। তাঁহার প্রাসাদের বহিঃ প্রাঙ্গনে ইহা যেন ক্রীড়া। অথচ ইহার মধ্যে একটি নিঃসংশয় বোধ থাকে যে সন্ধ্যাবেলায় ক্রীড়া শেষে সেই গৃহের অভ্যন্তরে ডাক পড়িবে, পরম আকাঙ্ক্ষার ধন যিনি তিনি সকল ধুলা ধুইয়া মানব শিশুকে

তাঁহার ক্রোড়ে আপনি তুলিয়া লইবেন। দীর্ঘ জাগরণের পর সে যেন পরম বিশ্রাম। কবির জীবনে বাহির অঙ্গনে খেলার পালা বুঝি সাঙ্গ হইয়া আসিল, কবি তাই চকিতে চকিতে অন্যমনা হইয়া পড়েন, কখন গৃহের অভ্যন্তর হইতে ডাক আসিবে।

"এখন সময় হয়েছে কি।
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, "আমার ধর্ম্ম হইল অতি মানবিক সত্তা, বিশ্ব-মানব-সত্তা এবং আমার ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা।"

ব্যক্তি-সত্তার ধীর বিকাশ ও সম্পূর্ণতা ঘটে বিশ্ব-সত্তার যোগে; পরিণামে ব্যক্তি-সত্তা ও বিশ্ব-সত্তার মধ্যে আর কোন ভেদ থাকে না। ব্যক্তি আপনার চেতনাকেই তখন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখে। কিন্তু এই পরিণাম লাভ করিয়াও ব্যক্তি-সত্তা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এখানেও সীমা বোধ থাকে। ব্যক্তি তখন বিশ্ব-সত্তাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। অসীম যিনি তিনি অব্যাকৃত থাকিয়াই কোন্ রহস্যের বশে সীমাকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দ্যে নিত্য উপচাইয়া পড়িতেছেন। তাই ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ মিলন সাধনই শুধু নয় সেই এক রহস্যের ভিতর দিয়া বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়াই বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধনাই সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বোত্তম সাধনা।

"এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল,
তারি 'পরে বিশ্ব কমল;
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে।"

যে সাধনায় পরিণামে দেশ-কাল তাহার অন্তহীন রূপ-লোক লইয়া চ্যুত বসনের মত চেতনা হইতে স্খলিত হইয়া যায়, সে সাধনা নয়, যে সাধনায় ব্যক্তি-চেতনা অসীমে ব্যাপ্ত হইয়া অন্তহীন সীমা-লোকে আপনাকে লীলায়িত হইতে দেখে সেই সাধনাই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য।

"যে নিরালায় তোমার দৃষ্টি
আপনি দেখে আপন সৃষ্টি
সেইখানে কি বাবেক আমায়
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে।"

মন ও বুদ্ধির জগৎ সীমার জগৎ। আমিত্ব বা অহঙ্কার বলিতে এই সীমার জগৎ ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। অসীমকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার সহিত স্বাভাবিক ভাবে সীমার বোধ ছিন্ন করিবার ব্যাকুলতা ওতপ্রোত হইয়া দেখা দিয়াছে। আমি নিম্নে পর পর কয়েকটি অংশ কেবল উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে এই দিকটির পরিচয় মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

"মবে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমাব মাঝে তোমার লীলা হবে।"
"মনকে, আমাব কায়াকে,
আমি একেবাবে মিলিযে দিতে
চাই এ কালো ছায়াকে।"
"নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে
আপন গড় স্বপন হতে
তোমাব মধ্যে জনম লয়ে।"
"আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।"
"আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত করো তাকে।"
"আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো,—"
"ওগো আলো,
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধূলায়
দিলেম ফেলে।"
" 'তুমি আমায় সৃষ্টি করো'
আজ তোমারে ডাকি,
ভাঙো আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।"
"আর আমার আমি নিজের শিরে
বইব না।"

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সেই চিরপুরাতন পথটিকে আশ্রয় করিয়াছেন। এক্ষেত্রে উপনিষদ হইতে অনুরূপ কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উভয় সাধনার ঐক্য স্পষ্টই লক্ষিত হইবে।

"ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। স্বয়ম্ভু সম্মুখ দিকে (ইন্দ্রিয়) দ্বার বিদ্ধ করিয়াছেন, সেইজন্য মানুষ বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আপনার অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না। কোন কোন জ্ঞানী অনন্ত জীবন লাভের আশায় অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।" (কঠ উপনিষদ)

"বন্ধন ও মোক্ষের দুটি শব্দ হইল অহঙ্কার বোধ ও অহঙ্কার বোধ শূন্যতা।" (পৈঙ্গল উপনিষদ)

"শিক্ষার দ্বারা, মেধার দ্বারা, এমনকি বারংবার শ্রবণ করিয়াও আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। আত্মা যাঁহাকে নির্বাচন করেন তিনিই কেবল আত্মাকে লাভ করিতে পারেন। কেবল এই পুরুষের নিকট আত্মা আপনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন।" (কঠ উপনিষদ)

"পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে (আশ্বলায়ন) বলিলেন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান এবং যোগ সাধনার ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা কর। ধনের দ্বারা নয়, অমৃতত্ব লাভ করিতে হয় ত্যাগের দ্বারা।"

(কৈবল্য উপনিষদ)

"* * * মন দ্বিবিধ বলিয়া কথিত হয়, বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত থাকিলে অবিশুদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হইলে বিশুদ্ধ। লয় বিক্ষেপ রহিত মনকে নিশ্চল করিয়া মানুষ মন হইতে মুক্ত হন। (মনের অতীত অবস্থা লাভ করেন)। ইহাই পরমপদ। মনকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা পরম অবস্থা লাভ করে। ইহাই জ্ঞান, ইহাই মুক্তি। আর সমস্ত কিছু গ্রন্থির বিস্তার, বন্ধন স্বরূপ। সমাধির দ্বারা যাঁহার মনের মালিন্য বিধৌত, যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মনের আনন্দময় অবস্থা বর্ণনাতীত। তাঁহাকে কেবল অন্তঃকরণের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। জলের মধ্যে জলকে অগ্নির মধ্যে অগ্নিকে আকাশের মধ্যে আকাশকে যেমন পৃথক করিতে পারা যায় না যাঁহার মন ইহার মধ্যে প্রবেশ করে তাঁহারও অনুরূপ অবস্থা হয়। তিনি সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মনই বস্তুতঃ মানব জাতির বন্ধন ও মুক্তির কারণ। উহা যখন বস্তুর সহিত যুক্ত তখন বন্ধন, যখন বস্তু মুক্ত তখন মুক্ত।" (মৈত্রী উপনিষদ)

"শ্রেয় ও প্রেয় দুইই মানুষের নিকট আসে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা চিন্তা সহকারে ইহাদের পার্থক্য নিরূপণ করেন। জ্ঞানীরা প্রেয়কে পরিহার করিয়া শ্রেয়কে লাভ করিতে চান। সাধারণ মানুষ পার্থিব ভোগ সুখের জন্য প্রেয় আকাঙ্ক্ষা করে।" (কঠ উপনিষদ)

এই সীমার বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে সমগ্র বহির্মুখী চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করিয়া একমাত্র অন্তর্জগৎকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহারপর আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া ভক্তিতে সমগ্র সত্তাকে বিগলিত করিয়া দিতে হয়।

কবির জীবনে এই ব্যাকুলতা কী ঐকান্তিক, কী মর্ম্মান্তিক আর্ত্তিরূপেই না প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।"
"আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।"
"নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণ তলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়ন জলে।"
"একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।"
"আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।"
"চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সবারে।"

মানুষের সমগ্র সত্তা আশ্রয় করিয়া দিব্য-চেতনা আপনাকে নিম্নতর ভূমিতে লীলায়িত করিতে চান। এইরূপে সমগ্র সৃষ্টি আশ্রয় করিয়া তাঁহার একটি বিশেষ ইচ্ছা চরিতার্থ হইতে চাহিতেছে, কিন্তু মানুষ তাহার মানুষী বুদ্ধি মানবিক বোধ আশ্রয় করিয়া থাকিবার ফলে দিব্য-চেতনা আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। জীবনকে যদি তাঁহার যন্ত্র স্বরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায় তবেই তাঁহার অভিপ্রায় মর্ত্ত্য-লোকে রূপ লাভ করিতে পারে।

উন্নততর চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জীবন বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা নাই, এই জীবনকে তাঁহারই যন্ত্রে পরিণত করা। আমিত্ব বিলোপের অর্থই হইল মানবিক

বোধ ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ঈশ্বরীয় বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। ইহাকেই বলে দিব্য-জীবন।

"তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

এতদিন কবি জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সীমার দিক হইতে, তাঁহার সকল প্রেরণা ছিল আমিত্ব বোধ জাত। এই জীবন যে উর্দ্ধতর কোন চেতনার অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তিনি এতদিন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে কোন সংশয় নাই। তাই আত্মসমর্পণের এমন ব্যাকুলতা।

ভক্তি তো নিশ্চেষ্টতা নয়। ইহার জন্য নিরলস, সদাজাগ্রত চেষ্টার প্রয়োজন। সমগ্র চেতনা-বৃত্তকে অন্তর্মুখীন করিয়া আজ কবি ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়াছেন। বাহিরে ইন্দ্রিয়-দ্বারে সকল আলোক নিভিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে সেই জ্যোতিপথ উদ্ঘাটিত হয় নাই, যে পথ বাহিয়া তাঁহার চেতনা উর্দ্ধাভিসার করিয়া চলিবে। এই সাময়িক শূন্যতা বোধের অসহায় অবস্থা কতদূর অসহনীয় হইয়া উঠিতে পারে, সেই যে মরণান্তিক পীড়া তাহা তাঁহার জীবনেও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিলরে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।"

নিম্নের উদ্ধৃতি কয়েকটির মধ্যে এই শূন্যতাবোধের সহিত বিজড়িত হইয়া কী গম্ভীর ঐকান্তিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।"
"এই কথটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে,—"

এই নির্ব্বন্ধ না থাকিলে ওই পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে পারা যায় না। বারংবার ব্যর্থতার ভিতর দিয়া জীবনের সর্ব্বশেষ চরিতার্থতা সাধন করিতে হয়।

অতি জাগতিক সত্তা লাভ করিতে গিয়া কবির মনে আজ একে একে কত সংশয়ই না জাগিতেছে। দিব্য-চেতনার সাক্ষাৎকারে কবির সত্তা কি সম্পূর্ণ রূপে বিগলিত হইয়া যাইবে? ব্যক্তি সত্তার পৃথক কোন অস্তিত্ব কি ওই লোকে আর কোন স্বরূপে থাকে না? জাগতিক সকল বোধই কি সেই কালে লুপ্ত হইয়া যায়? যদি থাকে তবে তাহা কোন্ স্বরূপে?

"জানি নে আর ফিরব কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা,—"

তখন কবির ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কোন্ দিব্য-বাণীর প্রকাশ ঘটিবে, কোন্ অমূর্ত্ত্য-প্রেরণায় তাঁহার চিত্ত-লোকে তখন কোন্ সৌন্দর্য্য অন্তহীন হইয়া পড়িবে? এক কথায় সেই দিব্য-জীবন কি, দিব্য-জীবন আশ্রয় করিয়া দিব্য-অভিপ্রায় কি ভাবে সক্রিয় হয়?

"তখন আমার পাখির বাসায়
জাগবে কি গান তোমার ভাষায়।
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা?"

এই অন্তহীন রূপ-লোকের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বা সুষমা রহিয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাকে একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীত রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সৃষ্টির অনন্ত রূপ বৈচিত্র্য যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন সুর। কোন গুনী এই বিচ্ছিন্ন সুরজাল বিস্তার করিয়া নিত্যকাল ধরিয়া এক অখণ্ড সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া চলিয়াছেন। সৎ স্বরূপ আত্মস্থিত থাকিয়া আপনাকে অন্তহীন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। গায়কের অন্তরে যেমন সঙ্গীতের একটি অখণ্ড রূপ থাকে এবং সেই অখণ্ড সঙ্গীতকে তিনি যেমন বিচ্ছিন্ন সুরের জাল বুনিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন, এই সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার তেমনি সম্পর্ক।

সৃষ্টি কেবল অন্তহীন, যদৃচ্ছা বিকাশ নয়। সমগ্র অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির একটি ধ্যান-রূপ পূর্ণ চেতনার মধ্যে রহিয়াছে। তাহারই বীজ-রূপ নিখিল বিসৃষ্টির বিকাশ ধারার মধ্য দিয়া ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

বিজ্ঞান জড়জগতের মধ্যে শক্তি-স্পন্দের কথা প্রমাণ করিয়াছে। এক একটি বিশেষ রূপ, বিশেষ রস, বিশেষ ভাব, এই সমস্ত কিছু শক্তির এক একটি বিশেষ স্পন্দন। যে সমস্ত শক্তি স্পন্দন গ্রহ সূর্য্য তারকায় নিত্য স্পন্দিত, সেই এক শক্তি স্পন্দ তৃণ কনা, ধূলি কনার মধ্যেও লীলা করিতেছে।

দেশ-কালের বক্ষে এই নিখিল বিসৃষ্টি সেই পরম গায়কের সঙ্গীত বিস্তার। তাঁহার গানের এক একটি ছিন্ন তান এই সংখ্যাতীত রূপ-লোক। ওই সুরের আবেগে যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া উহারা মহাশূন্যে উধাও হইয়া চলিয়াছে।

নিম্নের উদ্ধৃত অংশ কয়েকটির মধ্যে নিখিল বিশ্বের এই স্পন্দ-রূপটির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
গগনটুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।"

দেশ-কাল ব্যাপ্ত রূপ শূন্য এই স্পন্দন চক্রের সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে, আকর্ষণ বিকর্ষণে কোন্ অলৌকিক রহস্যে রূপ রস গন্ধ বর্ণ প্রাচুর্য্যের ভারে নিত্যকাল কেবলই উপচাইয়া পড়িতেছে।

"দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা চন্দ্রে রে।
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে।

সেই আনন্দ-চরণ পাতে
ছয় ধাতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধে রে।"

সেই একই ভাবের পরিচয়

"মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু,
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয় না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্য্য চন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।"

অন্যত্র

"বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নি ধারায়,—"

অথবা

"অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে।"

বিশ্ব জুড়িয়া এই যে অশ্রুত সঙ্গীত উৎসারিত হইতেছে প্রাণের মাঝে সে সঙ্গীত যে শুনিতে পারে সে শুনিতে পায়।

ব্যক্তি-সত্তা যতই বিকাশ লাভ করে, বিশ্বের সহিত তাহার মিলন যতই গভীর ও উদার হয় তাহার হৃদয়ে এই সঙ্গীত তত অধিক পরিমানে শ্রুত হয়। এমন একটি পরিণাম আছে যে পরিণামে ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে। তখন ব্যক্তি চেতনায় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত পরিপূর্ণ সুর ধ্বনিত হইয়া যায়।

কবির ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছে তাঁহার সৃষ্টি ততই সঙ্গীতময় এবং সে সঙ্গীত ততই অনির্ব্বচনীয় সুরের কম্পনে বিস্ময় কর বৈচিত্র্য লইয়া প্রকাশ লাভ করিতেছে। সেই বিশ্ব সঙ্গীতকে আজ আর আভাস রূপে নয় পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিবার জন্য কবি উৎকণ্ঠিত।

মহাশূন্যে অনন্ত কোটি রূপ-লোক পূর্ণ সাম সঙ্গীত গাহিয়া যে পরম দেবতার পূজা করিতেছে সেই পূজায় কবি ব্যক্তির পূজাকে এক করিয়া দিতে চাহিতেছেন। ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশ লাভ না ঘটিলে এবং এইরূপে ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে, ব্যক্তি ও বিশ্বের অতীত সত্তাকে লাভ করিতে পারা যায় না।

তাই কবি বিশ্ব-ছন্দটিকে লাভ করিতে চাহিতেছেন,—

"মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।"
"আমার লাগে নাই সে সুর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।"

বিশ্ব সঙ্গীতের ওই ব্যাকুল সুরের সহিত সুর মিলাইতে পারিলে বুঝি ঈশ্বরের করুণা লাভ করিতে পারা যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে।

"সেই সুবে মোর বাজাও প্রাণে
তোমাব ব্যাকুলতা।"

মানবিক বিচিত্র বোধকে নয়, আজ তাঁহার গানের ভিতর দিয়া কেবল অসীমের জন্য ব্যাকুলতা ধ্বনিত হইবে।

"যেখানে নীল মরণ লীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানেব তরী দিলেম খুলে।

*   *   *

দিশাহারা আকাশভবা সুরের কূলে
সেইদিকে মোর গানেব তবী দিলেম খুলে।"

সৃষ্টি প্রেরণা কখন সুর, কখন ও রূপ, কখনও ভাব রূপে কবির নিকট অনুভূত হইয়াছে। ইহা একই স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি মাত্র। বিচ্ছিন্ন সুরকে কবি যেমন অখণ্ড সঙ্গীতে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তেমনি তিনি রূপকে অরূপে, ভাবকে রসে বিগলিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অসীমের সাক্ষাৎকার লাভ যদি তাঁহার জীবনে আজও না ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী তাঁহার সাধনার অসম্পূর্ণতা। সাধনা সম্পূর্ণ হইলে তবেই অসীম বা অরূপকে লাভ করা সম্ভব। কবির সাধনা কি? তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা মনুষ্যত্ব বা পূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা নয়। যেখানে পরিণামে বিশ্বাতীতের

আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্তি ও বিশ্ব অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। জীবন ও জীবনাতীত সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দ্বিধা গ্রস্ত।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত একটি অখণ্ডতার অন্তর্গত। ভারতীয অধ্যাত্ম সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ এইরূপে পূর্ণতাভিমুখীন করিয়াছেন। তাঁহাকে সমস্ত জীবনভোর তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। অধ্যাত্ম জগতের এই পূর্ণ যোগের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে তাঁহার পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নাই।

রবীন্দ্রনাথ অসীমকে লাভ করিতে বারংবার ব্যাকুল হইয়াছেন, বারংবার আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়া আপনাকে পরম সত্তায় বিলীন করিয়া দিতে চাহিযাছেন, কিন্তু সেই পূর্ণতার সুরটি বাজে নাই বলিয়া সেই পরম সত্তা বারংবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কবির জীবনে এই সংগ্রাম দেখিতে পাই অনেক পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত। বিশেষ করিয়া প্রান্তিকের উপলব্ধির কথা এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতে পারে।

জীবনের বিকাশ ঘটে বিশ্বের সহিত ধীর যোগের ভিতর দিয়া, জীবনের সম্পূর্ণতা ঘটে বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলনে। এই পূর্ণ মিলন ঘটিলে তবেই অসীমকে লাভ করিতে পারা যায়, অন্তত: রবীন্দ্রনাথ এই স্বরূপে অসীমকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেকথা এক্ষেত্রেও বলিয়াছেন,

"শক্তি যাবে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা
ঘুচিয়ে দাও তার।"

এই শক্তি লাভ ঘটিলে সাধনা সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বরই পরম করুণায় ওই সর্ব্বশেষে আবরণ উভিন্ন করিয়া দেন।

জগৎ ও জীবনের নিয়তি সম্পর্কে কবির স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই।

সমগ্র বিশ্ব-জগৎ ও মনুষ্য-সমাজ যে ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে, এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। ইহার পরিচয় আমরা কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে বহুবার লাভ করিয়াছি। এক্ষেত্রেও সেই বিশ্বাসের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।"

জীবন যে কোন পরিণামে একান্ত ব্যর্থ হইয়া যায় না। ভ্রষ্ট পথও যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিণামে সেই এক রাজপথে আসিয়া মিলিত হয়, এই গভীর অধ্যাত্ম প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথ পোষণ করিতেন। তাঁহার করুণার বাহিরে কোন জগৎ নাই।

কমল-কলিকা জলের অন্ধকার তল হইতে উর্দ্ধমুখী হইয়া পরম নির্ভরতায় নিঃসংশয়ে পথ চলে। সেই দীর্ঘ ক্লান্ত পথ চলার একদিন অবসান হয়। জলের উর্দ্ধে অন্ধকার-লোকের সীমা পার হইয়া প্লাবিত প্রভাত সূর্য্য কিরণে আপনার মুদিত সহস্র দল একটির পর একটি মেলিয়া দেয়। কমল জীবনের সেই চরম সার্থকতা।

এই বিশ্বাস সে কেমন করিয়া কোথা হইতে লাভ করে, যে তাঁহার এই পথ-চলার একদিন অবসান ঘটিবে, এই অন্ধকার-লোক পার হইয়া কোন এক আলোক তীর্থে? সেই অনিবার্য্য পরিণামের দিকে কে তাহাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়?

অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রকাশ অমনি কমল-কলিকার মত প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রভাতে ওই আলোর কমল অন্ধকারের সীমা পার হইয়া আপনার আলোর দলগুলিকে দিকদিগন্তে ছড়াইয়া দেয়।

মানব অন্তরেও অমনি প্রত্যয় পরিপূর্ণ প্রেরণা থাকে। মর্ত্ত্য জীবনের অন্ধকার-লোক পার হইয়া একদিন তাঁহার চেতনা পূর্ণ লোকে পৌঁছাইয়া যাইবে।

সমগ্র দেশ-কাল সমেত এই বিসৃষ্টি অমনি উর্দ্ধাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে। একদিন যে পূর্ণতাকে লাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই। সেদিন এই বিশ্ব-লোকের সার্থকতম প্রকাশ দেখা দিবে।

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে বিশ্বের নিয়তির সহিত জীবের নিয়তি কীরূপ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। *বিশ্ব ব্যতিরিক্ত জীবের পৃথক কোন নিয়তি নাই।*

"এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এই দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।"

কিংবা

"মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণ পুটে।
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থ পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।"

পশ্চাতে মর্ত্ত্য-জীবনের যে পর্য্যায় পড়িয়া থাকে, তাহার মূল্য কোথায়? তাহাকে পরিহার করিয়া মানুষ কোন্ সান্ত্বনা লাভ করে? এক্ষেত্রে ওই মূল্য নিরূপণের এবং সান্ত্বনা লাভের সেই দার্শনিক স্বরূপটিই আমাদের বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে।

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ পরশ তাদেব পবে।"

মুক্তি রবীন্দ্রনাথের নিকট সম্পূর্ণতা। জীবনের ধীর সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া পরিণামে মুক্তি লাভ করিতে হয়। নিখিল বিশ্বের সহিত সমগ্র মানব সমাজ ওই পরিণাম লাভ করিতে চলিয়াছে।

এই বিশ্বাস এবং মুক্তি বলিতে এই অখণ্ডতার বোধ জীবনের প্রত্যেকটি পর্য্যায়কে চূড়ান্ত মূল্য দান করিয়াছে। এই বোধে জীবনের কোন পর্য্যায় একান্ত মিথ্যা বা মায়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। জীবনের এই মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভা অধ্যাত্ম বোধের আর একটি নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

জীবনের সার্থকতা কোন একটি বিশেষ পরিণাম লাভেই ঘটিতে পারে, তাহার পূর্ব্বের সমগ্র জীবন পর্য্যায়টাই কেবল নিরর্থক এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল না। জীবন তাই রবীন্দ্রনাথের নিকট আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিরহ, এই প্রতীক্ষাও আনন্দের, কারণ পরিণামে মিলন লাভ অনিবার্য্য রূপে ঘটিবে। পথের শেষে প্রিয় মিলনেই শুধু আনন্দ নাই, এই সমগ্র পথ পরিক্রমাটাই যে তাঁহার জন্য এই বোধ পথ চলাকেই আনন্দময় করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করিতেছি, তাহাতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইবে।

মৃত্যুর ভয় মহৎ বিনষ্টির ভয়, অপরিচয়ের ভয়। যদি এই বোধ গড়িয়া উঠে যে মৃত্যু জীবনের একটি পরিবর্ত্তন মাত্র, মৃত্যুতে যে লোক আমরা লাভ করি না কেন, যে চেতনা এই লোককে মাতৃক্রোড়ের মত পরিচিত করিয়াছে, সেই একই চেতনা সেই ভিন্নতর লোককেও একান্ত পরিচিত করিয়া তুলিবে, তাহা হইলে আর ভয় থাকে না।

"জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।"

এমনি করিয়া কত নূতন জীবন, কত নূতন লোক তিনি লাভ করিয়াছেন। জীবন এমনি করিয়া ধীর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

"সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।"
"চারিদিকে সুধা ভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে।
দেখা নাই নাই,
ব্যথা পাই,
সে ও মনে ভালো লাগে।"

কিংবা

"আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।"

তীব্র বিরহ জীবন ও জগতের সকল মাধুর্য্যকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া না দিয়া তাহার সকল মাধুর্য্যকে নিঃসীম করিয়া দিয়াছে।

এই সমগ্র জীবন ওই পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে। এই বোধ যখন জাগে তখন আনন্দ নিঃসীম হইয়া উঠে। প্রতীক্ষা সহনীয় হয়, পরম স্থৈর্য্যে অন্তর ভরিয়া উঠে।

"কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।"

পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য মানুষ যেখানে জগৎকে সেই সঙ্গে জীবনকে পরিহার করে, রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবে সেই সাধনাকে অস্বীকার করিয়াছেন। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ ও মুক্তি সাধনা রবীন্দ্রনাথের নিকট সমার্থক। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের সাধনায় জগতের অনিবার্য্য স্বীকৃতি আসিযাছে।

"এমনি করে চলতে পথে ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব নিস রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস দিবস-রাতে!"

এই দুর্লভ আনন্দ মুহূর্ত্তগুলি অন্তরে সঞ্চিত হইয়া অন্তরকে অক্ষয় সুধায় ভরিযা তুলে। এই আনন্দ মুহূর্ত্তগুলি যেন এক একটি প্রস্ফুটিত কুসুম, চেতনা সূত্রে গ্রথিত হইয়া পরিশেষে একটি মালিকায় পরিণত হয়। এই মালিকার সঞ্চয়কে জীবন শেষে অশ্রুজলে দযিতের কণ্ঠে পরাইয়া দিতে হয়। অর্থাৎ বিশ্বের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া জীবন ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

"ভরা আমার পরাণ খানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—"

এই পথ চলা, এই প্রতীক্ষা তাই কবির নিকট পরম রমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই রমনীয়তার জন্য কবি কোথাও কোথাও পূর্ণ পরিণামের তত্ত্বকেও অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। এই অপূর্ণতা আছে বলিয়া বেদনা আছে, এই বেদনাবোধের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য মানব-মন ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া কত রূপে না তাঁহার আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়। পূর্ণ মিলনের আনন্দ নয়, এই লীলা রসই রবীন্দ্রনাথের পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

"তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আমার জনম হবে ভোর!"

ব্যক্তি ও বিশ্ব যেমন ক্রমাগত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি এই অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া মানব-অন্তরে অরূপের আভাস নানা রূপে আসিয়া পৌঁছাইতেছে।

"আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।"

পথের আনন্দ যেখানে পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে—

"পথের শেষে মিলবে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব—"

এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।"

রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাই কোন অবস্থাতেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে চায় নাই; কারণ তাহা হইলে ওই লীলা-রসটিকে তো আর আস্বাদ করিতে পারা যাইবে না। তিনি তাই গান করেন—

"সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।

*　　*　　*

এমনি করে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।"

প্রিয়তমের জন্য এই অন্তহীন প্রতীক্ষা, এই চির প্রেম-লীলা জীবন ও জগৎকে কী মাধুর্য্যেই না ভরিয়া তুলিয়াছে।

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমাব চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখিবে কোথায় ঢেকে।"

কিংবা

"তোবা শুনিস নি কি শুনিস নি তাব পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন বজনী
সে যে আসে আসে আসে।"

অথবা

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্ব ভুবন তলে
পবাণ আমাব বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।"

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ স্বরূপে রবীন্দ্রনাথ যে উন্নততর চেতন পরিণাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদাশ্রয়ী হইয়া এই জীবনও জগতের যে দুর্লভ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন নিম্নের উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে তাহারই কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আকাশ তলে উঠল ফুটে
আলোব শতদল।
পাপড়ি গুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্ দিগন্তরে;
ঢেকে গেল অন্ধকাবের
নিবিড় কালোজল
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে,
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।"

সমগ্র বিশ্বের সৃজন প্রলয়ের ভিতর দিয়া সকল লোক-লোকান্তরের ভিতর দিয়া একটি দিব্য অভিপ্রায় ধীরে সার্থক হইয়া উঠিতেছে। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের

অভিপ্রায়ের সহিত, তাহার সৃষ্টি ও বিনষ্টির যোগে আমারও অভিপ্রায় বিজড়িত, আমারও সৃষ্টি-বিনষ্টি ঘটিতেছে, যখন এই বোধ জাগে তখন জীবন কী অপার বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়। এই উপলব্ধিকে মানুষ যখন অপরোক্ষ করে তখন সেই অবস্থাকে বলে বিশ্বানুভূতি। এই উপলব্ধিতে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ভয় চিরকালের জন্য দূর হইয়া যায়। কারণ, কোথাও আর হারাইয়া যাইবার ভয় থাকে না।

"কেমন করে তড়িৎ আলোয়
দেখতে পেলেম মনে
তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে
আমার এই জীবনে।
সে সৃষ্টি যে কালের পটে
লোকে লোকান্তরে বটে,
একটু তারি আভাস কেবল
দেখি ক্ষণে ক্ষণে।"

জীবন ও জগৎকে পরিহার করিয়া দেশ-কালের সীমাকেও ছাড়াইয়া দিব্য-চেতনা লাভের যে সাধনা রবীন্দ্রনাথ যে সেই সাধনাকে স্বীকার করেন নাই, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার সাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। বিশ্বাতীতকে লাভ করিতে ব্যক্তি ও বিশ্বকে পরিহার করা নয়, ব্যক্তি ও বিশ্বের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই বিশ্বাতীতকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

ইহার ফলে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও দর্শন আশ্চর্য্য সমৃদ্ধিই শুধু লাভ করে নাই, এক নূতন উপলব্ধির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

দেশকালের ভিতর দিয়া এক দিব্য অভিপ্রায় ধীরে সার্থক হইয়া উঠিতেছে; এবং পূর্ণতার সাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। মূল এই দুই উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় এক যুগান্তর সাধন করিয়াছেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় জীবন ও জগতের স্বীকৃতি প্রায় নাই বলিলেও চলে। স্বীকৃতি যেখানে যতটুকু আছে তাহাও আপেক্ষিক স্বরূপে। —অন্যদিকে তাহার মূল্যের ক্ষেত্রে যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না এই সম্পর্কেও

নিঃসংশয় বোধ। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবে জীবন ও জগতের মূল্যের পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন।

ঈশ্বরীয় অভিপ্রায়কে জগতে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে সর্ব্বাধিক বাধা আমাদের বিচিত্র অহঙ্কার বোধ, এবং এই অহঙ্কার বোধ প্রসূত বিচিত্র ধর্ম্ম ও দর্শন এবং তাহারই অনুকূল সমাজ-পরিকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বকে এই ভাবে সান্ত্বনা দান করিতে চান নাই। তাঁহার এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক। ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় প্রকাশের পথে ন্যূনতম বাধা ওই লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের মধ্যে বলিয়া সত্য ও ধর্ম্ম ওইখানেই পূর্ণ রূপ লইয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় যদি পরিণামে জয়ী হয়, তবে সে বিজয় আসিবে তাহাদের আশ্রয় করিয়া। এই অবিচলিত অধ্যাত্ম-বিশ্বাস তাঁহার ছিল। তিনি তাঁহার একাধিক নাটকের মধ্যে এই বিশ্বাসকে রূপায়িত করিয়াছেন।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় সংস্কৃতির স্তর বিন্যাস করা হইয়াছে দেহ বোধকে, সেই সঙ্গে জাগতিক বিচিত্র প্রয়াসকে ছাড়াইয়া উঠবার ক্রমের উপর। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনায় দেহ ও আত্মা পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতির ক্রম তাই ওই ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় বিশ্বানুভূতির কথা আছে, কিন্তু এই জাতীয় উপলব্ধির পরিচয় কোথাও যে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

ইহা কর্ম্মকে আদৌ পাপ বোধ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নয়। নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে মূল্যের পরিবর্ত্তনও অস্বীকৃত। কর্ম্মের প্রতি এই শ্রদ্ধা আসিতে পারে যাদ এই বোধ থাকে যে সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া মনুষ্য সমাজ ধীরে উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে। ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় একমাত্র এই জাতীয় কর্ম্মের ভিতর দিয়া সার্থক হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা আত্মাকে একমাত্র সত্য করিয়া তুলিয়া তাহারই অনুক্রমে মনুষ্যত্বের, সেই সঙ্গে সংস্কৃতির ক্রম সৃষ্টি করিতে চান তাঁহারা অন্ধ, মায়া বদ্ধ।

বহির্বিশ্ব অন্তর্লোকে একটি ভাব-জগৎ বা ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলে। এই ধ্যান-লোকের মধ্যে ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য জগতে এই তিনটি জগতের আশ্চর্য্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বহির্বিশ্ব কবির অন্তরে তাঁহার ধ্যানে আর এক অলৌকিক রূপ-লোক সৃষ্টি করে। এই রূপলোক আশ্রয় করিয়া অমর্ত্ত্য-লোকের আভাস কবির অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়। এই রূপলোক আশ্রয় করিয়া কবি কত দুর্লভ মুহূর্ত্তে অরূপের চকিত স্পর্শ লাভ করিযাছেন। ব্যক্তি, বিশ্ব এবং দিব্য -চেতনার মিলিত প্রেরণায় কবির কাব্য-সৃষ্টি।

এই মর্ত্ত্য-প্রেম কবির অন্তরে কত বারবার কত দুর্ল`ভ চকিত মুহূর্ত্তে প্রাণের জাগরণ ঘটাইয়াছে। সেই প্রাণ-বন্যায় ব্যক্তি ও বিশ্বের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। এই মিলন অনুভূতি পরিণামে কবির চেতনায় সেই পরমের অনুভূতি দান করিয়াছে। ব্যক্তি-প্রেম এই রূপে বিশ্বমুখীনতা লাভ করে। উহা আবার পরিণামে বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া যায়।

মর্ত্ত্য-প্রেমের নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া কবির জীবনে অমর্ত্ত্যের বারংবার স্পর্শ লাভ ঘটিয়াছে। ইহাই কবির অন্তরে দেবতার পাদ স্পর্শ।

ধ্যান নিমগ্ন হইয়া কবি যে বিচিত্র অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটি পরিচয় সর্ব্বশেষে দান করিতেছি।

ধ্যান-লোকটি যতই সমৃদ্ধ হইতে থাকে, আমাদের সমগ্র সত্তা ততই স্পষ্ট হইয়া যায়। একটিকে বলিতে পারি অধ্যাত্ম-সত্তা, অপরটি জীব-সত্তা।

সাধারণ মানুষের জীবনে অধ্যাত্ম সত্তার নিগূঢ় অবশ একপ্রকার প্রেরণা যদি থাকেও জৈবিক প্রেরণাই মুখ্য বহিঃসত্তাটিই মানুষের একমাত্র আশ্রয় স্থল হইয়া উঠে।

ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠিলে, জীবনে একটি গূঢ় দ্বন্দ্ব জাগে। মানুষ তখন কেবল অন্তর্লোকটিকে আশ্রয় করিতে চাহিলেও অন্যদিকে বহিঃসত্তা তখনও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই বলিয়া বহির্জগতের সান্নিধ্যে আসিলেই তাহা চঞ্চল হইয়া পড়ে।

কেবল তাহাই নহে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া যে নিগূঢ় ভাবানুভূতির স্ফুরণ ঘটে, উন্নততর জগতের যে চকিত আভাস আকাশ-পটে স্বর্ণ-রেখার মত ভাসিয়া

উঠিয়া আবার মিলাইয়া যায়, সেই সাক্ষাৎকার এবং সেই অনুভূতিকে বহির্বিশ্বে ইন্দ্রিয়দ্বারে সম্ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ধ্যানের জগৎ আরও সমৃদ্ধ হইলে বহিরিন্দ্রিয় সমূহ এতদূর অন্তর্মুখীন হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয় সমূহের উপর এমন একটি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মায়, যে বহির্বিশ্বের সান্নিধ্যে আসিলেও উহা আর ভাঙ্গিয়া পড়ে না। অন্তর্লোকটি তখন মানুষের একমাত্র সত্তা হইয়া উঠে।

"কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা ?
* * *
তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে
দিনে রাতে চুরি করে
এনেছি তাই লুটে যে।"

কবির অন্তরের তাপস, অর্থাৎ অধ্যাত্ম-সত্তা, 'তুমি' অর্থাৎ দিব্য-চেতনা লাভের জন্য ধ্যান নিমগ্ন। তাঁহার এই ধ্যান-লোকে যে অলৌকিক বিচিত্র অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ ঘটে 'পূজার মালঞ্চে' যে ফুল ফুটে, তাহারই অলৌকিক সৌন্দর্য্য-লোককে কবি কাব্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্যানের আরও উন্নত পরিণামে 'আমি' ও 'তাপসের' আর পার্থক্য থাকে না। আরও উন্নত পরিণামে 'তাপস' ও 'তুমি' একাকার হইয়া যায়।

রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনে সামঞ্জস্য তত্ত্বের কথা পূর্ব্বাপর উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনে বোধের বৈচিত্র্য এত বেশি, এতদূর পরস্পর বিরোধী, এমনি অভিনব এবং এই সকল বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে তাঁহাকে যে অতি তীব্র অধ্যাত্ম সংগ্রাম করিতে হয় তাহার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যেও একান্ত বিরল।

একটি সামঞ্জস্য তিনি কোন প্রকারে গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আবার নূতন কোন বোধের, নূতন কোন মূল্যের সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইয়াছে, যাহার ফলে ইহাদের সহিত মিলিত করিতে তাঁহাকে আবার বৃহত্তর সামঞ্জস্যবোধের সন্ধান করিতে হইয়াছে। এমনি ভাবে তাঁহার সামঞ্জস্যবোধের সীমা ক্রমাগত প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার অন্তরে বেদনাবোধও শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে।

এইদিক দিয়া কালিদাসের কাব্য-জগতের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগতের সামান্য তুলনা করিলে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিতে সুবিধা হইবে।

কালিদাস যে কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কালে সমগ্র জাতির অধ্যাত্ম সংগ্রামের একপ্রকার অবসান ঘটিয়াছে, জাতি-চিত্ত দীর্ঘকালের অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষে একটি স্থায়ী পরিণাম লাভ করিয়াছে। জীবন, জগৎ ও জগৎ-অতীতের মধ্যে এমন একটি সুসঙ্গত পরিকল্পনা লাভ করিয়াছে, যে সম্পর্কে জাতির মনে আর কোন সংশয় বা জিজ্ঞাসা নাই। (সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কালিদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলিত। কালিদাসের সৃজনী-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এখানে কিছুমাত্র নাই।) এই সম্পূর্ণ সুসঙ্গত জীবন-পরিকল্পনার সহিত কালিদাস সম্পূর্ণরূপে একাত্মতা বোধ করেন। এই জাতীয় কোন অধ্যাত্ম সংগ্রাম না থাকিবার ফলে কালিদাসের কাব্যের মর্ম্মমূলে কোন গভীরতর বেদনার স্পর্শ নাই। কেবল কালিদাস কেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যযুগীয় যে-কোন কবি-প্রতিভা সম্পর্কে এই মন্তব্য করিতে পারা যায়। তাঁহাদের জীবন কতকগুলি সুস্পষ্ট মূল্য বোধের (ইহ-লোক ও পর-লোক সম্পর্কিত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বোধ সম্পর্কিত) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

বর্ত্তমান যুগে এই সকল মূল্যবোধ এতদূর বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে এবং সে গুলি এমনি অভিনব এবং এতদূর বিপর্য্যযকারী যে তাহাদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিবার জন্য মহত্তর প্রতিভা, অনেক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অনেক উদার, অনেক ব্যাপক প্রজ্ঞার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের কালে সমগ্র জাতি বৃহৎ বিশ্বের সহিত দীর্ঘকাল পরে সেই প্রথম স্থায়িভাবে যুক্ত হয়। জাতি-চিত্তে সমগ্র বিশ্বের বিপুল বিচিত্র চিন্তাধারা, বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফল আসিয়া পৌঁছায়। ইহা স্বাভাবিক-ভাবে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত-লোককেও যে স্পর্শ করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রসঙ্গে মনস্বী A. N. Whiteheadর একটি উক্তি স্মরণে পড়িতেছে—

"In the earlier times, the deep thinkers were the clear thinkers,—Descartes Spinoza, Locke, Leibniz. They knew exactly what they meant and said it. In the Nineteenth Century, Some of the deeper thinkers among Theologians and Philosophers were muddled thinkers. Their assent was claimed by incompatible doctrines; and their efforts at reconciliation produced inevitable confusion." (Science and the Modern World)

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বিচিত্র বোধের পরিচয় লাভ করা যায় তাহাদের মধ্যে তিনি পরিণামে কোন পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিয়াছেন কি-না সে বিচার আপাতত না তুলিয়া তাহার বিপুল বৈচিত্র্য এবং সামঞ্জস্য সাধনের রক্তমোক্ষণকারী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্যযুগে এই বৈচিত্র্য এবং এই সংগ্রাম প্রায় ছিল না বলিলেও চলে।

সংস্কৃত কবিদের কাব্য-জগৎ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Keith সাধারণ ভাবে একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

"They live moreover in a world of tranquil calm, not in the sense that sorrow and suffering are unknown, but in the sense that there prevails a rational order in the world which is the outcome not of blind chance but in the actions of man in previous births. Discontent with the constitution of the universe, rebellion against it decrees, are incompatible with the serenity engendered by the recognition by all the Brahmanical poets of the rationality of the world order". (A History of Sanskrit Literature)

যে জীবন-দর্শনকে তাঁহারা আশ্রয় করেন, তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান এক্ষেত্রে অবান্তর, তবে এই জীবন-দর্শন রবীন্দ্রনাথের কালে বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়া সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-লোকের উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত কবিদের বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যের সহিত আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের তুলনা মূলক আলোচনা করি, কিন্তু মূল বোধের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের জন্য এই জাতীয় তুলনা মূলক আলোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কাব্য আলোচনায় তাহা একান্ত বহিরঙ্গিক।)

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বেদনা তাহা নূতন সামগ্রিক জীবন-দর্শন সৃষ্টির বেদনা। তাঁহার কাব্যের মর্ম্মমূলে যে অস্থিরতা তাহা নিত্য নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল। বিষয়টিকে আরো একটু বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য যতই থাক, প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট চিন্তা-পদ্ধতি, একটি স্থায়ী ভাব-লোক আছে। চিন্তার বিচিত্র ধারা এই বিশিষ্ট ভাব-লোক বা চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে।

ইহা যেন মহাসমুদ্রের তীরে তীরে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী এক একটি ক্ষুদ্র জলাশয় কাটিয়া লওয়া। প্রত্যেকটি দেশ বা জাতি আপনার এই

আবেষ্টনীকেই একমাত্র সত্যরূপে আশ্রয় করিয়া আছে। সেই সঙ্গে অন্য সকল জাতির ভাব-লোক হইতে আপনার ভাব-লোকের শ্রেষ্ঠতা সপ্রমানের নিঃসঙ্কোচ চেষ্টাও লক্ষিত হয়।

বর্ত্তমানকালে নানা কারণে সেই প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রবেষ্টনী ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহা যে নির্ব্বিশেষ সত্যকে সীমিত উপলব্ধির দ্বারা নানা রূপে সীমিত করিবার চেষ্টা সেই সত্যই দিনে দিনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই এক একটি আবেষ্টনীকে প্রত্যেক জাতির বংশানুগতি (tradition) বলা যাইতে পারে। এই বংশানুগতির আবেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকটি দেশ একটি বৃহত্তর উদারতর সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিতেছে। এখানে আসিয়া বিশ্ব-মানব-মনের বিকাশের একটি পর্য্যায় শেষ হইয়া একটি নূতন পর্য্যায় সুরু হইয়াছে।

বিশ্ব-মানবের যে মানস-লোক তাহাও সীমিত বলিয়া তাহাদের সকলের উপলব্ধ সত্য যে সীমিত তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সীমিত বোধের মিলিত প্রকাশ নয়। এই সকল ক্ষুদ্র সীমিত বোধ ভাঙ্গিয়া তাহা একটি অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে। এই অখণ্ডবোধের সত্তাটি এখন হইতে ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিবে।

বংশানুগতির সীমা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সকল বংশানুগতিকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া উপচাইয়া যে একটি বোধের প্রসার তাহাও নিসংশয়িত স্পষ্ট রূপ লইয়া এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। ইহা সেই রূপান্তরের পর্য্যায়। এই রূপান্তরের ফলে মানসিক নানা বিপর্য্যয় ও অব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে মন নূতনকে গ্রহণ করিতে একান্ত অসমর্থ, যাহার মধ্যে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত, যাহা কেবল বহনপটু, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যাহা কেবল বহন করিবার এই বৃত্তিটিকেই চর্চ্চা করিয়াছে, এই পরিবর্ত্তনের পর্য্যায়ে তাহারা স্বাভাবিক-ভাবে প্রাণপণে বংশানুগতিকে জড়াইয়া ধরিয়া একদিন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। গ্রহণের ক্ষমতা যাহাদের আছে, তাহাদের সামর্থ্য এবং সেইসঙ্গে মানসিক প্রতিক্রিয়ার নানা ক্রম ও রূপ আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্র এই মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইহা এক্ষেত্রে উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের জাতি-চিত্তে যে রূপান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে তাহার পূর্ণ প্রকাশ শুধু নয়, পূর্ণ আদর্শও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে আদর্শ শুধু নয়, পরিণামে একটি সত্যবোধে নিঃসংশয় স্থিতি আছে। বিশ্বের সকল সীমিতবোধের ধারা তাঁহার চেতনায় একাকার হইয়া একটি অখণ্ড সত্যবোধ যে ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অন্তশ্চেতনায় বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব একান্ত স্পষ্ট। সেই দ্বন্দ্ব তাঁহার বিচিত্র চেতনা পর্য্যায়ের মধ্যে, বিচিত্র চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যে, বিচিত্র ভাব-সাধনার মধ্যে, ব্যক্তি ও বিশ্ব, ব্যক্তি ও সমাজ, সমাজ ও জাতি, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা, ইহলোক ও পরলোক, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে।

এই বহুবিচিত্র বিরোধিতার মধ্যে যদি নিয়ত সঙ্ঘাতই থাকিত এবং তাহাতে কবি-চেতনা কেবল আন্দোলিতই হইত তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে মহান ট্র্যাজেডি চিহ্নিত হইয়া যাইত তাহাতে কোন সংশয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সকল বোধের মধ্যে একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সত্যবোধের মধ্যে তিনি পরিণামে এই সকল বিচিত্রবোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই মূল সত্যবোধটিকে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে।

বৃক্ষ যেমন প্রারম্ভিক অবস্থা হইতে পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ে বৃক্ষের পূর্ণ পরিচয় বহন করে, তাহা এক অংশের সহিত অপর অংশের কেবলই যোজনা নহে; তেমনি রবীন্দ্রনাথের সত্য খণ্ড খণ্ড বোধের যোজনা নহে। তাঁহার উপলব্ধি-চক্রের পরিধি কেবলই বাড়িয়া গিয়াছে। আর পরিণামে আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে বিশ্বের সকল ভাব-ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল অধ্যাত্ম প্রেরণা কেমন করিয়া কোন রহস্যের বশে স্থান লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বেদনা তাহা ক্ষুদ্রতর সামঞ্জস্য হইতে বৃহত্তর সামঞ্জস্য লাভের বেদনা। নিখিল মানব-সমাজের, বিশ্ব প্রকৃতির সকল প্রেরণা তাঁহার অন্তশ্চেতনায় নিয়ত গূঢ় গোপন রস সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার প্রাণ মূলে এই রস সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জীবন-বৃক্ষকে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সত্য তাই জীব-দেহের ন্যায় অখণ্ড। তাহাকে বাহির হইতে খণ্ড খণ্ড আকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায় না।

উপনিষদে দেশ-কালের উর্দ্ধে পরম সত্যের উপলব্ধির কথা আছে। নিখিল বিশ্ব যে এক অমোঘ নিয়মের অধীন (যাহাকে 'ঋত' বলা হইয়াছে) তাহার নিঃসংশয় উপলব্ধির কথাও আছে। বিসৃষ্টি যে ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহারও পরিচয় লাভ করা যায়।

এই তিনটি সত্য যে এক অখণ্ড বোধের মধ্যে বিধৃত, অর্থাৎ দিব্য-চেতনাই দেশ-কালের মধ্যে নানা চেতনা-ক্রমে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন; অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নিখিল বিসৃষ্টি আবার আপনার পূর্ণ স্বরূপ ফিরিয়া লাভ করিতে চলিযাছে, এই উপলব্ধির প্রকাশ কোথাও কোথাও লাভ করিতে পারা গেলেও ঠিক নিঃসংশয় রূপ লইয়া কোথাও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ঔপনিষদিক সাধনা অব্যাহত থাকিলে এই উপলব্ধি যে কালে সম্পূর্ণতা লাভ করিত তাহাতে সংশয় নাই।

মধ্যযুগে জাতি এই সাধন-ধারা হইতে সম্পূর্ণ রূপে স্খলিত হইয়া পড়ে। (ইহার বহুবিচিত্র কারণ নির্দ্দেশ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন)। তাহাতে পরমার্থ সৎ স্বরূপের সহিত দেশ-কালের জাগতিক জীবনের সম্পর্ক সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়।

দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় (আদৌ যদি তাহা থাকে) জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে পৃথক হইয়া পড়ে। (ভারতবর্ষই যে একমাত্র দেব-ভূমি, ঈশ্বরের একটি বিশেষ অভিপ্রায় যে এই দেশকে আশ্রয় করিয়া চরিতার্থ হইতে চায় তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে)। এই অভিপ্রায় দেশে দেশেই কেবল নয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে গোষ্ঠীতেও গোষ্ঠীতেও পৃথক! (তাহার সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে একথা স্পষ্টই স্বীকৃত)।

বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের অসামান্য সমৃদ্ধি ও বিচিত্র সত্য আবিষ্কারের ফলে সেই প্রাচীন সত্যের পুনরায় নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বিশ্বের এক নিয়তি নিয়মের সহিত সকল দেশ, সকল জাতি, সকল মানব গোষ্ঠী বিধৃত হইয়া আছে। প্রত্যেকের ভিতর দিয়া সেই এক নিয়তি চরিতার্থ হইতেছে।

এই পূর্ণ দৃষ্টি এদেশে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখিতে নাই। তাঁহার এই পূর্ণতার সাধনায় কতখানি সেমেটিক, কতখানি বৌদ্ধ, কতখানি খ্রীষ্টান, কতখানি গ্রীক, কতখানি উপনিষদ, কতখানি বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম, কতখানি আধুনিক বিজ্ঞান,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কাব্য সাহিত্যের কতখানি প্রভাব পড়িয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য শুধু নয়, নিষ্প্রয়োজনও। বলিযাছি, তাঁহার ধর্ম্ম একটি অখণ্ড সৃষ্টি তাহা এক অংশের সহিত অপর অংশের সচেতন মিলন চেষ্টার ফল নহে।

বলাকা

কবি তাঁহার জীবন-সাধনায় পরিপূর্ণতার যে আদর্শ লাভ করিতে চান. তাহার জন্য পূর্ব্বে প্রয়োজন ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার পূর্ণ মিলন বোধ, অর্থাৎ বিশ্বানুভূতি লাভ। এই মিলনবোধ সম্পূর্ণ না হইলে পূর্ণতার ওই আদর্শকে লাভ করিতে পারা যাইবে না। মূল এই অসম্পূর্ণতার জন্য কবির জীবনে যে পূর্ণ পরিণাম লাভ ঘটে নাই, তাহা কবি স্বীকার করিয়াছেন। গীতাঞ্জলি অধ্যাযে আমরা কবির সেই স্বীকৃতির পরিচয় লাভ করিয়াছি।

বিশ্বের সহিত একাত্মতা বোধ কেন কবির জীবনে অচরিতার্থ রহিযা গেল তাহার একটি স্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ তিনি বলাকার মধ্যে করিযাছেন। বিশ্বের সহিত একাত্মতা বলিতে কেবল তাহার সৌন্দর্য্য-ভাগের সহিত একাত্মতা বুঝায না ; তাহার অসুন্দর ভাগ, তাহার কঠোরতা, ভয়ঙ্করতা ও নির্ম্মমতার সহিতও একাত্মতা বুঝায়।

বিশ্বে সুন্দর-অসুন্দর, রূপ-বিরূপের এই পার্থক্যের বোধটি থাকে মানসিক চেতনায়। বিশ্ব-সত্তা মানবিকবোধের অতীত সত্তা তাহা সুন্দর নয়, অসুন্দরও নয়। তাহা 'নিরুপম' বা 'অনুপম' ; অর্থাৎ তাহার তুলনা বা উপমা নাই। তাহা সুন্দর-অসুন্দরের মিলিত প্রকাশও নয়। তিনি সুন্দর-অসুন্দরকে আশ্রয় করিয়া, তাহাদের পূর্ণ করিয়া অনন্তে ব্যাপ্ত। পূর্ণতার এই তত্ত্বটিকে মানুষ যখন লাভ করে তখন মানুষ আপনার চেতনাকেই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দেখে। সেখানে ভেদ থাকে না বলিয়া সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্ন নিরর্থক। মানবীয় চেতনার এই পরিণামকে অনির্ব্বচনীয় ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

রাজা নাটকে রাণী সুদর্শনার সাধনার কথা স্মরণে পড়িতে পারে। রাণীর মধ্যে যে অধ্যাত্ম সংগ্রামকে তিনি রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা যে কবিরই অধ্যাত্ম সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যে কারণে রাণী ঈশ্বরীয় সত্তাকে অপরোক্ষ করিতে পারেন নাই, সেই এক কারণ কবির নিজের জীবনেও বিদ্যমান ছিল। যে কারণে রাণী ঈশ্বরীয় সত্তাকে পরিশেষে লাভ করিতে সমর্থ হন, সেই এক কারণ কবির জীবনে পরিণামে সত্য হয়।

বিশ্ব-সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে আজ কবি এতদিন পরে নিঃসংশয় হইয়াছেন। এই সত্তা লাভের জন্য কবি পরবর্ত্তী সমস্ত জীবন ধরিয়া সাধনা করিয়াছেন। কবির অধ্যাত্ম সাধনায় ঈশ্বরীয় বিচার এইভাবে লীলা করিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে কবির বিশ্ব-সত্তার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছি যে তাহা যথার্থ বিশ্ব-সত্তা নহে, তাহা বিশ্বের সকল সীমিত সৌন্দর্য্যের সমাহার। সীমিত সকল সৌন্দর্য্যের সমাহার বলিয়া তাহাও সীমিত বোধ। তাহা মানবিক সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে এইরূপে এক অপরূপ ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়া তাহার আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি ঘটাইয়াছে।

অধ্যাত্ম-জীবনের পূর্ণ পরিণাম লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া কবি এতদিন পরে তাঁহার সাধনার অসম্পূর্ণতার মূল কারণ সম্পর্ক সচেতন হইযাছেন। আমি এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বলাকার ৪২ সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখ করিতেছি।

কবি যে সৌন্দর্য্যধ্যানে সচরাচর তন্ময় হইয়া থাকিতেন, বাস্তব জীবনের রূঢ় সংস্পর্শে বারংবার সে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে বারংবার তিনি অপ্রসন্ন অন্তরে বাস্তবতাকে পরিহার করিয়া সৌন্দর্য্য স্বপ্নে আবার হারাইয়া গিয়াছেন। বাস্তব জগৎ তাহার অচিন্তনীয় বিপুল বিচিত্র সমস্যা লইয়া সেই ধ্যান-লোকের বাহিরে আবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নির্ম্মম দারিদ্র্য, মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; ('ক্ষুধিত দারিদ্র্য সম মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম') কিন্তু সৌন্দর্য্য-সাধনার অন্তরায় বলিয়া তাহাকে তিনি একান্তে পরিহার করিয়াছেন।

বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তী নির্ম্মম, অতি ভয়ঙ্কর শক্তির লীলা কত বার তিনি অপরোক্ষ করিয়াছেন। 'যেন মৃত্যুদূত', 'অস্পষ্ট অদ্ভুত দুঃস্বপনের মতো'। কিন্তু এই

প্রকাশের রহস্যকে তিনি ভেদ করিতে চান নাই। আপনার জীবনে তাহার কোন প্রকাশকেও সত্য করিয়া তুলিতে চান নাই।

আজ কবি ধ্যান-লোক হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিপুল জনতার মাঝখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। মনুষ্যত্বের সকল প্রকার অবমাননাকে অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য তিনি আজ দৃঢ় সঙ্কল্প। তাই আজ তিনি সেই ভয়ঙ্কর নির্ম্মম শক্তির প্রকাশকে আপনার জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে চান; যাহা সর্ব্ববিধ অসত্যের মূলে দারুণ আঘাত করিতে পারে, যাহা পুরাতন সকল জীর্ণতাকে ঝরাইয়া দিয়া নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, যাহার প্রবল পরুষ স্পর্শে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভয়ের সকল মুখোশ খুলিয়া পড়ে, ঈশ্বরের অমোঘ শাসনের মত যাহা সকল দ্বিধা সঙ্কোচ ও দুর্ব্বলতা মুক্ত।

যে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি বিচিত্র সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজ তিনি দেখিলেন বৃহৎ জীবন লাভের ফলে তাহা অধিক দূর সহায়তা করে না।

"এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোনে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্দ্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।"

গীতাঞ্জলি পর্ব্বে কবি দিব্য-চেতনা লাভের জন্য যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলাকার মধ্যে তিনি তাহার পরিচয় এইভাবে দান করিয়াছেন।

"চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি স্বর্গ।

"ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।"

কিন্তু এই সাধনা তাঁহার জীবনে স্থায়ী ও সত্য হয় নাই। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা মোক্ষকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরিণামে জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা এই মোক্ষের সাধনা নয়। মোক্ষের সাধনা রবীন্দ্রনাথের নিকট শূন্যতার সাধনা।

যে রহস্যে দিব্য-চেতনা দেশ-কালের ভিতর দিয়া তাঁহার একটি বিশেষ অভিপ্রায় চরিতার্থ করিয়া তুলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই রহস্য ও অভিপ্রায়ের স্বরূপ জানিতে চান। এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেন যে দিব্য অভিপ্রায়কে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে এই সমাজকে তাহারই অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানব-সমাজ যথেষ্ট পরিণতি না লাভ করিলে ওই শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটিতে পারে না। সেই রাজার একদিন আবির্ভাব ঘটিবেই, কিন্তু তাঁহার আসন, তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য তাঁহার শয্যা প্রভৃতির রচনা চাই। অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে তাঁহারই অনুকূল করিয়া গড়িতে হইবে। ইহার জন্য সমাজ হইতে সর্ব্ববিধ মিথ্যাচার, অন্যায়, অবিচার, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও ভয় দূর করিয়া দিতে হইবে। যুগে যুগে মহাপ্রাণ ইহারই জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই ভাবে সমাজকে তাঁহারা ধীরে ওই পরিণামের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

দিব্য-চেতনার মধ্যে এই অভিপ্রায় আছে বলিয়া তিনিই নির্ম্মম আঘাত হানিয়া কবিকে ধ্যানাসন হইতে উঠাইয়া বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এমনি করিয়া দিব্য-অভিপ্রায় চরিতার্থ হইতে চলিয়াছে। ইহাকে তাই কবির অসামার্থ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে ভুল করা হইবে। কবিও তাঁহার এই উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন,

"হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।"

আজ কবিকে যদি সকল অসত্য ও অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, ঈশ্বরের

সেই অভিপ্রায় যদি তাঁহার জীবনে থাকে, তবে তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে তিনি স্বয়ং কবিকে শক্তি দিবেন।

"এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
    পরাও রণ সজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
    বাজবে জয় ডঙ্ক।"

কবি তাঁহার এই উপলব্ধির পরিচয় অন্যত্রও দান করিয়াছেন। কবি ইতিপূর্ব্বে যে মুক্তিলোক লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর সেই একই সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াছে। কবি তাহার পরিচয় এইভাবে দান করিয়াছেন,—

"তার আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাইরে দিবস, নাইরে তাহার নিশা।"

উপনিষদেও এই একই উপলব্ধির পরিচয় দান করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও এই জাতীয় কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

"সেখানে চক্ষু যায় না, বাণী যায় না, মন যাইতে পারে না, (মানুষ) ইহাকে শিক্ষা দিবে কিরূপে, তাহাকে আমরা জানি না, উপলব্ধি করিতে পারি না।" (কেন উপনিষদ)

"সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ প্রতিভাত হয় না, এই অগ্নি তাই কোথায়? কেবল সেই উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত কিছু আলোকিত। তাঁহার দীপ্তি এই সমুদয় বিশ্বকে প্রদীপ্ত করিয়াছে।" (কঠ উপনিষদ)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার এই আকাঙ্ক্ষিত পরিণাম লাভ করেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে ইহা তাঁহার নিকট পূর্ণতার বোধ জাগ্রত না করিয়া শূন্যতা বোধ জাগ্রত করিয়াছে। তিনি নিঃসঙ্কোচে একথাও স্বীকার করিয়াছেন।

"ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস।"

স্বর্গ বলিতে তিনি যাহা বোধ করিতেন তাহার পরিচয়ও তিনি এই প্রসঙ্গে দান করিয়াছেন।

> "কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
> জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধূলামাটির মানুষ।
> স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
> আমার প্রেমে, আমার স্নেহে
> আমার ব্যাকুল বুকে,
> আমার লজ্জা, আমাব সজ্জা, আমাব দুঃখে সুখে।"

আপাত দৃষ্টিতে ইহা কেমন অভিনব বলিয়া বোধ হয়। অতি জাগতিক সকল সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রবণতা। একপ্রকার নাস্তিক্যবোধ।

দেশ-কালের মধ্যে দিব্য-চেতনা যেখানে আপনাকেই নিত্য উৎসর্গ করিতেছেন, আপনার অভিপ্রায়কে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে তাঁহার যে বিশিষ্ট প্রকাশ, সেই উৎসর্গ, সেই অভিপ্রায়, সেই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ স্বর্গের সন্ধান লাভ করিরাছেন। দেশ-কালের এই আশ্রয়, রূপের এই আধার ছাড়া অসীম বা অরূপ বন্ধ্যা; তাহার কোন ঐশ্বর্য্য নাই বলিয়া তাহা শূন্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে সীমা ও অসীম, দুটি সখার মত শাশ্বত কালের জন্য যুক্ত হইয়া আছে। বরং অসীমকে তিনি পরিহার করিতে পারেন, কিন্তু সীমাকে নয়। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের ইহা যেন সীমার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত সত্যকে স্বীকার করে নাই, তাহার মূল্যের পরিবর্ত্তনকেও সেই সঙ্গে অস্বীকার করিয়াছে। দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত মূল্য সকল কালের জন্যই এক। তাই ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য হইল কোন একটি উপায়ে দেশ-কালের বোধকে ছাড়াইয়া উঠা। সেই সঙ্গে দেশ-কালের বোধ বা বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার সকল প্রকার চেষ্টা হইয়াছে।

দেশ-কাল সম্পর্কে খ্রীষ্টধর্ম্ম যে বিশ্বাস পোষণ করে এই প্রসঙ্গে তাহারও কিছু পরিচয় লাভের জন্য আমি Emil Brunner-এর দুই একটি মন্তব্য কিছু বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করিতেছি, তাহাতে ভারতীয় এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

"The Orient has a conception of time entirely different from that of the west, and this difference belong to the religious and metaphysical sphere."

"It is timeless, motionless, self-satisfied eternity ; therefore it is the deeper desire of the Indian Thinker to enter into or to share in that motionless eternal being, in Nirvana.'

"There is a clear cut opposition between eternity and the temporal world. Eternity is the negation of time : time is the negation of eternity. How this time-world came into being, and what kind of being it has, is a question which can hardly be answered satisfactorily from Plato's presuppositions.

"The time process in its totality, from beginning to end, is present in Him. For Him there is no surprise. Everything that happens does so according to His eternal decree. God is eternal.

"But the relation of this eternal God to temporal being and becoming is totally different from what it is in Indian thought or in the systems of Parmenides, Plato or the Neoplatonists."

"Here history is no circular movement. History is full of new things, because God works in it and reveals Himse'f in it. The historical time-process leads some where. The line of time is no longer a circle, but a straight line, with a beginning, a middle and an end."

"Still the idea of universal progress is impossible with in this Christian conception because, alongside this growth of the Kingdom, there is the concurrent growth of the evil powers and their influence within this temporal world. * * * The goal of history is reached not by an immanent growth or progress, but by a revolutionary change of the human situation at the end of history, brought about not by man's action, but by divine intervention—an intervention similar to than of incarnation, * * * the advent of the Lord, the ressurrection of the dead, the coming of the eternal world."

জগৎ ও জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য যদি পরিণামে দিব্য-সত্তার অবতরণকেই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অভিব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে মূল্যের রূপান্তরও অস্বীকৃত হইয়া যায়। কেবল দেশ-কালের স্বীকৃতির অবশেষ থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালের অস্তিত্ব, অভিব্যক্তি ও মূল্যের রূপান্তরও স্বীকার করেন। কোনও ঈশ্বরীয় সত্তার অবতরণের কথা তিনিও যে বলেন নাই তাহা নহে (বলাকার মধ্যেই তাহার পরিচয় আছে। ৫ সংখ্যক কবিতা)। তবে রবীন্দ্রনাথের অবতরণের ক্ষেত্রে উত্তরণ ও অবতরণ একটি পরিণামে সমার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই জাগতিক ধীর বিকাশের ভিতর দিয়া সমগ্র মানব-সমাজ ওই পরিণাম লাভ করিবে। জাগতিক

ধীর বিকাশের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটিতেছে বলিয়া সতের সহিত অসৎ সম ভাবে বৰ্দ্ধিত হইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথ তাই ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার মোক্ষকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি দিব্য-সমাজের সত্যতাকে স্বীকার করেন এবং তাহা জাগতিক ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া ঘটিবে।

বলাকার ২২ সংখ্যক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেন তিনি ঈশ্বরীয় সত্তায় ওই পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে চান নাই, কিংবা ওই সত্তাই তাঁহাকে ওই পরিণাম লাভ করিতে দেন নাই তাহার এই কারণ কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

মুক্তি বলিতে তিনি বোধ করিয়াছিলেন দেশ-কালের অন্তর্গত অন্তহীন প্রকাশের লোক হইতে বিচ্ছিন্নতা। এই পরিণাম লাভ করিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া তিনি বোধ করেন যে মুক্তি হইল বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলন অবস্থা। একান্ত আমিত্ব বোধ যেমন ব্যক্তিকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করে, মোক্ষও তেমনি বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্নতা। দুই-ই রবীন্দ্রনাথের অনাকাঙ্ক্ষিত। যে বোধ ব্যক্তিকে বিশ্বের সহিত মিলিত করে, যে বোধ ব্যক্তিকে বিশ্বের অকল রূপের মধ্যে অপরূপের আস্বাদ লাভ ঘটায়, যে বোধ মানবিক স্নেহ-প্রেম-প্রীতির মধ্যে অনির্ব্বচনীয় রসের প্রকাশ ঘটায় রবীন্দ্রনাথ সেই বোধ লাভ করিতে চান।

আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে কবিতাটির মধ্যে।

"একলা আপন তেজে
ছুটল সে যে
অনাদরের মুক্তি পথের 'পরে
তোমার চরণ ধূলায় রঙিন চরম সমাদরে।"

অরূপের অনির্ব্বচনীয়তা যেমন একমাত্র রূপকে আশ্রয় করিয়া তেমমি ঈশ্বরীয় প্রেমের লীলা ব্যক্তি-সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়া। এই ভাবে ভক্তি সাধনার এক অভূতপূর্ব্ব দ্বার তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত পরিচয় পরে লাভ করিতে পারা যাইবে। এক্ষেত্রে এই কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

এই ব্যবধান এবং এই লীলার ভিতর দিয়া তিনি ঈশ্বরকে আরো অধিক নিকটে লাভ করিয়াছেন।

"আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি
দেখি বদন খানি।"

দিব্য-সত্তার অবতরণ সম্পর্কে কবির জীবনে এই কালে যে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে তিনি বলাকার একটি কবিতায় তাহার পরিচয় দান করিয়াছেন। এই বিশ্বে তাঁহার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী শুধু নয়, সেই আবির্ভাবের কাল আসন্ন। এই বিশ্বে কোন্ মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিবে? সেই দিব্য নির্ব্বাচিত মানব কে, কোন্ সত্তার মধ্যে নীরবে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইবার জন্য সুগম্ভীর মহান প্রস্তুতি চলিতেছে, বিশ্বের কোন্ প্রান্তে, কোন গৃহে তাহা কবি জানেন না।

'কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে।"

অখণ্ড শান্তির বাণী লইয়া তিনি আসতেছেন। তাঁহারই প্রতীক রজনীগন্ধা ফুলের একটি গুচ্ছ। কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, ঝঞ্ঝা, উৎপাত, মানবের কোন রক্তমোক্ষণকারী সংগ্রামের ভিতর দিয়া তিনি আসিবেন না। পরিপূর্ণ মাধুর্য্যের রূপে, 'আনমনে গান গেয়ে' লীলাভরে তাঁহার আবিভাব ঘটিবে। উষার উদয়ের মত সে আবির্ভাব হইবে একান্ত সহজ পরিপূর্ণ দিক্‌প্লাবী।

যে মানবের মধ্যে ঈশ্বরীয় সত্তার এই পূর্ণ প্রকাশ ঘটিবে, 'সে থাকে এক পথের পাশে'। সে যে যুগ যুগ লাঞ্ছিত, অবহেলিত মনুষ্যত্বের মাঝখানে কোথাও বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে, এই বিষয়ে কবির অন্তরে কোন সংশয় নাই।

তাঁহার আবির্ভাব ঘটিলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের চেতনার ক্ষেত্রে এক বিপর্য্যয় ঘটিবে। একটি প্লাবিত আলোর বন্যায় স্নান করিয়া মানুষের সমগ্র সত্তা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

"বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে।"

যুগে যুগে মানুষ কত বারবার এই মর্ত্ত্যের শান্তিকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে, হিংস্রতা, বর্ব্বরতায় পশুকেও লজ্জা দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সেই প্রতাপ বারবার ধূলায় ধূলি হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। পরম সুন্দর যিনি তিনি এই অসুন্দরকে আপন হস্তে বারবার ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছেন। এই তো বিচার।

"হে সুন্দর
তোমার বিচার ঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে
তৃণ পুঞ্জে পতঙ্গ গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ কূজনে,
তরঙ্গ চুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব বীজনে।"

মানুষের প্রতাপ যত বড়ই হোক, অত্যাচারের সৌধ যত উচ্চ করিয়া গাঁথা হোক-না কেন, বিশ্বের অন্তর্নিহিত অখণ্ড সুষমার বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা একদিন ভাঙ্গিয়া পড়ে; কিন্তু এই সুষমার সহিত সঙ্গত আছে বলিয়া তুচ্ছ তৃণদল, ওই কোমল একখণ্ড মাধুর্য্য বক্ষে অসহায় ফুল, ওই পাখির কূজন মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া এই বিশ্বে বিরাজ করিতেছে।

মানুষের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ যত বীভৎস হোক, ঈশ্বরীয় বিচার জননীর স্নেহ রূপে, 'প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস রূপে, সতীর পবিত্র লজ্জা রূপে, বন্ধুর আত্মত্যাগ রূপে, প্রেমের প্রতীক্ষা রূপে, করুণা রূপে, ক্ষমা রূপে নিত্য প্রকাশ লাভ করিতেছে। তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যত্বের বিকার ঘুচিয়া যাইতেছে।

ঈশ্বরীয় বিচার কখন রুদ্র রূপ লইয়া উদ্যত হয়। তাহাতে এক একটি মনুষ্য সমাজ আত্মকৃত পাপের ভারে একদিন কোথায় তলাইয়া যায়।

কবির স্থির বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্য সমাজে এই বিপর্য্যয়, এই আত্মঘাতী সংগ্রাম এই পরস্পর হানাহানি, কাড়াকাড়ি, লোভ, সংশয়ের শীঘ্রই অবসান ঘটিবে। ইহারই ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের চিরন্তন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইবে। একটি নূতন

সমাজ বিরচিত হইবে। একটি স্থায়ী দিব্য পরিণাম সে নিঃসন্দেহে লাভ করিবে। মানুষের পাপের শক্তি যত বড়ই হোক, মানুষের পুণ্যের শক্তি তাহার চেয়েও বড়। সেই শক্তিই পরিণামে জয়ী হইবে। এই পুণ্যের শক্তির বন্দনা গান বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে কবি গাহিয়াছেন।

"বলো অকম্পিত বুকে,
'তোরে নাহি করি ভয়,
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

এমনি বীরের মত মৃত্যু স্বীকারের ভিতর দিয়া, এমনি সর্ব্বস্ব সমর্পণের ভিতর দিয়া, এমনি দুঃসহ দুঃখ-দহনের ভিতর দিয়া, মাতার, প্রেয়সীর স্নেহ অশ্রু-ধারার ভিতর দিয়া মর্ত্ত্য-লোকে স্বর্গ-রাজ্যের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা হইবে।

ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন। সেই ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া আজ কবি নিখিল বিশ্বের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের যে রূপ প্রতিভাত হইয়াছে বলাকার দুই একটি কবিতায় তাহার পরিচয় লাভ করা যায়।

এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের অন্তর্গত প্রতি ধূলিকণা, এই সৌরমণ্ডল, ওই অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র সমেত সমস্ত কিছুই অচিন্তনীয় বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোন্ শূন্যলোক হইতে মহাশূন্যে? সমস্ত কিছুই চঞ্চল, অধীর, বিরাম শূন্য। আর এই বেগে, ঘূর্ণাবর্ত্তে, পরস্পর সংঘাতে, রূপ, রস, গন্ধ, দুর্লভ চেতনা বন্যার ধারার মত ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। সমস্ত কিছু জড়াইয়া এই রহস্যের জন্যই চির পুরাতন পৃথিবী চির নবীন।

"বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে;

* * * *

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো।"

(রবীন্দ্রনাথ এইরূপে জড় ও চেতনার চিরন্তনদ্বন্দ্বকে জয় করিয়া উঠিয়াছেন লক্ষ্য করিতে পারা যায়।)

এককালে তিনি বোধ করিযাছিলেন (চিত্রার মধ্যে এই বোধের সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়।) এই বিশ্বের অন্তরালে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী কোথায় বিরাজ করিতেছেন, বিশ্বের সকল সীমিত রূপের মধ্যে তাহারই আভাস লাভ করিতে পারা যায়। তাহারই রূপের ছটায় বিশ্বের সকল রূপ বিচ্ছুরিত। বিশ্বের সকল অপূর্ব্ব রূপ সেই পূর্ণতাকে প্রতিনিয়ত ইঙ্গিত করিতেছে।

"সর্ব্বনাশা প্রেমে তাব নিত্য তাই তুমি ঘর ছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রেব মণি;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;
দুলে উঠে বিদ্যুতেব দুল;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লব পুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;"

বিশ্বের পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে এই অখণ্ড রূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিকে বৌদ্ধ স্পন্দবাদের উপলব্ধি হইতে স্বরূপতঃ পৃথক করিয়াছে। কেবল তাহাই নয় এই নিরন্তর চলারও যে স্থির কোন লক্ষ্য আছে তাহারও অস্পষ্ট আভাস কবিতাটির মধ্যে লাভ করা যায়।

এই নিখিল বিশ্ব, নিখিল মানবেব ভাব-লোক দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, কোন একটি স্থির পরিণাম লক্ষ্য করিয়া।

একদিকে সমগ্র বিশ্বের চাঞ্চল্য—

"শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।'

অন্যদিকে ভাব-লোকের মধ্যে নিত্য অস্থিরতা

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।"

এই সমগ্র পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে একটি পরিণাম লক্ষ্য থাকায় এই সাক্ষাৎকারের সহিত বৌদ্ধ স্পন্দবাদের স্বরূপতঃ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

বৌদ্ধরা জীবন প্রবাহকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই দার্শনিক উপলব্ধিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে এইভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

জীবন কতকগুলি অবস্থার অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা। প্রত্যেকটি অবস্থা উহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং তাহার মধ্যে ঠিক পরবর্ত্তী অবস্থার উদ্ভব হয়। জীবন-প্রবাহ তাই বিভিন্ন অবস্থার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন-প্রবাহকে তাই প্রজ্বলিত দীপ-শিখার সহিত তুলনা করা হয়। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের শিখা আপনার নিজের অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভরশীল অন্য মুহূর্ত্তের শিখা হইতে পৃথক। তৎসত্ত্বেও প্রত্যেকটি বিভিন্ন শিখার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আছে। আবার একটি শিখা হইতে যেমন অন্য একটি শিখা প্রজ্বলিত করিতে পারা যায় এবং দুটি শিখা পৃথক হইলেও কার্য্য-কারণ-সূত্রে যুক্ত, জীবনের সর্ব্বশেষ অবস্থা তেমনি পরবর্ত্তী জীবনের আদি অবস্থা হইতে পারে।

পুনর্জন্ম তাই আত্মার দেহান্তর গ্রহণ নয়, ইহা বর্ত্তমান জীবন হইতে পরবর্ত্তী জীবনের কারণ-রূপ প্রকাশ।

একদিকে চিরন্তন ভাব-লোক, অন্য দিকে রহিয়াছে চিরন্তন জড় জগৎ। এই পরিপূর্ণ ভাব-লোকটি দেশ-কালের ভিতর দিয়া জড়জগৎকে আশ্রয় করিয়া দীব বিকাশ লাভ করিতেছে। চিন্তা জড়জগতের উপকরণের (Technology) দ্বারা সামিত, এবং উপকরণের ক্রমিক উন্নতির ফলে চিন্তারও ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে এবং এই বিকাশের কোন পরিণাম নাই, রবীন্দ্রনাথ এই দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতিকে স্বীকার করেন নাই। তবে অধ্যাত্মবাদীদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জড় ও চেতনার মধ্যে যে বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে তাহা জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'আমি'র স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী কাব্যে একস্থলে বলিয়াছেন, "অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা মানুষের সীমানায়, তাকেই বলে আমি।" মানুষের সামানা, অর্থাৎ মনের সীমানা, মনের সীমানাই হইল দেশ-কালের সীমানা।

অসীম দেশ-কালের সীমানায় সাধনায় ব্যাপৃত। সে সাধনা হইল আপনার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে রূপের জগতে ধীরে ফুটাইয়া তোলা। দেশ-কালের এই সীমালোক না থাকিলে তিনি আপনার অন্তরের অন্তহীন সৌন্দর্য্য-লোককে তো প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না।

ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কেও একথা সত্য। বিশ্ব-সত্তার অন্তহীন মাধুর্য্য-লোকের কোন প্রকাশই ঘটিত না, যদি ব্যক্তি চেতনায় তাহা প্রতিফলিত না হইত। ব্যক্তি প্রেমে বিশ্বের নিকট ধরা দিয়াছে বলিয়া ব্যক্তির চিত্ত-লোকে বিশ্বের মাধুর্য্য অফুরন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। আর সেই প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্ব আপনাকে নানা রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছে। মানব প্রেম এইরূপে বিশ্বকে তাহার অপার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া দান করিতেছে। ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের, তাহার প্রেমের প্রসারতার নানা ক্রম আছে। যে সত্তা যত বেশি বিকশিত বিশ্বের মাধুর্য্য তাহার ভিতর দিয়া তত বেশি প্রকাশ লাভ করে।

এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা বলাকার মধ্যে আছে। এই কবিতা কয়েকটির মধ্যে তিনি ব্যক্তি-সত্তা বা 'আমি'র একটি বিশিষ্ট মূল্য নিরূপণ করিতে চাহিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্য রচনা পর্য্যায়ে কবি 'আমি'র নিঃশেষ বিলুপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। ওই কালে তিনি নিঃসংশয়ে বোধ করেন যে আমিত্ব বোধের লেশমাত্র থাকিতে দিব্য-চেতনা লাভ অসম্ভব। অন্ততঃ স্থায়ীরূপে তাহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। যে কারণেই হোক কবি পরিশেষে আপনার জীবনে ওই পরিণাম চিহ্নিত করিতে চান নাই। অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন।

ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের সহিত প্রেমে যে বিচিত্র লীলা তাহার আনন্দ কবির নিকট অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। ব্যক্তি-সত্তার নিঃশেষ অবসান কবি যে-কোন পরিণামে আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা যেন ঈশ্বরীয় সত্তার সহিত প্রেমে চিরকাল যুক্ত থাকে। প্রেম পার্থিব সকল ত্রুটিও অসম্পূর্ণতাকে সকল পাপ তাপকেও বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সদা উন্মুখ।

মানব-সত্তা ঈশ্বরের এক অপরূপ সৃষ্টি। ইহার বিনষ্টি তাঁহারও আকাঙ্ক্ষিত

নয়। তাঁহার আপন সৃষ্টি, মানব প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া এক দুর্লভ মহিমা লাভ করে। মানব-সত্তা রবীন্দ্র-কাব্যে তাই এক আশ্চর্য্য মূল্য লাভ করিয়াছে।

মানব কণ্ঠস্বর সঙ্গীতে সমুৎসারিত হইয়া মর্ত্ত্যে এক অপরূপ লোক উদ্ঘাটিত করিয়াছে। মানুষ বিচিত্র বন্ধনে বাঁধা। এই সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই তো তাহার সাধনা। এই তপশ্চর্য্যার প্রকাশ বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আর কোথাও নাই। দুঃখের দান মানব অন্তরে কোন অলৌকিক রহস্যের বশে আনন্দে পরিণত হয়। এমন করিয়া প্রেমে বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করিতে মানব-সত্তা ছাড়া আর কে পাবে? মানব-সত্তাই এই শ্রীহীন বিশ্বে মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই স্বর্গ-লোক রচনা করিতে মানুষ ছাড়া আর কে পারিত।

এমনি করিয়া ঈশ্বর আপনার দানকে ব্যক্তি-সত্তার ভিতর দিয়া শতগুন করিয়া ফিরিয়া লাভ করিতেছেন। ব্যক্তি-সত্তার বিলুপ্তি তাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

"মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।"

কিংবা

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
*　　*　　*
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।"

এই 'আমি' নিঃসন্দেহে কবির ব্যক্তি-আমি নয়। এই আমি দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত চেতনা যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'বিশ্ব-আমি'। তাঁহার এই 'অহঙ্কার বিশ্ব-মানবের হয়ে'। সীমা অসীমের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে বলিয়া তো ব্যবধানের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া নিত্য এত গান উৎসারিত হইতেছে। পরস্পরকে লাভ করিবার জন্য তাই এত ব্যাকুলতা। প্রেমে এই যে উৎসুক অধীরতা, এই যে পথ চাওয়া, এই যে ব্যথা মাধুরিমা ইহার কোন প্রকাশ তখন তাঁহার মধ্যে ছিল না, যখন তিনি এই সীমা-লোক সৃষ্টি করেন নাই। নিখিল বিশ্বের মধ্যে এই যে অন্তহীন রূপের প্রকাশ তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে তো প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই।

এই রূপ-লোকের অন্তহীন সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার আনন্দ নিঃসীম হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

মানবিক প্রেমের মধ্যে যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা, অধীরতা, যে অপার আনন্দ-বেদনার যুগপৎ লীলা তাহা তাঁহার পরম আকাঙ্ক্ষার ধন বলিয়া তিনি এই 'আমি'র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রেমে তিনি আপনাকেই ক্রমাগত গভীর করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে মানুষ লাভ করিতে পারিতেছে না। মায়ার এই আবরণ আছে বলিয়া মানুষের অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখী। এই ব্যবধান রচিত করিয়া মানব প্রেমের এই অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহলের সীমা নাই।

ঈশ্বর মানব-অন্তরের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশের ঐশ্বর্য্যকে নিত্য নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতেছেন।

> "এমনি করেই হবে
> এ ঐশ্বর্য্য তব
> তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।"

অন্তহীন রূপ-লোক লইয়া সমগ্র দেশ-কালের মধ্যে ঈশ্বরের একটি ধ্যান-রূপ ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিশ্ব-আমির যোগে ব্যক্তি-আমিরও এমনি একটি প্রকাশের ধারা আছে। বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া লোক হইতে লোকান্তর লাভের ভিতর দিয়া কবির বিশিষ্ট ব্যক্তি-সত্তার অমনি ধীর উন্মোচন ঘটিতেছে। নিখিল বিশ্বের মধ্যে আপনার ধ্যান-রূপকে রূপায়িত করিবার মধ্যে যদি তাঁহার আনন্দ থাকে, তবে ব্যক্তি-আমির এই ধীর প্রকাশের ভিতর দিয়া তাঁহার একটি বিশিষ্ট আনন্দ রস চরিতার্থ হইতেছে।

> "জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
> ফোটে তোমাব মানস সরোবরে
> *　　　*　　　*
> তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে।
> একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে"

একদিকে সীমার মূল্য, অন্যদিকে অসীমের সহিত তাহার সম্পর্কের স্বরূপ নির্দ্দেশ রবীন্দ্রনাথ সে ভাবে করিয়াছেন, তাহার পরিচয় লাভ করিবার জন্য আমি এক্ষেত্রে তাঁহার আরোও কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃত সূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নাহলে সে জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যার্মর্ধাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।"

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্ত্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতা সূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এইজন্যই কাল বিশ্ব চরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্ব্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গ পরম্পরারার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্ত্তগুলিকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্ত্তকে অন্য মুহূর্ত্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা একদিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর একদিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পাবে না। একদিকে তাহা হইয়াছে আর একদিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এইজন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এইজন্য কোনো বিশেষ রূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।" (রূপ ও অরূপ)

"নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্যদিয়া কত পর্ব্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘ যাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্ত্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না, তাহার অবিশ্রাম প্রবাহ ধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরোধেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়।" (মনুষ্যত্ব)

"অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি।" (দুঃখ)

"সীমা একটি পরমাশ্চর্য্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্ব্বচনীয়। এর কী আশ্চর্য্য রূপ, কী আশ্চর্য্য গুণ, কী আশ্চর্য্য বিকাশ। * * * সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে; যে অগননীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্ত্তন পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এতবড়ো সাধ্য আছে কার। * * * অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।" (সামঞ্জস্য)

"এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকাল স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য্য রহস্যকেই বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে পরিণাম বাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্ত্তিমান করছেন—জগৎ রচনায় করছেন, মানব সমাজের ইতিহাসে করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহঙ্কারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তাহলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহঙ্কারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহঙ্কারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহঙ্কারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন—নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম্ম থাকে না।" (পার্থক্য)

"পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতে আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটবড়ো কত আসক্তি অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেম সমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহঙ্কারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।" (পার্থক্য)

"অহংএর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জ্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।" (অহং)

"এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কার রূপ তৈরি হতে থাকে—এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্ত্তন করছে।" (নদী ও কূল)

"আত্মা দেশ কাল পাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে

সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহংলোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সন্তরণ করছে। এই অহং উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সঙ্গীত।" (নদী ও কূল)

"জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তা হলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলার তার শেষ নেই সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।" (আত্মার প্রকাশ)

"এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।" (আত্মার প্রকাশ)

"অহং এর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জ্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে। (আত্মার প্রকাশ)

"অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতর রূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগ সাধনই যদি জগতের মূল তত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্য সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।" (চিরনবীনতা)

"অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে যে নিজের যোগ স্বীকার করে অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলারূপে সুন্দর তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। (চিরনবীনতা)

এইরূপে নানা দিক হইতে নানাভাবে তিনি সীমা ও অসীমের যোগের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আপনার সাধনার লক্ষ্য সম্পর্কে পরিশেষে বলিয়াছেন—

"আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাহাদের প্রার্থনা দ্বৈতের জন্য, যাহাতে ঈশ্বরের সহিত ভক্তির বন্ধন চিরকাল থাকে। তাঁহাদের ধর্ম্ম এমন একটি সত্য যাহা চূড়ান্ত এবং যাহারা মানবিক ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অস্তিত্বের আরও দূরবর্ত্তী সত্তার জন্য যাত্রা করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে ইহারা ঈর্ষা করিতে অস্বীকার করেন; তাঁহারা জানেন আমাদের দুঃখের কারণ মানবিক অসম্পূর্ণতা, কিন্তু আমাদের সীমাবোধের মধ্যে প্রেমে সম্পূর্ণতা আছে, তাহা সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা স্বীকার করিয়াও তাহাদের ছাড়াইয়া যায়।" (মানুষের ধর্ম্ম)

বিশ্বের নিত্য চলমান স্রোতের উঠা-নামা, ভঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া ইহার প্রকাশ চির নবীন হইয়া আছে। এই নিত্য রূপান্তরের জন্য বিশ্ব এমন অপরূপ, তাহার সৌন্দর্য মাধুর্য্যের তাই অন্ত নাই।

যাহাকে ভালবাসিয়া একদিন এই পৃথিবীকে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখিয়াছিলাম, যাহার মাধুরি বিশ্বের সকল মাধুর্য্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল, যাহার প্রকাশ এত সত্য, এমন নিবিড়, এমনি একান্ত, মৃত্যুতে সেই দুর্লভ সত্তার একান্ত বিনষ্টি ঘটে ? এই জীবনে, এই জগতে তাহার কি কোন অবশেষ থাকে না ? যাহা হারাইয়া যাইতেছে, তাহা চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইতেছে ? বিশ্বের আর সব সত্য হইয়া বিরাজ করে, ওই গ্রহ নক্ষত্রের চুমকি লাগান নীল আভরণ, ওই তৃণের শ্যামলিমা, ওই পাখির কল কাকলি, ওই প্রভাত ও সন্ধ্যা, গৃহে গৃহে নর-নারীর বিচিত্র কর্ম্ম প্রয়াস, আর সেই শুধু মিথ্যা হইয়া যায় ?

যে উপলব্ধির ভিতর দিয়া কবি তাঁহার এই জিজ্ঞাসা ক্ষুব্ধ অন্তরকে শান্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সেই উপলব্ধির পরিচয়ও কবি দান করিয়াছিলেন।

মৃত্যুতে দেহ-রূপের হয়ত বিনষ্টি ঘটে ; কিন্তু প্রেমে ধ্যানের মধ্যে তাহার দিব্য-রূপ ফুটিয়া উঠে। এই দিব্য-রূপাশ্রয়ী প্রেমের নিগূঢ় প্রভাব জীবনের সর্ব্বত্র ক্রিয়া করে। এমনি করিয়া ধ্যানের মধ্যে আমরা তাহাকে ফিরিয়া লাভ করি বলিয়া পৃথিবীর মাধুর্য্য অটুট থাকে, হয়ত করুণ প্রশান্তির ভিতর দিয়া তাহা অধিকতর মধুর হইয়া ধরা দেয়।

"তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তারপরে হারায়েছি রাতে।
তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি"।

এই জাতীয় উপলব্ধির একপ্রকার বিপরীত প্রেরণার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়, ইহার ঠিক পরবর্ত্তী কবিতার মধ্যে।

প্রাণ-সমুদ্রে মুহূর্ত্তে কলহাস্য তুলিয়া সংখ্যাতীত রূপ বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার মুহূর্ত্ত পরে তাহারা সকলে একে একে রূপের দীপ নিভাইয়া অন্ধকারে কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। মনুষ্য-সমাজের মধ্যেও এই একই লীলা

প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। একদিনের ঐশ্বর্য্য প্রতাপ আর একদিন তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। আজ যাহারা সংসার জুড়িয়া আছে কাল তাহারা কোথায় হারাইয়া যায়। সুদূর অতীতকাল ধরিয়া কত নর-নারী এই মাটির ধরায় মাটির ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে. পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে, সংসার পাতিযাছে, আজ তাহারা কোথায়! সমুদ্রের ঢেউ-এর চিহ্ন সমুদ্রের ঢেউ-এ মুছিয়া যায়। প্রাণের প্রকাশের জন্য প্রাণকে পথ করিয়া দিতে হয়।

মানুষের মন তবু এই নিয়তিকে মানিয়া লইতে চায় না। তাহার প্রেম এই মৃত্যুকেও জয় করিয়া উঠিবার বারংবার ব্যর্থ চেষ্টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। মানুষ মাত্রেরই এই আকাঙ্ক্ষা। আমি একদিন এই পৃথিবীতে থাকিব না ; কিন্তু আমার এমন প্রেম, যে প্রেম অন্তহীন মাধুর্য্যের লোক উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, যাহা আমার নিকট বিশ্বের সকল সত্তার চেয়েও সত্য, তাহার কোন চিহ্নই এই পৃথিবীতে থাকিবে না? মানুষ তাই তাহার বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহার এই প্রেমকে বিশ্বের কাছে প্রচার করিতে বসে।

শাজাহান তাঁহার প্রেমকে তাজমহলের ভিতর দিয়া অমনি বিশ্ববাসীর কাছে অপরূপ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার প্রেমকে তিনি অমনি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু আনন্ত্যের দিক হইতে জীবনকে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন জীবনের আর এক স্বরূপ ফুটিয়া উঠে।

আমাদের জীবন তো এই জগতে একমাত্র এই রূপেই শেষ হইয়া যায় না। আমাদের জীবন লোক হইতে লোকান্তরে অনন্ত বিস্তৃত। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া বারংবার রূপ লাভ করিয়া মানবাত্মা লোক হইতে লোকান্তরে তাহার অনন্ত-যাত্রা পথ পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে। সেই চলার শেষ নাই।

সেখানে এক জীবনের সঞ্চয়, এক হাটের বোঝা তাহাকে অন্য জীবনে অন্যহাটে শূন্য করিয়া দিতে হইতেছে। জীবনে আবার নূতন সঞ্চয় ভরিয়া উঠিতেছে। এই পাওয়া ও হারানোর লালারও শেষ নাই।

এই জীবনে যে প্রেম শাজাহানকে অপার্থিব আনন্দ দান করিয়াছিল তাহারই মূর্ত্ত্য প্রকাশ এই তাজমহল সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা শাজাহানের অনন্ত জীবন-বিকাশের একটি ক্ষণ-পর্য্যায়ের পরিচয় বহন করিযা আছে মাত্র।

মানুষ তাহার কীর্ত্তির চেয়ে বৃহৎ। এমনি করিয়া জন্মে জন্মে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ, ভিন্ন ভিন্ন লোকান্তর প্রাপ্তির ভিতর দিয়া মানুষ বারংবার তাহার কীর্ত্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া ফেলিয়া দিতে চলিয়াছে। এমনি করিয়া তাহার আত্মা ক্রমাগত ফলবান হইয়া উঠিতেছে।

বলাকার মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে যে গুলির মধ্যে কবির ব্যক্তি-জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া নানা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা রূপ লাভ করিয়াছে।

নিখিল বিশ্বের চলমান ছবি, ব্যক্তি-সত্তার লোক-লোকান্তর ব্যাপ্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া কবি ব্যক্তি জীবনের আসক্তি জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনের এই কান্না কেন, না আমার সুদীর্ঘ জীবনের সঞ্চয়, পরিচিত এই ভুবন, এই সব প্রিয়জন মৃত্যুতে সব পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়।

জীবন যদি লোক লোকান্তর ব্যাপ্ত অনন্ত প্রসারিত হয়, তবে এক জন্মের ত্যাগের ভিতর দিয়া আর জন্মের প্রাপ্তির আনন্দকে লাভ করিতে হয়। তাহা না হইলে আসক্তি একান্ত হইয়া জীবনকে পরিণামে কেবল বিকৃত করে মাত্র।

লোকান্তর যদি নাও থাকে তবে নূতন সৃষ্টির জন্য পুরাতন সৃষ্টিকে বারংবার ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তো আমরা এই চির পুরাতন অথচ চির নবীন লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পাই। বিশ্ব প্রকৃতি জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ঝরাইয়া দিয়া নূতনকে বরণ করিয়া লইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এই নিগূঢ় সত্যকে আপনার জীবনে রূপলাভ করিতে দেখিয়াছেন। পরিণত বয়সে আসক্তির প্রবলতা বাড়ে, কারণ সৃষ্টির প্রেরণা ক্ষীণ হইয়া আসে। কবি এই সত্যাশ্রয়ী হইয়া আসক্তির বিকৃতিকে জয় করিয়া উঠিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। জীবনের প্রতিক্ষণে যাহা সত্য, মৃত্যুতে তাহা মিথ্যা হইতে পারে না।

"যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।"

মর্ত্ত্যে মানব সত্তার এই যে দুর্লভ প্রকাশ, তাহার স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, অধীরতা ও উৎকণ্ঠা, সৌন্দর্য্য বিহ্বলতা, বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের এই যে নিবিড় একাত্মতা ইহাকে কোন তত্ত্ব-সাধনার দিক হইতে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপলব্ধির গভীরতা ও প্রসারতার ভিতর দিয়া ইহা আপনার সত্য মূল্য নিঃসংশয়ে আদায় করিয়া লয়।

মৃত্যুতে এই জীবনের অবশেষ কোন স্বরূপে কিছুমাত্র থাকে না। (মৃত্যুতে জীবনের পরিণাম সম্পর্কে বিচিত্র দার্শনিক চিন্তা আছে। এই জাতীয় কোন চিন্তা কোন উপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।) মৃত্যুতে জীবনের নিঃশেষ অবসানকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা যত নির্ম্মম হোক এবং তাহা অন্তরে যত বড় বিক্ষোভ সৃষ্টি করুক।

"এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।"

কিন্তু এই উভয়ের মাঝখানে কোন একটি মিল কোন স্বরূপে যে আছেই এমন একটি অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ও কবির অন্তরে চিরকাল ছিল।

"এ দুয়ের মাঝে তবু কোনো খানে আছে কোনো মিল-"

এই দুয়ের মিলনের রহস্যভেদ মানুষ হয়ত কখনই করিতে পারিবে না, কিন্তু এই যোগের সত্যতা না থাকিলে এই প্রয়াসের ভাবনাও আদৌ মানব চিত্তে যে জাগিত না তাহাও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মানুষের মধ্যে যে একটি স্থায়ী সত্তা আছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মনে কখন কোন অবস্থায় সংশয় জাগে নাই। তাঁহাকে তিনি তাঁহার জীবন-তরীর হালের মাঝি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ঠিক স্বরূপটি তিনি জানেন না। তবে তিনি যে তাঁহার জীবনকে সকল জন্ম সকল মৃত্যুর ভিতর দিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন এই গভীর বিশ্বাস বোধ তাঁহার ছিল। এই জীবনের বিচিত্র বাসনা বন্ধনকে যদি স্বেচ্ছায় আমরা ছিন্ন না করি তবে মৃত্যু আসিয়া অনিবার্য্যরূপে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়।

এই বিশ্বাস বুকে লইয়া সকল গভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া কবি জীবন লীলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।

"এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু-দিনের নদী হব পার গো।
তারপরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তারপরে তার খবর কী যে ধারিনে তার ধার গো,
তারপরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।"

কিন্তু এত করিয়াও কবি বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। মৃত্যুতে মানুষ কোন্ পরিণাম লাভ করে? জীব-সত্তার যদি অবশেষ থাকে তবে তাহা কোন্ স্বরূপে? মৃত্যুর পর মানুষ যে-লোক লাভ করে তাহা কি এই জগতের স্বরূপ লইয়া প্রতিভাত হয়? এই জগতেরই মত এমনি করিয়াই কি সেখানে ধীরে ধীরে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে? অসীমের সহিত তাঁহার এই যে লীলা, তাহা ওই লোকে কি ভিন্ন কোন স্বরূপতা লাভ করে? অজ্ঞাত জগৎ, অজ্ঞাত পরিণাম সম্পর্কে বিচিত্র জিজ্ঞাসা কবিকে আবার বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

"কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ।"

মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিবর্তন ঘটে? এই জীবনেই কি আমরা সহস্র পরিবর্ত্তন লাভ করিতেছি না। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে পরিবর্ত্তনের এমনি কত-না পর্য্যায় আমরা পার হইয়া আসি। মৃত্যুতে আমরা এমনি আর একটি পরিবর্ত্তন লাভ করি মাত্র। মৃত্যু যদি জীবনের একটি পরিণামই হয়, শুধু কেবল একটি ভিন্ন লোক লাভ, তবে পশ্চাতে যাহা পড়িয়া থাকে, যাহাকে ফেলিয়া যাইতে হয় তাহার মূল্য কি?

মৃত্যুকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুতির ভিতর দিয়া কবির অন্তরে এই জিজ্ঞাসাও জাগিয়াছে।

"এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ;
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,

বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু"

জীবনের এই যখন নির্যাত তখন কিছু অশ্রুপাত করা ছাড়া আর কি উপায় থাকিতে পারে। এই অশ্রুপাত তো এই জীবনেই শুধু সত্য নয়। এমনি অশ্রুপাত করিতে করিতে আমরা অতীতে কত জীবন পরিক্রমা করিযাছি, ভবিষ্যতে অনন্ত জীবন পরিক্রমার ভিতর দিয়া এমনি করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে আমাদের যাইতে হইবে।

"সামনে সেও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির নিরুদ্দেশ।"

এই দেহ-বীণাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার কত বিচিত্র সুর বাজাইয়াছে, অন্তরে কত বোধের সঞ্চার করিয়াছে, কত অপূর্ব্ব অনুভূতি। মৃত্যুতে এই দেহ-বীণাকে এইখানে ফেলিয়া যাইতে হয়, কিন্তু এমনি ভাবে অন্তরের মধ্যে যে একটি স্থায়ী সত্তা গড়িয়া উঠে তাহার বিনাশ ঘটে না।

"এত কালের সে মোর বীণাখানি
এই খানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরি
নেব যে তার গান।"

মৃত্যুতে যে লোক যে-পরিণাম তিনি লাভ করুন না কেন, যিনি তাঁহার জীবন-সত্তাকে এমনিভাবে নানা জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবীকে পরিচিত করাইয়াছেন, ইহাকে ভালোবাসাইয়াছেন-যাঁহার কত বারবার চকিত স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুর পর তাঁহাকেই তিনি ফিরিয়া লাভ করিবেন, অপরিচিত জগৎকে তিনিই মাতৃ ক্রোড়ের মত পরিচিত করাইয়া দিবেন।

"সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।"

সীমা ও অসীমের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করিতে গিয়া বিচিত্র ধর্ম্ম ও দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও নানা চিন্তা পদ্ধতি, নানা উপলব্ধি আশ্রয় করিয়া এই উভয়ের যোগের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা ইহার নানা পরিচয় লাভ করিয়াছি, পরেও ইহার নানা পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

বলাকার মধ্যে যে তত্ত্ব-দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেন তাহাকে আমরা লীলা তত্ত্ব বলিতে পারি। একদিকে অসীম, আর একদিকে সীমা। উভয়ের শাশ্বত মূল্য তিনি স্বীকার করেন। ব্যক্তি-সত্তা বারংবার জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া অসীমকেই নানা রূপে লাভ করে। ইহাই লীলা। ইহা একই রূপের, একই রসের পুনরাবৃত্তি নয়। ইহার ভিতর দিয়া জীব ক্রমিক উন্নততর পরিণাম, সেই সঙ্গে আনন্দের ক্রমিক গভীরতর আস্বাদ লাভ করিয়া চলিয়াছে।

এই যে নির্দ্দিষ্ট একটি দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি এই পর্য্যন্ত নানাভাবে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিয়াছেন, বলাকার মধ্যেই এমন দুই একটি কবিতা লাভ করা যায়, যে-ক্ষেত্রে কবি-প্রাণের আর্ত্তিতে এই সকল দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সীমা ও অসীমের যোগের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারা যায় না। মানুষের জ্ঞান মানুষের উপলব্ধি এখানে আসিয়া শেষ সীমা রেখা টানিয়া দিয়াছে।

দার্শনিক চিন্তার দুটি ধারা আছে। একটির মতে চিন্তা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দেশ-কাল এবং নির্দ্দিষ্ট সমাজ-রূপের সহিত অঙ্গাঙ্গী-ভাবে বিজড়িত, তাহারই ফল। এই জাতীয় অভিমত যাহারা পোষণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্ট কোন একটি চিন্তার সম্যক পরিচয় দান করিতে সমসাময়িক সমাজ-রূপ, উপকরণ প্রভৃতির পরিচয় দানকে অনিবার্য্য করিয়া তুলেন। আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাহারা চিন্তাকে দেশ-কাল, সমাজ-নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ করেন। এই দুই বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তা ধারার বিস্তারিত পরিচয় দান এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ভাবে যে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, তাহাতে এই উভয়েরই আংশিক স্বীকৃতি আছে। পূর্ণতার একটি ধ্যান দেশ-কালের ভিতর দিয়া ধীরে চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে। এই উপলব্ধির ফলে দেশ-কাল নিরপেক্ষ অধ্যাত্ম সত্তার স্বীকৃতি যেমন আছে, তেমনি দেশ-কালের ভিতর দিয়া তাঁহারই ধ্যান ধীরে চরিতার্থতা লাভ করিতেছে বলিয়া

নির্দ্দিষ্ট সমাজ-রূপ ও উপকরণেরও অনিবার্য্য স্বীকৃতি আছে। এইরূপে জড় ও অধ্যাত্মের দ্বন্দ্বকে তিনি জয় করিয়া উঠিয়াছেন।

এক্ষেত্রে ইহা উল্লেখের কারণ এই যে বলাকার মধ্যে এমন দুই একটি কবিতা আছে, যে ক্ষেত্রে চিন্তা বা সৃষ্টি-প্রেরণা-সম্পূর্ণ ভাবাত্মক হইয়া দেশ-কালের অনুপ্রেরণাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। চিরন্তন ভাবনা-লোক, আদর্শ ও কল্পনার জগতের সহিত বস্তুজগতের, তাহার রূপান্তরের যেন কোন মিল নাই। তাঁহার সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,

"মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।"

মূল নাই, অর্থাৎ দেশ-কালের নির্দ্দিষ্ট কোন সমাজ-রূপের অনুপ্রেরণা হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। তাঁহার সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ ভাবাত্মক। সম্পূর্ণ ভাবাত্মক বা নির্ব্বিশেষ বলিয়া সকল কালের সকল দেশের নর-নারীর হৃদয়-লোকে তাহা স্থান লাভ করিতে পারিবে।

সার্থক সৃষ্টির সহিত অনিবার্য্যরূপে দেশ-কালের পরিচয় বিজড়িত হইয়া থাকে কি-না, নির্ব্বিশেষ রস-পরিণামের ক্ষেত্রেও আদিতে একটি বিশেষ আশ্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না, ইত্যাদি বিচার এক্ষেত্রে তুলিয়া লাভ নাই। কবির উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিলেই আমাদের চলিবে। তাঁহার এই উপলব্ধির পরিচয় অন্যত্রও লাভ করিতে পারা যায়।

একটি চিরন্তন বস্তু জগৎ। আর একটি চিরন্তন ভাব-লোক।—সকল দেশের সকল অতীত ভবিষ্যতের ভাবনার সামগ্রিক প্রকাশ। এই ভাব-লোকের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিবার একটি ব্যাকুলতা আছে। এই আকাঙ্ক্ষার বশে তাহারা বস্তু বা জড় জগৎকে আশ্রয় করিতে চায়। মানুষের সমাজ, গ্রাম-নগর রচনার মধ্যে সেই অমূর্ত্ত্য ভাবনার মূর্ত্ত্য রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেবল জড়-রূপের মধ্যেই নয়, ওই ভাব-ভাবনার প্রকাশ ঘটে কবির কাব্যে, সকল প্রকার সৃষ্টি-কর্ম্মের মধ্যে। কবির অন্তরে যে সকল ভাব-ভাবনা তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না, সেই সকল ভাব-ভাবনা বিশ্বের চিরন্তন ভাবনা-স্রোতের

সহিত মিলিত হইয়া আর কোন ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

"অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি,
গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্ম্যচূড়ে,
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।"

একদিকে চিরন্তন ভাব-লোক, অন্যদিকে চিরন্তন বস্তু জগৎ। উভয়ের মধ্যে আসা ও যাওয়ার, ভাঙ্গা ও গড়ার চিরন্তন লীলা। এইরূপে জড় ও অধ্যাত্ম জগৎ দুটি বিরুদ্ধ তত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে। অভিব্যক্তি-তত্ত্ব-সূত্রের সহিত গ্রথিত করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে এই দ্বন্দ্বকে যে ভাবে জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ্য হইয়া ছিলেন, তাহা এক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সৃষ্টি প্রেরণাকে কবি এই জীবন-পর্য্যায়ে কতদূর ভাবাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন তাহার আরও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

পার্থিব জীবনের সমস্ত কিছুই, তাহার মূল্য যেমনই হোক-না-কেন, একদিন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। বাণী বা ভাষা-বন্ধনে সৃষ্ট কবির কাব্যও অনন্ত কাল প্রবাহে একদিন লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, যাহা কিছু রূপ-লব্ধ তাহা কালে হারাইয়া যায়।

"নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি,
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।"

কবির চেতনায়, তাঁহার সৌন্দর্য্য-কল্পনা ও ধ্যানের ভিতর দিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে দিব্য-চেতনার আভাস নামিয়াছে, সেই অলৌকিক আনন্দ প্রেরণায় কবি কাব্য রচনা করিযাছেন।

"আমাব যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয় মিলায় পলকে।"

এই দিব্য-প্রেরণা তাঁহার জীবনে সত্য, কিন্তু তাহাকে তিনি স্থায়ীরূপে লাভ

করিতে পারেন নাই। এই অনুপ্রেরণা তাঁহার জীবনে অনিয়ন্ত্রিত। মর্ত্ত্য-চেতনায় তাহা উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। তাহা বাক্য ও মনের অগোচর।

"সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত নাহি যায় বাণী।"

দিব্য-চেতনা যদি সকল মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে মানুষ আপনার ভাবে আপনি নানা পথে চিরকাল ধরিয়া লাভ করিতে থাকিবে। কোন ব্যক্তি তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন পথ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে না।

"বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।"

দিব্য-চেতনাকে কাহারও 'নাম' বা সীমা-রূপের দ্বারা চিহ্নিত করা যাইবে না, তাহা চিরন্তন কালের সর্ব্ব মানব সাধারণ শাশ্বত সত্তা।

"সেই আলো অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।"

কবিতাটির মধ্যে 'আমার পুষ্পবনে' এবং 'বীথিকায় মোর' শব্দ কয়েকটি লক্ষণীয়। কবির কাব্যে যে রূপের পরিচয় আছে তাহা বিশেষ, কিন্তু এই বিশেষ সৌন্দর্য্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া তিনি যে দিব্য-চেতনার স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিশেষ। ওই বিশেষ রূপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু ওই নির্ব্বিশেষ সত্তার বিনাশ নাই।

বিশ্বের দুটি স্বরূপের কথা কবি নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। ইহা মানুষেরই দুটি সত্তা। মানুষ আপনার স্বরূপকেই বিশ্বে প্রতিফলিত দেখে। একটি সত্তায় সে বহির্মুখী, বিশ্বের রূপ হইতে রূপে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে বিহার করিয়া চলে। অন্তহীন রূপ-পিপাসা বক্ষে লইয়া তাহার দিন-রজনী স্বপ্ন বিভোর হইয়া কাটিযা যায়। তাহার নিঃসংশয় নিশ্চিন্ত কোন পরিণাম নাই। কেবল মাধুর্য্যের দোলায় দোল খাইতে খাইতে কোন্ অতলতার মধ্যে তলাইয়া যাওয়া। সে নারীর অপরূপ রূপ যেন বিশ্বময় কেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে তাই তাহারই

আভাস লাভ করিতে পারা যায়। বিশ্বের সকল রূপের ভিতর দিয়া তাহারই গোপন আহ্বান নিয়ত ব্যক্ত হইতেছে। কখন মিনতি বিজড়িত অশ্রু সজল, কখন কৌতুকময় নিষ্ঠুর, কখন একান্ত নিকটের পরমুহূর্ত্তেই আবার কোন্ দূর লোকের। সে ক্ষণে ক্ষণে নূতন, একান্ত মুহূর্ত্তের জন্য স্পর্শ করিয়া চকিত কলহাস্য তুলিয়া কোন্ শূন্যতার মধ্যে হারাইয়া যায়, সুদূর নীলিমা ব্যাপ্ত করিয়া তাহার নূপুর সিঞ্জনের অতিক্ষীণ অনুরণন যেন তখনও ধ্বনিত হইতে থাকে। তাহাকে পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিবার বাসনা অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। সেই জন্যই তাহাকে ঘিরিয়া এত বিস্ময় এত রহস্য...অপরিতৃপ্ত বক্ষের হাহাকার ও কান্নার উদ্বেলতা।

আর একটি সত্তায় পুরুষ অন্তর্মুখী বিশ্বের কল্যাণের জন্য যেখানে সে তপস্যা নিরত। যেখানে পরম স্থৈর্য্য, অচঞ্চল মাধুর্য্য। এই অচঞ্চলতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের হৃদয়-লোকে অনন্তের বিচিত্র আস্বাদ আসিয়া পৌঁছায়। ওই অবিক্ষুব্ধ ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া তাহার চেতনা মর্ত্ত্যের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়।

এই নারী পুরুষের সমগ্র বহির্মুখী চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিয়া তাহাকে একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যাশ্রয়ী করিয়া ধ্যান তন্ময় করিয়া তুলে। এখানে আছে সেবা, আত্মত্যাগ, উৎসুক প্রতীক্ষা, সেই দুঃখ যাহার বক্ষের মধ্যে অমৃত লুকান থাকে।

বলাকার ২৩ সংখ্যক কবিতার মধ্যে কবি নারীর এই যে দুটি রূপের বন্দনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ করিয়া চিত্রার মধ্যে লাভ করিয়াছি। সেক্ষেত্রে এই দুটি সত্তা স্পষ্ট পৃথক বলিয়া বোধ হইলেও এই দুটি কোন এক চেতনা-বৃন্তে বিধৃত কি-না, তাহার জন্য কবির পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। এই দুটি সত্তাকে একটি নারীর মধ্যে একত্রে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। কারণ পুরুষের চেতনায় এই দুই আপাত বিরুদ্ধ প্রেরণাও ওতপ্রোত হইয়া আছে। কোন একটিতে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পুরুষের অন্তরের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে না। 'মানস সুন্দরী' কবিতার মধ্যে যে নারী-সত্তায় তিনি এই উভয় প্রেরণার আশ্চর্য্য সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আজ একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

আজ বিশ্বের প্রাণ-লীলায় কবি-প্রাণ তেমন করিয়া সাড়া দিতে পারে না।

নিখিল বিশ্বের প্রাণ-ধারা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য রূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। ব্যক্তি হৃদয়ে এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নিবিড় অনুভূতির ভিতর দিয়া ধীরে ব্যক্তির প্রাণ বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় আসিয়া মিলিত হয়।

কবি-চিত্তে সেই প্রাণের উদ্বোধন আর তেমন করিয়া ঘটে না। হৃদয়ে তাহা কেবল অতি ক্ষীণ এক প্রকার বেদনাহত শিহরণ জাগাইয়া তুলে মাত্র।

"দক্ষিণ হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল
উঠল কেবল মর্ম্মের কল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গনে।"
"যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দল বল
আমার প্রাঙ্গন তলে কলহাস্য তুলে"

সে বসন্ত আজ কবির অন্তরে আসিয়া পৌঁছায় না, তাহা কবির হৃদয়ের বহিঃ প্রান্তে স্থির নেত্র মেলিয়া বসিয়া থাকে। যে বেদনার সুরটি এক্ষেত্রে কবির চেতনায় ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ওই লীলার সহিত যুক্ত হইতে না পারিবার ফলে। এমনি করিয়া কবিকে ধীরে ধীরে বিশ্ব-লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইবে? এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় কবি চিত্ত মুক, বেদনাহত।

দূর দিগন্তে অনিমেষ দৃষ্টি মিলিয়া কবি অন্যমনা বসিয়া থাকেন। ওখানে আকাশের উদার নীলিমায় মর্ত্ত্যের শ্যামশ্রী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। স্থির অনিমেষ দৃষ্টি অকস্মাৎ অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বলাকার মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে, যাহার মূল ভাব প্রেরণাকে যৌবন বন্দনা বলা যাইতে পারে। এই যৌবন বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? যৌবন এক্ষেত্রেও প্রাণ-তত্ত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাশ্রয়ী নয়। তাহা মুগ্ধতা ও আবেশের লীলা নয়।

যুগে যুগে যে শক্তি মহৎ আদর্শ ও কল্পনাকে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, আত্মত্যাগ ও সর্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে, দুঃসহ দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে হাসিমুখে বরণ করিয়াছে, সেই বিশিষ্ট অনুপ্রেরণাকেই কবি চির যৌবন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার জীবনে যদি এই জাতীয় ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় কিছু থাকে, যদি ইহারই জন্য তাঁহাকে ধ্যানাসন হইতে তিনি বহির্লোকে আকর্ষণ করিয়া আনেন, তবে কবির জীবনে এই অনুপ্রেরণা যেন সত্য হয় ।

"যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।"

চির নূতনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য চির পুরাতনের সহিত যে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়, প্রাণের এই উভয়মুখীন প্রেরণাই যৌবন। যে ব্যক্তি আসক্তির সকল সঞ্চয়ভারকে ভোগ বাসনাকে নিত্য জয় করিয়া উঠে তাহাই যৌবন। সত্য লাভের জন্য যে প্রেরণা মানুষকে সাধন নিষ্ঠ করে, মৃত্যুকে মন্থন করিয়া অমৃত আহরণ করে, সেই প্রেরণাই যৌবন। যে প্রেরণা পুরাতন দেহ-প্রাণের আধারকে জীর্ণ বসনের মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহাধার লাভ করিতে চায়, এবং এইরূপে মৃত্যুকে তাহারই সহায়ক বলিয়া বোধ করে তাহাই যৌবন। জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ফরিয়া ফিরিয়া মানুষ যে প্রাণকে লাভ করে, সেই প্রাণ-তত্ত্বই যৌবন-তত্ত্ব।

"চির যুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

কিংবা

"স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিন কার
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারবার
জীবনের এপার ওপার।"

পূরবী

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সোধনার ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে একটি আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই পরিবর্ত্তন ধারা লক্ষ্য করা যায় 'গীতাঞ্জলি'-পর্য্যায়ের পর হইতে। সে পরিবর্ত্তন হইল দিব্য-সত্তায়, অসীম বা অরূপে স্থিতি লাভ না করিয়া সীমা বা রূপের জগৎকে পরিণামে আশ্রয় করা। বিশ্বের এই রূপের জগৎ নর-নারীর এই প্রেমের জগৎকে কবি ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

মর্ত্ত্যের এই মোহ মুগ্ধ প্রেম, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদ করা, তাহার পর মৃত্যুতে নিঃশেষে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাওয়া।

"এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না হাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।" (পূরবী)

সকল রূপ বা সীমার অতীত সত্তা লাভ করিয়াও কবির অন্তরে অতৃপ্তি দূর হয় নাই। এই রূপের জগৎটিকে ফিরিয়া লাভ করিয়া যেন একটি গভীর পরিতৃপ্তি বোধে তাঁহার হৃদয়-লোক ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ইতিপূর্ব্বের অলৌকিক অতৃপ্তি যে বিশ্বের সহিত বিচ্ছিন্নতা বোধ জাত তাহা তিনি বিশ্বকে ফিরিয়া লাভ করিয়া নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন।

"তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে।" (মাটির ডাক)
"তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাইনি তাহা বুঝে—" (মাটির ডাক)

বিশ্বকে লাভ করিয়া কবির অন্তর আজ প্রাপ্তির আনন্দ সুধায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

"আজকে খবর পেলাম খাঁটি
মা আমার এই শ্যামল মাটি,—" (মাটির ডাক)

কেবল তাহাই নয়। সকল রূপের অতীত সত্তা লাভের জন্য তাঁহার ইতিপূর্ব্বের সকল সাধনাকে তিনি ব্যর্থতা, জীবনের অপচয় বলিয়া উল্লেখ করিতেও লেশমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ইহার জন্য কবির কী অপরিসীম গ্লানিবোধ!

দিব্য-চেতনা লাভ যদি সাধনার একমাত্র শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হয় এবং সেই সঙ্গে সীমা বা রূপের সকল বোধ যদি পরিণামে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া বোধ হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় আশ্রয় পরিবর্ত্তনকে স্বাভাবিক ভাবে সাধনচ্যুতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মর্ত্ত্যের আসক্তি প্রবল হইয়া কবিকে সাধনার পূর্ণ পরিণাম লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

প্রাচীন অধ্যাত্ম-সাধনা প্রায় সর্ব্বত্র কোন-না-কোন রূপে জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়া এমন একটি সত্তাকে পরিণামে লাভ করিতে চাহিয়াছে, যাহা সকল সীমা বা রূপের অতীত। (প্রাচ্য ঔপনিষদিক ব্রহ্ম এবং পাশ্চাত্ত্যে গ্রীক Idea of the Good) অধ্যাত্ম সাধনার মূল এই বোধের মধ্যে আমরা লালিত। এই বোধের জন্যই রবীন্দ্রনাথের বোধের এই পরিবর্ত্তনকে ওই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে সহজেই প্রলুব্ধ হই। কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিশিষ্ট রূপটির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে না।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার লক্ষ্য কি, তাহার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। তাহাতে একপ্রান্তে অরূপ বা অসীম, অন্যপ্রান্তে সীমা বা রূপ, একপ্রান্তে দিব্য-চেতনা অন্য প্রান্তে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন; একপ্রান্তে ঈশ্বরীয় প্রেম, অন্যপ্রান্তে জাগতিক স্নেহ-প্রেম-প্রীতির পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে। তাহাতে কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া অন্যটিকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা নাই।

রবীন্দ্রনাথ যদি জাগতিক চেতনা, মর্ত্ত্যের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে আজ একান্তরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহার জন্য দায়ী তাঁহার সাধনার অসামর্থ্য নয়। তবে কোন একটিকে যদি আদৌ একমাত্র রূপে আশ্রয় করিতে হয় তবে তাহার জন্য তিনি দিব্য-চেতনাকে পরিহার করিয়া মর্ত্ত্য-চেতনাকে আশ্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনার ও অধ্যাত্মবোধের কী আশ্চর্য্য বিপরীত ও বিরুদ্ধ প্রেরণা। এই বৈপরীত্য বোধের জন্য Plato-র রচনার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার এই জাতীয় প্রেরণার সহিত আমরা অত্যন্ত পরিচিত। তাহা আমাদের রক্তের সহিত একাত্ম হইয়া আছে।

"In this present life, I reckon that we make the nearest approach to knowledge when we have the least possible intercourse or communion with the body, and are not contaminated with the bodily nature, but keep ourselves pure until the hour when God himself is pleased to release us."

"when the soul uses the body as an instrument of perception, that is to say, when it uses the sense of sight or hearing or some other sense, she is dragged by the body into the region of the changeable, and wanders and is confused ; the world spins round her, and she is like a drunkard, when she touches change. But when she contemplates in herself and by herself, then she passes into the other world, the region of purity, and eternity, and immortality, and unchangeableness, which are her kindred, and with them she ever lives, when she is by herself and is not let or hindered ; then she ceases from her erring ways, being in communion with the unchanging. And this state of the soul is called wisdom."

"Evils, * * can never pass away ; for there must always remain something which is antagonistic to good. They have no place among the Gods in heaven, and so of necessity they hover around the mortal nature and this earthly sphere."

রবীন্দ্রনাথ চেতনার আদি-অন্ত প্রসারের সকল পর্য্যায়ে বিচরণ করিয়াছেন, একবার চূড়ান্ত অসীম তত্ত্বে, পুনরায় ফিরিয়া একান্ত মুগ্ধতার লোকে। ইহার ভিতর দিয়া তিনি চেতনার ক্রম নিম্ন বা ক্রম ঊর্দ্ধ প্রসারের প্রত্যেকটি গ্রন্থি মোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাধনার যে লক্ষ্য তাহাতে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত চেতনার নির্ব্বাধ চলাচলতা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া ইহাই করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি তাঁহার এই সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন? তবে এক্ষেত্রেও যে একটি দিব্য অভিপ্রায় তাঁহার জীবনে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁহারই নিগূঢ় কোন অভিপ্রায়ের ফলে নিম্নাভিমুখী প্রেরণা তাঁহাকে যে ওই ঊর্দ্ধ পরিণাম লোক হইতে অনিবার্য্য বেগে মর্ত্ত্যে আকর্ষণ করিয়া আনে তাহার পরিচয় তিনি স্বয়ং দান করিয়াছেন। কতকটা বিহ্বল হইয়া কবি আপনার জীবনে এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন।

কবি এই জীবন পর্য্যায়ে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহাকে বিশ্ব-সত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষা বলা যাইতে পারে। বিশ্ব-সত্তা লাভ বলিতে চেতনার সেই

পরিণাম বুঝায় যে পরিণামে মানবীয় চেতনা বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট ও লীলায়িত হইতে দেখে।

পরিব্যাপ্ত দেশ-কালের মধ্যে যে রূপ-শূন্য-শক্তি-প্রবাহের স্পন্দনে মুহূর্ত্তে সংখ্যাতীত রূপ রঙ্গ রেখা অজস্র ধারায় ফুটিয়া উঠিতেছে; অন্তহীন গ্রহ নক্ষত্র-লোক হইতে মর্ত্ত্যের ধূলিকণা পর্য্যন্ত যাহার বক্ষে কেবল বুদ্বুদের মত জাগিয়া ফাটিয়া যাইতেছে, সেই আদি প্রাণ উৎসের সহিত কবি আপনার চেতনাকে যুক্ত করিতে চাহিতেছেন। তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আদি প্রাণের অফুরন্ত সৃষ্টি রূপ লইয়া প্রকাশ লাভ করিবে। ইহার ফল লাভকে লীলা ছাড়া আর কী নামে অভিহিত করা যাইবে।

কোন সুদূর অতীত কাল হইতে মহাকাল একহাতে রঙ্গের পাত্র, অন্য হাতে তুলিকা লইয়া শূন্য-পটে মুহূর্ত্তে কত গননাতীত অপরূপ রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আবার নির্ম্মম ভাবে মুছিয়া দিতেছেন, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তেমনি নিরাসক্ত সৃষ্টির প্রবাহ ঝরণার মত সমুৎসারিত হইয়া একদিন হারাইয়া যাইবে। জীবনকে এই সৃষ্টি লীলার দিক হইতে তিনি দেখিতে চান। তিনি সে কথা বলিয়াছেন,—

"সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,—" (মুক্তি)

সৃষ্টির অবিষ্ট মুহূর্ত্তে, সুরের পথ বাহিয়া তাঁহার চেতনা মাঝে মাঝে সেই সত্তার চকিত স্পর্শ লাভ করিয়াছে, চেতনার সেই সীমাহীন ব্যাপ্তির উপলব্ধি মুহূর্ত্তে তাঁহার জন্ম জন্মান্তর যেন ধন্য হইয়াছে।

"মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।" (মুক্তি)

•বিশ্ব-সত্তার সহিত কবি আপন ব্যক্তি-সত্তাকে স্থায়ীরূপে যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। প্রাণের যে রহস্যে শূন্যে অমন অজস্র রূপের ফুল ফুটে সেই রহস্যকে তাহা হইলে তিনি ভেদ করিতে পারিবেন। আপনার সৃষ্টির মধ্যে সেই রহস্যের প্রকাশ ঘটিবে।

"তাহলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।" (মুক্তি)

বিশ্বের মর্ম্মমূলে সৃষ্টি-প্রেরণার যে আদি রহস্য, আপনার সৃষ্টির মধ্যে যখন সেই রহস্যের প্রকাশ ঘটিবে। তখনই তিনি পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ লাভ করিবেন।

"যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম তীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে।" (মুক্তি)

জড় ও চেতনার দ্বন্দ্ব সেই পরিণামে সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়। দেশ-কাল পূর্ণ করিয়া এক রূপ-হারা শক্তির প্রবাহ পরস্পরের সঙ্ঘাতে, আকর্ষণ বিকর্ষণে অন্তহীন রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছে।

"সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন।—" (মুক্তি)

বিশ্ব-সত্তা লাভ বলিতে আমরা সেই অবস্থাটিকে বুঝি যে অবস্থায় বিশ্বের এই ছন্দের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের ছন্দের পূর্ণ মিলন ঘটে। বক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-সত্তার অভিপ্রায় যখন সম্পূর্ণ বাধা মুক্ত হইযা প্রকাশ পায়। ব্যক্তির সকল অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা বিশ্বের অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার এক বিচিত্র প্রকাশ বলিয়া ব্যক্তির আসক্তি তখন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়। কবির এই আকাঙ্ক্ষা পূরবীর মধ্যে বারংবার নানাভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

"নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার।" (অন্ধকার)

সমগ্র সৃষ্টির মর্ম্মমূলে এক গূঢ় গোপন প্রেরণা রহিয়াছে। পূর্ণতাকে লাভ করিবার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশই তো এই বিচিত্র রূপ। এ যেন নিত্য দিন ধরিয়া একই পত্রের বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া লেখা। প্রিয়তমের নিকট লেখা বিরহের নীল পত্র। সে তাহার বেদনাকে নিঃশেষ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাই সৃষ্ট রূপের মধ্যে বাণীর মধ্যে এমন করুণ কোমলতা, একটি বিষাদের ঘের।

ব্যক্তি সত্তার মর্ম্মমূলেও এই একই প্রেরণা রহিয়াছে। তাঁহার সকল সৃষ্টির পশ্চাতে এই একই প্রেরণা সক্রিয়। যে সত্তা বিশ্ব-সত্তাকে যত গভীর করিয়া

লাভ করে, বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগ যত নিবিড় হয়, বিশ্বের এই প্রকাশের রহস্য তাহার নিকট তত বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহার প্রকাশ তত অফুরন্ত এবং তত অনির্ব্বচনীয়তা লাভ করে।

কবির বাণীর মধ্যে যেন বিরহিনী ধরিত্রীর 'চকিত ইঙ্গিত' তাঁহার 'বসন প্রান্তের ভঙ্গীখানি' চিহ্নিত হইয়া যায়। তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে যেন তাঁহার 'ছল ছল অশ্রুর আভাস' ফুটিয়া উঠে। তাঁহার প্রাণের স্পন্দন, যেন তাঁহার কাব্যের ছন্দকে আশ্রয় করে। 'উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার বক্ষতলে নিত্য যে ক্রন্দন' জাগে, সেই করুণ ক্রন্দন ধ্বনি যেন তাঁহার কাব্যের ছন্দের মধ্যে প্রকাশ পায়। 'মিলনের অমৃতে'র জন্য বিশ্বের যে নিত্য ক্ষুধা সেই ক্ষুধাকে যেন তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। অর্থাৎ বিশ্বের প্রকাশের রহস্য, তাহার ছন্দ, ধ্বনি, ভঙ্গী, তাহার রূপ-রঙ্গ-রেখা, ইঙ্গিত সমস্ত কিছু যেন তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে।

মুক্তি-লোক বলিতে তিনি এই বিশ্ব-চিত্ত-লোকের কথাই বুঝাইয়াছেন—

"—সেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দ হীন সঙ্গীত ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।" (সতেন্দ্রনাথ দত্ত)

ভারতীয় মোক্ষ সাধনা এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতার সাধনার মধ্যে স্বরূপত পার্থক্য আছে। গীতাঞ্জলি আলোচনা পর্য্যায়ে তাহারই কিছু পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছি। এই পার্থক্যকে আর একটি দিক হইতে বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।

দেশ-কালের উর্দ্ধতর যে পরিণাম তাহাতে সৃষ্টি প্রেরণা নাই। দেশ-কালের অন্তর্গত সৃষ্টি-লোক এবং দেশ-কালের উর্দ্ধতর চেতনার মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য আছে। আবার দেশ-কালের উর্দ্ধতর সত্তাই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারা দেশ-কালের সকল বোধকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই উভয় সত্তার স্বরূপতঃ পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। যে রহস্যের ভিতর দিয়া (যাহাকে বলা হইয়াছে, উত্তমম্ রহস্যম্) দেশ-কালের অতীত সত্তা, অসীম বা অরূপ, দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপের ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই রহস্যকে তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী বা স্রষ্টা বলিয়াই যে এই মহত্তম সৃষ্টির রহস্য ভেদ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা নহে; ওই রহস্যভেদ করিতে পারিলে মনুষ্য সমাজে ও মনুষ্য-জীবনে সৃষ্টির এক অপার্থিব দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে। এই স্থির অধ্যাত্ম বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এই জীবনও জগৎ দিব্য-জীবন ও জগতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। মানুষের সকল ক্রিয়ার মধ্যে অনায়াস ঐশী লীলার প্রকাশ পাইবে। প্রত্যেকটি নর নারী ঈশ্বরের এক সুসম্পূর্ণ সঙ্গীত রূপতা লাভ করিবে।

অন্তহীন অনায়াস সৃষ্টি-প্রেরণাই কবির মুক্তি-লোক বলিয়া তাঁহার নিকট আজ তাই প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ রূপে প্রাণের অনুভূতি কবিকে পরিণামে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দিবে। বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির বিচিত্র সৃষ্টি বলিয়া পরিণত বয়সে প্রাণের ক্ষীণ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কবির বিচিত্র সৃষ্টি প্রেরণাও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কবি তাই প্রাণের উদ্বোধন ঘটাইতে চাহিয়াছেন। বলাকার মধ্যে যৌবন-বন্দনা রূপে কবির প্রাণ-বন্দনার বিচিত্র রূপের পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। পুরবীর মধ্যে কবির সৃষ্টি-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের জন্যই স্বাভাবিক ভাবে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে।

"হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের মত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।" (পঁচিশে বৈশাখ)

কুজ্ঝটিকার ঘন আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া যেমন সূর্য্যের প্রকাশ ঘটে, শীতের জীর্ণতা ঘুচাইয়া উপচীয়মান প্রাণ-প্রাচুর্য্য লইয়া যেমন বসন্ত আবির্ভূত হয়, চতুর্দ্দিকে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, কবির জীবনে যেন তেমনি করিয়া প্রাণের প্রকাশ ঘটে;

প্রাণ, যৌবন অথবা নূতনের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক ইহার সহিত বিজড়িত হইয়া সৃষ্টির আর এক লীলা রূপ কবির দৃষ্টি সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এই লীলা রূপের একটি অপরূপ পরিচয় লাভ করা যায় 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মধ্যে।

সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি তাহার অন্তহীন রূপ ও মাধুর্য্যের পরিচয় লইয়া ঈশ্বরের ধ্যানের মধ্যে একবার সঙ্কুচিত, সংহত হইয়া আসিতেছে; আবার তাহা পর্য্যায়ের

পর পর্য্যায়ে একের পর এক ঐশ্বর্য্যের দল বিস্তার করিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের মত আপনার পূর্ণ মহিমা লাভ করিতেছে। এমনি করিয়া একবার ধ্যানের মধ্যে ফিরিয়া আসা, আবার দেশ-কালের মধ্যে প্রসার লাভ করা,—যুগ যুগান্ত, কোটি কল্প কল্পান্ত ধরিয়া ইহারই চিরন্তন লীলা চলিতেছে।

সৃষ্টিতে যদি একথা সত্য হয়, তবে মানুষের জীবনেও একথা নিশ্চিৎ সত্য যে প্রাণের অন্তহীন ঐশ্বর্য্য যৌবনাবসানে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায় না। তাহার সকল ঐশ্বর্য্য অন্তরে সংহৃত রূপে সুপ্ত হইয়া থাকে। আবার তাহার কোন-না-কোন রূপে নিঃসংশয় প্রকাশ ঘটিবে। যৌবনে অপরূপ রূপ-লীলা কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—

"ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন চোখে
নিত্য নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ তরঙ্গিমা।" (তপোভঙ্গ)

সেই রূপ মাধুরী, সৌন্দর্য্যের সেই বিচিত্র প্রকাশ, আর ইহাকে আশ্রয় করিয়া চেতনার সেই যে অপার বিস্তার, তাহা যে জীবনের একটি পর্য্যায়ে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় তাহা নয়। বসন্তের ঐশ্বর্য্য শীতের দীনতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

"নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সঙ্গোপনে।" (তপোভঙ্গ)

এই প্রসুপ্ত ঐশ্বর্য্যের আবার প্রকাশ ঘটিবে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তবে জীবনেও ইহা যে সত্য তাহাতে সংশয় নাই।

"বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।" (তপোভঙ্গ)

কবি তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রসুপ্ত ঐশ্বর্য্য রাশিকে বাহিরে আবার বিচিত্র প্রকাশ রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চান।

যে প্রেরণা সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে ধ্যানের মধ্যে সংহৃত করিয়া বিলীন করিয়া রাখে, সে প্রেরণা নয়, যে প্রেরণায় এই সংহৃত ধ্যান-মন্ত্রটি, বিশ্বসৃষ্টির অন্তহীন বৈচিত্র্য রূপে আত্ম

প্রকাশ করে, সেই প্রেরণাকেই কবি আপনার জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে চান। কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মের পশ্চাতে এই প্রেরণা। "সে নৃত্যের ছন্দে লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে তব সঙ্গ ধরে।"

সৃষ্টি প্রকাশের সেই আদি তত্ত্বের সহিত কবি আপনাকে একাত্ম করিয়া তুলিয়াছেন। কবির মুক্তি সেই আদি সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত পূর্ণ একাত্মতা বোধের মধ্যে।

> "বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন
> বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি তারি সিংহাসন,
> তারি সম্ভাষণ।
> তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রর, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
> স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
> তব তপোবনে।" (তপোভঙ্গ)

আমরা ইতিপূর্ব্বে বারংবার লক্ষ্য করিয়াছি, যে ব্যক্তি জীবনের গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত বিজড়িত হইয়া সৃষ্টির এক একটি স্বরূপ এমনি করিয়া কবির নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। কবির সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের যেমন, বিশ্বের সেই স্বরূপ সাক্ষাৎকারেরও তেমনি বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। শাস্ত্রে এই উপলব্ধির পরিচয় আছে।

> "অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্য হরাগমে।
> রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥" (গীতা)

"ইহাই সত্য। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন অনুরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি হে সৌম্য, অব্যক্ত হইতে এই বহুবিধ সত্তা জন্ম লাভ করিয়াছে এবং পুনরায় তাহার মধ্যে ফিরিয়া যায়।" (মুণ্ডক উপনিষদ্‌)

সৃষ্টির এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের নিত্য লীলারও উর্দ্ধতর তত্ত্ব লাভকে লক্ষ্য করিযাছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রূপের এই লোকটিকেই ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

নিদ্রামগ্ন বিশ্বের দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ঊষা ডাক দেয়। সুপ্তির ঘন আবরণের স্তরে স্তরে সে আহ্বানে কম্পন জাগে। অমনি প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হয়, লোক লোকান্তরে তাহার ঐশ্বর্য্য ছড়াইয়া পড়ে।

স্বর্গ লোকে কোন এক নারীর ব্যাকুল আহ্বান সুরে সুরে নিয়ত উৎসারিত

হইতেছে, তাই তো মর্ত্ত্যের মধ্যে সে আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য এমন চাঞ্চল্য, এত ব্যাকুলতা। এই বিচিত্র সৃষ্টি, এই রূপ, রস, এই সমস্ত কিছু তো সেই চাঞ্চল্যের প্রকাশ।

কবি আপন সত্তার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই আহ্বান শুনিতে পাইবার জন্য বিনিদ্র হইয়া কান পাতিয়া আছেন, সে আহ্বানে তাঁহার অন্তর্লীন সমগ্র ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ঘটিবে বিচিত্র সৃষ্টি রূপে।

এই প্রেরণা তিনি জীবনে কত বারবার লাভ করিয়াছেন, তাহাকে কত বিচিত্র সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সমস্ত কিছুর মধ্যে যেন অসম্পূর্ণতার বেদনা বিজড়িত হইয়াছে। সে সৃষ্টি বিশ্ব প্রকৃতির মত অমন পরিপূর্ণ, অনায়াস, অমন অন্তহীন বৈচিত্র্যরূপে আত্ম প্রকাশ করিতে পারে নাই।

বিশ্বের মর্ম্মমূলে স্বর্গের জন্য যে আকূতি, অমৃতের জন্য যে ব্যাকুলতা, যে পূর্ণ সামঞ্জস্য, মর্ত্ত্যের নারীর মধ্যে তো তাহারই প্রকাশ। প্রেমে তাই মানুষ সেই ব্যাকুলতা সেই পূর্ণ সামঞ্জস্যের কিছু আভাস লাভ করে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া কবির বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম্মের মধ্যে সেই অমৃতের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

"তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানস তরঙ্গ তলে বাণীর সঙ্গীত শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ জীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপানে ;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তি মন্ত্রে বজ্র করে বশ
অসত্যের হানে॥"

বিশ্ব-প্রাণ ব্যক্তির অন্তরে সৌন্দর্য্য ও প্রেম রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি ব্যক্তি-সত্তাকে বিশ্ব-সত্তার গভীর হইতে গভীরতর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। প্রাণের যোগে বিশ্ব-সত্তার অনুভূতি যতই গভীর হইতে থাকে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ততই অন্তহীন হইয়া পড়ে। কবির জীবনে এই লীলার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। আজ অতিক্রান্ত যৌবনে কবির সেই

প্রাণের অনুভূতি একান্ত ক্ষীণ। বিশ্ব-প্রাণের সহিত কবি-প্রাণের সংযোগ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি প্রেরণাও ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। তাই কবি ফিরিয়া ফিরিয়া প্রাণকে ('যৌবন') আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন; বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় আপনার প্রাণকে যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন।

কবির মুক্তির স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহা হইল বিশ্ব-সত্তা লাভ, বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের পূর্ণ যোগ সাধন। এই পরিণাম লাভে বিশ্বের সৃষ্টি-প্রেরণার মত তাঁহার সৃষ্টি-প্রেরণাও অন্তহীন বৈচিত্র্যরূপে পূর্ণ সুষমা লইয়া আত্ম-প্রকাশ করিবে। সে সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের সৃষ্টির মত আসক্তির কোন পরিচয় থাকিবে না। বিশ্ব-প্রাণ গননাতীত সত্তার ভিতর দিয়া আপনাকে যেমন অন্তহীন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিতেছে, কবির ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তেমনি অন্তহীন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিবে। কবির সত্তা বিশ্বেরই সৃষ্টি, বিশ্বের কোন এক গূঢ় অভিপ্রায় চরিতার্থ করিয়া তাহা একদিন বিশ্ব-প্রাণে হারাইয়া যাইবে।

কবি আজ আপনার ব্যক্তি জীবনের সেই পরিচয় সেই সার্থকতাই লাভ করিতে চান। সেই পূর্ণ সার্থকতা লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া হয়ত তাঁহাকে একদিন এই মর্ত্ত্য ভূমি হইতে বিদায় লইতে হইবে।

"মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।" (আহ্বান)

কিম্বা

"অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।" (আহ্বান)

এই অসম্পূর্ণতাবোধের বেদনার পরিচয় কবি অন্যত্রও দান করিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র খণ্ড রূপের অন্তরালে যে অখণ্ড সৌন্দর্য্য-সত্তা, কত দুর্লভ মুহূর্ত্তে কবি তাহার আভাস লাভ করিয়াছেন; সেই চকিত সাক্ষাৎ লাভের অলৌকিক আনন্দকে তিনি তাঁহার কাব্যে নানাভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে তিনি স্থায়ী রূপে লাভ করিতে পারেন নাই। যদি তিনি স্থায়ীরূপে লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তাঁহার এই জীবনের চরম অর্থ বোধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

"তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।" (ক্ষণিকা)

এই 'স্বপ্নে অবগুণ্ঠন খোলাই' কবির বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি। খণ্ডিত, সীমিত রূপের মধ্যে তাহারই ইঙ্গিত, তাহারই আভাস, কিন্তু সেই পরিপূর্ণ শ্রী, যাহা এই সকল খণ্ডিত রূপকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া অনন্তে আপনার নিঃসীম মহিমায় নিত্য উপচাইয়া পড়িতেছে, তাহাকে তাই বুঝি পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারা যায় না।

"গেল না ছায়ার বাধা ; না বোঝার প্রদোষ আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্ত্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয় মোহের নেশা ;—সে মূর্ত্তি ফিরেছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।" (ক্ষণিকা)

এই একই মনোভাবের প্রকাশ নিম্নের উদ্ধৃত অংশ কয়েকটির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

"পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা।" (অপরিচিতা)
"হয় তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়াল খানা,
চোখের দেখার হয়নি প্রাণের জানা।" (অপরিচিতা)
"আধেক চাওয়ায় ভুলে যাওয়ায় হয়েছে জাল বোনা,
তোমায় আমায় হয় নি জানা শোনা॥" (অপরিচিতা)

কবি কেন বিশ্ব-সত্তা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার একটি কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, এবং ইহাও সে ক্ষেত্রে উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে কবি যে-পূর্ণতার সাধনা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার জন্য প্রথমে প্রয়োজন বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ একাত্মতা বোধ। কবির সে সাধনার লক্ষ্য হইল ব্যক্তি-চেতনা বিশ্ব-চেতনা ও দিব্য-চেতনার পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা, ইহাদের যোগের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে মুক্তি লাভের যে আকাঙ্ক্ষা তাহা কোথাও কোথাও কতকাংশে সার্থকও হইয়াছে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

"যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্ত্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলা ভরে।

ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি ;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।" (প্রভাত)

কবি-চেতনার এই পরিণামকে যে নামে বা যে স্বরূপে চিহ্নিত করা যাক-না-কেন সমগ্র পূরবী কাব্যের মধ্যে কবি চেতনায় এই ঊর্দ্ধ পরিণামের পরিচয় আর কোথাও লাভ করিতে পারা যাইবে না।

বিশ্ব-সত্তায় কবি-চেতনার চূড়ান্ত পরিণাম না ঘটিলেও সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনা মাত্রেই কিছু-না-কিছু নিরাসক্তি বোধ থাকিবেই, চেতনার ঊর্দ্ধ পরিণাম ও সামগ্রিক দৃষ্টি কোন-না-কোন পর্য্যায় স্বরূপতা লাভ করিবে।

ভারতীয় তত্ত্ব-সাধনা ও সৌন্দর্য্য-সাধনা যে চূড়ান্ত পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছে, ইহা যে সেই জাতীয় কোন বোধ নহে, রবীন্দ্রনাথ যে ওই পরিণাম লাভ করিতে চান নাই তাহা বুঝিতে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"কোন বস্তুর আদি অকৃত্রিম স্বরূপ বিচার করিতে হইলে কতকটি শূন্যতা বোধের প্রয়োজন, মনুষ্য চেতনা সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আদি অবস্থা বলিতে যে পূর্ণ অবস্থা বুঝিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। * * * আদি নির্ব্বিশেষ অবস্থার মধ্যে বিলীন হয়া অপেক্ষা মানুষ হিসাবে মানুষের সম্পূর্ণতা বেশি।" (মানুষের ধর্ম্ম)

এই উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকারও যে তাই বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ মিলন বোধ জাত নয়, তাহা যে কবি মনের কতকটা শূন্যতা বোধ জাত তাহা স্বাভাবিক ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে।

কবির চেতনা-লোকের আশ্রয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারই অনুকূল বিশ্বের আর এক রূপও সেই সঙ্গে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই চেতনা-লোকের যেমন, তাহার অনুকূল বিশ্বের এই স্বরূপেরও তেমনি পরিচয় লাভ করিয়াছি। বিশ্বের এই স্বরূপের পরিচয় লাভ হইতে কবির বর্ত্তমান চেতনা-পর্য্যায় সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

ইহা সেই চেতনা পর্য্যায়ের উপলব্ধি যে পর্য্যায়ে কবি বিশ্বের সকল খণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্যের আভাস লাভ করিতেন। সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহাকে নানা ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল খণ্ড রূপ যেন তাহারই এক একটি আহ্বান বাণী, মূর্ত্ত্য ব্যাকুলতা।

কবির জীবনে এই বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার চেতনা বিকাশের একটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে, যে পর্য্যায় লাভ করিয়া তিনি সকল রূপের অতীত একটি অখণ্ড সত্তা সম্পর্কে প্রথম সচেতন হইয়াছেন। এই পরিপূর্ণ সত্তার সহিত কবির যে একটি বিশিষ্ট যোগের সম্পর্ক আছে, যে সম্পর্ক জন্মান্তর ব্যাপ্ত এবং ইহার সহিত যোগের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনে যে একটি নিয়তি রূপ চরিতার্থ হইতেছে, 'জীবন দেবতা' ইত্যাদি বোধের মধ্যে যাহার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি, তাহা তখনও অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূত হয় নাই। এই বিশিষ্ট বোধের পরিচয় লাভ করা যায় 'মানসী' হইতে 'সোনার তরী' পর্য্যন্ত। এই পর্য্যায়ে কবি সৌন্দর্য্য ও প্রেম বোধের ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রাণের সহিত যোগ অনুভব করিলেও, তাহা তখনও পর্য্যন্ত যথেষ্ট নিবিড় হইয়া উঠে নাই।

প্রারম্ভিক যৌবনে সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে আশ্রয় করিয়া কবি যে লীলা করিয়াছেন সেই চেতনার অধ্যায়টিকে লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই লীলা-রূপটি পুনরায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পরিণাম লাভের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে তাই জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে।

> "উদয় ছবি শেষ হবে অস্ত সোনায় এঁকে
> জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি।" (খেলা)

কিংবা

> "চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
> তেমনি হবে সারা।" (খেলা)

জীবনের প্রারম্ভে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে বিচিত্র স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছেন, যে বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের আশ্রয় করিয়া তন্ময় মুহূর্ত্তে চেতনার সেই যে সীমাহীন প্রসার, জীবনের শেষ পর্য্যায় কি এমনি সৌন্দর্য্য-প্রেমের ধ্যানের মধ্যে বিচিত্র রূপ সৃষ্টির মধ্যে কাটিয়া যাইবে?

এই চেতনা-লোক লাভের সঙ্গে সঙ্গে কবির সেই লীলা-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা সঙ্গিনী?" (লীলা সঙ্গিনী)

সেই নিরূপমা প্রিয়তমার কত চকিত স্পর্শ কত ভাবেই না তিনি লাভ করিয়াছেন।

"বর্ষা শেষের গগন কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়,
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।" (লীলা সঙ্গিনী)

বিশ্ব-সত্তার সহিত ব্যক্তি-সত্তার ব্যবধান সেই পরিণামে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, যে পরিণামে কবি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া চকিতে চকিতে তাহার স্পর্শ লাভ করিতে পারেন।

দিব্য-চেতনার সহিত কবি একদিন একাত্মতা বোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সকল প্রকাশ লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া এবং এইভাবে অসীম বা অরূপের যে বিচিত্র রূপের প্রকাশ তাহার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া কবি কতকটা ব্যবধান রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই ব্যবধান ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া আজ এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে, যে পরিণামে বিশ্ব সত্তা 'লীলা সঙ্গিনী' রূপে অনুভূত হইয়াছে।

এই চেতনা লাভ করাই যদি তাঁহার নিয়তি হয়, তবে আজও কবিকে ধ্যানে সৌন্দর্য্য প্রেমের বিচিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কবির এই জীবন-পর্য্যায়ে কি তাহা সত্য হইবে?

"আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমা গুলি?
কল্পনা পটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি?" (লীলা সঙ্গিনী)

কিন্তু এই পরিণত বয়সে প্রাণের এই লীলা কেমন করিয়া সত্য হইবে?

"দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।" (লীলা সঙ্গিনী)

জীব-জীবনের সকল নিয়তিকে মানিয়া লইয়া, সকল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া সকল অধ্যাত্ম ফল পরিণামকে পরিহার করিয়া কবি আজ মানবিক সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে কেবলমাত্র তাহার এই একমাত্র স্বরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই স্বরূপই কবিকে এক আশ্চর্য্য দুর্লভতার আস্বাদ দিয়াছে।

একদিকে প্রকৃতির এই সহজ, সরল, নিরাভরণ সৌন্দর্য্য,

"গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।" (আশা)

অন্যদিকে তেমনি আত্মবিস্মৃত অকুণ্ঠিত প্রেমের প্রকাশ।

"হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা ভরা আভা।" (আশা)

কবি যদি মর্ত্ত্যের এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আস্বাদ লাভ করিতে পারেন, ইহারই ভিতর দিয়া যদি তাঁহার জীবন একদিন অবসিত হইয়া যায়, তবে তাঁহার আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না।

কখন যদি অন্তরে প্রেম জাগে, আর এই অনুভূতির ভিতর দিয়া যদি বিশ্ব-সত্তার ক্ষীণতম আভাসও অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে তাহার পর হইতে অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে। ওই পরিণামকে জীবনে স্থায়ী করিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না।

"হয়তো তারে দুঃখ দিনে
অগ্নি আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বলবে শিখা।" (স্বপ্ন)

নরনারীর জীবনে প্রেমের উপলব্ধি যে কি কবি তাহার পরিচয় দান করিয়াছেন।

"ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান;
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাহিরে যে তার নাইরে পরিমাণ।"

আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ-সাগর তীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।" (প্রকাশ)

প্রেমের উপলব্ধি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক এই অর্থে যে তাহাকে জাগতিক কোন কিছুর সহায়তায় ব্যাখ্যা বা পরিমাপ করিতে পারা যায় না। তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা কেবল নিষেধাত্মক ভাবে করা যাইতে পারে। প্রেম নর-নারীর ভোগ বিলাস নহে। তাহা জাগতিক বিচিত্র কামনা বাসনাও নহে। তাহা আপনার পূজা বা উপাসনাও নহে; মনের বিচিত্র বিকার, মান-অভিমান, প্রেম বলিতে তাহাও বুঝায় না। তাহা এমন এক উপলব্ধি যাহা নর-নারীর চেতনাকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন করিয়া দেয়। বাহিরের বিচিত্র প্রয়াস নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। চিত্তে এক অলৌকিক বেদনাবোধ সঞ্চারিত হইয়া যায়। আর এই ব্যথা সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরে পরস্পরের এক দিব্য-রূপ ফুটিয়া উঠে। এই দিব্য-রূপের ধ্যান তন্ময়তায় নর-নারী পরিণামে সকল রূপের অতীত সত্তার বারংবার চকিত স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। এই অর্থে প্রেমকে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

"তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমনি রেখে গেছ অন্তরে আমার,
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।" (কৃতজ্ঞ)

প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, বিয়োগ আছে; কিন্তু অন্তরে তাহার রূপ অম্লান হইয়া বিরাজ করে। আমরা ধ্যানে তাহার সহিত নিত্য মিলিত হই। অশ্রুজলে তাহাকে নিত্য অভিষিক্ত করি। এইরূপে বাহিরে যাহাকে হারাই তাহাকে অন্তরে আরো নিবিড় করিয়া লাভ করি। ধ্যানের এই মূর্তি আবার ক্ষণে ক্ষণে অসীম বা অরূপের আভাস দান করে, চেতনাকে বিশ্বের সকল রূপের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। ইহা

চেতনার এমন এক বিকাশ যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বের অন্তহীন মাধুর্য্য-লোকের দ্বার বিশ্বের অমৃতছবি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

বিশ্বে বঞ্চনা আছে, সহস্রবিধ প্রতারণা, অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যাচার আছে; তাহার সঙ্গে আছে দেবতার দান এই প্রেমের অনুভূতি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ পরিণামে অমৃতের আস্বাদ পায়।

> "যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
> রাত্রির প্রহর মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
> নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি'
> স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
> তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
> অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
> যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
> ডাকিছেন সর্ব্বহারা মিলনের প্রলয় তিমিরে।" (সৃষ্টিকর্ত্তা)

তিনি প্রেমে আপনাকেই দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপে রূপে বহুধা করিয়াছেন, তাহার পর হইতে পরস্পরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতার অন্ত নাই। একদিকে দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপ-লোক অচিন্তনীয় বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে, অন্যদিকে তিনি দেশ-কালের ঊর্দ্ধে থাকিয়া নিয়ত ব্যাকুল সুরে তাহাকে আহ্বান করিয়া চলিয়াছেন। মিলন যেখানে সেখানে তো রূপের কোন প্রকাশ নাই, তাই তাহা 'সর্বহারা প্রলয় তিমির।'

যে প্রেমে ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি-রূপে বহুধা করিয়াছেন। সেই এক প্রেম মানুষের অন্তরে। নর-নারীর মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া তো শূন্যতা পূর্ণ করিয়া এত গান জাগে, এত মাধুর্য্যের প্রকাশ ঘটে। প্রেমে পরস্পরকে নিকটে লাভ করিবার এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া পরস্পরের ঐশ্বর্য্য নিঃসীম হইয়া পড়ে।

নর-নারী যখন প্রেমে মিলিত হয়, তখন তাহাদের অন্তরে যে ছন্দের স্পন্দন জাগে যে সুরের অনুরণন, তাহার সহিত বিশ্ব-ছন্দের ও বিশ্ব-সুরের মিল আছে। অন্তরে যে রূপ-লোক গড়িয়া উঠে তাহাতে বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তী পরিপূর্ণ রূপের আভাস ফুটিয়া উঠে।

প্রেমে প্রাণের দুর্বার প্রকাশ ঘটে। প্রাণের এই আবেগ সহ্য করিতে পারে যৌবন। যৌবন যেমন প্রাণকে জাগ্রত করিতে পারে, তেমনি প্রাণের বিচিত্র ক্ষুধাকে যৌবনই প্রশমিত করিতে পারে। আজ কবি প্রাণ-লোক হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অবসিত যৌবনে আজ প্রাণের প্রেরণা একান্ত ক্ষীণ। প্রাণের আকস্মিক প্রবল স্ফুরণকে মহাদেবের গঙ্গোত্রীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে ধারণ করিবার মত ইন্দ্রিয়ের সে সামর্থ্যও কবির আজ নাই। আজ তাই কবি কাহারও অন্তরে প্রাণ জাগ্রত করিতে আশঙ্কা বোধ করিতেছেন। তাহাতে যে তাঁহার প্রাণের দীনতা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আর প্রাণকে আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সেই যে অন্তহীন লীলা তাহারও দিন শেষ হইয়া গিয়াছে।

"তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি
তবে যে সেই দীপ্ত আলোর আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কি মোর আছে দিতে।" (আশঙ্কা)

বিশ্ব-প্রাণের লীলা হইতে কবি আজ কত দূরেই না সরিয়া আসিয়াছেন। ওখানে তো তাঁহার একদিন স্থান ছিল। বিশ্ব-প্রাণকে কত গভীর করিয়াই না তিনি অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়াছেন। সেই উপলব্ধির গভীরতায় তাঁহার প্রাণ-ধারা বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় একাকার হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যকে তিনি কত ভাবেই না আস্বাদ করিয়াছেন। তাঁহাকে কত বারবার অমৃতের আস্বাদ দিয়াছে, তাঁহার চেতনাকে অবারিত করিয়া কত বারবার সীমাহীন প্রসারতা দান করিয়াছে। কত বিচিত্র ভাবের, কত সূক্ষ্ম অনুভূতির সঞ্চার করিয়া এই দিন-রাত্রি এই ষড় রূপ ও রঙ্গের ষড় ঋতু তাঁহার মনকে বিভোর, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে।

তাহার কোন অবশেষ কি ওই প্রাণ-লোকে কোন স্বরূপেই থাকে না। বিচ্ছিন্নতার মুহূর্ত্তে ওই সমস্ত কিছু মুহূর্ত্তে শূন্যময় হইয়া যায়? এই সংশয় ব্যাকুল জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

"আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি?
কিছু কি থাকে না বাকি?" (বকুল বনের পাখি)

একদিন তাঁহাকে এই জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইতে হইবে। সেদিন এই ধরিত্রীর মাধুরিমার কোথাও লেশমাত্র হানি ঘটিবে না। সেদিনও বসন্ত তাহার অফুরন্ত দানভার লইয়া মর্ত্ত্যকে দুর্লভ ভূষায় সাজাইয়া তুলিবে। আম্র মুকুলের গন্ধে আতপ্ত বাতাস সঘন, আমন্থর হইয়া উঠিবে। আকাশে পরিপূর্ণ মাধুর্য্য লইয়া পূর্ণ চাঁদ বিরাজ করিবে। আর নিম্নে বসুন্ধরার বক্ষে স্বপ্নের ঘোর জড়াইয়া আসিবে, সুখভরা মুগ্ধতা। বকুল বীথিকায় জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়া আলো-ছায়ার স্বপ্ন-লোক রচিত হইবে। যেন মূর্চ্ছাহত দুর্লভ কোন মাধুরী। প্রেয়সী নারীর মত বসুন্ধরা কণ্ঠে ফুলের মালা দুলাইয়া কাহার প্রত্যাশায় অধীর উন্মুখ। প্রতীক্ষায় আঁখি দুটি খিন্ন সজল।

এমনি কত দুর্লভ মুহূর্ত্তে তিনি ব্যথার গান গাহিয়া ধরিত্রীকে উপহার দিয়াছেন। তাহার বেদনাকে আপনার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। কবি যেদিন এই মর্ত্ত্যে থাকিবেন না, সেদিন তাঁহার গান থাকিবে।—ধরিত্রীর গননাতীত বোধের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে যাহার মধ্যে।

"তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুল বীথির ছায়াখানি মধুর মূর্চ্ছাভরা;
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা;
সেদিন আমি আসবো না তো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান।"

ধরণীর শ্যাম বক্ষে কত দুর্লভ রূপ ফুটিয়া উঠে। কত অনির্ব্বচনীয়তার প্রকাশ ঘটায়; কত রেখা, কত রঙ্গ, কত গন্ধ। তাহার পরমুহূর্ত্তে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।—যে প্রকাশ এত সত্য, এত প্রত্যক্ষ, সমগ্র বিশ্বের যেন লক্ষ লক্ষ বৎসরের নিভৃত সাধনার ধন। বিনষ্টিতে তাহা একান্ত শূন্য হইয়া যায়? এই জগতে তাহার কোন অবশেষ থাকে না?

এই জিজ্ঞাসা কবিকে আপনার নিয়তি সম্পর্কে মুহূর্ত্তে অত্যন্ত সচেতন করিয়া দিয়াছে। তাঁহার জীবন ও মৃত্যুর উভয়তট পূর্ণ করিয়া এই যে দুর্লভ সত্তার প্রকাশ,

সহস্র বোধের এই যে নিত্য উৎসারণা, এত প্রেম, এত মাধুর্য্য, এত সাধ, এত আশা, মৃত্যুতে সমস্ত মিথ্যা হইয়া যায়? এই জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিয়া তাহার সমগ্র সত্তাকে মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে।—ফিরিয়া ফিরিয়া বিমূঢ় বিহ্বল অবোধ জিজ্ঞাসা।

"সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি?
লুকিয়ে সে কি রয়নি কোনোখানে?
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা?
অশ্রুতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি।"

তাহার পর কবি-চিত্ত একপ্রকার আর্ত্তনাদ তুলিয়াছে। অশ্রু-ধারার আর শেষ নাই। মৃত্যুতে আর কোন স্বরূপে মর্ত্ত্যকে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না, তাহার একান্ত নিঃশেষ অবসান ঘটে।

"সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।" (শেষ বসন্ত)

চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত যে দুর্লভ সত্তার প্রকশ দেখিতে পাই, যে অপরূপ রূপের প্রকাশ, তাহার বিকাশ ও বিনষ্টির মধ্যে আসক্তির ক্লিষ্টতা তো কোথাও নাই। জীবন ও মৃত্যুকে তাহারা কী আশ্চর্য্য নিরাসক্ত ভাবেই না বরণ করিয়া লয়। জীবন-রঙ্গ-মঞ্চে তাহারা ভিড় করিয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হয়, আবার এই লীলার পালা সাঙ্গ করিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে মরণ-উৎসবে যোগ দেয়। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও আপনার ঐশ্বর্য্যকে অকুণ্ঠিত ভাবে দান করিয়া যায়।

যে প্রাণের লীলায় আমাদের এই দুর্লভ সত্তার প্রকাশ, জীবনে সেই প্রাণের বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ঘটাইয়া একদিন সেই প্রাণের মধ্যে হারাইয়া যাইতে হইবে। এই সত্যকে যদি মর্ম্মের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি, তবে আসক্তি একান্ত

ছুইয়া জীবনকে এমন বিকৃত করিতে পারে না। প্রাণের এই লীলা-রূপটিকে কবি জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

"ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে
তারার মতন যাই যেন রাত ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি।" (বকুল বনের পাখি)

সাবিত্রী তাঁহার প্রভাতের দানকেই যে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলে তাহা তো নয়, তিনি যে তাঁহার বিদায়ের দানকেও অমনি বিচিত্র রূপ ও রঙ্গের ঐশ্বর্য্য দিয়া ভরাইয়া তুলে। তাহার জীবন প্রারম্ভের ও জীবন শেষের প্রকাশের মধ্যে লেশমাত্র পার্থক্য নাই। অস্তোন্মুখ সূর্য্য তাহার শেষ কিরণ জাল পূর্ব্বাকাশে দিগ দিগন্তে ছড়াইয়া দেয়, আকাশ-পটে রঙ্গের তুলিকা হস্তে অন্তহীন রূপ ফুটাইয়া তুলে, অপরূপ, অনির্ব্বচনীয়; মুহূর্ত্ত পরে এই সমস্ত কিছুর উপর একটি কৃষ্ণ আবরণ টানা হইয়া যায়, সমস্ত রূপ মুছিয়া একাকার হইয়া যায়।

তেমনি অহেতুক আনন্দে কবি তাঁহার জীবন প্রারম্ভের সৃষ্টির লীলাকে জীবন শেষের পূর্ব্বেও যেন সত্য করিয়া তুলিতে পারেন। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত অমনি প্রাচুর্য্যের ভারে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া, তাহার পর আসক্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অকুণ্ঠিত মনে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া।

"তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মুহূর্ত্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসি-কান্না ভাবনা বেদনা—
না বাঁধুক মোরে।" (সাবিত্রী)

তাহা ছাড়া কোন সত্তার বিনষ্টি তাহা যত দুর্লভও হোক না কেন, প্রাণের ক্ষেত্রে স্থায়ী শূন্যতা সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া নূতন সত্তার আবির্ভাব ঘটে। প্রাণের এই লীলা সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবি আপনার ব্যক্তিগত শোক ও চিরন্তন মানব ভাগ্যকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"শুকিয়ে পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধুলারি বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে।" (বিস্মরণ)

বিশ্বের সেই প্রথম সূর্য্যোদয় কিরূপ ছিল, কোন্ বিস্মিত সৃষ্টির সমক্ষে তাহার একের পর এক রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছিল? সেই আদি সৃষ্টির কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে অচিন্তনীয় কালের বিস্তার তাহাতে কত রূপ, কত রঙেরই না প্রকাশ ঘটিয়াছে। আবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আজও মহাকালের বক্ষে নিত্য রূপের আঁকা ও মোছার বিরাম নাই। তাহার পর কত যুগযুগান্তর কাল পরে মনুষ্য চৈতন্যে দুর্লভ প্রকাশ। আর সবচেয়ে দুর্লভ প্রকাশ তাহার এই প্রেম, যাহা বিচ্ছেদ আশঙ্কায় নিয়ত কাতর, সদা অশ্রুমুখী। এই দুর্লভতম প্রকাশও নিয়ত জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। এই বিশ্বের প্রাঙ্গনে যুগে যুগে কত মানব যাত্রী আসিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, পরস্পরকে ভালোবাসিয়াছে, তাহারা আজ কোথায়। এখানে আজ নূতন যাত্রীর মেলা। তাহাদের পদচিহ্নে পূর্ব্বের পদচিহ্ন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বের এই দুর্লভ সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে স্থায়ী করিয়া রাখিবার আশায় মানুষ তাহার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে তাহাদের রূপায়িত করিবার চেষ্টা করে। প্রাণ-জাহ্নবীর বক্ষে তাহারাও কিছুকাল ভাসিয়া স্রোতের আবর্ত্তে একদিন কোথায় হারাইয়া যায়। কবির এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে কি জগৎ ও জীবনের, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মায়া রূপ ফুটিয়া উঠে নাই? কবি সে কথা বলিয়াছেন—

"এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া—
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন অম্বর তলে;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা—
চিহ্নহীন পথচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তারপরে দিন যায় অস্ত যায় রবি;
যুগে যুগে মুছে যায়—লক্ষ লক্ষ, রাগরক্ত ছবি।" (ছবি)

অধ্যাত্ম-চেতনার কোন্ স্তর হইতে কবির কাব্য বিরচিত এবং কবির কাব্য পাঠক-চিত্তে কোন্ উন্নততর বোধের জাগরণ ঘটায়, এক কথায় কবির কাব্যের সিদ্ধি-সীমা কোথায়, তাহার পরিচয় কবি স্বয়ং পূরবীর একটি কবিতায় দান করিয়াছেন।

"আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ,
সেই প্রভাতের আলো এলো, আমি কেবল ভাঙ্গিয়ে দিলাম ঘুম।" (বাতাস)

রবীন্দ্র-কাব্য আমাদের অন্তরে সুপ্ত অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত করে। যে চূড়ান্ত উপলব্ধিতে মানব-জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া যায়, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই সেই উপলব্ধি হয়ত ঘটিবে না, কিন্তু যে অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া পরিণামে ওই ফল লাভ ঘটে, রবীন্দ্র-কাব্য-সৃষ্টির পশ্চাতে সেই ব্যাকুলতার নিপীড়ন রহিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে অন্তরে সেই ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

"আমি জানি তুমি কারে খোঁজ,
সেই আকাশে জাগল আলো, আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী।" (বাতাস)

রবীন্দ্র-কাব্য মুক্তির লোক নহে। বস্তুতঃ কোন কাব্যই তাহা নহে, পরম রসের আলম্বন স্বরূপে তাহা সত্য। ঋষির দিব্য সাক্ষাৎকার যে-কোন আলম্বন শূন্য, কাব্য পাঠে সেই সাক্ষাৎকার ঘটে একান্ত চকিতে, বিশিষ্ট কোন ভাব আশ্রয় করিয়া।

মানবাত্মার ব্যাকুলতার মূলে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা নিঃসংশয়ে জানেন। তিনি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া সেই সীমাহীনের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু কবির নিজের কথা কি? কবি নিজের জীবনে কোন্ ফল লাভ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কী তুমি চাও নিজে? তবে তিনি কি উত্তর দিবেন?

কবি স্বয়ং মুক্তিতে বিলয় চান নাই, সকলের অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে চান। কবি যদি স্বয়ং মুক্তি লাভ করিতে চাহিতেন, তবে সকলকে মুক্তির বাণী শুনাইত কে? ঈশ্বরের দূত তিনি। তাঁহার কাব্যে তিনি পরমের লিপি চিত্রিত করিয়াছেন।

"আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান
আমার শুধু গান।" (বাতাস)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-সাধনার সামর্থ্য-সীমা আর একদিক দিয়া আর একভাবে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে মন চঞ্চল, বহির্মুখী বাহিরে রূপের জগতে বন্দী, কেবল অস্থির হইয়া রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরে সে মন রবীন্দ্র-কাব্য-রস আস্বাদ করিতে পারিবে না। রবীন্দ্র-কাব্যের মর্ম্মমূলে যে ভাব-প্রেরণা ও সত্যবোধ রহিয়াছে, সে মন কখনই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। রবীন্দ্র-কাব্যের বাণী সে মনের কাছে ব্যর্থ।

প্রকৃতির মধ্যে এক একটি মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসে, যখন মনে হয় সমগ্র প্রকৃতি দয়িতকে লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা উন্মুখ। চতুর্দ্দিকে ধীরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, যেন একটি মুগ্ধতার আস্তরণ। ক্লান্ত হংসের দল জনশূন্য তটপানে ফিরিয়া আসিয়াছে। নদী জলের মধ্যে একটি পরিব্যাপ্ত শুব্ধতা। যেন আকাশের কোন মহামৌন বাণীকে কান পাতিয়া শুনিতে চায়, যেন মহাশূন্যে অনন্তকোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে স্পন্দিত সঙ্গীত শুনিবার অভিলাষী। একটি একটি করিয়া পাখি নীড়ে ফিরিয়া আসিতেছে। বেণু শাখার অন্তরালে অস্তোন্মুখ সূর্য্য শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে আকাশকে রঙের দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। দিনের ক্ষুব্ধতা ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। নারীর উদার স্থির দৃষ্টির সহিত তাহার মিল। বনের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে চাঁপার মৃদু গন্ধ যেন অব্যক্ত বেদনার মত; বিকীর্ণ শুষ্ক কুসুমের মত মনের ভাবনা যত লঘু, শিথিল।

এমনি একটি মুহূর্ত্তে যদি মন খোলা থাকে, অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত প্রত্যাশার ভাবটি যদি অন্তরের মধ্যে ঘনাইয়া আসে; অমনি বিষাদ, অমনি অনৈসর্গিক বেদনাবোধ; যদি সেই বেদনার দীপ জ্বালাইয়া হৃদয় কাহারো প্রত্যাশায় আসন পাতিয়া বসিয়া থাকে, তবে কবির কাব্য সেই বেদনাকে আরো নিবিড় করিয়া তুলিবে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র, ধ্যানকে আরো গভীর করিয়া তুলিবে। প্রতীক্ষা শেষে, ধ্যানের পরিণামে যে চূড়ান্ত ফল লাভ, কবির কাব্যে তাহা হয়ত পাওয়া যাইবে না, তবে তাহাকে লাভ করিবার জন্য নিগূঢ় প্রত্যয় জাগাইয়া নর-নারীর উৎসুক প্রতীক্ষাকে সহনীয় করিয়া তুলিবে।

"ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়বে তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা নীরব রাতে
অন্ধকারে জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বীজন প্রাণের প্রাঙ্গনে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আলপনা,—" (আনমনা)

এই প্রসঙ্গে খেয়া কাব্যের 'গানশোনা' প্রভৃতি কবিতার কথা স্বাভাবিক ভাবে স্মরণে পড়িতে পারে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে একটি ভাব-সঙ্গতি স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

মহুয়া

নর-নারীর অন্তরে প্রেমের প্রারম্ভিক যে অনুভূতি, তাহাই প্রাণের উপলব্ধি। প্রাণের অনুভূতির ভিতর দিয়া অন্তরে একটি ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। নর-নারীর চেতনা ওই ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া যখন ব্যক্তি-চেতনারও সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন বিশ্ব-প্রাণের সহিত তাহার মিলন ঘটে। প্রেমে মুক্তি বলিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-চেতনায় এই পরিণামটিকে বুঝাইয়াছেন।

বিশ্ব-সত্তা কেবল মুক্তি-লোক নহে, সৃষ্টি-লোক বলিয়া অন্তরে অনিঃশেষ সৃষ্টি-প্রেরণা রূপে অনুভূত হয়। ব্যক্তি-চেতনা যত গভীর করিয়া বিশ্ব-চেতনা লাভ করিতে থাকে ততই তাহার অন্তরে সৃষ্টি-প্রেরণা প্রবল ভাবে অনুভূত হয়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবোধে হোক, কিংবা প্রেম বোধে হোক এইরূপে বিশ্বের সহিত মিলন ঘটে বলিয়া নর-নারী সৌন্দর্য্য ও প্রেম বোধে অবিরাম সৃষ্টির পরিচয় দান করে।

প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-চেতনার যীর পরিণামের পরিচয়ই মহুয়া কাব্যের মুখ্য পরিচয়। সে পরিচয় লাভ করিবার পূর্বে প্রেমের একটি তত্ত্ব

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে জিজ্ঞাসা নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

নারী কিংবা পুরুষের জীবনে বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া প্রেম অনুভূত হয়, এবং সেই প্রেম বা 'রূপ' আশ্রয় করিয়া পরিণামে প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে যুক্ত হইয়া যায়। প্রেমে ওই একের প্রাণের যোগে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলন ঘটে। নর-নারীর জীবনে প্রেমের ওই আধার যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে ওই অনন্ত প্রেম প্রস্রবণ নিরুদ্ধ করিয়া উহারই শোকে জীবনকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়াই কি প্রেমের একমাত্র ধর্ম্ম? অর্থাৎ আর কাহাকেও আশ্রয় করিয়া কি ওই প্রেম অনুভূত হইতে পার না? প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় জিজ্ঞাসার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"সকল মানুষের হৃদয়ে প্রেমের অমৃত উৎস আছে, তাহার জন্যই জগতে সন্ধান পড়িয়া গেছে। যত দিন যাইতেছে ততই মানব হৃদয়ের সেই অমৃত উৎস গভীরতর হইতেছে।

যদি এমন হয় যে, একজন সাহসী এক আঘাতে তোমার হৃদয়ের কঠিন স্তর বিদীর্ণ করিয়া অমৃত উৎসের অনন্ত মূল অবারিত করিয়া দিয়াছে তবে সেই উৎস কি কেবল খননকারীর নাম-খোদিত সমাধি পাষাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে?

প্রেমের উন্মুক্ত সদাব্রতই প্রেমিকের স্মরণ চিহ্ন, পাষাণ ভিত্তির মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল নহে।

প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে শিল মোহরের ছাপ মারিয়া আমার বলিয়া কেহ ধরিতে পারে না। সে জন্ম জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে। তাহার উৎসের মধ্যে গোরের মাটি চাপা দিয়া তাহার প্রবাহ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা কেবল বৃথা কষ্টের কারণ মাত্র।

বিস্মৃতি আমাদের জীবন গ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবন বিকাশের সহায়তা করে। এক জীবনের মধ্যেও শত সহস্র বিস্মৃতি চাই তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব ব্যাকরণ বিরুদ্ধ একটিমাত্র দীর্ঘ স্মৃতি লইয়া জীবন শেষ করিলে জীবন শেষই হয় না।

অতএব আমাদের বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে।"

যে বিস্তৃত অংশটি উদ্ধৃত করিলাম তাহা রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের চিন্তা না হইলেও সুপরিণত বয়সের চিন্তা নয়।

বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ক্রমে আপনার প্রেমকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইলে যে সহস্র বিস্মৃতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কোথাও যদি সত্য হয় নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে নহে।

প্রণয় নিষ্ঠা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে তীব্র মন্তব্য উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'খননকারীর নাম-খোদিত সমাধি পাষাণ', 'পাষাণ ভিত্তির মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল', 'শিল মোহরের ছাপ,' 'গোরের মাটি চাপা দিয়া তাহার প্রবাহ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা', ইত্যাদি কোন্ চেতনাধিষ্ঠিত হইলে সম্ভব তাহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি কতখানি সত্য।

বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে প্রেম অনুভূত হয় তাহাতে ওই আধার ভাঙ্গিয়া গেলে হয় সীমাশূন্য শোকে প্রেম মুহূর্তে বিশুষ্ক হইয়া পড়ে, নতুবা নূতন কোন আধার আশ্রয় করিয়া ওই প্রেমকে আবার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হয়। প্রেম যেখানে ক্রমাগত একরূপ হইতে আর এক রূপ আশ্রয় করিয়া চলে সেখানে বিস্মৃতির মধ্যদিয়া বৈচিত্র্য লাভ সম্ভব, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কোন কালে এককে লাভ করিতে পারা যায় না।

আমাদের বোধ সীমাবদ্ধ, এই সীমাবদ্ধ বোধ দিয়া আমরা খণ্ড খণ্ড রূপ গড়িয়া তুলি, কিন্তু এই খণ্ড রূপকে যতই গ্রথিত করা যাক-না-কেন তাহাদের সমাহারের ভিতর দিয়া একের বোধ কোন প্রকারেই গড়িয়া উঠে না। রূপের সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে কেবল একের অনুভূতি লাভ সম্ভব। আমরা রূপ হইতে রূপে কেবল বিচরণ করিতে পারি, অরূপের সন্ধান লাভ করিতে পারি না।

প্রেমে নিষ্ঠার প্রয়োজন রূপের সীমা ছাড়াইয়া অরূপকে লাভ করিবার জন্য। বিরহে আমাদের অন্তর শূন্য হইয়া যায়। সাধনার ভিতর ওই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া যে রূপ-লোক গড়িয়া উঠে নর-নারীর চিত্তে তাহাই ধ্যান-লোক। এই ধ্যান-লোকের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনা যখন উন্নততর চেতনার আভাস লাভ করে তখন ওই রূপটা গৌণ হইয়া যায়। নর-নারীর তাহা নির্ব্বিশেষ এক উপলব্ধি। বারংবার আধার পরিবর্ত্তনে নর-নারী এই পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

সুপরিণত বয়সে নর-নারীর প্রেম এবং জীবন-সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে

অধ্যাত্ম বিশ্বাস গড়িয়া উঠে তাহার একটি সুন্দর পরিচয় মিলিবে 'তিনসঙ্গী' গল্পের অচিরা এবং তাহার অধ্যাপক দাদুর শেষ কথোপকথনের মধ্যে।

মহুয়ার মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যে ক্ষেত্রে প্রেমের এই সাক্ষাৎকার প্রধান হইয়া প্রেমের নিষ্ঠা বা সাধনার দিকটিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অবশ্য মহুয়ার মধ্যেই প্রেমের সাধনার দিকটিরও পরিচয় লাভ করা যায়। তাহাতে কবির এই জাতীয় সাক্ষাৎকারের প্রতিবাদই মিলিবে।

"যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্য থাল,
দীপ দিনু জ্বালি।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে।" (দূত)

বিশ্ব-প্রাণ এমনি করিয়া নর-নারীর অন্তরে নিত্য নূতন ভাবে অনুভূত হইতে চায়। নর-নারীর প্রেমে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের এই ধর্ম্মটিকে স্বীকার করিয়াছেন। বিরহে ধ্যানের ভিতর দিয়া নারীর যে চেতনা উন্নততর পরিণাম লাভ করে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে তাহাকে শূন্যতার সাধনা বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। প্রেম যেখানে নিত্য নূতন বিগ্রহ আশ্রয় করিতে চায় সেখানে ব্যাপ্তি ধর্ম্মটি আছে সত্য, কিন্তু সে ব্যাপ্তি কেবল রূপ হইতে রূপে সঞ্চরণ।

প্রেমে রূপ-ধ্যান আশ্রয় করিয়া নর-নারীর চেতনা যখন উন্নততর পরিণাম লাভ করে, তখন আর রূপের বোধটি থাকে না, সেখানে প্রেমের যে বোধ তাহা নৈর্ব্যক্তিক।

উন্নততর চেতনালোকে বিস্মরণ যেমন সত্য, তেমনি মর্ত্ত্য-চেতনায় রূপ হইতে রূপে, আধার হইতে আধারে নিত্য পরিবর্ত্তিত যে প্রেম সে ক্ষেত্রেও বিস্মরণ সত্য। যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে কবি প্রাণের যে বিস্মরণ তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই মর্ত্ত্য-চেতনালোকে মনোভূমিতে।

বহিশ্চেতনায় মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই। এই চেতনায় 'শুধু আমি অংশ জনতার'। কেবল অধ্যাত্ম-সত্তায় মানুষ সমস্ত সৃষ্টি হইতে আপনাকে পৃথক

করিয়া বোধ করিতে পারে। ওই সত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি, 'বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে'।

প্রেমে নর নারীর চিত্তে প্রাণের জাগরণ ঘটে। প্রাণের এই জাগরণ মুহূর্ত্ত হইতে নরনারীর বহিরিন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখীন হইয়া পড়ে। এই অন্তর্মুখীন চেতনাশ্রেয়ী অন্তরের আর এক যে উপলব্ধি তাহাই অধ্যাত্ম-উপলব্ধি।

ঊর্দ্ধতর লোকের সহিত মানবীয় চেতনার যে যোগ তাহা এই অধ্যাত্ম সত্তা আশ্রয় করিযাই ঘটে। একদিকে অমর্ত্ত্য- চেতনা; অন্যদিকে মর্ত্ত্য চেতনা, উভয়ের সংযোগ স্থলে আলো-আঁধারের যে-লোক তাহাই অধ্যাত্ম-লোক।

"সে মহা নির্জ্জন
যে গহনে অন্তর্য্যামী পাতেন আসন
সেই খানে আনো আলো—" (প্রকাশ)

প্রেমের উপলব্ধি মনুষ্য সত্তাকে স্পষ্ট দ্বিধা করিয়া অন্তর্জগৎ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলে।

নারীর মূল্য আমরা এই দিক দিয়া বিচার করি না। সমাজে নারীর যে মূল্য পুরুষ নির্দ্ধারণ করে তাহা কতকটা স্থূল ভোগ ও সেবার দিক দিয়া, কতকটা বা পারিবারিক ও সামাজিক বিচিত্র প্রয়োজনের দিক হইতে।

নারী যে পুরুষের ধর্ম্ম-সঙ্গিনী এক্ষেত্রে সেই অর্থ টাই লুপ্ত হইয়াছে। সামাজিক বা পারিবারিক যে ধর্ম্মের কথা বলা হয় তাহার কথা নয়, মানুষের যে খাঁটি অধ্যাত্মবোধ তাহার কথাই বুঝিতে হইবে। আধ্যাত্ম বোধ বিকাশের মূল কথা যদি হয় মানুষের সকল বৃত্তিকে ঊর্দ্ধমুখীণ করিয়া দেওয়া, বাস্তবের নিত্য গ্লানির ঊর্দ্ধে অন্তরকে তুলিয়া ধরা এবং পরিণামে মর্ত্ত্য-চেতনাকে অতিক্রম করিয়া মহামুক্তি লাভ করা, তবে নর-নারীর প্রেমেও সেই সামর্থ্য আছে। পুরুষের অধ্যাত্ম-জীবনে নারী-প্রেমের চূড়ান্ত সামর্থ্যের কথাটিই নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

"তোমার প্রবল প্রেম প্রাণ ভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস।" (প্রতীক্ষা)

কিংবা

"হে নারী, আত্মার সঙ্গিনী;
অবসাদ হতে লহো জিনি
স্পর্দ্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।" (প্রতীক্ষা)

নারী পুরুষের জীবনে এমনি সৃষ্টি-প্রেরণা লইয়া আসে। প্রাণের যে উপলব্ধি, সৃষ্টিরই আবেগ বলিয়া যে এমনটি ঘটে তাহা বলিয়াছি। এই অনুভূতি যে অধ্যাত্ম অনুভূতি, অর্থাৎ প্রাণের জাগরণের ভিতর দিয়া অন্তরে যে ধ্যান-লোক জাগ্রত হয় তাহা বলিয়াছি। ধ্যান-লোক জাগ্রত হইলে মানুষের জীবনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসে। ধ্যান্-লোকে মানুষ চেতনার এমন এক বিপুল ব্যাপ্তি, এমন এক অন্তহীন মহিমা প্রত্যক্ষ করে যাহার ফলে মর্ত্ত্যের এই একান্ত সীমাবদ্ধ দেহ-রূপটিকে বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

ছলনা-প্রতারণা, রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু পরিকীর্ণ এই জীবনের অন্তরালে যে এক পূর্ণ সুষমা-লোক রহিয়াছে প্রেমে মানুষ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। প্রেমে মানুষ মর্ত্ত্য লোকে সেই পূর্ণ সুষমা ফুটাইয়া তুলিতে নিরন্তর সংগ্রাম করে। ইহা যেমন যে-কোন অধ্যাত্ম-সাধনার তেমনি প্রেম-সাধনারও লক্ষ্য।

পুরুষ যেন নারীকে এই সাধনার অঙ্গ স্বরূপে আশ্রয় করে। খাঁটি প্রেমের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। নর-নারীর প্রেমে আর কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে না, সমাজের দোহাই দিয়া নয় তথাকথিত ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও নয।

পরিবার ও সমাজের সকল প্রয়োজনের উর্দ্ধে যে ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম-চেতনারও অতীত যে অধ্যাত্ম পরিণাম পুরুষ নারীকে যেন এই ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার জন্ম গ্রহণ করে।

নর-নারীর এই প্রেমোপলব্ধির দিক হইতে এই কালে রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার একটি সুন্দর পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় 'মিলন' কবিতাটির মধ্যে।

প্রকৃতির মধ্যে দেখি প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে, লাভ করিতেছে, উভয়ের মিলনে আবার নূতন রূপের প্রকাশ ঘটিতেছে। প্রাণের এই

নিত্য লীলায় প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ প্রাচুর্য্যের ভারে উপচাইয়া পড়িতেছে। প্রাণের নিত্য যোগে প্রকৃতি তাই প্রাচীন হইয়াও চির নবীন।

মানব সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই এক দৃশ্য চোখে পড়ে। নর-নারীর হৃদয় আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রাণ নিত্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে; প্রাণের নিত্য মিলনে এই সংসার তাই চির নবীন। প্রেমে নর-নারী মিলিত হইবে এ আকাঙ্ক্ষা একেবারে সৃষ্টির মর্ম্ম মূলে রহিয়াছে।

"সৃষ্টির সে রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
দুজনার গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।" (মিলন)

অসীম প্রাণ স্পন্দে এই নিখিল জগৎ রূপে রূপে মহতো মহীয়ান। নর নারীর অন্তরে প্রেমে যে প্রাণের উদ্বোধন ঘটে তাহা পরিণামে উভয়কে বিশ্বের সহিত মিলিত করিয়া দেয়।

"নিবি তোরা তীর্থ বারি সে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্ত কালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে—" (মিলন)

প্রকৃতির মধ্যে নূতন সৃষ্টির জন্য মিলন লাভের এই যে প্রেরণা, সেই একই প্রেরণা নর-নারীর মধ্যে অনুভূত হয়। নর-নারীর মধ্যে মিলন ঘটাইবার এই প্রকৃতি-প্রেরণার পশ্চাতে উর্দ্ধতর পরিনাম লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে।

প্রাণের যে অনুভূতি, নর-নারীর যে মিলনাকাঙ্ক্ষা, তাহার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তাহারা উন্নততর পরিণাম লাভ করিবে। এই উর্দ্ধতর পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির অভিব্যক্তির মর্ম্মমূলে রহিয়াছে।

প্রেম প্রকৃতি পরবশ। এই প্রকৃতি বশ্যতায় যে সৃষ্টির বিকাশ ধরা পড়িতে পারে মনুষ্য সমাজে তাহারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের অথবা প্রাণের উপলব্ধি যেখানে প্রকৃতি বশ্যতা ছাড়াইয়া উঠে, সম্পূর্ণ আত্মচেতনাধিষ্ঠিত হইয়া তাহারই প্রেরণায় যে সৃষ্টি তাহা প্রকৃতির শাসন মুক্ত এমন এক দিব্য সৃষ্টি-প্রেরণা যাহার কোন উপলব্ধি আমাদের নাই।

নর-নারীর প্রেমে প্রকৃতির শাসন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতির এই শাসনের মধ্যেই উন্নততর চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রহিয়াছে বলিয়া নর নারীর অন্তরে তাহা নিত্য অতৃপ্তির অগ্নি-শিখা জ্বালাইয়া দেয়।

মানবীয় চেতনা যেখানে ব্যক্তি চেতনার সীমা অতিক্রম করে সেখানে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া সমগ্র সৃষ্টি-রূপ মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত হইয়া যায়। এক মায়া-রূপে মহামায়ার সে এক আশ্চর্য্য প্রকাশ।

"অন্তহীন কাল আর অসীম গগন,
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি ম'ন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলাল।" (সৃষ্টি রহস্য)

দিব্য-চেতনা ছিলেন আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত। তখন তিনি ছিলেন বন্ধ্যা। তিনি প্রেমে ধন্য হইতে চাহিলেন, আপনাকেই প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলেন। যুগ যুগান্ত তপস্যার পর তাঁহারই অনন্ত শক্তি দেশ-কালের মধ্যে সীমা-রূপ লাভ করিয়াছে। তিনি সীমা-রূপে আপনাকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

পুরুষও প্রেমে নারীর মধ্যে তেমনি আপনার অন্তহীন রহস্যকে বিগ্রহ রূপে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রত্যক্ষ করিবার সাধনাই প্রেমের সাধনা, তাহার পরা প্রাপ্তি। প্রেমে পুরুষ আপনার চেতনাকে অনন্ত প্রসারী দেখিবে, আবার সেই অনন্ত প্রসারী চেতনা মাত্রকে একটি বিগ্রহেব মধ্যে রূপ-বদ্ধ দেখিবে। প্রেমে রূপ ও অরূপের, সীমা ও অসীমের লীলা।

সৃষ্টির ইহাই নিগূঢ় কথা। নর-নারীর অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটাইয়া ক্রমে তাহাদের বিশ্ব-চেতনালোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া।

"আপনারে দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।" (পরিণয়)

সমগ্র সৃষ্টি-লোক জুড়িয়া বাসনার আগুণ জ্বলিতেছে। ধূলিকণা হইতে আদি অন্তহীন গ্রহ-নক্ষত্র-লোক সকলে এই অগ্নি বক্ষে জ্বালাইয়া ছুটিয়াছে। ছুটিয়া চলিয়াছে একে অন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য।

প্রেমে অসীম যিনি তিনি আপনাকে অন্তহীন রূপে রূপে সীমিত করিয়াছেন।

সকল কিছুর মূলে তাঁহারই অনন্ত প্রাণ প্রৈতি, তাঁহারই প্রেম আছে বলিয়া সকল কিছু এমন গতি চঞ্চল নিয়ত অস্থির।

প্রাণের এই জাগরণের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-প্রাণ যখন বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত হয়, তখন মানুষ আপনার চেতনাকেই অনন্ত প্রসারিত দেখে।

"নীরবে গোপনে মর্ত্ত্য ভুবন পরে
অমরাবতীর স্থর স্থরধনী ঝরে।
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার বাঁধন-হারা—" (পরিণয়)

প্রাণের স্পর্শে, প্রেমে যখন প্রাণ জাগে তখন নর-নারী আপনার মধ্যেই অনন্ত প্রাণের প্রসার বোধ করে, তখন ব্যক্তি-প্রাণ, বিশ্ব-প্রাণ-সমুদ্রে একাকার হইয়া যায়।

জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। অনন্ত প্রাণের লীলায় কত রূপ বিনষ্ট হইতেছে, আবার নূতন রূপ জাগিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে। প্রাণ-লোকে তাই চির নবীনের জয় ঘোষণা।

তেমনি বিশিষ্ট প্রেম নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সংসারে প্রেম নিত্য নূতন রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। কত প্রেম হাহাকারে বুদ্বুদের মত বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা বলিয়া সংসারে প্রেম তো হারাইয়া যায় না। অনন্ত কোটি নর-নারীর হৃদয় আশ্রয় করিয়া যুগ যুগান্ত ধরিয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

"যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
* * * *
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন তুমিও অমর।" (বাসর ঘর)

সংসারে প্রাণের ধারা চিরন্তন। ব্যক্তি-প্রাণ ক্ষণিক। এই ক্ষণিকতার ভিতর দিয়া প্রাণের ধারা নিত্য বহিয়া চলিয়াছে। এই জগতে মানুষ আসে মানুষ যায়; পশ্চাতে তাহার সকল কর্ম্মভার নামাইয়া দিয়া যায়। বিশ্ব-প্রাণের চিরন্তন ধারা ব্যক্তি-প্রাণ আশ্রয় করিয়া নানারূপে আপনার ঐশ্বর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। সে ঐশ্বর্য্য তাই সকল কালের সকল মানুষের তাহাতে ব্যক্তির

নাম-রূপ খোদিত করিয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। মানুষ যতই উন্নততর সৃষ্টি-প্রেরণা লাভ করিতেছে, ততই সে অতীত সৃষ্টির অপূর্ণতাকে আপনার হাতে বারংবার মুছিয়া দিতেছে। সেই সঙ্গে উহার সহিত বিজড়িত হইয়া কত নাম-রূপ মুছিয়া যাইতেছে, কে তাহার পরিচয় রাখে। সৃষ্টি সৃষ্টির প্রতি এমনি উদাসীন।

"জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম্ম-উপহার
রেখে গেল তার।" (নব বধূ)

ইহাই যখন জীবনের স্বরূপ, তখন জীবনের সার্থকতা কোথায়, কোন্ বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষ সান্ত্বনা লাভ করিবে? বস্তুতঃ এই চেতনাশ্রয়ী হইয়া সর্ব্বোচ্চ যে জীবন-দর্শন গড়িয়া তোলা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন। এই জীবন-দর্শনের মর্ম্ম কথা হইল মানব-প্রেম এবং প্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন।

জীবনে দুঃসহ দুঃখ আছে, বিচ্ছেদের হাহাকার আছে, তুচ্ছতা ও গ্লানির কত-না কণ্টক আছে। ইহা সত্য। কিন্তু মানুষ এই সমস্ত কিছুকে স্বীকার করিয়া লইয়া জগৎকে যদি সব কিছু দিয়া ভালোবাসিতে পারে, যদি হৃদয়ের ভালোবাসা অন্য হৃদয়ের ভালোবাসা জাগ্রত করিতে, লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না। প্রেমে আত্মত্যাগে জীবনের এমন এক আশ্চর্য্য পূর্ণতা বোধ জাগে যাহা মৃত্যুর বেদনাকেও জয় করিয়া উঠে।

"প্রাণ দিয়ে যে ভরেছে বুক
সেই তার সুখ।" (নববধূ)

মহুয়ার মধ্যে এক শ্রেণীর কবিতা আছে যে গুলির মধ্যে কবি একটি বিশিষ্ট তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই কবিতা গুলির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই তত্ত্বটির একটি সামগ্রিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা বিশেষ করিয়া অদ্বৈত বাদ চেতনাকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; একটি সৃষ্টি-লোক, (ইহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন মায়া) অপরটি সকল সৃষ্টির ঊর্দ্ধতর চেতনা, মুক্তি-লোক, মায়াবাদীরা ইহাকে বলিয়াছেন আত্মা বা ব্রহ্ম।

যে সাধনা জীবন ও জগৎক মায়া বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে শূন্যতার সাধনা বলিয়া পরিহার করিয়াছেন।

মুক্তি লাভের আশায় পুরুষ প্রতি মুহূর্ত্তে চেষ্টা করিতেছে প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে; অন্যদিকে প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে চেষ্টা করিতেছে পুরুষের অন্তরে আপনার বোধ সঞ্চারিত করিয়া দিতে।

নারী-প্রেমে পুরুষের ধ্যান-লোকে জগৎ ও জীবনের যে অসীম সৌন্দর্য্য ও রস-লোকের সন্ধান ঘটে সেই অসীম সৌন্দর্য্য ও রস-প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণা। যে প্রেমে জগৎ ও জীবন এইরূপে অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে কবি সেই প্রেমকেই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

"সেই খানেতেই আমার অভিসার
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন বনের
ছায়া তলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে।" (মায়া)

যে পুরুষ তত্ত্ব-জ্ঞান আশ্রয় করিয়া জগৎ ও জীবনের সকল সৌন্দর্য্য উন্মুলিত করিয়া দেয়, সৌন্দর্য্যের আবরণ উদ্‌ভিন্ন করিয়া কেবল যন্ত্রটিকেই বাহিরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করে, সে পুরুষেরর অন্তরে নিভৃততম প্রদেশে যদি কোথাও ক্ষীণতম ভাবেও সৌন্দর্য্য বোধ রহিয়া যায় (যাহাকে ইঁহারা বলেন মোহ) তবে ওই মোহ বা সৌন্দর্য্য বোধ আশ্রয় করিয়া মায়া ধীরে ধীরে পুরুষের সম্পূর্ণ অগোচরে আপনার প্রভাব বিস্তার করে। নারী প্রেম সেইখানে আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া পুরুষের তত্ত্ব-জ্ঞানের পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া দেয়।

নারী প্রেম, যাহা মায়াই বটে, এই রূপে পুরুষের ধ্যান-লোকে অপরূপ রূপলোক সৃজন করে। পুরুষের যে মুক্তির এষণা তাহা এই ধ্যান-লোকে, সৃষ্টির উর্দ্ধতর কোন চেতনা-লোকে নয়। নারী প্রেমে পুরুষকে এই রূপে সৌন্দর্য্য ও রস-লোকে মুক্তি দান করে। মুক্তি-তত্ত্ব বলিতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

নারী-প্রেম এবং তদাশ্রয়ী সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া পুরুষের অন্তরে উন্নততর লোক সমূহের আভাস নামে।

"গন্ধ দিবে সিন্ধু পারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন বিদেশের
কী বিস্মৃতিব।" (মায়া)

প্রেমোপলব্ধিতে পুরুষের অন্তরে যে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, উহারই চূড়ান্ত তন্ময় মুহূর্ত্তে পুরুষের চেতনা ক্ষণে ক্ষণে মর্ত্ত্য-চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। অন্তরে রূপের নিবিড় আসঙ্গ বোধ বা ধ্যান এবং ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া উন্নতর চেতনার দিব্য আনন্দ আস্বাদ করিয়া পুরুষ হয় গীতকার,রূপকার, পুরুষ হয় স্রষ্টা।

"পরশ মম লাগবে তোমাব
কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
উঠবে ভেসে।" (মায়া)

অন্তরে ধ্যান-লোকে এই যে নিত্যনূতন রূপ সৃষ্টি তাহাই নারীর সত্য রূপ। সত্য রূপ বলিবার অর্থ এই যে ধ্যানে নারীর যে রূপ প্রতিভাত হয়, তাহা সীমা বা রেখার বন্ধনে আবদ্ধ রূপ নহে। ধ্যানে নারীর যে রূপ প্রতিভাত হয়, তাহা মুক্ত-স্বরূপ এই অর্থে যে তাহাতে অসীমের চকিত আভাস লাভ ঘটে।

এই তত্ত্ব তো রবীন্দ্র-কাব্যে নূতন নয়। পরন্তু এই মূল উপলব্ধিটিকেই তিনি নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পূরবীর 'স্বপ্ন' কবিতাটি এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতেছে। সেখানে বস্তুর মুক্ত স্বরূপ সম্পর্কে কবি যে উক্তি করিয়াছিলেন, 'স্বপ্ন শুধুই মর্ত্ত্যে অমর আর সকলই বিড়ম্বনা ;' ঠিক সেই ভাবটিই বর্ত্তমান কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

"বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর
তুমি আমার আপনি রচে আপন কর।" (মায়া)

নির্ব্বিশেষ রূপ প্রেমে, সৌন্দর্য্য-ধ্যানে এমন একটি বিশিষ্টতা লাভ করে বিশ্বে যাহার আর তুলনা মেলে না। অন্তহীন রূপ-লোকে তাহা একক প্রকাশ।

পুরুষের ধ্যান-লোকটি বিশিষ্ট, বাহিরের রূপ উহারই অনুরাগের আশ্চর্য্য স্পর্শে অপরূপতা, অনন্যতা লাভ করে।

জগৎ ও জীবনের 'মায়া'-রূপ পুরুষের চেতনায় কোন্ পরিণামে মুক্তি লাভ করে এবং এইরূপে মায়ার সাধনায় কোন্ পরম পরিণাম রবীন্দ্রনাথের নিকট মুক্তি স্বরূপতা লাভ করিয়াছে তাহা হয়ত কিছুটা বুঝিতে পারা গিয়াছে। এই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ মহুয়ার আরও দুই একটি কবিতায় যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার স্বরূপটিকে এক প্রকার বুঝিতে পারা যাইবে।

মায়াবাদী তাত্ত্বিকের নিকট জগৎ ও জীবন যেমন মায়া, তেমনি আর একটি দিক আছে যেক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য বোধে এই যে মুক্তি তাহা শূন্যতা বলিয়া বোধ হয়।

যাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়া বোধ করিতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে পারি কেবল তাহাই এই শ্রেণীর মানুষের নিকট সত্য। এই শ্রেণীর মানুষের সমগ্র সত্তা বহির্বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া নির্ভরতা পায়। বহিশ্চেতনা নিরপেক্ষ যে-কোন অস্তিত্বের উপলব্ধি ইহাদের নিকট সত্য নহে।

রবীন্দ্রনাথের যে মুক্তি-লোক বা রস-লোক তাহা ভাবেরই বিচিত্র বিলাস এবং ওই ভাব আশ্রয় করিয়া উন্নততর চেতনার আভাস লাভ। এই ভাবে মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য-লোকের মধ্যে তিনি এক প্রকার সামঞ্জস্য লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে মুক্তি-লোক তাহা মায়াবাদীদের অমর্ত্ত্য-চেতনা নহে, তেমনি জড়বাদীদের কেবল মর্ত্ত্য-চেতনাও নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্। যেখানে এইরূপ উক্তি লাভ করা যায়—

"যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।" (ছায়ালোক)

সেখানে তত্ত্বজ্ঞান বলিতে মায়াবাদীদের ব্রহ্মজ্ঞানও যেমন হইতে পারে, তেমনি জড়বাদীদের বস্তুতত্ত্বও হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমের কোন মূল্য নাই। একদিকে মর্ত্ত্য-প্রেমকে মায়া বলিয়া সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করা হইয়াছে, অন্যদিকে নারীর মূল্য কেবল প্রয়োজন বোধের দ্বারা নির্ণীত।

যদি সৌন্দর্য্য বোধের ক্ষীণতম আভাসও এই সমস্ত পুরুষের অন্তরে থাকে, তবে সেই সৌন্দর্য্য বোধ আশ্রয় করিয়া অন্তরে প্রেম জাগে। অন্তরে প্রেম বা প্রাণ জাগ্রত করিয়া তুলিতে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য জড়বাদীদের অন্তরে এমন একটি অতৃপ্তি বোধ সঞ্চারিত করিয়া দেয় যাহাকে বাহিরের কোন কিছুর দ্বারা পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারা যায় না। অন্যদিকে ক্ষণে ক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানাদের শূন্যচিত্তে প্রকৃতির কিংশুক রক্তিমা লাঞ্ছিত হইয়া যায়। ওই অতৃপ্তি বা ওই রক্তিমা লাঞ্ছনের ভিতর দিয়া পুরুষের চিত্তে অনুরাগ জাগে।

> "সেথায় আমি যাব যখন চৈত্র রজনীতে
> বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা
> চাঁদের আলোয় ঘুম হারানো পাখির কলগীতে
> পথ হারানো ফুলের রেণু মেশা।" (ছায়ালোক)

আর কিছু নয় একটা সৌন্দর্য্য-লোক ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা। চৈত্রের রাতে বাতাস উতলা হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় শাখান্তরাল হইতে মাঝে মাঝে পাখি ডাকিয়া উঠিতেছে আসন্ন প্রভাত বোধ করিয়া। সারারাত তাহাদের চোখে ঘুম নাই। ফুলের গন্ধ ও রেণু বিজড়িত বাতাসে সেই কলকাকলি মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যেন স্বপ্নের জাল বুনিতে থাকে। তখন মনের মধ্যে এক অনাস্বাদিত বেদনা জাগে, যে বেদনায় বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল ফুটে, কিশলয় জাগে, সেই বেদনার পথ বাহিয়া মন কোন্ অজ্ঞাত লোকে অভিসার করে কে জানে। কাহাকে লাভ করিতে তাহার এমন ব্যাকুলতা, তাহা সে জানে না। শুধুমাত্র জানে যে তাহাকে লাভ না করিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রেমে মানুষ অন্তরের ধ্যানটিকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করে, তাহাকে বাহিরে নানা ভাবে রূপায়িত করিতে চায়।

এই তত্ত্ব সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত বিজড়িত। স্রষ্টা আপনার অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে

বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলেন। ইহা প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া দেশে-কালে তিনি অন্তহীন রূপ-লোক সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টি-লোক আশ্রয় করিয়া তিনি নিত্যকাল আপনার ধ্যান-রূপটিকে প্রেমে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বস্তুত প্রত্যেক চেতনা-পর্ব্বে সৃষ্টির এক একটি পর্য্যায় আছে। এই সৃষ্টির পর্য্যায় ব্যতীত চেতনা বন্ধ্যা। চূড়ান্ত তত্ত্বের কথা থাক্। অন্তত সৃষ্টি-লোকে রূপ এবং চেতনা অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত। একটি ব্যতীত আর একটির কোন অস্তিত্ব নাই।

প্রেম যে চেতনা জাগ্রত করে পুরুষ তাহাকে নানা রূপে বাহিরে সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া তাহার অবিরাম সৃষ্টি-ক্রিয়া চলে। নারীর বাস্তব রূপ গৌণ। পুরুষ নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া তাহার আপনার রূপ-ধ্যানকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করে।

"সে রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে,
যে-রূপ তোমার পরাণ দিয়ে আঁকা।" (ছায়ালোক)

প্রেমে বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। এই ধ্যান-লোকে উন্নততর চেতনার আভাস লাভ ঘটে বলিয়া যে রূপ প্রতিভাত হয় তাহা বাহিরের রূপ আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও তাহা বহিঃ সৌন্দর্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আর এক সামগ্রী হইয়া উঠে। অন্তরের ধ্যানে সৌন্দর্য্য অপার মহিমা লাভ করে। নিত্য নূতন রস-বিস্ময়ে মনকে আবিষ্ট করে।

কখন কখন ধ্যানের এই সৌন্দর্য্যকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। যে-রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরের ধ্যান সমৃদ্ধ হইয়াছে সেই ধ্যান লব্ধ সৌন্দর্য্যকে পুরুষ ওই বিগ্রহের মধ্যে অনুসন্ধান করে।

"কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপন কায়া
তোমার মর্ম্মের মাঝখানে।" (ছায়া)

নারীর মর্ম্মের মাঝখানে এই যে 'স্বপন কায়া' তাহা তো নারীর মধ্যে নাই। পুরুষের ধ্যান-রূপটি নারীর রূপের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া পুরুষের দৃষ্টিতে ওই রূপ অপরূপের বিস্ময় দান করে।

"বসন্ত কুঞ্জিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে।" (ছায়া)

সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলাম। নারীর কণ্ঠস্বরে অমর্ত্ত্য আর এক সুর ঝঙ্কারের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু পুরুষের ধ্যান-লব্ধ শ্রুতি, তাহার কোন পরিচয় বাহিরে নাই। সেই উপলব্ধিটিকেই অন্য এক ভাবে পুনরায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভীড়ে।" (ছায়া)

মূল এই কথাটিই আমাদের বুঝিলে চলিবে যে অন্তরে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া মানুষের চেতনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উর্দ্ধতর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। 'অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে', 'অশ্রুত কাহার বাণী মেশে', কিংবা 'স্বপন কান্না' ইত্যাদি বোধ জাগে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধতর লোকের চকিত আভাস লাভের ফলে।

নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে যে ধ্যান-লোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই ধ্যান-লোকে নিত্য নূতন রূপ-সৃষ্টি করিয়া পুরুষের চেতনা অন্তহীন অভিসার করিয়া চলে। রস-লোকের দ্বারের পর দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া এই যে রূপাভিসার, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ইহাকেই মুক্তি তত্ত্ব স্বরূপে আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। সেই সৌন্দর্য্য-লোকের কথাই কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

"সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে। (সন্ধান)

কিন্তু অন্তহীন সৌন্দর্য্য-ধ্যানে পুরুষের এই যে মুক্তি, তাহার মধ্যেও অপূর্ণতার পীড়া লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই বেদনা বোধটিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে কথা নহে। এই বেদনা বোধেরই বা স্বরূপ কি। তাহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম, যে সীমার যে-কোন স্বরূপে মানবীয় চেতনা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

সেই একই চেষ্টার পরিচয় এক্ষেত্রেও লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতেও অসম্পূর্ণতার বেদনা কবি বোধ না করিয়া পারেন নাই।

"আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে,
অজানার মাঝে অবুঝের মত ফেরে
অশ্রুধারায় মজে।" (সন্ধান)

অন্তরে ধ্যান-লোকে রূপের সহিত যখন নিত্য মিলন ঘটে তখন বাহিরের রূপ হারাইয়া গেলেও হৃদয় আর শূন্যতার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে না। রূপ ধ্যানে যখন স্থির পরিণাম লাভ করে, তখন রূপ মুক্তি দেয়। যেখানে বাহিরে রূপ হারাইয়া গেলে অন্তর শূন্যতায় ভরিয়া যায় এবং শূন্যতার ভারে মানুষের মন একেবারে শতধা হইয়া যায় রূপ সেখানে বন্ধন।

বাহিরে রূপের বিনষ্টিতে অন্তর যখন নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় তখন ওই অন্ধকার-লোক অতিক্রম করিয়া প্রাণের দুর্জ্জয় শক্তির বশে মনুষ্য চেতনায় আর এক রূপ সাক্ষাৎকার ঘটে। ধ্যান-লোকে এই যে রূপ সাক্ষাৎকার এবং তাহার সহিত যে নিত্য মিলন রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বলিয়াছেন সাধনা। মানুষ যেখানে বিরহের এই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে দিব্য আর এক রূপ সাক্ষাৎ করিতেছে সেই খানেই সৃষ্টি, সেইখানেই সঙ্গীত। নহিলে শুধু শূন্যতা বোধে যেমন গান নাই, তেমনি পরিপূর্ণ প্রাপ্তিতেও সঙ্গীত নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

"তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ।" (বিচ্ছেদ)

বিচ্ছেদের অন্তহীন অশ্রু-সমুদ্রের দুই তীরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে সুরের প্রবাহ। শুধু বিচ্ছেদ তো নয়, উহার বেদনার ভিতর দিয়া যে সঙ্গীত জাগে। 'গানের বিচ্ছেদ' শব্দটির ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

অসীম বা অরূপ যিনি তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের তো কোন প্রকাশ ছিল না। দেশ-কালের পরিসীমায় তিনি আপনাকেই রূপে বিশ্লিষ্ট করিলেন। রূপও অরূপের এই আপাত বিচ্ছেদ (ইহাই শাশ্বত মায়া তত্ত্ব) সৃষ্টির মধ্যে রূপ-রস-গন্ধ প্রাচুর্য্যের

ভারে উপচাইয়া পড়িতেছে। নর-নারীর বন্ধ্যা একক চেতনা প্রেমে দ্বিধা হইয়া যায়। তখন সেই যুগল লীলায় অন্তর্লীন সকল ঐশ্বর্য্যের একে একে প্রকাশ ঘটে।

'অন্তর্দ্ধান' কবিতাটির মধ্যে এই তত্ত্বটির সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

"বিচ্ছেদেবি হোম বহ্নি হতে
পুণ্য মূর্ত্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।" (অন্তর্দ্ধান)

বিচ্ছেদের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া ধ্যান-লোকে ধীরে ধীরে ওই রূপ ফুটিয়া উঠে। পুরুষের বেদনা-দীপ ওই মূর্ত্তিকে নিত্য উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলে। নিত্য নিভৃত অশ্রুপাতে ওই ধ্যান-মূর্ত্তিকে সে নিষিক্ত করিয়া দেয়।

ধ্যানে রূপের সহিত এই যে নিত্য আসঙ্গ তাহাতে অপার বেদনাবোধ আছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উর্দ্ধতর চেতনা-লোকে ওই বোধকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে চান নাই। তাহাতে বেদনা হয়ত লোপ পায় কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বৈত বোধটি আর থাকে না বলিয়া প্রেমের এই বিশিষ্ট সম্ভোগটিও আর থাকে না। সেই একই তত্ত্ব—

"তুমি কবে মর্ম্ম মাঝে পশি
আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী॥" (বিরহ)

নর-নারীর প্রেমের কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম্মের পরিচয়ও কবি ইতস্ততঃ দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিচিত্র ধর্ম্ম নহে, একই বোধের বিচিত্র বিলাস মাত্র। 'মহুয়া' কাব্য পাঠ করিতে বসিয়া এই দিকগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ প্রয়োজন।

পুরুষের প্রেমে তাহার প্রেম নিবেদনে এমনি অধ্যাত্ম-প্রত্যয়। বাহিরে আশা বিশ্বাসের ক্ষীণতম আভাস যদি না থাকে, যদি বাহিরে তাহার পরিচয় হারাইয়া যায়, তবু পুরুষের প্রেম ধ্যান-লোকে অনির্ব্বাণ নিঃসংশয়ের দীপ জ্বালাইয়া রাখিতে পারে। পুরুষের প্রেমে এই যে দৃঢ় প্রত্যাশা, তাহার রূপক-স্বরূপ কদম্ব ফুলের অর্ঘ্যের উল্লেখ সার্থক কবি কল্পনার পরিচায়ক।

যেদিন আকাশ ঘিরিয়া মেঘ নামে, সূর্য্যের সকল দাক্ষিণ্য হইতে ধরণী যেদিন বঞ্চিত, তাহার অসীমতার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া সীমার পর সীমা টানিয়া দেয়, ধরিত্রীর কান্নাই যেন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ধারার পর ধারায় নামিয়া আসিতে থাকে, সেদিনও

কদম্ব ফুল কেশরে রৌদ্রের স্বপ্ন লইয়া ওই নৈরাশ্য জয় করিয়া জাগিয়া থাকে। প্রিয় মিলনে ইহা সাময়িক বিচ্ছেদ বোধ মাত্র, একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন—সূর্য্য-দয়িতের সহিত তাহার মিলন ঘটিবেই।

"মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়
বৃন্ত ছিল ক্লান্তি হীন তখনো সে পড়েনি ধূলায়
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার দিনু উপহার।" (পরিচয়)

নারীর প্রেম পুরুষকে সৌন্দর্য্য-ধ্যানের লোকে, রস-লোকে মুক্তি দান করে। যেখানে পুরুষ নারীকে বাহিরে আপনার ভোগের আবেষ্টনে লাভ করিতে চায়, সেখানে পুরুষ যেমন স্বধর্ম্ম চ্যুত হয়, নারীর প্রকৃতিও তেমনি বিকৃত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে এমন মন্তব্য করিয়াছিলেন, যে মাতাল দীপ-শিখাকে আলিঙ্গন করিতে চায়, সে যেমন নিজে পুড়ে তেমনি দীপ-শিখাটিকেও নিভাইয়া দেয়।

নারীর প্রেমে তাই দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য-সৌরভের দিক, সেই সৌরভ পুরুষের ধ্যানকে সদা জাগ্রত করিয়া রাখে। আর একটি তাহার দেহ-ধর্ম্মের দিক, সম্ভোগের মধ্যে যাহা পুরুষের সমস্ত ধর্ম্মকে মুহূর্ত্তে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। নারী-প্রেমের এই ধর্ম্মটি কেতকী ফুলের রূপকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিদ্ধ-কণ্টকের জ্বালার ভিতর দিয়া পুরুষকে নারী-প্রেমের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয়।

"সহজ সাধন লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন
অন্তরে ঐশ্বর্য্য রাশি আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।" (পরিচয়)

যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, সেই সঙ্গে মানুষের বহু বিচিত্র কীর্ত্তি, কত-না-প্রয়াস একদিন ধূলিসাৎ হইয়া পড়ে। একদিনের গৌরব, আর একদিনে স্মরণেও থাকে না। সেখানে কেবল প্রেম চিরন্তনী। উহারই স্নিগ্ধ ছায়ায়, উহারই

শীতল ধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া জীবনের এই কয়েকটা দিন কাটাইয়া দেওয়া।

চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অদূরে ভগ্ন দেউল হৃত গৌরব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যে প্রান্তরের উপর দিয়া একদিন রাজধানীর প্রশস্ত পথ রচিত হইয়াছিল, আজ সে রাজধানী নাই সে পথও নাই। নির্জ্জন প্রান্তরের প্রান্তে পায়ে চলা পথ দিয়া নিঃসঙ্গ জনপদ বধূ কেবল কলসীতে জল ভরিয়া ঘরে ফিরিতেছে। এই চতুর্দ্দিক ব্যাপী রিক্ততার মাঝখানে কেবল দুটি শ্যামল তরু দাঁড়াইয়া।

জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুই বুঝি এমনি অন্তহীন পাষাণ ভার। নর-নারী যেখানে প্রেমে মিলিত হয়, সেইখানেই কিছু শ্যামলিমা, কিছু প্রাণের মৃদু গুঞ্জরণ, অর্থের চকিত আভাস।

জীবন অবসানে নর-নারীর অন্তরের এই দুর্লভ ধন হয়ত হারাইয়া যায় কিন্তু প্রেম বা প্রাণ চিরন্তন। যুগ যুগ ধরিয়া নর-নারী পরস্পরকে ভালোবাসিবে, একই চিরন্তন প্রেম, একই প্রাণ-ধারা উভয়ের হৃদয় আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইবে।

"আর কোন যুগে অন্য যুগের প্রিয়া
তারে আর কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া।" (বাণী)

সমগ্র কাব্য-দেহ বেষ্টন করিয়া এমন একটি করুণ সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যাহাকে ভাষা-বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় না।

"অসীমের বুকে অনাদি বিষাদি খানি
আছে সারাক্ষণ মুখে আবরণ টানি।" (বাণী)

এই অনাদি বিষাদের সুর সমগ্র কবিতাটি পরিপূর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রেমে প্রত্যাশায় স্বরূপটিও কি কম বিস্ময়ের। যাহাকে কোন কালে ফিরিয়া লাভ করা যাইবে না, যাহার সকল চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, তখনও অন্তরের কোন্ স্থির বিশ্বাসে প্রেমিকা অনন্ত রজনীর প্রহর গননা করিয়া চলে। তাহারই নামের মালা জপিতে জপিতে আয়ু শেষ হইয়া আসিলেও অন্তরে মিলনের দৃঢ় প্রত্যয় বহিয়া সে মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া যায়। কোথায় কোন্ লোকে মিলিত হইবে বলিয়া তাহার এই বিশ্বাস। ধ্যানের কোন্ দিব্য-আলোক মৃত্যুর

ঘন কৃষ্ণ যবনিকাকেও বিদীর্ণ করিয়া লোক লোকান্তরকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলে, তাহা আমরা জানি না। প্রেমিকার বহিশ্চেতনায় মাঝে মাঝে সংশয় জাগে বৈকি। তখন সে কী বেদনা বোধ। তাহার অসহনীয় নিপীড়নে প্রতি রোমে রোমে রক্তধারা নিস্থত হইতে চায়। সেই আবেগ মুহূর্ত্তেও অন্তরের ধ্যান অচঞ্চল আলোক-শিখা বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

"আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ শব্দে মেতে।" (প্রত্যাশা)

সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি যেন বিরহিনী বধূ। চির নির্ব্বাসিত কোন দয়িতের জন্য নিত্য প্রত্যাশার অগ্নি বক্ষে জ্বালাইয়া দ্বার প্রান্তে আকাশ নীলিমার উদার সিক্ত দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া থাকে। কবি বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট হইতে এই প্রত্যয় রহস্য শিক্ষা করিতে চান।

"হায় গো আমার ভাগ্য রাতের তারা
নিমেষ গগন হয়নি কি মোর সারা।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গনময় বনের বাতাস এলো মেলো,
সে কি এলো।" (প্রত্যাশা)

মহুয়ার মধ্যে কবির অধ্যাত্ম সংগ্রামের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার স্বরূপ না বুঝিলে কাব্য পাঠ সম্পূর্ণ হইবে না। পরিশেষে তাই তাহারই একটি দিক নির্দ্দেশ করিব।

মহুয়ার মধ্যে কবি সৌন্দর্য্য ও প্রেম আস্বাদের জন্য যেমন প্রাণ প্রার্থনা করিয়াছেন, তেমনি এই সৌন্দর্য্য ও প্রেম লীলায় কিছু কাল যাপনের পর ইহাকে আবার তিনি পরিহার করিয়াছেন। ইহা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন, যে ইহার পথ বাহিয়া মানবীয় চেতনা খুব বেশীদূর উর্দ্ধগামী হইতে পারে না।

মানবীয় চেতনার উর্দ্ধাভিসারে সৌন্দর্য্য ও প্রেমানুভূতির একটা সীমা আছে বলিয়া কেবল যে কবি ইহাকে পরিহার করিয়াছেন তাহা নহে, অবসিত যৌবনে ক্লান্তি জনিত, অসামর্থ্য জনিত একটি অসহায় বোধের গোপন হাহাকারও উহার সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে।

একথা ইতিপূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে ইন্দ্রিয়-প্রাণের সামর্থ্য যখন স্বাভাবিক ভাবে কমিয়া আসে তখন প্রকৃতি হইতেই নির্দ্দেশ আসে অধ্যাত্ম-জীবনটিকে আশ্রয় করিবার। বসন্তে ফুলের ঐশ্বর্য্যের পর গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ফল ফলানোর পর্য্যায় আসে।

পরিণত বয়সে এমনি করিয়া একটি পর্য্যায় শেষ করিয়া আর একটি পর্য্যায় সুরু করিতে হয়। তাহা না হইলে অর্থাৎ বাহিরের রূপ মাত্রকে আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয় প্রাণের অসামর্থ্যে এই রূপ দিনে দিনে স্তিমিত হইয়া আসে। প্রাণের হাহাকার দিনের পর দিন বাড়িয়া যায়। পরিশেষে এক সান্ত্বনা শূন্য হাহাকারের মধ্যে জীবন হারাইয়া যায়।

অধ্যাত্ম-জীবনে এই যে পরিণামের কথা বলিলাম তাহা লাভ করিতে কিংবা আশ্রয় করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কি মর্ম্মান্তিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই? ইতিপূর্ব্বে এই সংগ্রামের পরিচয় আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই লাভ করিয়াছি। মহুয়ার মধ্যে ইহার যে সামান্য পরিচয় আছে প্রসঙ্গতঃ তাহা উল্লেখ করিব।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মানবীয় প্রেম আস্বাদের জন্য কবি অন্তরে আজ প্রাণের উদ্বোধন ঘটাইতে চান। ফাল্গুনে প্রকৃতির মধ্যে কেবল প্রাণের সাড়া জাগে নাই, কবির অন্তরে সেই প্রাণের স্পর্শ আসিয়া লাগিয়াছে।

"প্রাণদেবতার মন্দির দ্বার
যাকরে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।" (অর্ঘ্য)

কবির এই সুপরিণত জীবনে এই নূতন সৃষ্টির মূলে আছে প্রাণের অনুভূতি। প্রাণের বোধ সঞ্চারিত হইবামাত্র সৃষ্টির এক প্রবল প্রেরণা কবির জীবনে আসিয়া গিয়াছে।

"আমার প্রকাশ নতুন বচন ধরে
আপনাকে আজ নতুন বরণ করে।" (অর্ঘ্য)

যৌবনে অতি সমৃদ্ধ প্রাণ প্রাচুর্য্যে কবি একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন, প্রাণ-ধারার স্পর্শে কবি কণ্ঠে আজ সেই গান ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। যৌবনে কবি যে চেতনাশ্রয়ী ছিলেন সেই চেতনাশ্রয়ী হইতে আবার সেই চেষ্টা জাগিয়াছে।

"কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিলে লীলা ভরে
দুয়ার খোলা পুরানো খেলা ঘরে
যেখানে বসে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি।" (মুক্তি)

যৌবনের একই ভাবে ভাবিত হইলেও কবির অন্তরে সেই প্রাণ যেমন গভীর ভাবে অনুভূত হইতে পারে না, তেমনি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ভাব কল্পনাগুলির সেই পরিপূর্ণ প্রকাশও ঘটিতে পারে না। সুপরিণত বয়সে অতিক্ষীণ প্রাণ-ধারায় যৌবনের স্মৃতি-লোকটি কেবল উদ্বেল হইয়া উঠে। সৌন্দর্য্য ও প্রেম আস্বাদ করিবার আকাঙ্ক্ষা অথচ জীবনে তাহার অক্ষমতা বোধ কবির অন্তরকে বেদনা বিক্ষুব্ধ বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'পুরাতন' কবিতাটি সম্পূর্ণ পাঠ করা যাইতে পারে। আমি এক্ষেত্রে তাহারই কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে।" (পুরাতন)

কবির জীবনে আজ যৌবনের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের স্মৃতি-লোকটিই একমাত্র সম্বল। নূতন করিয়া প্রাণের সম্পদ আহরণের শক্তি কবির জীবনে প্রায় নিঃশেষিত।

"শুনি যেন কানন শাখায়
বেলা শেষের বাজায় বেণু
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণ ভরা গন্ধ রেণু।" (শেষ মধু)

কবির জীবনেও ফাল্গুন অবসিত হইয়া গিয়াছে, আজ কেবল তাহার স্মৃতিকেই গভীর মমতায় জড়াইয়া ধরিতে পারা যায়।

কবি সৌন্দর্য্য ও প্রেম আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই অসামর্থ্য বোধ করিয়া স্মৃতি-লোকটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে যে কবি বহির্জীবনকে পরিহার করিয়াছেন, কেবল বাধ্য হইয়াই নহে, মহত্তর পরিণামে ইহাদের সত্য মূল্য খুব বেশী নাই বলিয়া।

"সারাটা বেলা সাগর ধারে
কুড়ালি যত নুড়ি
নানা রঙের শামুক ভ'রে
বোঝাই হল ঝুড়ি'
লবণ পারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়।" (অবশেষে)

বহির্জীবনকে আশ্রয় করিয়াও অন্তরে অধ্যাত্ম-লোকের গভীর বাণী কবি বারংবার শুনিয়াছেন। এই আহ্বানে উন্মনা হইয়া কবি কতবারই তো কর্ম্ম ভুলিয়া, ঝিনুক সংগ্রহ পরিহার করিয়া অন্তর্জগতের অতল গহ্বরে অধ্যাত্ম-সমুদ্রের তীরে বসিয়া তাহার বাণী শুনিয়াছেন। অজানিত গভীর গোপন বেদনায় কবির দুই চক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া বারংবার অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাকুলতার অর্থ কবি তখন বুঝিতে পারেন নাই। কখনও বা বুঝিতে পারিয়া বারংবার অজানা সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাকেই বলিয়াছিলাম ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের জন্য গভীর গোপন বেদনা। এই অধ্যাত্ম পরিণামের জন্যই তো মানুষকে অন্তর্লোকটিকে আশ্রয় করিতে হয়। অন্তরের ওই পথ ছাড়া উন্নততর পরিণাম লাভের আর কোন উপায় নাই।

"ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকুল তল জুড়ি
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।" (অবশেষে)

কবি অবশেষে অন্তর্জগৎটিকে আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে কবি-চিত্তের দ্বন্দ্বটি আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

"কাননবীথি ফুলের রীতি
না হয় গেছে ভুলি
তারকা আছে গগন কিনারায়।" (অবশেষে)

যৌবনের সৌন্দর্য্য-প্রেমের পর্য্যায় যদি শেষ হইয়া থাকে, তবে আশ্রয় করিবার মত অন্তরে ধ্যান-লোক আছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, এই আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে পূর্ণতর চেতনা লাভের গভীরতর আনন্দের কোন প্রকাশ নাই। যেন একটির পরিবর্ত্তে আর একটিকে আশ্রয় করা, কাননের ফুলের পরিবর্ত্তে আকাশের তারা। একটা সংশয়ের গোপন পীড়ার ক্ষীণতম আভাস যে ইহার মধ্যে নাই তাহাও নহে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা যেমন সামঞ্জস্যের সাধনা, তেমনি তাঁহার প্রেমোপলব্ধির ক্ষেত্রেও একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য বোধের সন্ধান লাভ করিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমোপলব্ধির ক্ষেত্রে দেহ-রূপের আকর্ষণ ও সৃষ্টি যেমন আছে, তেমনি ভাবের আকর্ষণ ও সৃষ্টি, এবং চিন্তার আকর্ষণ ও সৃষ্টিও আছে। অর্থাৎ তাঁহার প্রেমে দেহ-রূপ, ভাব-রূপ, চিন্তা-রূপ ও নির্ব্বিশেষ আনন্দ পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রেমে কোন একটি রূপ লাভের জন্য আর একটি রূপ অস্বীকৃত হইয়া যায় নাই। এই পূর্ণ সামঞ্জস্যের জন্য সৃষ্ট রূপের ক্রম নির্দ্দেশও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের চিন্তায় এই সামঞ্জস্য তত্ত্বের একান্ত অভাব। তাহার ফলে তাঁহাদের প্রেমোপলব্ধির ক্ষেত্রেও এই একই ভাবের পরিচয় লাভ করা যায়। চেতনারক্রম অনুসারে প্রেমে রূপ বা দেহ-সৃষ্টি আছে, কবিও শিল্পীদের বিচিত্র ভাব-ভাবনা ও জ্ঞানের সৃষ্টি আছে, এবং পরিশেষে সকলের ঊর্দ্ধে সমাজও রাষ্ট্র সৃষ্টির চেতনা আছে। তিনি 'ideas' 'forms' বা 'universals' বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাদের সহিত বিশিষ্ট জড়-রূপের যোগের যেমন রহস্যভেদ নাই, তেমনি বিভিন্ন 'ideas'-র মধ্যে এবং পরিশেষে 'Idea of good' র মধ্যে এই সকল 'ideas'-র যোগের কোন সন্ধান লাভ করিতে পারা যায় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় প্লেটোর দার্শনিক চিন্তায় যেমন, তেমনি প্রেমোপলব্ধির ক্ষেত্রে ভাব ও রূপের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে। প্রেম সম্পর্কে প্লেটোর যে দার্শনিক উপলব্ধি তাহার কিয়দংশ কিছু বিস্তারিত ভাবে এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে উভয়ের দার্শনিক উপলব্ধির মূল পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

'He who wishes to approach love rightly should turn in youth to beautiful forms, and first love one such from only—out of that he should create fair thoughts ; and soon he will of himself perceive that the beauty of one form is akin to the beauty of another and then if beauty of from in general is his pursuit, how foolish would he be not to recognize that the beauty in every from is one and the same. And when he perceives this he will cease to concentrate his love on a single object—that will seem foolish and petty to him—and will become a lover of all beautiful forms ; in the next stage he will consider that the beauty of the mind is more honourable than the beauty of the outward from. So that if he meets some one with few charms of person but whose nature is beautiful, he will be content to love and care for him, and will being to birth thoughts which make youth better, until he is compelled to contemplate and see the beauty of institutions and laws and to understand that the beauty of them all is akin, and that personal beauty is a trifle ; and after laws and institutions he will go on to the science, that he may see their beauty and not be like a servant in love with the beauty of one youth or man or institutions, slavish, mean, and petty, but drawing towards and contemplating the vast sea of beauty, he will create many fair and lofty thoughts and notions in boundless love of wisdom ; until on that shore he grows and strong, and at last the vision is revealed to him of the single science, which is the science of beauty every where."

"He who has been instructed so far in the mystry of love, and who has learned to see the beautiful correctly and in due order, when he comes toward the end will suddenly perceive a wondrous beauty. It is eternal, uncreated, indestructible, subject neither to increase or decay ; not like other things partly beautifnl, partly ugly ; not beautiful at one time or in one relation or in one place, and deformed in other times, other relations, other places ; not beautiful in the opinion of some and ugly in the opinion of others. In is not to be imagined as a beautiful face or from or any part of the body, or in the likeness of speech or knowledge ; it does not have its being in any living thing or in the sky or the earth or any other place. It is Beauty absolute, separate simple and everlasting, which with out diminution, and without increaes, or any change is emparted to the evergrowing and perishing beauties of all other things. If a man ascends from these under the influence of the right love of a friend, and begins to perceive that beauty, he may reach his goal. And the true order of approaching the mystery of love is to bagin from the beauties of earth and mount upwards for the sake of that other beauty, using these as steps only and from one going on to two, and from two to all beautiful forms, and from beautiful forms to beauty of conduct, and from beauty of conduct to beauty of knowledge, until from this we arrive at the knowledge of absolute beauty, and at last know what the essence of beauty is."

বনবাণী

বিশ্ব-প্রাণ প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য রূপে এবং মানুষের মধ্যে প্রেম রূপে অভিব্যক্ত। কখনও বহিঃসৌন্দর্য্যের ধ্যানে কখনও মানব প্রেমের ধ্যানে কবি সকল সীমার অতীত বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম বোধ করিয়াছেন।

বনবাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে কবি বিশ্ব-প্রাণের সংযোগ লাভের জন্য একমাত্র প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছেন। মানব প্রেমকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়া কেবল মাত্র প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার মধ্যে কি কোন গূঢ় কারণ আছে?

তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কবি এই কাব্যের ভুমিকায় বনবাণী সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে কবির কাব্য-ধারার এই পরিণামটিকে বুঝিয়া লইতে সুবিধা হইবে।

"মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রেব উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙ্গে রঙ্গে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম শিবম অদ্বৈতম্। সেই সুন্দবের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রানি দেখি ফুলে ফুলে পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্ম্মল অবাধেব বাণী শুনি।"

"গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলন সঙ্গীতে বদ্‌সুর লাগে না।"

"সেই প্রথম প্রাণপ্রেতির নব নবোন্মেষ শালিনী সৃষ্টির চির প্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।"

"সেই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবে আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই।"

নর-নারীর মিলন বোধ প্রাণেরই বোধ। প্রেমে যে প্রাণের উদ্বোধন তাহাতে উহা দুটি বিপরীত শক্তি রূপে ক্রিয়া করে, একটির প্রেরণায় উভয়ে সমগ্র বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রেমের ইহা আসক্তির দিক। এই দিকটি প্রবল হইয়া নর-নারীর জীবনে ঘোর বিনষ্টি ঘটায়।

প্রেমের আর একটি দিক আছে, যেদিকে সে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া অসীম ব্যাপ্তি লাভ করিতে চায়। বিশ্ব-প্রাণের যোগে নর-নারীর প্রেম যতই ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে ততই তাহা আসক্তি মুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধ আনন্দের সামগ্রী হইয়া উঠে।

নর-নারী যখন আপনার প্রেমকে সমগ্র বহির্বিশ্বের সহিত যুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করে তখন ওই প্রেম বন্ধন স্বরূপ না হইয়া মুক্তির আস্বাদ ঘটায়।

প্রেমকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত করিবার সার্থকতম উপায় প্রকৃতির নিবিড় আসঙ্গ লাভ। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলন সঙ্গীতে বেসুর লাগে না।"

এই তো গেল দুটি পর্য্যায়, একদিকে প্রেমে প্রাণের উদ্বোধন, অন্যদিকে প্রকৃতির সহিত মিলনে বিশ্ব-প্রাণের মহামুক্তির আস্বাদ।

'বনবাণী'র মধ্যে মনুষ্য চেতনার পরম পরিণাম বা মুক্তি-তত্ত্ব স্বরূপে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রাণ-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছেন। 'বনবাণী'র কাব্য-প্রেরণা ইহার উর্দ্ধ পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইহারও উর্দ্ধতর পরিণাম যে আছে সে সম্পর্কে এই কালেও কবি সচেতন। ভূমিকায় কবি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

"এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে (অর্থাৎ বিশ্বচেতনা লাভের পর) স্নিগ্ধ হয়ে আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই।"

ভূমিকায় কবি এই রূপে ব্যক্তি-চেতনা, বিশ্ব-চেতনা এবং দিব্য-চেতনার ক্রমিক তিনটি পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রেমে ব্যক্তি-চেতনায় প্রাণের জাগরণ, বিশ্ব-চেতনায় তাহার মহা ব্যাপ্তি এবং দিব্য-চেতনায় তাহারই পরম পরিণাম।

কিন্তু যে কথা উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এই যে বিশ্ব-চেতনা লাভের জন্য কবি মানব প্রেমকে অস্বীকার করিয়া একমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ধ্যানকেই আশ্রয় করিলেন কেন; কেবল তাহাই নহে প্রেমে প্রাণের যে উদ্বোধন তাহাকে কবি আজ একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছেন।

প্রেমে প্রাণের যে জাগরণ তাহার মধ্যে আসক্তির একটা দিক আছে সত্য, কিন্তু ওই আসক্তির দিকটিকেই অমন একান্ত করিয়া তুলিবার কারণ যৌবনের যে দুর্ব্বার

শক্তি ওই আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে পারে, কবির জীবনে সে যৌবন অবসিত।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ধ্যানেও বিশ্ব-সত্তার সংযোগ লাভ ঘটে, একথাও সত্য যে ইহার জন্য মানুষকে আসক্তি বা প্রবৃত্তির সহিত দুরন্ত সংগ্রাম করিতে হয় না, কিন্তু প্রেমে আসক্তির সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়া নর-নারীর চেতনা যখন বিশ্ব-চেতনা লাভ করে, তখন উভয়ের দেহ-প্রাণ-মন-আত্মার যে বিরাট মহিমা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহার পরিচয়ও অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

কেবলমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-প্রাণ যেখানে বিশ্ব-প্রাণের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে সেখানে জীবনের এই জাতীয় ঐশ্বর্য্যের কোন পরিচয় থাকে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবির 'সোনার তরী' 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, সেখানে যে-প্রাণ-লীলা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে মর্ত্ত্য-প্রেম-পিপাসা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-পিপাসা একাকার হইয়া গিয়াছে। প্রাণের আবেগ কখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কখন বা মর্ত্ত্য-প্রেম আশ্রয় করিয়া বারংবার রূপ লাভ করিয়া আবার নির্ব্বিশেষ প্রাণ-লীলায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্ব-প্রাণের সে এক অত্যাশ্চর্য্য লীলা। সেইরূপ কোন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় যে 'বনবাণী'র মধ্যে নাই তাহা নিশ্চয়ই আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না।

দিব্য-চেতনাই দেশ-কালের পরিসীমায় অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। সীমাহীন শক্তি সমুদ্রের বক্ষে রূপের সংখ্যাতীত ঢেউ জাগিয়া উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। সেই অন্তহীন প্রাণ-লীলার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দান করিয়াছেন।

"সে জীবন
মরণ তোরণ দ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্ত কালের তীর্থ পথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহ রথে।" (বৃক্ষ বন্দনা)

মৃত্যু তো জীবনের নিঃশেষ বিনষ্টি নয়, মৃত্যু জীবনের অন্তহীন পথ চলার এক একটি তোরণ দ্বার। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষ লোক হইতে লোকান্তরে নব নব দেহরূপ লাভ করিয়া চলে। এক প্রাণ-সূত্রে সকল লোক বিধৃত। নব নব

রূপে লোক হইতে লোকান্তরে তাই প্রাণের এক অবিচ্ছিন্ন লীলা চলিয়াছে, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই।

দেশ-কালের পরিসীমার মধ্যে সৃষ্টির যে স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিছু পরিচয় মিলিবে।

> "দেবকন্যা দুঃসাহসী
> কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃ স্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
> পাংশু ম্লান গৈরিক বসন-পরা, খণ্ডকালে দেশে
> অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে
> দুঃখের সঙ্ঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
> নিবিড় করিয়া পেতে।"

মানুষ দিব্য-চেতনা লাভের অতি তীব্র প্রেরণায় বারংবার মর্ত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের চকিত স্পর্শ লাভ করিবে ইহাই ছিল সৃষ্টির একমাত্র স্বরূপ।

সীমা অসীমেরই প্রকাশ, মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্যেরই এক পরিণাম। অসীম কেমন করিয়া সীমারূপ লাভ করিলেন, অমর্ত্ত্য কেমন করিয়া মর্ত্ত্য পরিণাম লাভ করিলেন তাহা দার্শনিক ব্যাখ্যার অতীত সামগ্রী। এখানে সকল দর্শন মূক।

রবীন্দ্রনাথ এই খণ্ড দেশ-কালে পরিপূর্ণ রূপ-লোকটিকে অরূপ বা অসীমেরই এক পরিণাম বলিয়া বোধ করিতেন। মর্ত্ত্য যে স্বরূপেই হোক অমর্ত্ত্য-জাত, সে তাই 'দেব-কন্যা'।

খণ্ড দেশ-কালে এই বিশ্বসৃষ্টির অর্থ কি? কেন অসীম আপনাকে এই রূপের জগতে সীমিত করিলেন? "অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে"। সীমার জগতে মর্ত্ত্য-চেতনায় সেই অপার্থিব আনন্দের আস্বাদ পাই কেমন করিয়া?-যখন মানুষের সমগ্র সত্তা দারুণতম দুঃখের সঙ্ঘাতে উন্মুখ হইয়া উঠে, সকল ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখীন হইয়া যায়। মানুষ অন্তরের পথে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া অভিসার করে।

> "দুঃখের সঙ্ঘাতে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
> নিবিড় করিয়া পেতে।"

এই যে রস-প্রেরণা অর্থাৎ মর্ত্ত্য-চেতনায় দিব্য-চেতনার জন্য এই যে নিত্য উৎকণ্ঠা এবং উহারই তীব্র, ব্যাকুল মুহূর্ত্তে সীমা বা রূপের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া দিব্য-চেতনার চকিত সাক্ষাৎকার, ইহা রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিশিষ্ট দর্শন স্বরূপতা লাভ

করিয়াছে। শুধু বিশিষ্ট দর্শন নয়, মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য চেতনার এই ভাবে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ আপনার একমাত্র দর্শন গড়িয়া তুলেন। মর্ত্ত্য-চেতনাশ্রয়ী প্রাণ যেখানে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহারই রক্ত নিষেকে মনের কল্পলতায় দিব্য-আলোর কুসুম ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সেই সাক্ষাৎকারের প্রেরণা রবীন্দ্র-কাব্যের মুখ্য প্রেরণা।

প্রকৃতির নিবিড় আসঙ্গ এবং সৌন্দর্য্য অনুধ্যানের ভিতর দিয়া কবির প্রাণ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাকার হইয়া যাইত, 'বনবাণী'র কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

যে প্রাণের যোগে বৃক্ষের পত্র সম্ভার, তাহার বিচিত্র প্রকাশ, সেই প্রাণ স্পর্শে মানুষের অন্তরে নিত্য নূতন ভাবের কুসুম ফুটে। নির্ব্বিশেষ প্রাণ উভয়ের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট ধারায় প্রকাশ পায়, একটি সৌন্দর্য্য রূপে, অপরটি ভাব রূপে। বৃক্ষ যেমন প্রাণের যোগে আপনাকে নিত্য নবীন রাখে, জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ঝরাইয়া দেয়, মানুষ তেমনি বিশ্ব-প্রাণের যোগে আপনার প্রাণকে চির নবীন করিয়া রাখে।

জড়ের মধ্যে সুপ্ত দিব্য-চেতনার সেই একই এষণা রহিয়াছে পরম পরিণাম লাভের। সেই এষণার বশেই ধরিত্রীতে প্রাণের প্রকাশ। প্রাণ তো শেষ পরিণাম নহে, তাই ওই পর্য্যায়ে উন্নততর পরিণাম লাভের জন্য অহর্নিশ একটা আবেগ অনুভূত হয়। পূর্ণ পরিণাম লাভের জন্য ধরিত্রীর বিরহ প্রকৃতির মধ্যে অমনি মুখর হইয়া উঠে।

প্রাণের স্তরে যে আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা এবং মানস-চেতনায় যে উৎকণ্ঠা, উভয়ের ধর্ম্ম বা স্বরূপ একই, পার্থক্য কেবল পরিণাম গত।

"তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি
ধরণীর বিরহ বারতা
গভীর গোপনে।" (আম্রবন)

বহিঃপ্রাকৃতির সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে গভীর অতৃপ্তি বোধ জাগে। এই অতৃপ্তির স্বরূপ কি, না উন্নততর পরিণাম লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

প্রাণের এই ধার জাগরণের ভিতর দিয়া অন্তরে ধীরে ধীরে একটি ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। এই ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া মনুষ্য-চেতনা পরিণামে সীমালোক অতিক্রম করিয়া যায়।

বিশ্ব প্রকৃতির যোগে অন্তরে ধীর অতৃপ্তি বোধের সঞ্চার এবং উহারই ভিতর দিয়া ধ্যান-লোক সৃষ্টির সেই পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দান করিয়াছেন।

"আমার নিভৃত চিত্তে সে ভাষা সহজে চলে আসে
মিশে যায় সঙ্গোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
স্বপনে বেদনে
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ।" (আম্রবন)

তাহারপর কবির চেতনা ওই ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-চেতনায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে।

"আমার জীবন আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনম মরণ পরপার।" (আম্রবন)

বিশ্ব-প্রাণের যোগে রূপের যে লীলা কবি ইহারই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চান। তাহা হইলে আপনার জীবনে উহাকে সত্য করিয়া তুলিতে পারিবেন। বিশ্ব-প্রাণের যোগে 'আমি'-রূপে বিশিষ্ট প্রাণের যে লীলা কবি তাহাকেই প্রত্যক্ষ করিতে চান।

"ভুবনে ভুবনে যে প্রাণ সীমানা হারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
লজ্জায় লহে ভরি।" (মধু মঞ্জরী)

কিংবা

"যে ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া
বুঝিতে যে চাই কেমনে সে ওর পাওয়া
চেয়ে থাকি অনিমেষে। (মধু মঞ্জরী)

অন্তরে প্রাণের যখন কোন প্রকাশ নাই, তখন নিখিল বিশ্ব-লোক পূর্ণ করিয়া যে অপার সৌন্দর্য্য-লীলা, তাহার কোন পরিচয় আমরা পাই না।

প্রকৃতির বিশিষ্ট কোন রূপ আশ্রয় করিয়া যখন অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটে

এবং এই রূপে বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণ যুক্ত হইয়া যায়, তখন সমগ্র সৃষ্টি-লোক ঘিরিয়া রূপ-রস-গন্ধের যে অসীমতার আভাস লাভ করা যায় তাহাতে মানবীয় চেতনা অপার বিস্ময় পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

বিশ্ব-চেতনার সহিত ব্যক্তি-চেতনার যোগে যে বিস্ময়, সেই অপার বিস্ময় তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ পরম তত্ত্ব স্বরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। এই বিস্ময় বোধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে।

> "কেন একে জানে এত বর্ণ গন্ধেব উল্লাস,
> প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।" (নীলমনি লতা)

অন্তহীন প্রাণ-সমুদ্রে কত সংখ্যাতীত রূপ জাগিয়া উঠিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিকাশ ঘটাইয়া ক্ষণকাল পরে হারাইয়া যাইতেছে। উভয়কে মিলিত করিয়া এই যে দেখা তাহাতে কবি-প্রাণ বিস্ময় বিস্ফারিত হইযা স্তম্ভিত হইযা গিযাছে। এই বিস্ময় বিমুগ্ধতায় সকল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা একপ্রকার রস-পরিণাম লাভ করে।

যে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিযাছিলাম। এই কালে কবিকে কি আসক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই? বিশ্ব-চেতনার সহিত পূর্ণ যোগের তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াও ব্যক্তি-রূপের বিনষ্টি জনিত যে হাহাকার তাহাকে কবি কি জয় করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন? 'বনবাণী'র কয়েকটি কবিতা হইতে তাহারই উত্তর লাভের চেষ্টা করিব।

অনন্ত প্রাণ-স্পন্দের একটি ক্ষুদ্র বিচি-বিক্ষেপ এই 'আমি'-রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-প্রাণের এই যে বিশিষ্ট একটি প্রকাশের লীলা যাহাকে বলি 'আমি', এই আমির বিনষ্টিতে প্রাণের এই বিশিষ্ট প্রকাশটিকে তো আর কোন প্রকারেই ফিরিয়া লাভ করা যাইবে না।

ইতিপূর্ব্বে নানা তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কবি মৃত্যু-শোক জয় করিয়া উঠিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি। ব্যক্তির এই বিশিষ্ট রূপের জন্য হাহাকার এক্ষেত্রেও লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

আমরা কেবল জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী এই বিশিষ্ট প্রকাশটিকে দেখি, জন্মের পূর্ব্বে এবং মৃত্যুর পর তাহার আদি অন্তহীন যে প্রসার তাহার কোন পরিচয় আমরা

জানি না। কেমন করিয়া এই জগতে এই রূপের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে। এই জীবনের এই লীলা সমাপ্ত করিয়া মৃত্যুতে উহা আবার কোথায় হারাইয়া যায়, তাহাও মানুষ জানে না।

ক্ষোভ তো এই জন্য নয়, তাহার সহিত এমন হৃদয়কে কে যুক্ত করিয়া দিয়াছে! সে যে ভালোবাসে, ভালোবাসে এই মর্ত্ত্যের প্রতি ধূলিকণাকে, ভালোবাসে তাহার সংখ্যাতীত নর-নারীকে, এই ভালোবাসা যে সকল সীমিত বোধকেও ছাড়াইয়া যায়। মৃত্যুতে এই ভালোবাসার সম্পদকে চিরকালের জন্য হারাইতে হয়। ক্ষোভ তো এইজন্য।

"সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির,
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
পথ চলা গান,
কালি তার হবে সমাপন।" (আত্মবন)

প্রাণের লীলায় সৃষ্টির আনন্দ তো শুধু নাই বিনষ্টির বেদনাও আছে: সৃষ্টি-বীণায় এক যোগে আনন্দ-বেদনার দুটি সুর নিত্যকাল ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্ব-প্রাণ-ধারা অন্তরে এমনি দ্বিধা হইয়া উর্দ্ধতর চেতনায় যে এক নির্ব্বিশেষ পরিণাম লাভ করে তাহা আনন্দ নহে, বেদনাও নহে। সকল তত্ত্বের আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া ব্যক্তি-রূপের জন্য কবি-চিত্ত আর্ত্তনাদ তুলিয়াছে।

"তারপরে যবে চলে যাব অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল ফোটাবার ব্যথা।" (মধুমঞ্জরী)

মৃত্যুতে 'আমি' কোথায় হারাইয়া যাইব কে জানে। তখনও এই পৃথিবীতে এই সমস্ত কিছুর লীলা চলিতে থাকিবে। 'আমার' জন্য তাহার মধ্যে কোথাও কোন অভাব জাগিয়া থাকিবে না। তখনও বসন্ত অফুরন্ত পুষ্পভার রাশি রাশি করিয়া ঢালিয়া উজাড় করিয়া দিবে আর কবির একান্ত প্রিয় এই যে 'মধুমঞ্জরী' লতা তাহাতেও ফুল ফুটিবে, কিন্তু সেদিন কবি সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সেই অর্ঘ্যভার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লইতে পারিবেন না। বৎসরের পর বৎসর কবির

শূন্য আঙিনায় এমনি কতফুল ফুটিয়া ঝরিয়া যাইবে। সে প্রতীক্ষা আর কোন কালে পূর্ণ হইবে না।

তাহারপর প্রাণের অনন্ত লীলায় 'আমি'-রূপে বাঁচিয়া থাকিবার যে চেষ্টা পরিশেষে লক্ষ্য করা যায়, তাহা যে কীরূপ করুণ এবং ওই কালে কবি-চিত্ত যে কতদূর অসহায় বোধ করিয়া ছিল তাহা নিম্নের কয়েকটি পংক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

"অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণ চিহ্ন কত যাবে উন্মূলে
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক ওর ফুলে
মধু মঞ্জরী লতা।" (মধু মঞ্জরী)

বিশ্ব-প্রাণ-লীলার এই স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি—

"নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষ গুটি
অস্তিত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি,
মর্ত্ত্য প্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তারা রূপ নাম, তারপরে আর তারা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে।" (শাল)

শাশ্বত চেতনার বুকে দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত রূপের এই নিত্য উঠা নামা। তাহার মধ্যে এই মর্ত্ত্য-লোক কতটুকু, কত ক্ষণিক। এই মর্ত্ত্যে মুহূর্ত্তে কত সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া ঝরিয়া যাইতেছে। মর্ত্ত্য-লোকের এক নিভৃত প্রদেশে এই 'শালবৃক্ষ', মর্ত্ত্যের কাল পরিমাণে ইহার কাল পরিমাণ কতটুকু। তবু মানুষের জীবন অপেক্ষা উহা স্থায়ী। কী অচিন্তনীয় দ্রুত বেগে রূপের এই সৃজন প্রলয় চলিতেছে!

মৃত্যুতে 'রূপ' বিনষ্টির যে বেদনা তাহা কবির অন্তরে ছিল। এই বেদনাকে মহাব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াছে অতীতের বিনষ্টি বোধ। বস্তুতঃ প্রকৃতির কোন রূপের মধ্যে বেদনা বিজড়িত নাই। কবির অন্তর্বেদনা এমনি করিয়া প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এই বেদনা বোধ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়ার মধ্যে প্রাণের আর একটি গূঢ় বেদনা চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে। এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে বেদনা বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার সহিত কবির বেদনাও এক হইয়া থাকিবে। চিরন্তন

কাল ধরিয়া ভবিষ্যতের নর-নারীর অন্তরে এই বেদনা বোধের সহিত কবির হৃদয়-ব্যথাও সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। এমনি করিয়া কবির প্রাণ মনকে ঘুম পাড়াইয়া এক প্রকার স্বপ্নে সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

"হায়, আজি তব পত্র দোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্ত কল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্ত্ত্যের বেদনা মেশে।" (শাল)

পরিশেষ

ধরিত্রীর প্রাণের অন্তহীন বিচিত্র প্রকাশকে কবি তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিবার সাধনা করিয়াছেন। ফাল্গুনে তরুর মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফুটাইবার গভীর গোপন বেদনা, প্রাণের সেই অধীর উৎকণ্ঠাকে কবি আপনার কাব্যের মর্ম্মমূলে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর নিয়ত রূপ বিনষ্টির জন্য প্রাণের যে গভীর বিষাদ তাঁহার কাব্যে সেই বিষাদেরও কত-না পরিচয় আছে। প্রাণ চেতনায় সৃষ্টি ও বিসৃষ্টির আনন্দ-বেদনা ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রতি তৃণে তৃণে মৃত্তিকা নিম্নের প্রতি প্রাণ কণায় আলোকের আনন্দ স্পর্শ লাভে যে নিঃসাড় আনন্দ কোলাহল, তাঁহার কাব্যে সেই আনন্দের কত-না প্রকাশ ঘটিয়াছে। সূর্য্য দয়িতের জন্য রূপ-হারা বিবশা অমানিশার যে ভয়ঙ্করী তপশ্চর্য্যা, অন্তশ্চেতনার দীপ জ্বালাইয়া প্রতীক্ষায় যে ক্লান্ত প্রহর গণনা, পরমের স্পর্শ লাভের জন্য কবির কাব্যে সেই তপশ্চর্য্যার বাণী-রূপ রহিয়াছে। পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য, জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সাধনের জন্য মানব-হৃদয়ের যে কান্না, তাঁহার কাব্য-রূপের মধ্যে তাহা বাণী লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। নিরুদ্ধ হৃদয়ের সংশয় ব্যাকুলতাকে কবি এইরূপে প্রকাশ করিয়া ভার-মুক্ত করিয়াছেন। দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রাণের প্রবাহ চলিয়াছে, তাহারই আঘাতে সঙ্ঘাতে এই অন্তহীন গ্রহ নক্ষত্র বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে। সৃষ্টি ও বিনষ্টি, হাসি ও কান্না, আলো ও ছায়া সেই প্রাণ-সমুদ্রে একাকার হইয়া আছে। মহাকালের এ যেন আদি অন্তহীন নিষ্কারণ

লীলা। তাঁহার এক চরণ পাতে সংখ্যাতীত রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, অন্য চরণ পাতে তাহারা আবার কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। এই নিঃসীম আনন্দ-বেদনাকে কবি তাঁহার কাব্যে কিছুটা সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরল রোলে
উঠিতেছে রণ রণি, ছায়ারৌদ্র সে-দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ বেদনা।" (প্রণাম)

আর যে মানব-চেতনাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের এই অন্তহীন বিচিত্র বোধের অনুভূতি লাভ, কবির সকল বোধের ধারা পরিণামে সেই মানব সমুদ্রে একাকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

"এই গীতি পথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।" (প্রণাম)

বিশ্বের বিচিত্র অনুভূতির যোগে মানবীয় সত্তার সম্পূর্ণতা। এই সম্পূর্ণতাই কবির নিকট মুক্তি। বিশ্বের বোধ মুক্ত যে মুক্তি তাহা কবির নিকট মহাশূন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ সমগ্র জীবনের তপস্যার সঞ্চয় ভারকে ঈশ্বরের পদ প্রান্তে একটি সূত্রে গ্রথিত করিয়া মাল্য স্বরূপে অর্ঘ্যদানের সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। আজ জীবনসন্ধ্যায় কবির প্রাণ-মন ক্লান্ত অবসন্ন। গভীর কোন সত্য লাভের জন্য দুঃসহ তপশ্চর্য্যায় নিমগ্ন হইবার দিন কবির জীবনে অবসান লাভ করিয়াছে। বাহিরে রূপের জগতে স্নিগ্ধতায়, মাধুর্য্যে, কারুণ্যে অপরূপের যতটুকু আভাস লাভ করিতে পারা যায়, আজ কবি তাহাতেই পরিতৃপ্ত। বনভূমির শ্যামল ছায়ায়, আষাঢ়ের মেঘের কারুণ্যে দিবাবসান পূর্ব্বের আকাশ-পটে বিচিত্র বর্ণের অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনার মধ্যে, সন্ধ্যা-তারার অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহারই যে ক্ষীণ আভাস মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়া হারা-

হইয়া যায়, কবি আজ তাহাই মাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। শ্যামলা ধরিত্রীর সহজ সরল প্রাণের বিচিত্র দাক্ষিণ্যই আজ কবির পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এই যে ধূলিতলে অনায়াসে ফুল ফোটা ও ঝরা, পাখির কণ্ঠে এই যে বিচিত্র সুরে প্রাণের সহজ সরল বন্দনা গান, যে গানের সুরের সহিত মিল রহিয়াছে আলোর গজ্যাতে জাগা সবুজের ছন্দে, এই একান্ত তুচ্ছতম মহত্তম প্রাণের সম্পদ আজ কবির জীবনে পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইযা উঠিয়াছে।

"এই বিশ্ব সত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্ব্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্র তটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।"

স্বর্গ বা মুক্তি-লোক তো আর কোথাও নাই। এই নিখিল বিশ্বে এই মানব সংসারে একদিন স্বর্গের প্রকাশ ঘটিবে। জীবন ও জগৎ ছাড়াইয়া তাহাকে বাহিরে আর কোথাও আর কোন রূপে লাভ করিতে পারা যাইবে না। মানুষের মুক্তি বলিতে তিনি বুঝিতেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ। ব্যক্তির জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মকে বিশ্ব-জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের যোগে পূর্ণ বিকশিত করিয়া পরিণামে ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা। মূল এই উপলব্ধিকে তিনি নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'পান্থ' কবিতাটির মধ্যে এই একই ভাবের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের জোয়ার ভাটা চলিয়াছে। নর-নারীর মধ্যে আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি রূপে তাহারই বিচিত্র প্রকাশ। তাহার একদিকে সৃষ্টি, আর এক দিকে বিনষ্টি। এই প্রাণ-স্রোতে নিত্যকাল ধরিয়া উষা ও চন্দ্র আলোক সম্পাত করিয়া কত বিচিত্র বর্ণের আলপনা আঁকে। ওই মহাশূন্যে অনন্ত কোটি গ্রহ-তারা-লোক, ওই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আভায় রাঙা দিগদিগন্ত, তাহারই বুকে কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া যায়, পাখি তার গানের অর্ঘ্য ভাসাইয়া দেয়। বিশ্ব-প্রাণের এই লীলার সহিত কবি যখন আপন প্রাণের লীলাকে যুক্ত করিয়া দিতে

পারেন, তখনই কবি মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করেন। প্রাণের এই প্রকাশ-লোকের বাহিরে কোন মুক্তি-লোক নাই।

"সে তরঙ্গ নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্ব প্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহিনা কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ মিলন গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।" (পান্থ)

এই উপলব্ধি সম্পর্কে কবির আরও দুই একটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে; কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে। এই সংসারকে তোমার স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে। সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে। তার ঘর-ভরা শিশু তার মা-বাপ ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-প্রতিবেশী এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে। না, তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব, আর সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গ সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এতবড়ো একটা চরম সৃষ্টি হতে পারেনি। সর্ব্বশক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্ব্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গ রচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এই জন্যে যে তিনি যুগ যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কতকাল ধরে অপেক্ষা করেন নি। আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্য শ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তারপরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে। তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনও বাকি। বাষ্প আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য্য ফোটেনি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গ-লোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাঁর সেই রচনাকার্যে

তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন; কিন্তু আমরা কেবল খাব, পরব, সঞ্চয় করব, এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল তো ভাঙবে; মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলেম। অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেছি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য্য ফুটেছিল। জগৎ সংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম, অভাবকে তো কিছু পূরণ করেছি, কিছু অজ্ঞান দূর করেছি। এই কথাটিতো বলে যেতে হবে। এদিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাকব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না। কিছু দিতে পেরেছি। (পিতার বোধ)

যে জীবন-দর্শন জীবন ও জগৎকে মায়া বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে, পাপ পুণ্যের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে সত্য বলিয়া জানে, জীবন ও জগতের এই লীলাকে ছাড়াইয়া উঠাকে মুক্তি বলিয়া বোধ করে, তাহা হইতে এই উপলব্ধি যে কত বিপরীত কতদূর বিরুদ্ধ তাহা স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। তাঁহার ইতিপূর্ব্বের জীবন-সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সাধনা। আর এখন হইতে সেই স্বর্গলোকের ছবিকে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করা। আর কাব্যে তাহাকে রূপায়িত করিবার নিরলস প্রয়াস।

"অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোট হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন। এই জন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনি আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করেছেন, আমাদের কথা শুনেছেন এবং শোনাচ্ছেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক, যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানব সম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। ***কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্র রূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানব জন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো হয় কোনো পূর্ব্ব পিতামহের নয় নিজের জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্ম্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায়

আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ করে রেখেছে। *** অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোন অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি।" (ছোটো ও বড়ো)

এই জীবনে স্বর্গের যে আভাস তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি জীবনে ও জগতে ফুটাইয়া তুলিতে জীবনভোর চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি-রূপটিই এই স্বর্গের প্রতিচ্ছবি। এই রূপ সাক্ষাৎকারের কিছু পরিচয় এক্ষেত্রে লাভ করা যাইতে পারে;

"এই যে দশদিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়েছেন, সেখানে প্রাচুর্য্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য্য, কী সৌন্দর্য্য। সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না।—যুগে যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দখিতে পাই না। কে বলে তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে তিনি ধরা দেন না। তিনিই যে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে। **এ যে আশ্চর্য্য। মানুষ জন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছি। এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্য লীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎতন্ত্রী খচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত-ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম—পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য্য অপরিমেয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীট পতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারা সূর্য্য চন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।" (আনন্দরূপ)

"আমি বলছি এই চোখ দিয়েই এই চর্ম্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এতবড়ো এই গ্রহতারা—চন্দ্র সূর্য্য খচিত প্রাণে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্ম প্রকাশ করছে। ** আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চারিদিকে যা আছে তার কোনোটাই আমরা দেখতে পাই নি—ওই তৃণটিকে না। ***

কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ-কেবলই এক রূপ থেকে আর এক রূপের খেলা; কোথাও আর তার শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাইনে, ভেবেও পাইনে। রূপের ঝরণা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্ত রূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। সেই অপরূপ অনন্ত রূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার যে কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এইটুকু জানি আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে জাগিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্ত্তা আনছে তার এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে আনন্দরূপ সে দেখা এখনও আমাদের দেখা হয় নি—মানুষের মুখে তাঁর অমৃতরূপ সে-দেখার এখনও অনেক বাকি। "আনন্দরূপমমৃতং" এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা সার্থক হবে।" (দেখা)

স্বর্গ-লোকের ক্ষীণ আভাস-রূপে এই জগতে রূপের যে ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, ইহার সহিত পৌরাণিক বিচিত্র স্বর্গ-লোক কল্পনার (ধ্যান বা অতি মানসিক চেতনা-লব্ধ?) কী মর্ম্মগত গভীর পার্থক্য!

তাঁহার এই উপলব্ধিকে যে তত্ত্ব-দৃষ্টির সহায়তায় তিনি সামগ্রিক জীবন-দর্শন রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই বিস্তারিত পরিচয় দানের সাধ্যমত চেষ্টা করিযাছি। এই প্রসঙ্গে কবির আরোও কিছু কিছু অভিমত একত্র সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নদী যেমন তাহার বহু দীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত পর্ব্বত প্রান্তর মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘ যাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতি মুহূর্ত্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না, তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরোধেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়।"

"বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতে আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হতে থাকি।" (ধর্ম্মপ্রচার)

"মানব সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতি সম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতি রস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতি বৃত্তির স্বাভাবিক

পরিণাম যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্ম্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয় বৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধিপ্রীতি ও কর্ম্মদ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই।" (ধর্ম্মপ্রচার)

"অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো—তিনি রস। তাহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি।" (দুঃখ)

"তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকে বন্ধন স্বরূপ না করে মুক্তি স্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্ম্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্ম্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই কর্ম্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জ্জন না করে সমস্তকেই সত্য-ভাবে স্বীকার করে মুক্তি।" (প্রাণ ও প্রেম)

"বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।" (মুক্তির পথ)

"একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম, তা-হলে অনন্তকে পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতররূপে তাঁকেই পেতে থাকব, এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোন অর্থই নেই, তবে বিশ্ব-রচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ মায়া মরীচিকা মাত্র।" (পূর্ণ)

"এই যে পরিপূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তারি সঙ্গে যুক্ত হওয়াদেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধি দ্বারা দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা।"
(সামঞ্জস্য)

যে কয়েকটি অংশ এক্ষেত্রে পর পর উদ্ধৃত করিলাম তাহাতে জীবন ও জগতের পরিপূর্ণ স্বীকৃতির যে পরিচয় লাভ করা যায়, ভারতীয় জীবন-সাধনায় তাহার কোন পরিচয় কোথাও কিছু মাত্র থাকিলেও সামগ্রিক জীবন-দর্শন রূপে তাহার এমন প্রতিষ্ঠা যে কোথাও নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

কবি আপনার সমগ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনটি সত্তার যুগপৎ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এক বহিঃসত্তা, যাহার জন্ম আছে, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনষ্টি আছে। মৃত্যুতে এই জড় সত্তাটিরই বিনাশ ঘটে। কিন্তু এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বাহিরের যে বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়, প্রাণের যে বিচিত্র অনুভূতি তাহা অন্তরে নিয়ত সঞ্চিত হইয়া অন্তরে আর একটি স্থির ভাব-লোক গড়িয়া তুলে, ইহাকে অধ্যাত্ম-সত্তা বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক, ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে বিশিষ্ট। কবি বা শিল্পী অন্তরের এই ভাব-লোকটিকে বাহিরে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে প্রকাশ করেন। দেহ-রূপের বিনষ্টিতে দেহের নিয়ত সেই সঞ্চয় ভার আর থাকে না বলিয়া এই ভাব-লোকটিরও নিঃসন্দেহে বিনষ্টি ঘটে। ব্যক্তির আর একটি সত্তা আছে যাহা এই ভাব-লোকের সীমাকেও অতিক্রম করিয়া যায়। মানুষ ভাব-তন্ময় মুহূর্ত্তে চকিতে চকিতে সেই অপর সত্তা সাক্ষাৎ লাভ করে, মানসিক সত্তার তাহা যেন এক অপার বিস্তৃতি। এই সত্তা সর্ব্ব মানব সাধারণ সত্তা। এই সাধারণ সত্তা ব্যষ্টির ভাব-লোক আশ্রয় করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বিশ্ব-আমি। এই সত্তা দেশ-কালের ভিতর দিয়া অন্তহীন মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক ক্রম পরিণাম রূপে আপনাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। সমগ্র মানব-সত্তার এই নিয়তি-রূপের সহিত ব্যক্তির নিয়তি-রূপ বিজড়িত। এই 'বিশ্ব-আমি'র যেমন তাঁহার রচনারও তেমনি বিনাশ নাই। ইহার ঊর্দ্ধতর তত্ত্ব হইল অসীম, যিনি নির্ব্বিশেষ।

সাধক, কবি, বা শিল্পী বিশ্ব আমির যোগে নিখিল মানবের ভাব-লোককে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রসারিত ও বিচিত্র করিয়া তুলিতেছেন।

"এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্ত্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।" (আমি)

আদি অন্তহীন অতীত ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-আমির সেই পরিপূর্ণ রূপটি কেমন? নিখিল মানব-চিত্তকে আশ্রয় করিয়া এ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন যে রূপ ফুটিয়া

উঠিয়াছে তাহাদের মিলিত প্রকাশের মধ্যে ওই পূর্ণ-রূপের কতটুকু আভাস ফুটিয়াছে ?

> "ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
> সে মানব-মাঝে
> নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
> সর্ব্বত্রগামীরে।" (আমি)

বিশ্ব-প্রাণের বিচিত্র লীলায়, সত্তার বিচিত্র প্রাকাশের মাঝে আমারও প্রাণ লীলা করিয়াছে, আমার সত্তা বিরাজিত। এই বিস্ময়ের কি অন্ত আছে। জীবনের এই প্রকাশ মহিমার নিকট আর সব গৌরব বুঝি ম্লান হইয়া যায়।

> "আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
> সেই বারতা রইল আমার গানে।" (আছি)

সীমা ও অসীমের বোধ-বিজড়িত এই জীবন কী অপার বিস্ময়ে কবি-চেতনাকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আজ জীবন-সন্ধ্যায় সেই বিস্ময়বোধের কথাই বারংবার মনে পড়িয়া যায়। আর সমস্ত কিছু জড়াইয়া রহিয়াছে কবির ভালবাসা, যাহার অপূর্ব্বতায় জন্ম-মৃত্যুর সীমা একাকার হইয়া যায়।

> "এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি,—
> কত ভালোবেসেছিনু আমি।" (বর্ষশেষ)

আপনার অতীত সমগ্র জীবনটিকে দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া কবি আজ তাহার একটি মূল্য নিরূপণ করিতে চান। সে লীলায় কবি-চেতনা কখন অশ্রু সজল, কখন আশায় উদ্দীপ্ত, কখন পূর্ণতার আস্বাদ লাভে পরম শান্ত,—যাহা মানুষের সকল জন্ম, সকল মৃত্যুর সীমা পার হইয়া অনন্ত প্রসারিত। আর আপনার এই লীলার সহিত যুক্ত করিয়া তিনি বিশ্ব-মানবের লীলা-রূপ তাহার নিয়তি-রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন।

আজ তাঁহার দুঃসহ তপশ্চর্য্যার, দারুণ পরীক্ষা মুহূর্ত্তগুলির কথা স্মরণে পড়ে ; মানুষের সংশয়ে, প্রতিবাদে, অপবাদে যখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিয়াছে তখনই তাঁহার অন্তরে উর্দ্ধ-লোক হইতে আলোক নামিয়া আসিয়াছে। সে আলোকে, সে নির্দ্দেশে তিনি আবার নিঃসংশয় বোধে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

এই বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার অন্তহীন ঐশ্বর্য্যের দানভার লইয়া কবির সম্মুখে নিত্যদিন অবিভূর্ত হইয়াছে, তাহার মাধুর্য্যের তিনি অন্ত পান নাই। তাঁহার দেহ-প্রাণ-মন এই মাধুর্য্যের স্রোতে অবগাহন করিয়া নিত্য শুচি হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের এই প্রাণের লীলা, তাহারই আনন্দ-বেদনাকেই তিনি আপনার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

"যে নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে।" (বর্ষশেষ)

যে সকল মহাপুরুষ অসীমের লীলাকে মর্ত্ত্যে দৃষ্টি গোচর করাইবার জন্য যুগে যুগে আবিভূর্ত হইয়াছেন; অসীম বা অনন্তের বিজয় ঘোষণা করিবার জন্য যাঁহারা সকল নির্ম্মম অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অবমাননা ও মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মানুষের পরমাত্মীয়। তাঁহাদের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই প্রকাশের লীলা-রূপটিকে কি আমরা কবির জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পাই না।

বিশ্ব-প্রাণের, বিশ্ব-সত্তার যোগে, তাহারই ক্রমিক গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়া মানুষের জ্ঞানের জগৎ, ভাবের জগৎ, সৃষ্টির জগৎ ক্রমাগত প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। বিশ্ব-সত্তার যোগে ব্যক্তি-সত্তার যা-কিছু সৃষ্টি তা বিশ্বের মানব-সাধারণের। এমনি করিয়া সমগ্র মানব-সমাজের যাত্রা চলিয়াছে ক্রমোন্নতি, ক্রম বিকাশের দিকে। অন্তহীন ব্যক্তি-সত্তার যোগে বিশ্ব-সত্তা আপনাকে ধীরে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। কবির চেতনাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-সত্তা আপনার অন্তর্লীন ঐশ্বর্য্যের এক অভাবিত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে। বিশ্ব-সত্তার সে ঐশ্বর্য্য আজ সকল মানুষের আপনার প্রাণের সম্পদ।

যে-সত্তা সকল সীমাবোধেরঅতীত, যাহা অসীম বা অরূপ কবি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন।

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে।" (বর্ষশেষ)

কিংবা "ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।" (বর্ষশেষ)

ইহা প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"যেখানে মানুষ দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু উপলব্ধি করে না, তাহাই ভূমা। যেখানে মানুষ কোন কিছু দেখিতে পায়, কোন কিছু শুনিতে পায়, কোন কিছু উপলব্ধি করে তাহাই অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, যাহা অল্প তাহা মৃত্যু। 'হে ভগবন, ভূমা কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত'? স্বীয় "মহিমায় অথবা মহিমার উপরও নয়'।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ)

মানুষ যেখানেই আপনার নিত্যদিনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধনা করিয়াছে, সেইখানেই সে মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনার অংশভাগী হইয়াছে, সকল যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মানুষের সে আত্মীয় ভুক্ত হইয়াছে।

এমনি বিচিত্র পথে কবির জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া আজ অবসান লাভের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু কবি জানেন এই অবসানও একান্ত বিচ্ছেদ নয়, তাহা আর এক নূতন আরম্ভের সূচনা।

শ্রাবণের আবশ্রান্ত ধারাপাতের নির্ম্মম পীড়নকেও জয় করিয়া নিঃশঙ্কে যুথী অন্তরের পূর্ণতাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলে; অচঞ্চল সাহস, আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুলতা, আপনার সীমায় সহজে স্ববশ থাকিবার মূর্ত্ত্য প্রকাশ। তাহারপর আপনার সৌন্দর্য্যের, সৌরভের দান ভারকে অকাতরে বিলাইয়া দিয়া একদিন ঝরিয়া পড়ে। অমনি যুথীর মত বাহিরের সকল নিন্দা খ্যাতি, মান অপমানের উর্দ্ধে উঠিয়া অবিক্ষুব্ধ অন্তরে পরম সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া কবি যেন তাঁহার সকল চিন্তা ও ভাবনাকে রূপদান করিতে পারেন।

নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র নিয়ত পরিবর্ত্তন পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, নিয়ত মৃত্যুলাভের ভিতর দিয়া। নিয়ত মৃত্যু-দ্বার পার হইয়া নিয়ত ভিন্ন রূপ জন্মলাভ করিতেছে। এই যদি সত্য হয়, তবে মৃত্যু মানবজীবনে একান্ত বিচ্ছেদ কখনই দান করিতে পারে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া নিঃসন্দেহে নূতন জীবন লাভ করি। জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-সত্তা নিত্য নব রূপ লাভ করিয়া চালয়াছে। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সেই সঙ্গে মানব সত্তার এই যে নিত্য নবরূপ লাভ তাহা কি কেবল আবর্ত্তন মাত্র, ফিরিয়া ফিরিয়া একই লীলা, তাহার ভিতর দিয়া মূল্যের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না? রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাসের পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি।

"হে দুয়ার, জীব-লোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তি সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্য নিশীথে।" (দুয়ার)

আদি অন্তহীন প্রসারিত দেশ-কালের মধ্যে প্রাণের যে নিত্য প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে তাহাতে কত রূপ-বুদ্বুদ নিত্য জাগিয়া মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অনন্ত কালের বক্ষে এই শ্যামলা ধরণী তেমনি একটি বুদ্বুদমাত্র। এই ধরণীতেই আবার কত ভাঙ্গা-গড়া, কত রূপান্তর, রাজ্যের কত উত্থান-পতন, কত বিলুপ্তি-বিস্মৃতি, কত নূতনের আবির্ভাব। তাহার মধ্যে আমার এই জন্ম-মৃত্যুর বেড়া দিয়া ঘেরা এই আমির প্রকাশ কী অচিন্তনীয় ক্ষণিক! কিন্তু এই ক্ষণিকতা বোধটিই এই কবিতার মর্ম্মকথা নয়। এই ক্ষণিক সত্তা যে বিশ্বের আর সকল সত্তার সহিত একদিন সত্য ছিল, এই বিস্ময় কবিচেতনাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। কবি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে এই বিস্ময়বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিস্ময় প্রেরণায় কবির দৃষ্টি সমক্ষে এই বিশ্বের যে অন্তহীন সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চেতনাকে যে সদা জাগ্রত ও উন্মুখ করিয়াছে, একটি আনন্ত্যের বোধে মনকে সর্ব্বদা নিমজ্জিত করিয়া তাহাকে যে আশ্চর্য্য ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াছে, তাহার কোন পরিমাপ আমরা কেমন করিয়া দান করিব?

"আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্ক সভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্য লীলা।" (বিস্ময়)
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।" (বিস্ময়)

সত্তার এই ক্ষণিক প্রকাশের এক আশ্চর্য্য মূল্য নিরূপণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় 'প্রাণ' কবিতাটির মধ্যে।

দেশ-কালের মধ্যে তুচ্ছতম হইতে মহত্তম যে-কোন সত্তার প্রকাশ তাহা যতই ক্ষণস্থায়ী হোক-না-কেন, তাহাদের প্রত্যেকটির অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে।

যে চিত্রকর মুহূর্তে এক একটি অপরূপ রূপ সৃষ্টি করিয়া আবার মুছিয়া দিতেছে, সেই সমগ্র চিত্রের সম্পূর্ণতার জন্য তুচ্ছতম সত্তারও একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই সমগ্র সৃষ্টি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। সেই সমগ্র কবিতাটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্বুদ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি
সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠিত না শঙ্খধ্বনি,
মিলিত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রহিত নীরব।" (প্রাণ)

সংসারে প্রাণের লীলায় মুহূর্তে কত প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, আবার তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়া কত প্রাণের প্রকাশ ঘটিতেছে। তাই সংসার চির পুরাতন হইয়াও চির নবীন। আমার সীমিত বোধের আবেষ্টনী ঘেরা যে-'আমি'র প্রকাশ, তাহার সুখ-দুখ, লাভ-ক্ষতি, হাসি-কান্না ওই চির চঞ্চল, চির নবীন প্রাণের প্রবাহকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

"দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়া ঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে।"

অসীম প্রাণের লীলার দিক হইতে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যায় সৃষ্টি ও বিনষ্টি, লাভ ও ক্ষতি একই তরঙ্গের উঠা ও নামা, কান্না-হাসির মিশ্রিত সুরে একই প্রাণের বীণায় নিত্য সামগান ধ্বনিত হইতেছে।

ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের আবেষ্টনীর বাহিরে আসিয়া যাঁহারা বিশ্বপ্রাণের এই লীলা-রূপটিকে যত অধিক করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে, লাভ করিতে পারেন, মৃত্যুভয় তাঁহাদের তত অধিক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়। তাঁহাদের চেতনা পরিণামে সেই শান্তিকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, যে শান্তি এই সৃষ্টি-বিনষ্টির, তরঙ্গের এই নিত্য উঠা-নামার দ্বারা অবিক্ষুব্ধ।

"যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীর মন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।" (যাত্রী)

বিশ্বপ্রাণের সহিত ব্যক্তিপ্রাণের যোগের যে-পর্য্যায় লাভের ফলে বিশ্ব-সত্তা কবির নিকট 'মানসী', 'মানস-সুন্দরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি রূপে অনুভূত হইয়াছিল, যাহাকে বিশ্ব-সত্তার পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যায় জীবন-দেবতারও পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সুদীর্ঘকাল পরে 'বলাকা' এবং তাহারও পরবর্ত্তী কাব্য 'পূরবী'র মধ্যে কবি ওই চেতনা-পর্য্যায় লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'লীলাসঙ্গিনী', 'তুমি' প্রভৃতি রূপে তাহার পুনরায় আবির্ভাব ঘটিয়াছে লক্ষ্য করা যায়। একই সত্তা ভিন্ন চেতনা-পর্য্যায়ে ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। ফিরিয়া ফিরিয়া কবির ভিন্ন ভিন্ন চেতনা-পর্য্যায় লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব স্বরূপের ফিরিয়া ফিরিয়া প্রকাশ ঘটিয়াছে।

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া কবি তাঁহারই স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। মানবিক বিচিত্র প্রেম সম্পর্কের মধ্যেও তাঁহারই প্রকাশ।

"জীবন ধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া," (বিচিত্রা)

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং মানবিক বিচিত্র বোধ তাঁহাকে পরিণামে এক অপূর্ব্ব লোকের আভাস দান করিয়াছে, যেখানে সকল বোধের সীমা হারাইয়া যায়। অনির্ব্বচনীয়তার মূর্চ্ছণায় নিঃশেষ আত্মবিস্মৃতি।

"পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্ব্বেরি কূলে।" (বিচিত্রা)

অপরূপকে এমনি রূপ বা সীমা আশ্রয় করিয়া লাভ করিতে হয়। প্রাণের উপলব্ধি বলিয়া এবং যৌবনে প্রাণের সামর্থ্য সর্ব্বাধিক থাকে বলিয়া প্রাণের আস্বাদ লাভের মুহূর্ত্তে ফিরিয়া ফিরিয়া যৌবনের কথা মনে পড়িয়া যায়। আর সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় ধীর নিঃশেষিত প্রাণের বঞ্চনা। যৌবনের সেই প্রাণের লীলা, আনন্দ-বেদনার উদ্‌ভ্রান্ত দিবস রজনী, নিবিড়তম সুখ ও গভীরতম বেদনায় কম্পিত হৃদয়ের শতবর্ণের প্রকাশ ; তাহাকে জীবনের এই পর্য্যায়ে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই। প্রাণের তবুও কেন এই গভীর আকুতি, এমন মিনতি বিজড়িত, সকরুণ, অশ্রু ছলোছলো চক্ষের আহ্বান।

"তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে ;
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব করা দানে।' (বিচিত্রা)

এই পর্য্যায়ের আর একটি কবিতা 'তুমি'। চিত্রার পূর্ব্বে মানসী, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই তুমির স্বরূপ বিচার করিয়াছি। কবি ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সকল বিরোধ অবসান শেষে সেই প্রথম আপন অন্তরের মধ্যে একটি সুসমঞ্জসিত ভাব-লোক গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিশ্ব-প্রাণ-মনের যোগে বিকাশ যেমন ঘটে, তেমনি সামঞ্জস্যও সাধিত হয়। আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ সুষমা মণ্ডিত এই অপর সত্তার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকল বিরোধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি সুষমা মণ্ডিত সত্তার উপলব্ধি ঘটিয়াছে। চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অন্তরে যেমন বিশ্বের অন্তরেও তেমনি সুষমা-লোকটির ধীরে বিকাশ ঘটিতে থাকে। ইহার নানা পরিণাম, নানা ঐশ্বর্য্যের পরিচয় আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির মধ্যে লাভ করিয়াছি। এই পর্য্যায়ে কবি যাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহা ওই মানসী, সোনার তরী পর্য্যায়ে পৃথক সত্তা রূপে অনুভূত 'তুমি'।

এই 'তুমি' বিশ্ব-প্রাণ বা বিশ্ব-সত্তা, কিন্তু ব্যক্তি-চেতনার বিকাশের একটি বিশেষ পর্য্যায়ে অনুভূত। চেতনা বিকাশের ক্রমিক উন্নততর পরিণামে একই বিশ্ব-সত্তা, 'তুমি' ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে অনুভূত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কবিতাটির মধ্যে যাহা সবিশেষ লক্ষণীয় তাহা হইল এই চেতনা-পর্য্যায় লাভ করিয়াও কবি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ এই চেতনা-

পর্য্যায়ে বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণের যে বিচিত্র লীলা, সৌন্দর্য্যও প্রেমের যে বিচিত্র মাধুর্য্যাবেশ তাহা কবি-প্রাণের দ্রুত অবসানের জন্য আর সম্ভব নয়।

এই অসামর্থ্যের জন্য কবির হৃদয় কান্নার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অসহায় হইয়া কবি আপনার ধীর আচ্ছন্ন চেতনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সহস্র জিজ্ঞাসা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"চেনামুখখানি আব নাহি জানি
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পাব,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমাব
গহনে হল যে লুপ্ত।" (তুমি)

কবির জীবনে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও প্রেমের সম্পদ আহরণের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই আজ ফিরিয়া ফিরিয়া যৌবনের কথা মনে পড়িয়া যায়। সেদিনকার আহরিত সম্পদগুলিকে স্মৃতির মঞ্জুষা খুলিয়া একে একে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন, দেখিতে দেখিতে কখন অন্যমনা হইয়া পড়েন, আঁখিপাতা সজল হইয়া আসে। অতীত দিনের স্মৃতি বিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্য্য ও প্রেম পরম গম্ভীর মহিমা ও বিষাদ বিজড়িত হইয়া যায়।

অজিকার পথ চলায় পথ পার্শ্বের ঘন বনের মধ্যেকার লেবু ডালের স্নিগ্ধ ছায়ায় কোকিল ডাকিয়া উঠে। সেই সুরে আজিও কবির মন মুহূর্ত্তে অপূর্ব্বতার আভাসে ভরিয়া উঠে, তাহারই পথ বাহিয়া মন কোন সীমাহীন লোকে প্রয়াণ করে, যেখানে নিত্যকাল ধরিয়া পরম শান্তির মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে থাকে ; সংসারে পাপ-তাপ-গ্লানি কুশ্রীতা সে পথ অতিক্রম করিতে পারে না।

"যে-শান্তিটি সব-প্রথমের, যে শান্তিটি সবার অবসানে,
যে-শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্ব্বচনীয় ;—
'তুমি আমার প্রিয়'।" (চিরন্তন)

এই শ্রেণীর আর একটি কবিতা কন্টিকারি। বাহিরে প্রাণের সম্পদ আহরণের দিন যখন ফুরাইয়া আসে তখন অন্তরের স্মৃতি-লোকটি একমাত্র আশ্রয় হইয়া উঠে।

কবি আজ তাই ক্ষণে ক্ষণে ওই স্মৃতি-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া ফিরিয়াছেন। স্মৃতি বিজড়িত বলিয়া সেই প্রত্যেকটি সৌন্দর্য্য-লোক করুণ-কোমল, বিষাদ-নীল।

"আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
দুঃখ দিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে,
হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
মাটির কাছে কণ্টিকারির নীল-সোনালির বাণী।" (কণ্টিকারি)

যে-সংসারে নিত্য নূতন প্রাণের লীলা চলিতেছে, সেই সংসার হইতে কবি আজ কত দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। আজিকার প্রত্যক্ষ প্রেমের লীলা দৃষ্টে কবির হৃদয় শূন্য করিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে।

"বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশ বছর বয়স কালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যা তারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকর ঢালা পথের 'পরে ডাক পিয়নের পদধ্বনির সুরে।" (আরেক দিন)

'তে হি নো দিবসাঃ', 'সাথী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে এই একই ভাবের পরিচয় লাভ করা যায়।

বিশ্ব-প্রাণ কত-না রূপে কত ভাবে মানুষের প্রাণকে আকর্ষণ করে, মনের মধ্যে কত অপূর্ব্বতার বোধ জাগাইয়া তুলে, অজানিত কত বেদনা,—এই সমস্ত কিছুকে একত্র করিয়া মানুষ কত মানসী মূর্ত্তি গড়িয়া তোলে। জীবনকে জড়াইয়া রহিয়াছে কী আশ্চর্য্য বিচিত্র বিরুদ্ধ বোধ, কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত তর্ক ও বিশ্বাস, কত ভীতির পীড়ন, কত কাল্পনিক সান্ত্বনা, অতীতের কত বিচিত্র প্রাণহীন সংস্কার, কত আদেশ, কত নির্দ্দেশ, কত গোপন ভালবাসা, কল্পনার কত মূর্ত্তি সৃষ্টি, কত প্রেম, কত আত্মত্যাগ, অসম্ভবকে লাভ করিবার কত-না প্রয়াস, কত মহত্ত্বের পূজা, কত হীনতার সন্তোষ সাধন, কত প্রবঞ্চনা, কত জয়, কত পরাভব। এই সমস্ত কিছু জড়াইয়া মনুষ্য-সত্তার পরমাশ্চর্য্য প্রকাশ। তাহার পর একদিন এই মনুষ্য সত্তা তাহার এই সমস্ত কিছু বোধ লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সকল মনুষ্য-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া এই লীলার এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। সত্তার এই প্রকাশের, তাহার বিচিত্র সৃষ্টির এইরূপে মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ ও সৃষ্টির যে ধারা চলিয়াছে তাহার অর্থ কি?

"যে-চেতনা ধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি,—
* * *
অসংখ্য এ রচনায় উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস,
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।" (অপূর্ণ)

মানব-সত্তার অর্থ সম্পর্কে এই যে জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের পাড়া তাহা যে কবির গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির এক বিচিত্র প্রকাশ তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

"জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।" (অপূর্ণ)

কিংবা

"তোমার সে-সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলের নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।" (অপূর্ণ)

কবির এই জিজ্ঞাসা ব্রহ্মবাদীদের চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

"ব্রহ্মবাদীরা বলেন, কি কারণ? ইহা কি ব্রহ্ম? কখন আমরা জন্মলাভ করিয়াছি? কাহার দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি? আমরা কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত? হে ব্রহ্মবিদ্ (আমাদের বলুন) কাহার উপর অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা সুখ দুঃখের বিভিন্ন পর্য্যায় যাপন করি।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিসদ্)

"কাহার ইচ্ছায় এবং কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মন তাহার বিষয় সমূহের উপর আলোকপাত করে? কাহার আদেশে প্রাণ প্রথম চঞ্চল হইল? কাহার ইচ্ছায় মানুষ এই বাক্য উচ্চারণ করে? তিনি কোন্ দেবতা যিনি চক্ষু ও কর্ণকে নিয়োজিত করেন?"

(কেন উপনিষদ্)

কবির সেই সামগ্রিক বোধটি কি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল জিজ্ঞাসা একটি উত্তর লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে তাহারই পরিচয় লাভের চেষ্টা করিয়াছি।

সমগ্র বিসৃষ্টির (তাহার সকল অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমেত) একটি পরিপূর্ণ ধ্যানরূপ রহিয়াছে পরম চেতনায়। দেশ-কালের ভিতর দিয়া সেই ধ্যান-রূপ বিসৃষ্টির মধ্য দিয়া ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। মানব-সত্তা একক এবং সামগ্রিক ভাবে তাহাদের বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া এই পরিণামকে ধীরে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিযাছে। পরিণামে এই মর্ত্ত্য-লোকে, এই মানব সমাজে স্বর্গলোকের আভাস ফুটিয়া উঠিবে। ঈশ্বরের সহিত মানুষের তখন পূর্ণ যোগের লীলা। কোন সীমিত বোধ বা অহঙ্কার এই লীলার পথে আর লেশমাত্র বাধা দান করিবে না।

মানুষের এমন সত্তা আছে যাহা অবিনাশী, অক্ষয়। মানুষের স্পর্দ্ধা যত বড়ই হোক, অত্যাচার যত নির্ম্মম হোক, পাপ যত ঘন মশিলিপ্ত হোক মৃত্যুতে তাহার একদিন বিনাশ ঘটে। কিন্তু মানবাত্মা মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে। এই সমস্ত কিছু তাহার অমর আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই পাপের সহিত সংগ্রামে মানবাত্মা অপরিম্লান হইয়া বিরাজ করে। যাঁহারা মানবাত্মার এই অমরতাকে আপনার আত্মার আলোকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন, এই জীবনে তাঁহারা ধন্য।

"আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।" (মৃত্যুঞ্জয়)

বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, মানবিক স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, অবিক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যেই একমাত্র ঈশ্বরের প্রকাশ নয়। যেখানে মানুষ দুরূহ কার্য্যে, দুঃসাধ্যের সাধনায় নির্ম্মম কর্ত্তব্য সাধনে, বিচিত্র পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত সেখানেও তাঁহার আর এক প্রকাশ, আর এক রূপ। এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ঈশ্বরের আহ্বান শুনিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সাধনায় তাঁহার চিত্ত-লোক যত গভীর করিয়া সাড়া দিয়াছে, তাঁহার সমগ্র সত্তা যত গভীর করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে; দীপ্ত প্রাণের নির্ম্মম অসঙ্কোচ প্রকাশ লীলায় তাঁহার চেতনা তেমন করিয়া সাড়া দিতে পারে পাই।

"ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।" (আহ্বান)

কিন্তু

"শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।" (আহ্বান)

এই উভয় ক্ষেত্রকে একযোগে আশ্রয় করিতে পারিলে মানুষের সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছবি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন নিরন্তর সাধনা করিতে হইবে, তেমনি তাহাকে বহির্বিশ্বে রূপায়িত করিবার জন্য নিরলস চেষ্টা করিতে, তাহার জন্য সকল প্রকার দুঃখভোগ করিতে জীবনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। ঈশ্বর যে মানুষের অন্তর বাহিরকে পরিপূর্ণ করিয়া অনন্ত প্রসারিত। কোন একস্থানে তাহাকে একান্ত করিয়া লাভ করিবার যে সাধনা তাহাতে অপূর্ণতার পীড়াবোধ থাকিবেই। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্য্যায়ের পর হইতে এমনি একটি অপূর্ণতা বোধের পীড়া কবির জীবনে ক্রমাগত গভীর হইয়া চলিয়াছে। আমি পূর্ব্বাপর এই ধারার একটি পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছি।

নারী-পুরুষে মিলিত হইয়া মর্ত্ত্য-লোকে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের যে অপরূপ ভাব-লোক সৃষ্টি করে, প্রেমে তাহাদের পরস্পরের জন্য যে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা, যে আশ্চর্য্য আবেশ, যে আত্ম-বিস্মৃতি, যে মুগ্ধতা, চেতনার যে সীমাহীন প্রসার, জীবন ও জগতের যে অপরূপ সৌন্দর্য্য-লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন, তাহাকে বোধহয় মৃত্যুতে আর কোন স্বরূপে লাভ করিতে পারা যায় না।

"এই যে সত্যে ও ভুলে
রচিত আমার মূর্ত্তি, সংসারের কূলে
এ নিয়ে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
এরে ভালোবেসেছিল, এরে নিয়ে খেলা
সাঙ্গ করে চলে গেছে।" (নিরাবৃত)

মৃত্যুতে জীবনের যদি একান্ত অবসান না-ও ঘটে, সত্তার কোন স্বরূপে যদি অবশেষ থাকেও তবে তাহাতে এই বিশিষ্ট লীলা-রস আস্বাদ যে সম্ভব-নয় তাহা নিশ্চয়। তাহা সকল সীমার, অজ্ঞানতার, অপূর্ণতার বোধ মুক্ত পূর্ণ তত্ত্ব-দৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু জীবন জ্ঞান ও অজ্ঞান, সত্য ও ভুল, পূর্ণ ও অপূর্ণের বোধ বিজড়িত য এক অপূর্ব্ব প্রকাশ তাহাকে তো আর লাভ করিতে পারা যাইবে না।

প্রেম-তত্ত্বের সহিত রূপ-তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। প্রেম উপলব্ধির সহিত একটি বিশিষ্ট রূপের বোধ অন্তরে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হইয়া যায়। মৃত্যুর পরপারে এই রূপ আর কোন রূপে নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয়, কারণ এই দৃষ্টি আর থাকে না। প্রেম যে সেই একমাত্র রূপটিকে ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চায়।

দিব্য-চেতনা তো বন্ধ্যা তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ কিছু নাই। তিনি আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া সীমার অবগুণ্ঠন টানিলেন। দেশ-কালের মধ্যে রূপ-রস-গন্ধ তাই অন্তহীন হইয়া পড়িল। নিখিল বিশ্ব অসীমের সীমা-রূপ। ইহা এক পরমাশ্চর্য্য প্রকাশ। এই রূপ, এই সীমা, প্রতিনিয়ত সরিয়া, বিকাশ লাভ করিয়া, পরিপূর্ণ হইয়া, বিদীর্ণ হইয়া, বিশীর্ণ হইয়া অসীমকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট সীমার এই আশ্চর্য্য প্রকাশটি পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

"পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে, সৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।
সে মায়াতে বেঁধেছিনু মর্ত্ত্যে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর, অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিনু, মর্ত্ত্য পাত্রে পেয়েছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্ম্মম সে যে শুদ্ধ অনাবৃত।" (নিরাবৃত)

যে তত্ত্ব-দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎ এমন সুদুর্লভ মহিমা লাভ করে, সেই তত্ত্ব-দৃষ্টির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে পারিলে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-দর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

মানুষ মুহূর্ত্তের জন্যও যদি সেই অপূর্ব্বতার আস্বাদ লাভ করে, তবে ধর্ম্মের নামে সমাজের নামে গড়া সংস্কারের বিচিত্র বেড়া, পাকের ঘের দিগন্তে স্খলিত বসনের মতো ছায়া হইয়া কোথায় মিলাইয়া যায়। তখন এই বোধ জাগে, বিশ্বের অন্তহীন সত্তার মত তিনিও আমার সত্তাকে পরম অনুরাগে সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্তার অপার বিস্ময় আমার মধ্যেও প্রকাশমান। আমার জীবন-পাত্র পূর্ণ করিয়া তিনি আপনার অমৃত আপনি পান করিয়াছেন। এই ক্ষণাতম কালে তুচ্ছতম

আমার এই প্রকাশ না ঘটিলে তাঁহার এই বিশ্ব-রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আমার এই আমি-রূপের যোগে বিশ্বের সকল রূপের একতানে, এক সুরে লীলা।

ঈশ্বরীয় চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বের সকল রূপের সহিত যোগে এই লীলা আস্বাদের পর মানুষের জীবনে আকাঙ্ক্ষার আর কিছু থাকে না।

"তারপর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।" (জলপাত্র)

অর্থাৎ মুহূর্তের এই উপলব্ধি লাভের পর হইতে মানুষের জীবনে নিয়ত চেষ্টা চলে জীবনকে তাহারই অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। —পরম সুন্দরের যোগে জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা। পরম সুন্দরের যোগে জীবনকে কেবল গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই নয়, জগতে তাহাকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য তাহারপর হইতে মানুষ প্রাণপণ করে। তাহারপর হইতে এই জীবন একটি যজ্ঞে, একটি পরিপূর্ণ প্রণামে, একটি অখণ্ড আত্ম নিবেদনে পরিণত হইয়া যায়।

"হে মহান, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ,
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা পানে করুক বহন।" (জলপাত্র)

প্রাচীন সৃষ্টি তাহা যতই অপূর্ব্ব হোক-না-কেন, কালে তাহা একদিন জীর্ণ হইয়া ধূলির সহিত ধূলি হইয়া হারাইয়া যায়। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি প্রেরণা তো অব্যাহত থাকে। নূতন কালের মানুষ আবার নূতন রূপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন সৃষ্টি নূতন কালে একান্ত মিথ্যা হইয়া যায় না। প্রাচীন সৃষ্টির সাধনাকে নূতন কাল আরো উন্নত সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। এমনি করিয়া সৃষ্টি যুগ হইতে যুগান্তরের ভিতর দিয়া নিত্য নব-রূপ লাভ করিয়া পূর্ণতাকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিতেছে।

"ধূলা তারে ডাক দিয়ে কয়—
'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা'।" (লেখা)

বলাকা আলোচনা প্রসঙ্গে কবির উপলব্ধ চিরন্তন ভাব বা বাণী-লোকের পরিচয় লাভ করিয়াছি। বলাকার 'অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী', ইত্যাদি উদ্ধৃত অংশটির সহিত মিলাইয়া পরিশেষের 'আলেখ্য' কবিতাটি পাঠ করা যাইতে পারে। এই ভাবের একটি প্রবাহ পরবর্ত্তী কাব্যগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুনশ্চের 'চিররূপের বাণী' এবং আরোগ্যের 'বিরাট মানব চিত্তে' প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখ করিতে পারা যায়।

"অপেক্ষা করিয়াছিলি শূন্যে শূন্যে কবে কোন গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
* * *
প্রকাশের ভ্রম কোন
চিরদিন রবে না কখনো।
* * *
আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।" (আলেখ্য)

স্থির একটি চিন্তা বা ভাব-লোক আছে, যাহা মানব-হৃদয়ের ভিতর দিয়া ক্রম পরিণাম রূপে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। এই ধীর অভিব্যক্তির নিঃসংশয় উপলব্ধি প্লেটোর চিরন্তন 'Ideas', 'forms' বা 'universals' এর তত্ত্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিকে মূলত পৃথক করিয়াছে। মিল যেটুকু রহিয়াছে তাহা চিরন্তন কতকগুলি বোধের উপলব্ধির ক্ষেত্রে। রূপ বিনষ্ট হয় কিন্তু রূপাশ্রয়ী ভাবগুলি (অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-প্রেরণা সমেত) চিরকাল রহিয়া যায়। সেইগুলি আবার ফিরিয়া ফিরিয়া নূতন রূপ লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিকে একটু বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। বিশ্বের সহিত এই ধীর মিলন বোধের গভীরতা ও প্রসারতার ভিতর দিয়া ব্যক্তির প্রেমের, কর্ম্মের ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। বিশ্বের সহিত মিলনবোধের ভিতর দিয়া মানব হৃদয়ে এই যে আর একটি ভাবলোক সৃজিত হইতেছে, তাহা নিখিল মানবের চিত্ত-লোক আশ্রয় করিয়া ক্রমিক গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সকল খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভাব ধীরে এইরূপে একটি অখণ্ড ভাব গড়িয়া

তুলিতেছে। তাহার সমগ্র প্রকাশটি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হইতেই পারে না। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যকে তাহার সকল অতীত সমেত যদি সমগ্র রূপে দেখি তবে একটি অখণ্ড রূপের আভাস নিঃসংশয়ে ফুটিয়া উঠে।

বিশ্ব-মানব-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া এইরূপে যে ভাব-লোকের ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিতেছে, তাহা বহির্বিশ্বের সহিত একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। মানুষ যুগে যুগে বিচিত্র কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই ভাবকেই বাহিরে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে। ভাবের ধীর বিকাশ বা সম্পূর্ণতার সঙ্গে কর্ম্মের ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিতেছে। তাহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সমাজ-চিন্তায়, রাষ্ট্র-চিন্তায়, বিচিত্র ধর্ম্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। অর্থাৎ মানুষ জ্ঞান-জগতের বিচিত্র বিভাগকে মিলিত করিয়া ক্রমাগত উন্নততর সামঞ্জস্য বা মিলন তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছে। এই সামঞ্জস্যের সহিত যাহা মিলিতেছে না তাহা কালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ভাব, চিন্তা ও কর্ম্ম, অন্তর ও বাহির একত্রে মিলিত হইয়া এইরূপে একটি অখণ্ডতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় অখণ্ডতার কোন তত্ত্ব নাই। তাহার একদিকে জীবন, অন্যদিকে জীবনাতীত ; তাহার যে নামই দেওয়া হোক-না-কেন। তেমনি তাহার সাহিত্য-তত্ত্বানুশীলনের ক্ষেত্রেও এই একই ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ মানবিক কোন একটি বোধকে (হৃদয় বা মানস-বৃত্তি) রস পরিণাম দান করিয়া তাহার একাত্মতা ও তন্ময়তার ভিতর দিয়া পরিণামে সকল বোধের সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টাই সাহিত্যের পরা প্রাপ্তি বা শ্রেষ্ঠ ফললাভ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় ভাব ও রূপ পরিণামে একাত্মতা লাভ করিয়া একটি অখণ্ডতার সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ সাহিত্যে ভাবের সম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে রূপের জগতেও ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিয়া চলিয়াছে, পরিণামে এই ভাব ও রূপ একটি একাকারত্বে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য।

সাহিত্যের লক্ষ্য তাই নিখিল বিশ্ব-মানব-হৃদয়ের মিলিত চেষ্টার শ্রেষ্ঠ রূপাদর্শ

লাভ, তাহা কোন অরূপ তত্ত্ব নহে। এই শ্রেষ্ঠ রূপাদর্শের সহিত একদিন বহির্বিশ্বের রূপের মিলন ঘটিবে।

বিশ্বের সহিত মিলন বোধের ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞান রাজ্যের সীমা ক্রমাগত প্রসার লাভ করিতেছে। এইরূপে জ্ঞানের প্রসারতার ভিতর দিয়া সে বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বকে ক্রমাগত আপনার করিয়া লইতেছে।

বিশ্বের সহিত হৃদয় বোধের ক্ষেত্রে যে মিলন, যাহাকে আমরা বলি সৌন্দর্য্য, তাহার সীমাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপে সৌন্দর্য্যের প্রসারতার ভিতর দিয়া হৃদয়বোধের ক্ষেত্রে সে বিশ্বকে ক্রমাগত আপনার করিয়া লইতেছে। সাহিত্যের মধ্যে আমরা মানুষের হৃদয়বোধের এই ধীর প্রসারতার পরিচয় লাভ করি।

ব্যক্তি-মানুষ এইরূপে বিশ্বের সহিত যোগে বিশ্ব-মানবে পরিণাম লাভ করিতে চলিয়াছে;—যে মানুষ বিশ্বের সকল জ্ঞান, সকল প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে, সকল কর্ম্মের মধ্যে আপনার অব্যবহিত যোগ অনুভব করে।

নিখিল বিশ্বের মানুষ এই যে বিশ্ব-মানবতা লাভ করিতে চলিয়াছে, বিশ্বের সহিত বন্ধনে যে মহানন্দময় মুক্তি লাভ করিতে চলিয়াছে, তাহার সহিত নির্ব্বাণ মুক্তির যে সুদূর কোন মিল নাই, তাহা স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। এই বিশ্ব মানবতা সাহিত্যের লক্ষ্য। তাহাকে তাই মুক্তি-তত্ত্বের বা যোগ-তত্ত্বের সহিত মিলিত করিয়া পাঠ করিবার কোন উপায় নাই।

সাহিত্যের উৎকর্ষও অপকর্ষ বিচারের তাই নূতন সূত্র প্রয়োজন। সে সূত্র হইল ব্যক্তির অনুভূত সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক, ব্যক্তির হৃদয়লোক, বিশ্বের সৌন্দর্য্যও প্রেম লাভের কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল। বিশ্ব-হৃদয়ে হৃদয় সংযোগের এই ক্রম প্রসারিত আবেগের প্রাবল্যে প্রতিকূল যে-কোন প্রেরণা একদিন লুপ্ত হইয়া যাইবে। অপকৃষ্ট সাহিত্যের রূপ এইরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

পুনশ্চ

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবির অন্তরে প্রাণের অনুভূতি যত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কবির কাব্য প্রতিভাও তত ম্লান হইয়া পড়িতেছে।

'সোনারতরী' 'চিত্রা' প্রভৃতি রচনাকালে কবির প্রাণের অনুভূতিকে যদি প্রমত্তা পদ্মার সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কবির অন্তরে প্রাণের এখনকার অনুভূতিকে 'কোপাই'য়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 'কোপাই'য়ের সৌন্দর্য্য-সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া প্রাণে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া আজ তাই কবির পদ্মার কথা মনে পড়িয়া যায়—যৌবনের কত দিন-রজনীর কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী।

একদিকে পদ্মা

"ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,
তাদের সহ্য করে স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধতার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জ্জন পর্ব্বতের স্মৃতি, আর একদিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।" (কোপাই)

পদ্মার এই বর্ণনার মধ্যে কবির প্রতিভা-প্রদীপ্ত যৌবনে রচিত কাব্যধর্ম্মের নিগূঢ় পরিচয় লাভ করা যায়। সেই নিগূঢ় ধর্ম্মের স্বরূপ কি? অন্ততঃ কবি আপনার কাব্যের কোন্ স্বরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

যে প্রাণ বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া সকল রূপের কূল ছাপাইয়া অনন্তের অভিমুখে দুর্ণিবার বেগে ছুটিয়া চলে কবির যৌবনে রচিত কাব্যে প্রাণের সেই জাতীয় প্রেরণা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

জীবনে সীমার দিকটিকে সহ্য করিতে হয়, সহ্য করিতে হয় ইহার সকল বন্ধন-দশা, তুচ্ছতা ও মালিন্য। কিন্তু কবি জীবনের এই স্বরূপকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন এই সকল সীমা বোধকে ছাড়াইয়া জীবন অনন্ত বিস্তৃত। অসীমের জন্য তাঁহার প্রাণ নিত্য দীপ্ত হুতাশন জ্বালাইয়া বসিয়াছিল।

আর এই মহাভাবকে প্রকাশ করিতে সেদিন কবির কাব্যে ছিল বিশুদ্ধ আভিজাতিক ছন্দ।

তাঁহার কাব্যে একদিকে ছিল নির্জ্জন পর্ব্বতের স্মৃতি, আর অন্যদিকে ছিল নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান। অর্থাৎ সেদিনের কাব্যের মধ্যে সকল বস্তুভার সত্ত্বেও ছিল আশ্চর্য্য নিরাসক্তি, অতি তীব্র বৈরাগ্য। সে কাব্যের আদিতে ও অন্তে অর্থাৎ সমগ্র কাব্য ব্যাপিয়া ছিল অমর্ত্ত্য-লোক লাভের অতি প্রবল অভীপ্সা।

সৃষ্টি-লোক ব্যাপ্ত অন্তহীন প্রাণ স্পন্দনের একদিকে চিরস্থির শাশ্বত দিব্য-চেতনা-লোক, অন্যদিকে চেতনার সর্ব্বশেষ পরিণাম, জড়লোক। সৃষ্টির অনন্ত প্রাণ-ধারার সহিত কবির চেতনাও সেকালে এক প্রকার সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল।

অন্যদিকে কোপাই—

"বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো
ভাঙ্গে না ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্ত্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে বয়ে চলে।" (কোপাই)

আজ কবির প্রাণের অনুভূতি যখন সর্ব্বাধিক তীব্র হয়, তখন হয়ত বর্ষার দুই কূল পরিপূর্ণ 'কোপাই'য়ের মত অমনি এক প্রকার গতি ও বিস্তার লাভ করে, তাহা ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বে মহাব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না। অচিন্তনীয় বিপুল বিশ্ব-প্রাণ-প্রবাহ কবির চেতনায় আজ 'কোপাই'য়ের মত ক্ষীণ এক ধারায় প্রবাহিত।

তাহাতে অন্তরের গভীর উদাত্ত মহান বৈরাগ্যের ওঙ্কার ধ্বনি নাই। প্রাণের সে প্রবাহে অসীমের ছায়াপাত ঘটে না। আজ কবির প্রাণ-প্রবাহ একান্ত ক্ষীণ, আসক্তির নানা বাধা-বন্ধনে মন্থর, সহস্র তুচ্ছতাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহাদের ছায়া বক্ষে লইয়া করুণ রোল তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে প্রাণের এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সাক্ষাৎকারও কেমন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

আমি এক্ষেত্রে আরও একটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে কবির এই অধ্যাত্ম-পরিণামটিকে আর একদিক দিয়া বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

বিশ্বের সহিত নিবিড় মিলনের ভিতর দিয়া, বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় আপনার প্রাণের যোগের ভিতর দিয়াই কবি সৃষ্টি-প্রেরণা বোধ করিতেন। আজ কবি সেই প্রাণ-ধারাকে অন্তরে গভীর করিয়া সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিতেছেন না। বিচ্ছিন্ন সত্তার নিঃসঙ্গ বোধে সৃষ্টি প্রেরণা শূন্য হইয়া কবি জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিতে চাহিয়াছেন।

"কাল আপনার পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
একদিনের দায় টানি কেন আব একদিনের পরে,
দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই না কেন সামনের দিকে চেয়ে।" (নূতন কাল)

বলিয়াছি, প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য ও প্রেম সম্ভোগের দিন, প্রাণের যোগে প্রাণ আস্বাদের দিন কবির জীবনে একপ্রকার অবসিত হইয়াছে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সামর্থ্য ধীরে ধীরে কমিয়া বাহিরের যোগ অনিবার্য্য রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বাহিরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু মনের বন্ধন ঘুচে না। মন তখন অতীত স্মৃতির ওই সঞ্চয় লইয়া তাহাকেই গভীর মমতায় জড়াইয়া ধরে। স্মৃতির ওই সঞ্চয় তখন কাব্যের একমাত্র বিষয় বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কবির কাব্য-জীবনে এই পরিণামও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই স্মৃতিও ম্লান হইয়া আসিতে থাকে। তখন জীবনে অবশেষ থাকে শুধু অন্তহীন বেদনার ভার, যাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তাহার পর একদিন জীবন-দীপ অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই নিয়তি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জীবনের এই রূপাশ্রয়ী সাধনাকে তাই তিনি পরিহার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরিহার করা কবির জীবনে ঘটিল না। কেন ঘটিল না তাহার কারণও কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই,
তখন দেখি তুমি যে আছ
একালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।" (নূতন কাল)

এই 'তুমি' কে ? 'তুমি' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে বোধ আশ্রয় করিয়া কবি বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শ লাভ করিতেন, সেই প্রাণের যে ক্ষীণ ধারা আজও তাঁহার অন্তরে আছে এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্যও প্রেমের যোগে বিশ্ব-প্রাণ-ধারার যে ক্ষীণ অনুভূতি আজও তিনি লাভ করেন তাহারই আকর্ষণের কথাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই তুমি বিশ্ব-প্রাণ-ধারাই বটে, সৌন্দর্য্য ও প্রেম রূপে যাহার অনুভূতি অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়। কবি এই প্রাণের, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই সাধনাকে এক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

জীবনের দুটি সাধন-ধারা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটি রূপাশ্রয়ী, জীবনের সকল পর্য্যায়ে এই রূপকেই কোন-না-কোন স্বরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া। আর একটি সাধনা রূপকে উত্তীর্ণ হইয়া অরূপকে লাভ করিতে চাহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই রূপের সাধনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অরূপ চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রকাশ পাক-না-কেন, তাহা যত অপরূপ, যত দুর্লভ হোক, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পরিহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের নিকট এই রূপের জগৎ, এই স্বরূপেই দুর্লভতম, উহারই রসাস্বাদ দিব্য-চেতনার আনন্দ আস্বাদ অপেক্ষাও মহৎ। সেই রস-সাধনার নাম রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়াছেন প্রেম।

"দিনের শেষে নূতন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।" (নূতন কাল)

মর্ত্ত্যের এই 'ভালোবাসা' অমর্ত্ত্য-প্রীতি অপেক্ষাও দুর্লভ! এই 'ভালোবাসার' স্বরূপটিকে তাই আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-ধারা সৌন্দর্য্য ও প্রেম রূপে কবির অন্তরে যত ক্ষীণ ভাবে হোক আজও তো অনুভূত হয়। ওই অনুভূতিকেই তিনি তাঁহার কবি-জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নানা ভাবে প্রকাশ করিয়া যাইবেন। কিন্তু কাব্য রচনার ওই প্রয়াসের কালে কবি দেখিলেন—

"তুমি গেলে সেই খানেই
যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।" (নূতন কাল)

ইহার অর্থ কি? সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধ আশ্রয় করিয়া যে প্রাণের অনুভূতি তাহা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কবি-চেতনাকে বিশ্ব-চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়াছে, আমরা তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি। অনুভূতির এই ধীর পরিণাম এবং বিশ্ব-চেতনার আভাস লাভের মধ্যেই কবির সার্থক কাব্য-সৃষ্টি।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্য দিয়া প্রাণের যে বিকাশ ঘটে তাহা যদি পরিণামে বিশ্ব-চেতনায় পরম বিস্তার না লাভ করে, তাহা হইলে আসক্তি প্রবল হইয়া চিত্তের বন্ধন সৃষ্টি করে।

পরিণত যৌবনে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে অনুভূতি কবির প্রাণ-ধারাকে বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় যুক্ত করিয়া দিয়াছিল; ('তুমি'র আসঙ্গ লাভ ঘটাইয়াছিল) সুপরিণত বয়সে তাহা আর ওই পরিণাম লাভ ঘটায় না বলিয়া 'তুমি'র সহিত মিলন বোধটাও নাই।

যৌবনে বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির যে সার্থক কাব্য-সৃষ্টি-প্রেরণা, তাহা এই কালে একপ্রকার নিরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। একালে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতিটি আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম নাই, আজ তাহা কেবল বন্ধন মাত্র। অধ্যাত্ম সত্তা এবং তাহারই যোগে বিশ্ব-সত্তার সহিত মিলনের পরিচয় বহন করিয়া আছে কবির অতীত কালের কাব্য।

বিশ্ব-চেতনা লাভের এই পরিণামটিকে যদি স্পষ্ট করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে কবির কাব্য পাঠে সুবিধা হইবে। বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আর ভিন্ন পথ নাই।

'পুনশ্চে'র মধ্যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম বর্ত্তমানে কবি-প্রাণের কোন্ পরিণামের ফলে সম্ভব হইয়াছে তাহাই কেবল বুঝিতে হইবে।

অলস তপ্ত মধ্যাহ্নে পুকুরের স্থির কালো জলের বিস্তারের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে কবির বুকের ভিতর গোপন কোন এক বেদনা জাগে। আর এই বেদনার ভিতর দিয়া কবির স্মৃতি-লোক উদ্বেল হইয়া উঠে।

স্মৃতিটাও খুব স্পষ্ট নয়। সব ঘিরিয়া বেদনার একটা চকিত আভাস। যে আলেখ্যটি স্মৃতি-লোক মথিত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
'তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে,
সে আঙ্গিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে,
সে আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছু বলতে পারে না,
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে।" (পুকুর ধারে)

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মমতা বিজড়িত সকরুণ একটি ছবি। কবির প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য ও প্রেম আস্বাদের জীবন অবসিত হইয়াছে। তাই অমন করিয়া অতীত স্মৃতির মণি-মঞ্জুষা খুলিয়া তাহাদের একটি একটি করিয়া অঙ্গুলি প্রান্তে তুলিয়া গভীর মমতায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন। প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাদের লাভ করিবার উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে মন উদাস হইয়া যায়। শিথিল অঙ্গুলি প্রান্ত হইতে স্মৃতির মুক্তা খণ্ড টুকু খসিয়া পড়ে। চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে। অবশেষে থাকে কেবল এক অসহায় শূন্যতা বোধ।

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের মধ্যে দুটি দিক প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক অপরটি ওই লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবার বেদনা।

এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক আবার কবির স্মৃতি-লোক। কবির যৌবনে সৌন্দর্য্য ও প্রেম-লোক সৃষ্টির যে পরিচয় লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যেও এক প্রকার বেদনা বোধ বিজড়িত ছিল। সেদিনের সেই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান এবং বিরহ বোধের মধ্যে আজিকার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান ও বিরহের মধ্যে পার্থক্য আছে।

তাহা প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লীলা বলিয়া শুধু নয়, সেই পিপাসা দেখিতে দেখিতে আর এক পিপাসায় রূপান্তরিত হইয়া যাইত। সকল রূপের

পশ্চাতে যে অরূপ, শাশ্বত, চির স্থির চেতনা, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে অনন্ত বা অখণ্ড সৌন্দর্য্য-লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ফলে সৌন্দর্য্য ও প্রেম লীলার যে আলোকিক ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার কোন প্রকাশ যে কবির একালের কাব্যে নাই তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

ওই লোক লাভের সেই আশ্চর্য্য প্রেরণা কোথাও একটা দুর্ব্বার আবেগ রূপে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে রূপ বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। কবি-প্রাণের বেদনা যেন একেবারে সৃষ্টির মর্ম্ম মূলে ধ্বনিত হইয়াছে। সেই কান্নার সুরে সৃষ্টির কান্নার সুর মিলিয়াছে। সেই একাত্মতার ভিতর দিয়াই কবি বোধ করিতেন, "অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন"। অনন্ত বা অসীমকে লাভ করিবার প্রেরণায় সেদিন ব্যক্তি ও বিশ্ব একাকার হইয়া যাইত।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যানের মধ্যে আজ কবির বেদনা মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা মানুষের সেই পূর্ণতা লাভের শাশ্বত কান্নার বিশিষ্ট প্রকাশ নয়। এই কান্না আসক্তির রূপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নয়, রূপকে মমতায় বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার জন্য।

জগৎ ও জীবনের যতটুকু স্পর্শ, প্রাণের যতটুকু সাড়া কবি আজ অন্তরে বোধ করেন, তাহা স্মৃতি-লোকের ভিতর দিয়া।—অতীত দিনের কত সুখ দুঃখ মথিত অমৃত সঞ্চয়।

> "মনে আনবার অনেক দিন ক্ষণ আমাবো আছে,
> অনেক কথা অনেক দুঃখ।
> তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
> নূতন বসন্তের হাওয়া আসে
> রজনী গন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে।" (ফাঁক)

সেই স্মৃতির বিষামৃত বক্ষে বহন করিয়া কবি জগৎ ও জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। জীবনের সেই চিরন্তন নিত্য পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লীলা। তাহা আজও বহিয়া চলিয়াছে। সেই লীলার জগৎ হইতে কবি কত দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। মাঝখানে যেন অন্তহীন পথ। তাহার ওপার হইতে ওই জীবনের মিনতি মাখান অতি করুণ আহ্বান ইঙ্গিত আসে। কবি কেমন করিয়া উহার

সহিত মিলিত হইবেন। বক্ষের সমস্ত পঞ্জর জীর্ণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে।

"তারি ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখছে চিঠি নূতন বধূ
ফেলছে ছিঁড়ে, লিখছে আবার।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে
আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে।" (ফাঁক)

প্রত্যক্ষ জীবনের এই রিক্ততা বঞ্চনা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কবি মনে মনে সৌন্দর্য্য-লোক সৃজন করিয়া তাহাতে প্রাণের অতবড় শূন্যতা ভরাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ যোগে, প্রাণের সহিত প্রাণের তীব্রতম আসঙ্গে কবির এই সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্টি নয়। তাহা জীবনের প্রতিরূপ নয় (যে স্বরূপ হোক-না-কেন) এক প্রকার কল্পনা আহৃত সামগ্রী।

'পূরবী'র 'আশা' কবিতাটির মধ্যে ইহারই একটি পূর্ব্বাভাস আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তবে সেক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ওই পিপাসা অনুভূত হইয়াছে জগৎ জীবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা হইতে। কিন্তু 'পুনশ্চে'র 'বাসা' কবিতাটির মধ্যে জীবনের রিক্ততাকেই অমনি একটা স্বপ্ন সঞ্চরণের ভিতর দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার বাসনা। কবি আজ প্রাণ-লীলার কেন্দ্রস্থলে আপনার 'বাসা' নির্ম্মান করেন নাই; তাহা জীবন-বিচ্ছিন্ন এক শূন্য-লোক।

"আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।" (বাসা)

ময়ূরাক্ষীর স্বরূপ আনরা জানি, তাহা সেই পূর্ণতার লোক, রবীন্দ্রনাথের নিকট যাহা অখণ্ড সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অধ্যাত্ম স্বরূপে অনুভূত হইয়াছে।

ওই পূর্ণতা লাভের গোপন আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সকল সময় জাগ্রত ছিল। সেই অখণ্ড সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান আজ কোন্ পরিণামে 'ময়ূরাক্ষী'তে পরিণত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

কেবল তাহাই নহে, তাহা ছিল জীবন ও জগৎকেই তাহার পূর্ণ স্বরূপে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। সেই সাক্ষাৎকারে জগৎ ও জীবন অন্তহীন সৌন্দর্য্য ও লীলা-স্থলীতে পরিণত হইয়া যায়। কবি আজ সেই পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছেন জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিয়া। মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উন্নততর লোকের ছায়াপাত ঘটিয়া যায়। এই প্রতিভাস হইতেই তো বুঝিতে পারা যায়, যে মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেম, সৌন্দর্য্য ও প্রেম স্বরূপেই কেবল সত্য নহে। উহা অপর কোন সত্য স্বরূপে উত্তীর্ণ হইবার একটা পর্য্যায় মাত্র।

সৌন্দর্য্য বোধের ক্ষেত্রে যেমন—

"একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।"

তেমনি প্রেমের অনুভূতির ক্ষেত্রে—

"প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্য যুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা ছোঁয়ার বাইরে।" (সুন্দর)

মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমে যে অরূপ সৌন্দর্য্য ও প্রেম মুহূর্ত্তে প্রতিভাসিত হইয়া যায়, তাহাকে কবির ধ্যান-লোক বা অধ্যাত্ম-সত্তা বলিয়া কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছি, কবি এই প্রতিভাসিত সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জগৎ লাভের জন্য একদিন দুরূহ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উন্নততর চেতনালোকে উত্তীর্ণ হইয়া ওই জগৎ হইতে কত না অপরূপ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সম্পদ অহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। আজ সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার মত কবির সে প্রাণ শক্তি নাই।

অবশ্য 'পুনশ্চে'র মধ্যে এমন দুই একটি কবিতা আছে যেখানে মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যানে একান্ত ক্ষীণভাবে অধ্যাত্ম-লোকের বিদ্যুচ্চকিত ছায়াপাত ঘটিয়া গিয়াছে।

এই বিদ্যুচ্চকিত ছায়াপাতের ভিতর দিয়াই তো উন্নততর চেতনালোক লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। একদিন এই আকাঙ্ক্ষাকে কবি সার্থক করিয়াছেন; অন্তত সদা জাগ্রত সাধনা ছিল। আজ তাহা আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই রহিয়া গিয়াছে।

"যেখানে ওর অন্তর্য্যামীর আসন পাতা,
সেই খানে তার পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথা ধূপের পাত্রখানি।" (কোমল গান্ধার)

কিংবা

"যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন করে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।" (কোমল গান্ধার)

লক্ষ্য করা যায় এই সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের সহিত বেদনা বোধ বিজড়িত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে এই বেদনা বোধের দার্শনিক স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শান্তি নিকেতনে'র 'সৌন্দর্য্যের সকরুণতা' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া স্মরণে পড়িতেছে।

তাহার মূল ভাবটি এই যে, সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে একটি অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা জাগে। এই ব্যাকুলতা হইল উন্নততর চেতনা-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাই জাগতিক জীবনে মানুষকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে দেয় না।

যে অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এই একই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এক কালে ব্যাকুলতা নিরসনের যে প্রয়াস ছিল এবং ওই প্রয়াসের ভিতর দিয়া কবি-চেতনার যে অপরূপ বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, আজ সে চেষ্টা নাই, সে বিকাশও নাই

নিখিলের যে প্রাণ-ধারা সৌন্দর্য্য-প্রেম রূপে বিকশিত সেই প্রাণ-ধারার সহিত প্রাণের অতি ক্ষীণ সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া ওই ব্যাকুলতা অমন অসহায় ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যে বোধে প্রাণের সহিত প্রাণ একাকার হইয়া বিশ্ব-প্রাণের মধ্যে আপনাকেই অনন্ত ব্যাপ্ত দেখে, প্রেমের সেই যে পরিণাম তাহার কোন পরিচয় কি এক্ষেত্রে রহিয়াছে?

নিম্নে যে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, সেক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া চেতনা ব্যক্তি বা রূপের সীমা কেমন করিয়া প্রায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তাহার একটি পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

ধ্যান-লোকে ইন্দ্রিয়-চেতনা লব্ধ সৌন্দর্য্যের রূপান্তর ঘটে, কেবল তাহাই নহে, উহাতে দিব্য-চেতনার চকিত আভাস নামিলে ওই পরিচিতি সৌন্দর্য্য-লোক এমন এক প্রকার অপরিচয়ের বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়, যে তাহাকে আর পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না।

"অন্তহীন কাল সরোবরে
মাধুরীর শতদল
তার'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।" (ভীরু)

এই কালে জীবনও জগতের যে স্বরূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই সাক্ষাৎকারের সহিত বিজড়িত হইয়া যে সমস্ত দার্শনিক জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তে জাগিয়াছিল এখন একে একে তাহাদের পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

জীবন যে স্বরূপে আজ কবির নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নের কয়েকটি পংক্তির মধ্যে মিলিবে।

"এব পানে অনেকদিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল দিনে আর আমার বাদল গানে
তারা কেউ আছে, কেউ গেল চলে।
আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথ রাত্রের তাবা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে।"

কবি অনুরাগে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কত প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া এই জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এই জগৎ ও জীবনকে মধুময় বলিয়া বোধ করিয়াছেন। আর আজ প্রাণের অতি ক্ষীণ প্রেরণায় জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য ও প্রেমোপভোগের দিন তো গিয়াছেই, স্মৃতির সঞ্চয়টাও একান্ত ম্লান ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ স্মৃতি বা ধ্যান-লোকটিও অম্লান থাকে জগৎ ও জীবনের সহিত নিত্য প্রাণের যোগে। বিচ্ছিন্ন সত্তাবোধে তাই কবির স্মৃতি বা কাব্য-লোক অমন সৌন্দর্য্য শূন্য কেবল বেদনা কলুষিত। এমনি করিয়া প্রাণের সঞ্চয় ও একদিন হারাইয়া যাইবে। তাহার পর এই জগৎ হইতে নিঃশেষে বিদায় লইবার শেষ মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিবে।

অকস্মাৎ কোথা হইতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে? প্রাণের যোগে প্রাণ কেমন করিয়া এই জীবন ও জগৎকে অপরূপ সৌন্দর্য্য ও প্রেম মণ্ডিত বলিয়া বোধ করে? সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই বোধটাই বা কি? মৃত্যুতে এই প্রাণ আবার কোথায় হারাইয়া যায়? এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিতে চাহিয়া বিচিত্র দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে দার্শনিক এই জাতীয় কোন জিজ্ঞাসা এবং তাহার উত্তর লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় নাই।

দেশ-কালের পরিসীমায় জীবনকে কেবল জীবনের স্বরূপে প্রত্যক্ষ করা, উহারই বিস্ময় বোধে দার্শনিক বিচিত্র জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই লীলা শাশ্বত। এই জীবন তাহার মধ্যে ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া মণি দীপ্তি ছড়াইয়া কোথায় হারাইয়া যায় কে জানে।

এই সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার, এই অনুরাগ, এমনি অনিচ্ছায় একদিন নিঃশেষে সমস্ত কিছু পরিহার করিয়া যাওয়া জীবনের এই নিয়তি সাক্ষাৎকার।

'খেলনার মুক্তি' কবিতাটির মধ্যে জীবনের এই স্বরূপ সাক্ষাৎকারের আর একটি দিক প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের যে প্রবাহ নিত্য বহিয়া চলিয়াছে, ব্যক্তিপ্রাণ তাহারই একটি অচিন্তনীয় ক্ষুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গ মাত্র। মৃত্যুতে ওই প্রাণ অনন্ত প্রাণ প্রবাহে মিলিয়া যায়। অনন্ত প্রাণের যোগে সৃষ্টির সকল রূপের মধ্যে মানুষ আপনার চেতনাকেই লীলায়িত দেখিয়া মুক্তি লাভ করে।

"ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।" (খেলনার মুক্তি)

মানুষের প্রেম এই সাক্ষাৎকারে সান্ত্বনা মানে না। সে যে রূপের ভিখারী। ওই বিশিষ্ট রূপ না হইলে তাহার প্রেম ধন্য হয় না। আমরা যাহাকে ভালবাসি

তাহাকে ওই বিগ্রহ স্বরূপেই লাভ করিতে চাই। মৃত্যুতে ওই হাহাকার তাই শূন্য হৃদয় ঘিরিয়া প্রতিধ্বনি তুলে।

জীবনের এই সান্ত্বনা শূন্য শোককে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন দার্শনিক পরিণাম লাভে এই শোককে যে দূরীভূত করিতে পারা যায় না, এক্ষেত্রে কবির এমনি এক প্রকার বিশ্বাস বোধ জাগিয়াছে। তাই এমন জিজ্ঞাসা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। 'তবে শুধু কি রহিবে বাকি কান্নার খেলা'।

এই বেদনা যত গভীর হোক, তাহা একক হৃদয়ের। মৃত্যুতে ওই শোকও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। নিত্য নবীনের লীলা এই জগতে। ব্যক্তির যে-কোন বোধ প্রাণ-সমুদ্র-তটে ক্ষণকালের জন্য রেখা মাত্র টানিয়া চিরকালের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইযা যায়।

"রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টি ধোওয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।" (খেলনার মুক্তি)

আমরা আমাদের চেতনা দিয়া এই বিপুল বিশ্বের অস্তিত্ব বোধ করি। এই অচিন্তনীয় বিপুল অস্তিত্ব যদি সত্য হয় তবে মৃত্যুতে আমরাই কেবল অনস্তিত্ব হইয়া পড়িব, ইহা কখন সত্য হইতে পারে না।

সীমাহীন দেশ-কালের বক্ষে অগণিত জ্যোতিষ্ক-লোকের কল্পনাতীত শক্তির স্পন্দন লীলা চলিতেছে।

"যত গ্রহ নক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্ত্তন
মহাকাল সমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম অকম্পিত রেখার এধারে।" (মৃত্যু)

দেশ-কাল জুড়িয়া এত বড় অস্তিত্ব যদি কবির চেতনায় সত্য হয়, তবে মৃত্যুতে সেই চেতনার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে।

"নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
এ কি সত্য হতে পারে।" (মৃত্যু)

কিংবা 'ছুটি' কবিতাটি। তাহার মধ্যে কবি জীবনের কোন্ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

অনন্ত প্রাণ প্রবাহে কত রূপ নিত্য জাগিয়া উঠিতেছে আবার বিলীন হইতেছে। পরিপূর্ণ নিরাসক্ত এই সৃষ্টির লীলা। এই অনন্ত লীলা যিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহার প্রাপ্তির আনন্দ নাই, বিয়োগের বেদনাও নাই। সৃষ্টি এবং বিনষ্টি দুইকে আশ্রয় করিয়াই সেই এক পরম অস্তিত্বের প্রবাহ।

"যাওয়া আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে
ধরে রাখার নাই কোন আগ্রহ,
দূরে রাখার নাই তো অভিমান।" (ছুটি)

পর পর যে কয়েকটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলাম, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কবি জীবনের এই নিয়তি রূপটিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই মর্ত্ত্য-লোকে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে, বাড়িয়া উঠে, ভালোবাসে, মুগ্ধ হয়, আনন্দ-বেদনার সংখ্যাতীত তরঙ্গ তাহার হৃদয়তটে একের পর এক রেখা চিহ্নিত করিয়া দিয়া যায়, সেই বিচিত্র বোধকে গভীর করিয়া লাভ করিতে, প্রকাশ করিতে সে কত নর-নারীকে আকর্ষণ করে, তাহারা একে একে আবার কোথায় দূরে চলিয়া যায়, কেহ মর্ত্ত্য-লোকে, কেহ মৃত্যুর পরপারে,—এমনি করিয়া একদিন আসে যখন মানুষের চেতনা-দীপ ফুৎকারে নিভিয়া যায়।

মানুষ কোথা হইতে আসে, মৃত্যুতে আবার কোথায় হারাইয়া যায়? সে কি কোন শূন্য লোক হইতে শূন্য লোকে, মাঝখানে ক্ষণিক অস্তিত্বের একটা বোধ সৃষ্টি করিয়া? না অস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব-লোকে মাঝখানে মায়াময় মরীচিকা সৃষ্টি করিয়া?

এই জীবন সৃষ্টি কেন? কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে তাহার এই জগতে আসা? এই জগৎ ও জীবন সৃষ্টির পশ্চাতে কোন্ উদ্দেশ্য আছে? সে উদ্দেশ্য কি?

এই জাতীয় যে-কোন জিজ্ঞাসা মানুষকে অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, জ্ঞান মরীচিকার সন্ধানে ছুটিয়া তাহার তৃষিত বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই এক্ষেত্রে জীবনকে জীবনের স্বরূপে মানিয়া লইয়াছেন। সৃষ্টি যেমন আমার ইচ্ছায় হয় নাই, এই জীবনের কোন কিছুর উপর যেমন আমার নিয়ন্ত্রণ নাই, তেমনি মৃত্যুতে জীবনের যে পরিণাম তাহাকে এমনি নিরাসক্ত ভাবে মানিয়া লওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথের একটি মনোভাব কেবল ব্যক্ত করিলাম। ইহার বিচার তাই নিষ্প্রয়োজন।

'খেলনার মুক্তি' কবিতাটির মধ্যেও কবি এই জীবন-জিজ্ঞাসাকে আর একটি দিক দিয়া পরিহার করিয়াছেন।

আমার মধ্যে যে প্রকাশ মৃত্যুতে তাহা বিসৃষ্টির অনন্ত প্রাণ-ধারায় একাকার হইয়া যায়, নানা রূপের মধ্য দিয়া আবার তাহার প্রকাশ ঘটে। অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রে সংখ্যাতীত রূপের তরঙ্গ উঠিয়া আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শাশ্বত কাল ধরিয়া সৃজন-প্রলয়ের এই লীলা চলিতেছে।

কিন্তু এই বিশিষ্ট ব্যক্তি-রূপ? হাহাকার তো এই বিশিষ্ট রূপের জন্য। কোন্ সাক্ষাৎকার এই বেদনাকে লোপ করিয়া দিতে পারে? অন্ততঃ সেরূপ কোন সাক্ষাৎকার আছে কি-না, রবীন্দ্রনাথ তাহাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তি-রূপের নিঃশেষ বিনষ্টিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রূপের এই অনতিক্রমণীয় নিয়তি। ইহার জন্য হাহাকার তাই চিরন্তন। তবে এই বেদনার চিহ্ন জগতে থাকে না। ঢেউ-এ যে রেখা পড়ে ঢেউয়েই তাহা ধুইয়া মুছিয়া যায়।

"মৃত্যু" কবিতাটির মধ্যে কবি এই জিজ্ঞাসাটিকে সম্পূর্ণ পরিহার করেন নাই। তাঁহার উত্তর লাভের স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-উপলব্ধি বলিয়া কিছু বিচার প্রয়োজন।

মানুষ তাহার চেতনাকে যতদূর প্রসারিত করুক-না-কেন, তাহা যে-কোন পরিণামে সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। এই সীমাবদ্ধ চেতনা দিয়া সে বহির্বিশ্বকে যতদূর আবেষ্টন করিতে পারে ততদূর তাহার জগৎ। আমিত্ব বলিতে এই সীমার বোধটিকেই আমরা বুঝিয়া থাকি।

ইহার বাহিরে যে অনন্ত প্রসারিত জগৎ তাহাকে মানবীয় চেতনা দিয়া আমরা প্রমাণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু এই চেতনাকেও ছাড়াইয়া উঠিবার উপায় আছে। তাই মানবীয় চেতনার বাহিরের জগৎ অপ্রমাণ হইয়া যায় না। মৃত্যুতে এই সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট চেতনা এবং উহার সহিত অন্বিত হইয়া যে বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ জগৎ, (ভাবময় বা রূপময়) তাহা লুপ্ত হইয়া যায়।

যে অসীমের বুকে এই সকল সীমার প্রকাশ, সেই অসীম চিরন্তন, তাহার এই সীমা বা রূপের লীলাও চিরন্তন ; কিন্তু মৃত্যুতে এই বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট এই সীমার বোধ চিরকালের জন্য অনস্তিত্ব হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সীমার দিক হইতে চিরন্তনতার যে-কোন বোধ, যে-কোন তত্ত্ব গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়।

'ছুটি' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিসৃষ্টির আর এক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সৃষ্টি-লোকে সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া আবার বিনষ্ট হইতেছে। একটা সীমাশূন্য শক্তির স্পন্দন ছুটিয়া চলিয়াছে শূন্য হইতে শূন্যে, তাহারই আবর্তে ঘুরিয়া কত রূপ বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে। মানুষের জীবন এমনি এক একটি ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ মাত্র। জীবনের ইহাই যখন স্বরূপ তখন আসক্তির এই বেদনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। যে নিয়মে এই চেতনার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই নিয়মে একদিন এই চেতনা হারাইয়া যাইবে। মাঝখানে আসক্তির এই বিকৃত প্রয়াস কেন ?

ইতিপর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক জাতীয় রস-সাধনার পরিচয় লাভ করিয়াছি। 'পুনশ্চে'র মধ্যে তাহার যে পরিচয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে এক্ষেত্রে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া একস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অদ্বৈতবাদীরা অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া যে জীবন ও জগৎকে পরিহার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সাধনা করিয়াছেন। এই সাধনার পরম ফল লাভ হইল প্রেম, উহারই পরিণাম করুণা।

ইহার যে বিশিষ্ট আস্বাদ তাহা উন্নততর চেতনা লাভে, পূর্ণতার সাধনায় লাভ করিতে পারা যায় না, ইহাই কেবল সত্য নয়, সে আস্বাদে ব্রহ্মাস্বাদও অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়া গিয়াছে।

সীমাবদ্ধ চেতনায় জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ (অপূর্ণ স্বরূপই) উদ্‌ভাসিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের (আসক্তি ও মোহ বিজড়িত) দুর্লভতা অমৃতকেও পরাভূত করিয়াছে। সীমাবদ্ধ চেতনার উর্দ্ধে উঠিয়া আর যাহাকেই লাভ করা যাক, জীবনের ঠিক এই স্বরূপটিকে তো আর লাভ করিতে পারা যায় না।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী চেতনার এই যে বিশিষ্ট লীলা, এই চেতনাশ্রয়ী হইয়া জগৎ ও জীবনের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ও প্রেমোপভোগ তাহা অনন্ত কাল প্রবাহে আর কোন এক মুহূর্ত্তের জন্যও লাভ করিতে পারা যাইবে না।

যে সাক্ষাৎকার জীবনকে জীবনের এই স্বরূপেই এমন একান্ত মধুর করিয়া তুলে, সেই সাক্ষাৎকারের তত্ত্বটিকে আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

"কোন অভাব নেই দেব লোকেব
নেই তার পিপাসা
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর।
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে।
* * *
তোমার আকাংক্ষা দিয়ে কারো আমাকে বরণ
দেব লোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্ত্ত্যের সেই অমৃত অশ্রুর ধারা।" (নাটক)

মর্ত্ত্যে এই অপূর্ণতা আছে বলিয়াই তো পূর্ণতার জন্য মানুষের অন্তরে নিত্য ব্যাকুলতা। রবীন্দ্রনাথের নিকট পূর্ণতার প্রাপ্তিটা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়, তাঁহার নিকট মানব-প্রেমের ওই ব্যাকুলতার মূল্য তাহার চেয়েও বড়।

জীবনের ইহা এক আশ্চর্য্য মূল্য নিরূপণ! ওই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া অন্তরে যে বিশিষ্ট অনুভূতি জাগে, তাহার আস্বাদ লাভই জীবনে পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।

অমরতার বোধ বড় কথা নয়। প্রেমে যে মৃত্যু কাতরতা, বিচ্ছেদ-বিয়োগের যে নিত্য আশঙ্কা এবং ওই আশঙ্কা বিক্ষুব্ধ প্রেমের যে নিত্য জাগরণ, কল্যাণ কামনায় যে নিয়ত করুণ কাতর প্রার্থনা, তাহা অমরতার বোধ অপেক্ষাও বড়।

মৃত্যুকে নিত্য অমৃতে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে এই প্রেম। ইহা মৃত্যুকে পরিহার করিয়া অমৃতের প্রার্থনা জানায় না।

মৃত্যু আছে, অপূর্ণতা আছে, সেই সঙ্গে আসক্তিও আছে, ইহাকে কবি কোন চেতনা আশ্রয় করিয়া, কোন দার্শনিক বোধে লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই (এই দার্শনিক মনোভাবের ক্ষেত্রে কেবল একথা বুঝিতে হইবে)। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই, ইহার যে মূল্য তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে ঋষির দিব্য-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষাও ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ণের জন্য ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া অন্তরে যে অহর্নিশ অনুরাগের দীপ্ত দীপ জ্বলে, তাহাতে দিব্য-চেতনার আদিত্যবর্ণও ম্লান বোধ হয়। ওই ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া চিত্তের যে আস্বাদ তাহাকেই কবি সার্থক আনন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ণ যখন আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়াছিলেন তখন তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের কোন প্রকাশ ছিল না, কোন আনন্দ ছিল না।

তিনি আপনার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া আপনাকেই দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন। এই নিখিল বিসৃষ্টি তাঁহারই সীমারূপের প্রকাশ

'মায়া' (ব্যাখ্যাতীত) এই অসীমের বুকে দেশ-কালের, সীমার বোধ সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি মায়া আশ্রয় করিয়া আপনাকেই দ্বিধা করিয়া আপনার আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যকে অফুরাণ করিয়া লাভ করিতেছেন।

আবার ওই পূর্ণতাকে ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়া নিখিল বিসৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্তি ঘটিয়া চলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া বিসৃষ্টির মধ্যে এক একটি চেতনা পর্ব্বের সেই সঙ্গে সৃষ্টির এক একটি পর্য্যায়ের আশ্চর্য্য প্রকাশ ঘটিতেছে। যেন চেতনা শতদলের এক একটি দল খুলিয়া খুলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেকটি দল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমিক উন্নততর সৌন্দর্য্য ও সুষমার প্রকাশ ঘটিতেছে, তাহার মধুকোষ ক্ষীরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, সৌরভে দিগ দিগন্ত ক্রমে আমোদিত হইয়া উঠিতেছে।

অন্য দিকে আপনারই ঐশ্বর্য্যের ধীর প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া অসীমের আনন্দ সীমাহীন হইয়া পড়িতেছে। এমনি করিয়া একবার বন্ধনের ভিতর দিয়া আরবার মুক্ত স্বরূপে তিনি আপনাকেই আপনি ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতেছেন।

"অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রা পথে
আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করেছ স্থির হয়ে,
নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রলোক
নিতান্তই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী।" (বিচ্ছেদ)

এই প্রসঙ্গে 'শাপমোচন' কবিতাটিও উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীবনের অপূর্ণতা, অসুন্দর ও বেদনার মূল্য কবি আর একদিকে দিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পূর্ণের নিজের তো কোন রূপ নাই, আনন্দ নাই। অপূর্ণ, সসীম বিসৃষ্টি-লোক আশ্রয় করিয়াই তো তাহার রূপের লীলা। বস্তুতঃ পূর্ণতা তত্ত্বে করুণা তত্ত্ব নাই। করুণা নাই তাহার অর্থ, প্রকাশ নাই। অপূর্ণতাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণের করুণা ধন্য হয়।

অসুন্দর ও অপূর্ণতা সকলদিক দিয়া সুন্দর ও পূর্ণতাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। এই সার্থকতার ভিতর দিয়া আবার এমন এক বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটিতেছে যাহা পূর্ণের মধ্যে ছিল না, কিংবা অপূর্ণ না হইলে যাহার প্রকাশ ঘটিত না।

শ্যামল মেঘ আছে বলিয়াই সূর্য্যালোক অমন ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে। মর্ত্ত্যলোকের রিক্ততায় 'শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব'। ইহার কোন প্রকাশ তো বৃষ্টি-ধারায় ছিল না।

"ওই কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান"

কিংবা

"আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে,
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।"

অসুন্দর ও অপূর্ণকে পরিহার করা নয়। প্রেম যখন অসুন্দর ও অপূর্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট একটি শ্রী দান করিতে সমর্থ হয়, তখনই প্রেমের সার্থক সাধনা।

নর-নারীর জীবনে এ সাধনা তো সহজ নয়। কমলিকাও প্রথমে ব্যর্থ হইয়াছিল। হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ কমলিকার মধ্যে তখন সে প্রেম ছিল না। প্রেম কি, না সেই বোধ যাহা রূপের অন্তরালে আর একটি রূপময় ভাব-লোক প্রত্যক্ষ করিতে পায়।

"কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা,
বলতে, বলতে, কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।"

কমলিকার অন্তরে একদিন ওই প্রেম জাগ্রত হইয়াছে। দুঃখের নিপীড়নের ভিতর দিয়া কমলিকার অন্তরে অধ্যাত্ম বোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। এই বোধে নরনারীর যে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করি তাহা ইন্দ্রিয় জাত সৌন্দর্য্য বোধের অনেক উর্দ্ধে।

সৌন্দর্য্য বোধ আদিতে ইন্দ্রিয় বোধকে আশ্রয় করিলেও পরিণামে ইন্দ্রিয় বোধের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। 'মাটির প্রদীপ শিখায়' এইরূপে 'সোনার প্রদীপ জ্বলে' উঠে। ইন্দ্রিয় লব্ধ সৌন্দর্য্যই ধ্যান-লোকে আর এক সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে।

সে কোন্ প্রেম, যে প্রেমের আলোকে অসুন্দরের মধ্যেও নর-নারী পরম সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়। ইন্দ্রিয় বোধে আমাদের যে সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য বোধ তাহা লোপ পায়। প্রেমে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, 'রাজা ও রাণী' নাটকের রাণীর উক্তি আশ্রয় করিয়া বলা যায়, তাহা 'সুন্দর' নয়, 'কুৎসিত' নয় তাহা 'অনুপম'।

দেখা দুই রকমের আছে। একটি সাধারণ ইন্দ্রিয় বোধ দিয়া দেখা। আর একটি দেখা আছে যাহা আদৌ ইন্দ্রিয় বোধাশ্রয়ী নয়। আমাদের বোধ ইন্দ্রিয় বোধাশ্রয়ী বলিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। যাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও উহাকে উপমা দিয়া বুঝাইতে পারেন না।

এই 'শাপ'-বদ্ধ এ জগতের প্রত্যেকটি নর-নারী। ওই 'শাপ' কি, না অন্তরে স্নেহ প্রেম শূন্যতা, যে প্রেমে জগৎ ও জীবন অপার সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হইয়া যায়।

মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্মবাদীদের মত ব্রহ্ম রূপ-পরিণাম-স্বরূপে জগৎ ও জীবনকে সাক্ষাৎ করিবার সাধনা ইহা নহে। ইহা আসক্তি ও মোহ বিজড়িত

মর্ত্ত্য-প্রেমের সাধন-প্রসূত দেব দুর্লভ করুণা। সে করুণায় এই জগৎ ও জীবন অমন পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে।

একদিকে বিচ্ছিন্ন সত্তায় 'আমি'র প্রকাশ, অন্যদিকে এই বিশ্ব জগৎ। আমার আনন্দে যেমনি, আমার বেদনায়ও তেমনি সে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। আমার আনন্দ বেদনার কোন চিহ্নই তাহার মধ্যে নাই।

"অতি বৃহৎ বিশ্ব
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি
মাথা তুলেছে দুর্দ্দশ সূর্য্য-লোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তাব অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।" (বিশ্ব-শোক)

যেখানে এই বিচ্ছিন্ন সত্তা বিশ্ব-সত্তার সহিত একাত্ম হইয়া যায়; অর্থাৎ আমার প্রাণ-ধারা আমার চেতনার স্পন্দন, বিশ্ব-প্রাণ-ধারা ও তাহার স্পন্দনের সহিত সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যায়, সেখানে আমার মধ্যেই বিশ্ব-প্রাণ-লীলার সাক্ষাৎকার ঘটে। মানবীয় চেতনায় ওই অনন্ত শক্তির স্পন্দন অলৌকিক আনন্দের আবার অসহনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস বলিয়া অলৌকিক বেদনার সঞ্চার করে। ওই চেতনা লাভের মুহূর্ত্তে বিশ্ব-চেতনা কখন অপার আনন্দের প্লাবন, কখন অন্তহীন বেদনার অশ্রুধারা বলিয়া বোধ হয়।

"এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্ব-রূপে।" (বিশ্ব শোক)

আর কিছু নয়, বিশ্ব-চেতনা লাভটিই বড় কথা। তাহার অনন্ত প্রাণ-লীলাকে বেদনারূপে যেমন, আনন্দ রূপেও তেমনি সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে। আনন্দ ও বেদনা তত্ত্ব বিশ্ব-চেতনায় এক হইয়া যায়।

মানুষের একটি মুক্ত চেতনা আছে, যাহা দেহ-প্রাণ-মনের বিনষ্টিতেও বিনষ্ট হইয়া যায় না। মানুষ তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছে মানস-চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার পর।

এই নিখিল বিসৃষ্টিও দিব্য-চেতনার যোগে সত্য। দিব্য-চেতনার ধ্যানই বস্তু আশ্রয় করিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। কবি 'চির রূপের বাণী' কবিতাটির মধ্যে যে

তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা এই যে দিব্য-চেতনার যে ধ্যান বস্তু (দেশ-কালের পরিসীমায় যে নিখিল বিসৃষ্টি) আশ্রয় করিয়া রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া গেলেও ধ্যান চিরন্তন হইয়া থাকে।

"মাটির জিনিষ ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।" (চির রূপের বাণী)

চিরন্তন 'অশ্রুত এক বাণী'—লোক রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পায় বস্তু আশ্রয় করিয়া। বস্তু জীর্ণ হইয়া কালে ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাতে ওই 'অশ্রুতবাণী' বিনষ্ট হয় না। বাণী চিরন্তনী। কালে কালে তাহা মানুষের হৃদয় হইতে হৃদয়ে বহিয়া চলে। মনুষ্য লোক বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহা থাকে বিশ্ব মানব মনে।

"বায়ু সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুত বাণীর চক্র লহরা,
কিছুই হারায় না।" (চিররূপের বাণী)

এমনি করিয়া কবি বস্তুর ঊর্দ্ধে ভাবের অশ্রুত বাণীর, তাহারও ঊর্দ্ধে আত্মার, তাহার অরূপ ধ্যানের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। এমনি করিয়া কবি আপনার অন্তরে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। কবির কাব্যে যে অরূপ ধ্যান এবং অশ্রুত বাণী রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইলেও ওই ধ্যান ও বাণী রূপহীন স্বরূপে চিরন্তন হইয়া থাকিবে।

আপনার রূপও বাণীকেই (যাহা অরূপও অশ্রুত) মানুষ বস্তু আশ্রয় করিয়া প্রকাশ করে। এই সত্যটি যখন উপলব্ধি করি তখন মানুষের সকল সৃষ্টি-প্রেরণার মূল রহস্যটিকে যেমন উপলব্ধি করিতে পারি, তেমনি সেই কারণে মৃত্যু ও বিনষ্টির মহৎ ভয়ও দূরীভূত হইয়া যায়।

"দেহ মুক্ত রূপের সঙ্গে যুগল মিলন হ'ল দেহ মুক্ত বাণীর
প্রাণ তরঙ্গিনীর তীরে, দেহ নিকেতনের প্রাঙ্গনে।" (চিররূপের বাণী)

কেবল মাত্র অরূপ-ধ্যানে যে মানুষের ক্ষুধা মেটে না তাহাকে বস্তু আশ্রয় করিয়া রূপদান করিয়াই যে মানুষের পিপাসা মেটে, তাহারই পরিচয় 'প্রথম পূজা' কবিতাটির মধ্যে।

অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে বস্তুর মধ্যে বিগ্রহ স্বরূপে সাক্ষাৎ করিতে মাধব আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিল।

'চির রূপের বাণী'র মধ্যে অরূপের ধ্যানে মানুষ মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিয়াছে, 'প্রথম পূজা'র মধ্যে মানুষ রূপ সাক্ষাৎ করিতে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। এই দুই বিপরীত তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের স্বরূপ আমাদের বুঝিতে হইবে।

একদিকে অরূপের সাধনা অন্যদিকে রূপের জন্য চির হাহাকার, একদিকে আত্মা আর একদিকে দেহ, (স্থূল ভোগের বাসনা নয়) এই দুইয়ের মধ্যে যে তত্ত্ব পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে তাহাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, উহার সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে প্রাণের আনন্দ বোধেই কবি সমগ্র জীবন ধরিয়া কত-না সঙ্গীত রচনা করিযাছেন। প্রাণ-প্রবাহে নিত্য কত রূপ গড়িয়া উঠিতেছে, আবার তাহারা প্রাণ-প্রবাহে হারাইয়া যাইতেছে। তেমনি কবির গান, যাহা প্রাণ-জাহ্নবীর বন্দনা গানই বটে, তাহা প্রাণ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে একদিন ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। জীবনের এই নিয়তি সাক্ষাৎকারে, কবির প্রাণ সান্ত্বনা অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছে।

কিন্তু 'গানের বাসার' মধ্যে একটি বিপরীত প্রেরণার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

প্রকৃতির এই নিয়তি-নিয়মকে লঙ্ঘন করিতে চাহিয়া মানুষ সৃষ্টি করে। সে তাহার ধ্যানকে, তাহার প্রেমকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়া রাখিবে বলিয়াই তো তাহার সৃষ্টি। কাল-প্রবাহে প্রকৃতির সকল রূপ, সকল সঙ্গীত নিত্য জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। প্রকৃতির মধ্যে মানুষ কেবল এই নিয়মকে মানিতে চায় নাই। সে প্রতি মুহূর্তে এই নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে।

"আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে,
খুঁজে আনি জরা বিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।" (গানের বাসা)

সাধারণ মানুষের জীবনের বঞ্চনাকে কী নগ্ন ভাবেই না কবি ব্যক্ত করিয়াছেন 'বাঁশি' কবিতাটির মধ্যে। কিন্তু এই কথাটিই শেষ নয়। প্রেমের অনুভূতির ভিতর দিয়া এমনি একটি বঞ্চিত মানুষও যে বিশ্ব-চেতনায় পরম বিস্তার লাভ করিতে পারে, অধ্যাত্ম সম্পদে প্রেমের বিভূতিতে জগতের যে-কোন সম্রাটের সহিত একাসনে বসিতে পারে, সেই উপলব্ধিই বর্তমান কবিতাটির একমাত্র ভাব-প্রেরণা।

বাহিরের ঐশ্বর্য্যে মানুষে মানুষে যতই পার্থক্য থাক, অন্তরের পথই মানুষের অধ্যাত্ম সম্পদ লাভের একমাত্র পথ। অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভের জন্য ওখানে সব মানুষকে বাহিরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া দীনতম ভিখারির মত আসিতে হয়। কারণ দুইকে একযোগে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। জগতের কত নর-নারী অন্তরের পথ বাহিয়া সেই এক পরম তীর্থের পানে চলিয়াছে। সকলের চরণ রেণু-ধূসরিত, কণ্টক-বিদ্ধ, বিক্ষত হৃদয় করুণ-কোমল, নয়নে অশ্রুর কালিমা। অন্তর্জগতে, অধ্যাত্ম-লোকে প্রেমের অভিসারে বিশ্বের নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

"বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে॥" (বাঁশি)

এই অধ্যাত্ম বোধের জাগরণ ঘটিয়াছে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া। ওই রূপাশ্রয়ী হইয়া অরূপের সেই বোধ আসিয়াছে বলিয়া ওই রূপ তাহার সহিত জড়াইয়া একাকার হইয়া এক শাশ্বত পরিণাম লাভ করিয়াছে।

যে রূপ আশ্রয় করিয়া প্রেম অনুভূত হয়, ধ্যানে আসঙ্গ লাভ ঘটে, ওই ধ্যান আশ্রয় করিয়া পরিণামে ঊর্দ্ধতর চিরন্তন এক সৌন্দর্য্য ও প্রেম-লোকের আভাস লাভ ঘটে, সেই রূপের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। সেই গোধূলি লগ্ন, সেখানে ধলেশ্বরী বহিয়া চলিয়াছে। তাহার তীরে তমালের শ্রেণী। উহার শ্যামছায়া পড়িয়াছে ধলেশ্বরীর বুকে। গৃহের আঙ্গিনায় বসিয়া অন্যমনা সেই কিশোরী নারী। 'তার পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিন্দুর।'—এই ছবি ধ্যানে চিরস্থির হইয়া গিয়াছে। বাহিরের জগৎ ওই সৌন্দর্য্য-লোকের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, সেখানে কত ভাঙ্গা-গড়া, কত পরিবর্ত্তন।

বিচিত্রিতা

বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দে কবির প্রাণ যখন সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যীভূত হইয়াছে, তখন চেতনার অচিন্তনীয় ব্যাপ্তিতে কবি মুক্তির উল্লাস বোধ করিয়াছেন। মুক্তির এই উল্লাস বোধে, এই আকাঙ্ক্ষায় কবির অন্তর হইতে অবিরাম সৃষ্টি-ধারা সমুৎসারিত হইয়াছে।

বিচিত্রিতায় বিশ্ব-সত্তার সেই পরিপূর্ণ উপলব্ধি নাই বলিয়া কবি-প্রেরণা আজ একান্ত দীপ্তিহীন। বিচিত্রিতা হইতে কবি-প্রতিভার এই পরিণামের দিকটিই সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দেশ করিব।

বিশ্ব-প্রাণ-ধারা কবি-চিত্তকে আজ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কেবল চকিত স্পর্শ করিয়া যায়। সেই চকিত স্পর্শে একটি ক্ষীণ আনন্দ বোধ কবির অন্তরে জাগে। সেই পূর্ণ মিলন বোধ মুক্তির সেই উল্লাস আজ আর নাই।

"ছবির মত ভাবনা পরশিয়া
একটু আছ মনেরে হরষিয়া।" (অচেনা)

প্রাণের সহিত প্রাণের যোগ তেমন নাই বলিযাই আজ বাহিরের রূপটুকুই কেবল কবির দৃষ্টি-গোচর হয়। বিশ্বের অনন্ত রূপ-লীলার একেবারে প্রাণ-কেন্দ্রে কবি পৌঁছাইতে চাহিয়াছিলেন।

"আমাব কাছে রহিলে বিদেশিনী
লইলে শুধ্ নয়ন মম জিনি।" (অচেনা)

আজ বিশ্ব-জগতের বিচ্ছিন্ন রূপ কেবল দৃষ্টি গোচর হয়।

কবি যতই উন্নততর চেতনা-লোক লাভ করিয়াছেন এই জগৎ সেই সঙ্গে মহৎ হইতে মহত্তর রূপে কবির নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। ইহার সৌন্দর্য্য-সীমা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়াছে। তবুও ঐ রহস্য পূর্ব্বেও যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গিযাছে।

উন্নততর চেতনা-লোক লাভে অপরিচযের যে বিপুল বিস্ময় তাহা অবশ্য এক্ষেত্রে নাই। অন্তরে প্রতিভাসিত জগৎটিই একান্ত খণ্ডিত ভাবে ক্ষীণ এক প্রকার বিস্ময় বোধ জাগাইয়াছে। অনেক কালের সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও কবির নিকট এই জগৎ অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। এই অনেক কালের বিস্ময় বোধ এবং অপরিচয়ের কথা এবং আজিকার অপরিচয় বোধের কথা আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

"অনেকদিন দিয়েছ তুমি দেখা,
বসেছ পাশে তবুও আমি একা।" (অচেনা)

কবি বিশ্ব-সত্তার অনুভূতি লাভে যেখানে সমর্থ হইয়াছেন তাহারই পরিচয় লাভ করিতে এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই অংশ পাঠ করিলে স্বতঃই বুঝিতে পারা যাইবে কবি-প্রতিভা আজ কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছে।

একথা যদি সত্য হয় যে বিশ্ব-প্রাণের অনুভূতি লাভের সহিত কবির সৃষ্টি-প্রতিভারও একটা নিবিড় যোগ আছে, তাহা হইলে একান্ত আচ্ছন্ন এই সৃষ্টি-প্রেরণার জন্য একথাও সত্য হইয়া উঠে, যে বিশ্ব-প্রাণের এই অনুভূতি কবির জীবনে আজ তেমনি সত্য নহে।

বহিঃসৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবির অন্তর ধীরে ধীরে ধ্যান তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে, এই ধ্যানের ভিতর দিয়া কবির চেতনা পরিশেষে সীমা-লোক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—

"নিরালা মাঠের মাঝে বসি
সাম্প্রতের আবরণ মন হতে গেল দ্রুত খসি।" (পসাবিণী)

মন হইতে সাম্প্রতের আবরণ খসিয়া যাওয়ার পর কবির দৃষ্টিতে বিশ্বের যে রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে—

"আলোকে আকাশে মিলে
যে-নটন এ নিখিলে
দেখ তাই আঁখির সম্মুখে,
বিরাট কালেব মাঝে
যে ওঙ্কার ধ্বনি বাজে"— (পসাবিণী)

দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত অন্তহীন রূপ-লীলা সাক্ষাৎকারের কোন বিস্ময় বোধই এখানে নাই। এই ক্ষণে অন্ততঃ মানসী হইতে পূরবীর মধ্যবর্ত্তী এই পর্য্যায়ের প্রত্যেকটি কাব্য গ্রন্থের রূপ সাক্ষাৎকারের বিস্ময় বোধ যদি স্মৃতি পথে অতি দ্রুত একবার আবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা হইলে পার্থক্য যে কত গভীর তাহা সহজেই বোধ করিতে পারা যাইবে।

প্রকৃতি এবং নারীর সৌন্দর্য্য অনুধ্যানের ভিতর দিয়া কবির চেতনা পরিণামে যে বিশ্ব-চেতনায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এই তত্ত্ব কবির সমগ্র জীবনের উপলব্ধি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বিশ্ব-প্রাণের এক ছন্দ প্রকৃতি এবং মানবীর সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে অভিব্যক্ত।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম হইয়া কবি-চেতনা একবার বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে একবার নর-নারীর নির্ব্বিশেষ প্রেম চেতনার মধ্যে আপনাকে কীরূপ সীমাহীন রূপে বোধ করিয়াছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আজ তাহার ক্ষীণ আভাসমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত এই জাতীয় পংক্তির মধ্যে লাভ করা যায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া অস্তিত্বের যে 'ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ভরি উঠে মনে, প্রাণের যে প্রশান্ত পূর্ণতা', সেই অনুভূতি তিনি মানবীর সান্নিধ্যেও লাভ করিতেন।

"লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই",— (শ্যামলী)

যৌবনে কবির প্রাণ বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত যে একাত্ম হইয়া যাইত তাহাও কবি উল্লেখ করিয়াছেন। আজ সেই অনুভূতি নাই বলিয়া যৌবনের কথাই এমন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে।

ব্যক্তি এবং বিশ্ব-সত্তার মধ্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু কবির যৌবনে ওই ভেদ রেখাটি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লুপ্ত হইয়া যাইত। যৌবনে প্রাণের দুর্নিবার প্রবাহ দুটি রূপকে একাকার করিয়া বিশ্ব-প্রাণ-সমুদ্রের অতলে কত বার বার তলাইয়া দিয়াছে।

"নিমেষে দোঁহারে করেছে সমান
একই আবর্ত্তে টানি।" (প্রভেদ)

আজও কবি যে মাঝে মাঝে প্রাণের আকর্ষণে বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন তাহারও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"আমারে তোমার বসাইল বাঁয়ে
একাসনে দিল আনি।
নবারুণ রাগে রাঙ্গা হয়ে গেল
কালো ভেদ রেখা খানি।" (প্রভেদ)

এই অনুভূতি কেবল বিবৃতি মাত্র। পূর্ণ মিলনের যে অলৌকিক আনন্দ বাণী-রূপ লাভের জন্য উদ্দাম হইয়া উঠে সে আনন্দ প্রেরণার কোন পরিচয় কি এক্ষেত্রে আছে? উহারই একটা অতি ক্ষীণ আভাস কবি-চিত্তে চকিত একপ্রকার শিহরণ জাগাইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে।

যৌবনের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বিচিত্র রঙ্গীন বিহ্বল দিন গুলিই ধ্যান-লোকটিকে গড়িয়া তুলিতেছে। প্রাণের অনুভূতি এমনি করিয়া উন্নততর চেতনালোক লাভের জন্য ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলে।

"জান না কি যে-বসন্ত সঞ্চরিল কায়া .
তারি মৃত্যুহীন ছায়া
অহর্নিশি আছে তব সাথে সাথে
তোমার অজ্ঞাতে।" (ছায়াসঙ্গিনী)

কবিতাটিকে ভিন্ন দিক হইতে পাঠ করা যাইতে পারে। যৌবন গত হয়, তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সেই মধুময় দিনগুলিও চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়। এই অতীত হওয়ার অর্থ নিঃশেষ বিলুপ্তি নয়। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সেই অনুভূতি এই জীবনের সহিত কোন একটা স্বরূপে একাত্ম হইয়া থাকে।

ইহা পূরবীর 'তপোভঙ্গে'র সান্ত্বনা নয়। অর্থাৎ ওই সুপ্ত যৌবন আবার প্রকাশ লাভ করিবে এমনি করিয়া যৌবন বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে, সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত বিজড়িত করিয়া এই জাতীয় তত্ত্ব-সৃষ্টি এবং সান্ত্বনা লাভের কোন প্রয়াস এখানে নাই।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লীলার ভিতর দিয়া জীবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমই অন্তরে একটি পরম গম্ভীর ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলে। পরিণত বয়সে এই ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিতে হয়।

পার্থিব অনুভূতি এই রূপে অপার্থিব অনুভূতি লাভে সহায়তা করে। যে রূপ জীবনের একটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে বহির্মুখীনতা দান করে, সেই রূপ আর একটি পর্য্যায়ে সমগ্র সত্তাকে অন্তর্মুখীন করিয়া ধ্যান নিমগ্ন করে।

"যে চাঞ্চল্য হয়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর।" (ছায়াসঙ্গিনী)

একান্ত শৈশব হইতেই কবির নিকট এই জগৎ ও জীবন পরম কোন এক সত্যের প্রতিভাস বলিয়া বোধ হইয়াছে; সেই সঙ্গে এই সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়াছে।

তাঁহার সকল সৃষ্টি-কর্ম্ম সকল সাধনার ভিতর দিয়া সেই পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষাই নানা স্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

"যে আমারে হারালে সেই কবে
তারই সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণা খানি।" (নীহারিকা)

কিংবা

"মোর বিরহ সব মিলনের তলে
রইল গোপন স্বপন-অশ্রু-জলে" (নীহারিকা)

চেতনার ঊর্দ্ধ পরিণামের যেমন শেষ নাই, তেমনি ওই অনন্তকে নিঃশেষে লাভ করিতে পারা যায় না বলিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অচিন্তনীয় বিরাট বোধ মানব-চিত্তকে অভিভূত করে। অপরিচয়ের বিস্ময় তাই কোন কালেই লোপ পায় না।

অভিসার অন্তহীন বলিয়া যে-কোন পর্য্যায়ে কবির চেতনায় অতৃপ্তি বোধের পীড়া যেমন, তেমনি বেদনাবোধও রহিয়াছে। ঊর্দ্ধতর চেতনালোক প্রাপ্তির আনন্দ অতিক্রম করিয়া কবি-চিত্তে চিরকাল অতৃপ্তির বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

সৃজনের পূর্ব্বে অরূপ বা অসীম ছিলেন বন্ধ্যা। আপনার ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎকার হইতে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। আপনার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি আপনাকে আনন্দে প্রেমে দেশ-কালের পরিসীমায় আবদ্ধ করিয়াছেন। অসীম মায়া আশ্রয় করিয়া সীমারূপ গড়িয়া তুলিলেন।

এই রূপে অসীম আপনাকেই কোন উপায়ে (ইহাই মায়া) বিশ্লিষ্ট করিয়া আপনার আনন্দ রূপকে নিত্য কাল ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই পৃথক বোধ আছে বলিয়া বিশ্বের ঐশ্বর্য্য দিনের পর দিন অফুরান হইয়া উঠিতেছে।

ব্যক্তি বা বিশ্বের মাঝখানে এমনি ব্যবধান আছে বলিয়া ব্যক্তির এমন নিত্য ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতাই সৃষ্টি-প্রেরণা রূপে অনুভূত হয়। এই মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া মানুষ আপনার অন্তর্লীন ঐশ্বর্য্যকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

"এপারে চলে বর বধূ সে পরপারে,
সেতুটি বাঁধা তার মাঝে।
তাহারি পরে দান আসিছে ভারে ভারে
তাহারি পরে বাঁশি বাজে।" (বরবধূ)

এককালে যাহাদের তিনি নিকটে লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহারা কোথায়! জীবন সায়াহ্নে তাহাদের স্মৃতি একে একে জাগ্রত হইয়া কবির হৃদয়কে করুণ-কোমল করিয়া তুলিয়াছে। সেই সকল আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে যে পরমের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা কবির জীবনে আজও অচরিতার্থ রহিয়া গিয়াছে।

"সেই দূরে ছায়া রূপে রয়েছে সে
বিশ্বের সকল শেষে।
যে আসিতে পারিত, তবুও
এল না কভুও।" (অনাগতা)

এই অধ্যাত্ম শূন্যতা বোধের কালে কবি পরম মমতায় স্মৃতি-লোকটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া তো হৃদয়ের শূন্যতা ভরে না। এই দুঃসহ একাকীত্ব বোধের কথাই আলোচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যোপভোগের দিন, স্মৃতি সঞ্চয়ের দিন কবির জীবনে গত হইয়াছে। আজ সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ করিলে স্মতি-লোকটিই কেবল উদ্বেল হইয়া উঠে। তাহারই ম্লান ছায়া সকল রূপের উপর প্রতিফলিত হইয়া ছায়াছবির মত ধীরে ধীরে সরিয়া যায়।

নিশ্চেষ্ট অবস্থায় স্মৃতি-লোকটি কখন বাহির হইয়া কবির দৃষ্টি সমক্ষে মরীচিকার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন তিনি ওই স্মৃতিতে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। সচেতন হইয়া বোধ করেন অজানিত বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, স্তিমিত দুই চোখের কোনে জল।

> ''এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে
> যারা চলে গেছে একেবারে
> ফাল্গুন মধ্যাহ্ন বেলা শিরীষ ছায়ায় চুপে চুপে
> তারা ছায়া রূপে
> আসে যায় হিল্লোলিত শ্যাম দূর্ব্বা দলে।" (অনাগতা)

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজম্ যে উন্নততর চেতনার জগৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রসূত তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। তাহা জীবনেরই প্রসার, জীবন বিমুখী কল্পনা বিলাস নয়। জীবনের স্বরূপ লাভ করিবার জন্য কবির চেতনা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর লোকে অভিসার করিয়াছে।

বাহিরের সৌন্দর্য্যকে ইন্দ্রিয় চেতনার জগৎ হইতে মুক্ত করিয়া যখন ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, তখন ওই সৌন্দর্য্য কতকটা মুক্ত স্বরূপতা লাভ করে বলিয়া উহার সম্ভোগে মানুষ তেমন বন্ধন পীড়া বোধ করে না।

ধ্যানলোকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই যে সম্ভোগ তাহা আদিতে প্রাণের অতি গভীর অনুভূতিকে আশ্রয় করে বলিয়া সুপরিণত বয়সে প্রাণের অনুভূতি ক্ষীণ হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-লোকটিও ক্রমশ শ্রীহীন হইয়া পড়ে।

এক্ষেত্রে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি, সেক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি ধ্যান-লোকে অন্তশ্চেতনাকে দ্বিধা করিয়া কেমন পরস্পরের আসঙ্গ লাভ করিয়া

ধন্য হইতেছে তাহার একটা পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে সত্য, কিন্তু 'কল্পনা' প্রভৃতি কাব্যের সেই আন্তর লীলার, সেই ঐশ্বর্য্যের কোন প্রকাশের পরিচয় এক্ষেত্রে নাই।

মানস-লোকটিই দ্বিধা হইয়া একদিকে মানস-প্রজাপতি রূপে মনেরই আর একটি অংশকে পুষ্পিত করিয়া তাহারই সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া চলিয়াছে।

একদিকে

"ঐ যে তোমার মানস প্রজাপতি"

অন্যদিকে

"মনে তোমার ফুল ফোটান মায়া"

এই উভয়ের সেই মানস-সম্ভোগ

"মরীচিকার ফুলের সাথে
মরীচিকার প্রজাপতির মিলন ঘটে ফাল্গুন প্রভাতে।"

একদিকে 'ফাল্গুন প্রভাত' অন্যদিকে 'তোমার যৌবন' অর্থাৎ প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য্য কবির অন্তরে প্রাণের ক্ষীণ সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে।

এই ধ্যান-লোক হইতে কবি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লীলা সাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়া বাহিরের 'রূপ' আপনার সীমাকে অনেকটা ছাড়াইয়া বিরাটতর কোন এক সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে আভাসে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্য-চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে একই সত্তা ততই বিরাটতর সৌন্দর্য্য-লোকের আভাস দান করে।

"মনে হয় যেন তুমি ভুলে যাওয়া তুমি
মর্ত্ত্য ভূমি,
তোমাদের যা বলে জানে সেই পরিচয়,
সম্পূর্ণ তো নয়।" (পুষ্পচয়নী)

কিংবা

"যে ভঙ্গীটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহু দূরের আভাস।
মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছে অতীতে।" (পুষ্পচয়নী)

এই সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ যে ধ্যানাশ্রয়ী তাহা সৌন্দর্য্যের ব্যাপকতা ও বিস্ময় বোধ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

"আজি মোর চোখে
কাছের মূর্ত্তির চেয়ে দূরের মূর্ত্তিতে তুমি বড়ো।" (বিদায়)

বিরহে প্রেমের আধারটি দৃষ্টি বহির্ভূত হইলে অন্তরে অতল স্পর্শ শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কারণ প্রেমে যে প্রাণের উপলব্ধি তাহা ওই কালে কতকটা উর্দ্ধ পরিণাম লাভ করিলেও তাহা ইন্দ্রিয়-চেতনাকেই মুখ্যতঃ আশ্রয় করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় আশ্রয় শূন্য হইয়া পড়িলে মানুষ অন্তরের মধ্যে সীমাহীন শূন্যতা বোধ করে। তাহার পর প্রাণের প্রেরণায় ধ্যান-লোকে ওই রূপটি ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয় হইতে অনেককাংশে মুক্ত হইয়া যায় বলিয়া তাহার আর এক বিরাট রূপ ফুটিয়া উঠে। মানুষ তখন ধ্যানের ওই রূপ আশ্রয় করিয়া বাহিরের সকল রূপ পরিহার করে। অন্তর্লোকের সেই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের তুলনা বাহিরে কোথাও নাই।

সর্ব্বস্ব সমর্পণের সার্থকতা তো কাহারও প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে না। ইহা সেই প্রেরণা, যে প্রেরণায় মনুষ্য-চেতনা বহির্বিশ্বকে পরিহার করিয়া ধ্যান-লোকে, ক্রমে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর লোকে অভিসার করে। বাহিরে ত্যাগের সার্থকতা অন্তরে ক্রমিক প্রাপ্তির মধ্যে।

এই কালে কবি-চিত্তে যে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল তাহারও কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। এই জিজ্ঞাসা গুলি কবির জীবনে যেমন নূতন নয়, তেমনি উহারা কবির সমগ্র সত্তা মথিত করিয়া জাগ্রত হয় নাই। বস্তুত পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধি গুলি আজ ক্ষণে ক্ষণে কেবল অবশ প্রেরণায় কবি-চিত্তকে মুহূর্ত্তের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে।

বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দন প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য রূপে নর-নারীর মধ্যে প্রেম রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একই প্রাণের প্রকাশ, পার্থক্য কেবল পরিণাম গত।

"তোমার আমার মর্ম্মতলে
একটি যে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।

কী যে বলে সেই সুর, কোন দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ সখি বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।" (পুষ্প)

অসীম কালের পটে কণাতম কালে আনন্দ-বেদনাপূর্ণ জীবনের এই যে বিদ্যুৎ চকিত প্রকাশ ইহার অর্থ কি? অসীম প্রাণের কোন ইচ্ছায় এই জীবন গড়িয়া উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া যায় তাহার স্বরূপ আমরা জানি না। কেবল এই মাত্র জানি যে আমাদের জীবন-বিকাশ যেমন আমাদের ইচ্ছায় হয় নাই, ইহার বিনষ্টিও তেমনি আমাদের ইচ্ছা বহির্ভূত। সুতরাং ইহার অর্থ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা তাঁহারই মধ্যে যাঁহার ইচ্ছায় এই প্রাণের প্রকাশ।

জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যাক কিংবা না যাক, এই জীবন-লীলার পশ্চাতে কাহারও সচেতন আকাঙ্ক্ষা এবং সাক্ষাৎকার যে আছে, সে সম্পর্কে কবি নিঃসংশয়।

মৃত্যুতে এই জীবনের সমস্ত কিছুর অবসান। এই ধরণীর বুকে তাহার চিহ্ন মাত্রও কোথাও কোন স্বরূপে থাকে না।।

"তার পরেতে ভোলার পালা, কথা কবে না,
অসীম কালের পটে ছবির চিহ্ন রবে না।" (সাজ)

কিন্তু এই স্বরূপ সম্পর্কে কবি নিঃসংশয়—

"এই মানে তার বুঝতে পারি
খেয়াল যাঁহার খুশি তাঁরি
জান-না-জান।" (সাজ)

একদিকে বিশ্ব-প্রাণ প্রবাহ অন্যদিকে রূপে রূপে নর-নারীর হৃদয়ে প্রেম স্বরূপে তাহার বিচিত্র প্রকাশ।

প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া যে সাক্ষাৎকার, তাহাই রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ণ সাক্ষাৎকার তত্ত্ব। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে এই তত্ত্বটির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে; কিন্তু বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত নর-নারীর প্রেমের পূর্ণ যোগের সেই অপার সৌন্দর্য্য লীলার সেই মহৎ ঐশ্বর্য্যের কোন পরিচয় মিলিবে না।

নিখিল বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যে প্রাণ-প্রৈতি, যে আদি বাসনা, সেই বাসনা চাঞ্চল্যে নিত্য অন্তহীন রূপ সৃষ্টি হইয়া মহাশূন্যে নিত্যকাল কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এই চলার আদি নাই অন্ত নাই।

নর-নারীর মিলন আকাঙ্ক্ষার মাঝে সেই আদি এষণা। এই আকাঙ্ক্ষায় যখন তাহারা মিলিত হয়, তখন বিশ্বের সুরের যোগে উহারই সৃষ্টি-প্রেরণায় তাহাদের সকল সৃষ্টি সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠে।

"সমস্ত বিশ্বের মর্ম্মে যে চাঞ্চল্য তারায় তারায়
তরঙ্গিছে প্রকাশ ধারায়
নিখিল ভুবনে নিত্য যে সঙ্গীত বাজে
মূর্ত্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে।" (যুগল)

বাহিরের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্য্য, অন্তরে ধ্যান-লোকে আর এক সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়া যায়। এই ধ্যানের সৌন্দর্য্যকে বেষ্টন করিয়া থাকে এক অপার্থিব-জগতের আভা। এই আভা বিজড়িত হইয়া ধ্যানের সৌন্দর্য্য এক বিস্মিত রূপ উদ্ঘাটিত করে। সীমা-বদ্ধ রূপ এই রূপে অন্তরে জড়ের বন্ধন মুক্ত হইয়া এক প্রকার মুক্ত স্বরূপতা লাভ করে। একখণ্ড মেঘকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া সূর্য্যের কিরণ যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত বর্ণের আলিম্পনা আঁকে, অপূর্ব্বতার নানা আভাস, তেমনি এই রূপকে আশ্রয় করিয়া অলৌকিকতার নানা আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়।

"কেমনে জানিবে তুমি তারে সুর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃত স্নানে সে যে অয়ি প্রিয়ে,
হারায়েছে সীমা।" (আরশি)

শেষ সপ্তক

কালের আবর্ত্তে, পথ চলায় একদিন আত্মবিস্মৃত প্রেম হারাইয়া যায়। কিন্তু এই হারাইয়া যাওয়ায় তাহার নিঃশেষ বিলুপ্তি ঘটে না, তাহা স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে। তাহার পর একদিন উদাস অবসরে ওই বিস্মৃত প্রেমের আত্মপ্রকাশ ঘটে সুদুর্লভ মহিমায়। তখন ওই স্মৃতির মূর্ত্তিটিকে বেষ্টন করিয়া মন নিত্য অশ্রুপাত করিয়া চলে। এক একটি অশ্রুবিন্দু পূজার এক একটি ফুল।

"এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা
নিয়েছি তুলে বুকে।"

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, নানা তুচ্ছ কর্ম্ম, নানা ঘটনার সূত্রে গাঁথা জীবন, তারই মধ্যে প্রেমের স্পর্শ নামে অন্তরে হয়ত মুহূর্ত্তের জন্য, কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত মানুষের চেতনাকে সকল বাধা মুক্ত করিয়া কোন্ সীমাহীনলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য-লোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। জীবন ও জগৎ ঘিরিয়া অসীম রহস্যের মহামৌনতা মুহূর্ত্তের জন্য যেন ঘুচিয়া যায়, সৃষ্টি-লোকের গূঢ়তম মহামন্ত্র চিত্তকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠে।—এক গভীরতম অস্তিত্বের অনুভূতি।

"জোয়ারের তরঙ্গ লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'ল
চির দুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র বেলায়।"

প্রেম জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতির সঞ্চয়। জীবনের সকল পরিণাম, সকল পরিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধে তাহা স্থির ধ্রুবতারকার মত কিরণ বিস্তার করে। আর সেইদিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একদিন জীবন মৃত্যুর অতলতার মধ্যে হারাইয়া যায়। তখনও কি সেই সব সঙ্গহারা জীবনের অজ্ঞাত কোন পরিণামে এই দুর্লভ প্রেমই একমাত্র সঙ্গী হইয়া থাকে?

"তারপরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে;—"

সৃষ্টির যাহা চরম সত্য তাহা অমনি সহজ, সরল, তাহা অমনি নিঃসংশয় প্রত্যক্ষ গোচর, যেমন প্রত্যক্ষ গোচর রৌদ্র ঝলমল একগুচ্ছ কিশলয়। প্রাণের কী আশ্চর্য্য রূপময় প্রকাশ! সমগ্র সৃষ্টির অন্তরালে সেই এক আশ্চর্য্যের প্রকাশ। প্রেমে প্রাণের জাগরণের ভিতর দিয়া সমগ্র সৃষ্টি রহস্যের কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যায়। হয়ত কোন শুভলগ্নে সেই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কবির সেই প্রেম অবসান লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির সেই নিরাভরণ বাণীরূপ কেমন? যেমনই হোক জীবনে তাহার প্রকাশ ঘটিলে কোথাও আর সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না।

সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দিন, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বিচিত্র স্বপ্ন সঞ্চরণের দিনের অবসান ঘটে। থাকে ওই সকল স্মৃতির সম্পদগুলিকে নানাভাবে গভীর মমতায় একে একে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিবার দিন। কবির এই দুটি জীবন-পর্য্যায়েরই পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি।

"ঝরে পড়া ফুলের ঘন গন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারদিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি
গুন গুন করে বেড়ায়,
কোন্ অলক্ষের সৌরভে।"

প্রাণের সম্পদ সঞ্চয়ের দিনের শেষ হয়, সেই সঙ্গে প্রাণ-লোকের সহিত ধীরে বিচ্ছেদ ঘটিতে থাকে। বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু মনের গ্রন্থি আরো দৃঢ় হয়। এই স্মৃতি-লোকটিকে মানুষ তখন আরো গভীর করিয়া জড়াইয়া ধরে। স্মৃতি-লোকে জড়ের বন্ধন-মুক্তি কতকটা ঘটে, কিন্তু স্মৃতি-লোকও সীমার লোক। তাই স্মৃতি-লোক জীবন ও জগতের সম্যক পরিচয় লাভের পথে দুর্লভ বাধার সৃষ্টি করে। কবি তাই তাঁহার স্মৃতি-লোকের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল। ব্যক্তির সকল প্রকার সীমিত বোধের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুলতা। তাহা হইলে জীবন ও জগৎকে তাহার যথার্থ স্বরূপে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইবে।

"এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।"

সীমিত বোধের বাহিরে আসিয়া পরম অস্তিত্বের অনুভূতি লাভের এই যে আকাঙ্ক্ষা তাহা ব্রহ্মবাদীদের অরূপ বা অসীম যে নয় তাহা অন্ততঃ নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। তাহা কি, না সৃষ্টির প্রেরণা বক্ষে লইয়া যে অন্তহীন প্রাণের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, যে প্রবাহে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে, তাহারই সামগ্রিক অস্তিত্বের উপলব্ধি।

"এর আলো ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে থাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগর সঙ্গমে।"

প্রাণ-তত্ত্বে মহাপ্রাণ ও মহামৃত্যু সমার্থক।

এই বিশ্বলোক ঈশ্বরের অন্তহীন মানস-সরোবরের একটি পদ্ম। এই বিসৃষ্টি পদ্মের দল একটির পর একটি করিয়া বিকশিত হইতেছে, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের একটির পর একটি করিয়া দ্বার ধীরে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইতেছে। একটি পরিণামে এই বিসৃষ্টি-পদ্ম পূর্ণ বিকশিত হইয়া তাহার অন্তর্লীন সকল ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করিবে। তিনি আপনার সৃষ্টির সেই পূর্ণ প্রকাশ দেখিবার জন্য আপনি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাঁহার সেই প্রতীক্ষার সেই প্রেমের কী পার আছে। কত যুগ যুগান্ত পার হইয়া গিয়াছে সামনে কত যুগ যুগান্ত!

সমগ্র বিশ্বের সহিত একাত্ম বলিয়া মানুষের জীবনে এই একই নিয়তি চরিতার্থ হইবে। অর্থাৎ এক একটি ব্যক্তি-সত্তাকেও আশ্রয় করিয়া চেতনার ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। এই বিকাশ তো এক জীবনে এক-লোকে সম্পূর্ণ হয় না। লোক হইতে লোকান্তরের ভিতর দিয়া মানবাত্মা রূপ হইতে রূপান্তর লাভ করিয়া চলিয়াছে।

"এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্য সৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে?

এই জিজ্ঞাসা সংশয়মূলক নয়, বরং পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম প্রত্যয় প্রসূত। তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তি হইতে বোধ করিতে পারা যায়।

"কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রকাশ হব আপনার আলোতে"

কবির এই প্রার্থনা উপনিষদের ঋষি-কবির প্রার্থনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"পূষন্ ; একর্ষে যম, প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ-তেজঃ
যৎ তে রূপং কল্যাণতমম্, তৎ তে পশ্যামি
যো সাব অসৌ পুরুষম্ সোঽহম্ অস্মি।"

কিন্তু এই উভয় প্রার্থনার মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যে 'আমি'র পূর্ণতা লাভ করিতে চান তাহা অন্তর ও বহিঃসত্তার পূর্ণতা, বহির্বিশ্বের যোগে

যাহার ধীর বিকাশ। ইহাতে আছে দেশ-কাল ও রূপের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি। উপনিষদের ঋষি-কবির প্রার্থনায় (অন্ততঃ অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য অনুসারে) যে-'আমি', তাহা কেবল অসীম বা অরূপ। তাহার সহিত দেশ-কাল ও রূপের কোন তত্ত্ব নাই। দেশ-কাল ও রূপের যে-কোন তত্ত্ব তো মানব মন ও বুদ্ধি প্রসূত, যাহা আদৌ সীমিত বোধ, তাহাই মায়া।

বিশ্বের যোগে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনকে আশ্রয় করিয়া কবির চেতনা কত বারবার সীমাহীন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিযাছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে অন্তহীন বিচিত্র মানস-সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের ধীর সামর্থ্য হ্রাসের ফলে ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিয়া জীবনাবসানে একদিন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

"যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলন-শয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে ক'রে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।"

কিংবা

"যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে
রাতের শেষ প্রহরে।"

কবির ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের আধারই তো প্রদীপ, তাহাই তো বাঁশরি। মৃত্যুতে ইহার নিঃশেষ বিনষ্টি ঘটে এমনি একপ্রকার অধ্যাত্ম প্রত্যয় কবির পরবর্ত্তী জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। বলাকায় এই বোধের প্রথম পরিচয় লাভ করা যায়। নিখিল বিশ্বে ব্যক্তি-সত্তার বিশেষের কোন মূল্য নাই। কেবল মানব-জীবনে নয় বিসৃষ্টির সর্ব্বত্রই সত্তার এই বিনাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রকাশে যাহা এত সত্য, এত প্রত্যক্ষ, এত নিবিড়, এমন একান্ত, অনিবার্য্য, অসংশয়, মৃত্যুতে তাহার নিঃশেষ অবসান ঘটে এও সত্য। জীবন ও জগতে একক সত্তার বিনাশ কোন শূন্যতার সৃষ্টি করে না। এই উপলব্ধির মধ্যেই কিন্তু কবিতার সমাপ্তি নয়।

"তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্য
কেউ একজন
সেই শূন্যটির কাছে একটি ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।"

মানব-প্রেমের মধ্যে সেই অমৃত আছে, যাহার মুহূর্তের আস্বাদ জন্ম-মৃত্যুর সকল সীমানা পার হইয়া যায়। তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির মর্ম্মমূলে এই আস্বাদ আছে। কাব্যের ভিতর দিয়া মানব অন্তরে সেই আস্বাদকে তিনি অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছেন। মানব-প্রেম হইল অসীমের সীমিত প্রকাশ। মানব-প্রেমের ভিতর দিয়া আমরা অসীমকেই বিচিত্ররূপে সম্ভোগ করি।

দেশ-কালের বক্ষে কত কোটি কল্প কল্পান্ত ধরিয়া মহত্তম রূ" হইতে ক্ষুদ্রতম প্রাণ-কণা পর্য্যন্ত অন্তহীন রূপ-লোকের সৃষ্টি হইতেছে, আবার তাহার বিনাশ ঘটিতেছে। ইহা যেন প্রাণ-সমুদ্রে অন্তহীন বুদ্বুদের বিকাশ ও বিনষ্টি। এই প্রাণ-ধারা কোন্ অকূল হইতে কোন্ অকূলে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা কে জানে!

"মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতল স্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গ তলে।'

তাঁহার ধ্যানই একবার অন্তহীন সৃষ্টিরূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে, আবার তাহারা তাঁহার ধ্যানের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

এই সৃষ্টি ও বিনষ্টির উর্দ্ধে যে অবিক্ষুব্ধ শান্তি, যে নির্ম্মল নিরাসক্তির লোক, কেবল পরম অস্তিত্ব রূপে যাহার প্রকাশ, সমগ্র চঞ্চলতার মধ্যে যাহা মহান বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। এই উপলব্ধি বৌদ্ধ স্পন্দবাদ হইতে রবীন্দ্রনাথকে মূলতঃ পৃথক করিয়াছে। নিম্নের পংক্তি কয়েকটির মধ্যে সেই অধিষ্ঠানভূমি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হইয়াছে।

"জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া ও হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি হোমাগ্নি শিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।"

যিনি অসীম দেশ-কালের মধ্যে তিনিই আপনাকে অন্তহীন সীমা-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশেই তাঁহার আনন্দ, তাঁহার লীলা।

মানুষের সৃষ্টির মূলে এমনি অহেতুক আনন্দ প্রেরণা। বিশ্ব-প্রাণের যোগে প্রাণের যে অলৌকিক আনন্দ অনুভূতি, বিচিত্র সৃষ্টি তাঁহারই বন্দনা গান। সৃষ্টি প্রাণের যোগে প্রাণের প্রকাশ আবার প্রাণেই তাহার অবসান।

"এই নিত্য বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।"

কবির সৃষ্টি এই প্রাণ-সঞ্জীবিত মনের আনন্দানুভবের প্রকাশ। নিখিল বিশ্বের অন্তরালে যে প্রাণ বিচিত্র রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে, সেই একই প্রাণ ব্যক্তি-হৃদয় আশ্রয় করিয়া নানা সৃষ্টি রূপে আত্ম প্রকাশ করে। সেই সকল সৃষ্টির গায়ে নামাঙ্কিত করিয়া রাখিবার যে চেষ্টা তাহা মানবিক হইতে পারে, কিন্তু তাহার অধ্যাত্ম মূল্য কিছু নাই। তাহা আসক্তি মাত্র। কালে তাহা একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এই আসক্তিকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টাই বর্ত্তমান কবিতার মুখ্য প্রেরণা।

"সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্ব চিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।"

মানুষ আপনার ভাবনাকে বাহিরে রূপায়িত করে। এই রূপায়নকে আমরা বলি সৃষ্টি। ব্যক্তি-মানুষ সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া যাহা সৃষ্টি করে, সেই সকল সৃষ্টি-রূপকে জোড়া দিয়া তাহার একটি মানস-রূপ গড়িয়া তোলা সম্ভব। এই ভাব-জগৎটিকে আমরা বলি ব্যক্তির অধ্যাত্ম-সত্তা। সৃষ্টি রূপ আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির এই যে সত্তার উপলব্ধি, তাহা প্রত্যক্ষ গোচর। ইহাকেই বলি স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব বা আমিত্ব। কিন্তু ব্যক্তির কতটুকু প্রকাশ ঘটে তাহার সৃষ্টির মধ্যে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে সীমাহীন অপ্রত্যক্ষতা। এই অপ্রত্যক্ষতার আবরণের অন্তরালে থাকিয়া

বিশ্ব-স্রষ্টা তাঁহার একটি বিশিষ্ট ভাবনা বা অভিপ্রায়কে রূপায়িত করিয়া চলিয়াছেন। যতদিন না সেই ভাবটি সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হইতেছে ততদিন ব্যক্তি-মানসের পক্ষে সেই ভাবের সম্যক উপলব্ধি অসম্ভব। কবির সমগ্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহার একটি আভাস হয়ত লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই সমগ্র রূপ-কল্পনা অসম্ভব।

কবির এই জীবনে বিধাতার সেই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই—

"আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,
সবাই রইল দূরে,
যারা বললে 'জানি', তারা জানল না।"

অসম্পূর্ণতার এই বেদনাবোধ কিন্তু এই কবিতার শেষ কথা নয়। এক একটি ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের এক একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় চরিতার্থ হইতেছে বলিয়া এই অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ রূপায়নের পূর্ব্বে কোন সত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তি তাই অসম্ভব। মৃত্যু জীবনের একটি ছেদ মাত্র, নূতন আরম্ভের সূচনা। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীবনের ধারা বহিয়া চলে যে পর্যন্ত না একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতেছে।

"এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলে মানুষী।"

কোন্ অধ্যাত্ম-উপলব্ধিতে কবি হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। তাহারপর কবির ওই জিজ্ঞাসা—

"তার নকশা শেষ হবে কবে?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার?"

মুক্তি বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন তাহারও পরিচয় এই উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়। ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় যতদিন না চরিতার্থ হয়, ততদিন জীবনের গতি অব্যাহত থাকে। জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাহার যাত্রা চলিতে থাকে। ব্যক্তি-সত্তা তাহার এই বিশিষ্ট অভিপ্রায়টিকে যখন সম্পূর্ণরূপে লাভ করে তখনই ব্যক্তির মুক্তি। মুক্তি এই পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতা সাধন ব্যতিরিক্ত যে মুক্তি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহা শূন্যতা মাত্র। ব্যক্তি-সত্তা তাহার বিশিষ্ট স্বভাবের (এই বৈশিষ্ট্যকে স্বধর্ম্ম বলে, তাহার কারণ ইহার ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় চরিতার্থতা লাভ করে।) ভিতর দিয়া যখন সম্পূর্ণতা লাভ করে, তখনই ঈশ্বরের সহিত তাহার 'প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ যোগের এই লীলাই রবীন্দ্রনাথের নিকট মুক্তি।

বিচিত্র তারে বাঁধা, সুরে বাঁধা, যন্ত্রের প্রকাশ সীমিত। তাহার চতুর্দ্দিকে মানুষ কত সৌন্দর্য্যের আলপনা আঁকে, কত বিচিত্র রঙ না ফুটাইয়া তোলে। তাহাকে ঘিরিয়া মানুষের এই ভালোলাগার ভালোবাসার বিচিত্র প্রকাশ। কিন্তু যন্ত্রে যে সুর ধ্বনিত হয় তাহাতে সীমার সকল পরিচয় হারা। সুরের সে কম্পনে যন্ত্রের তার দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া যায়, সীমা অসীমে, রূপ অরূপে পরিণত হইয়া যায়।

বিশ্বের সকল রূপের মত নারী রূপের মধ্যেও সীমা ও অসীমের অপরূপ সমন্বয়। কয়েকটি বিশিষ্ট রেখার মধ্যে সীমিত নারীর যে প্রকাশ, যাহাকে ঘিরিয়া আমরা অন্তরের মধ্যে বিচিত্র স্বপ্ন-লোক বা সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্টি করি, বাস্তবে ও কল্পনায় আমাদের একান্ত পরিচিত যে নারী রূপ, ধ্যানের তন্ময়তা ও প্রগাঢ়তার একটা পরিণামে তাহা কেমন করিয়া কোন্ অপরূপতার মধ্যে তলাইয়া হারাইয়া যায়। বিশ্বের অন্তহীন রূপের মধ্যে সে-রূপের আভাস কেমন করিয়া বিলসিত হইয়া যায়। বিশিষ্ট একটি রূপের ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা এমন একটি পরিণাম লাভ করিতে পারে যে পরিণামে ব্যক্তির হৃদ্-স্পন্দন বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দনের সহিত চকিতে চকিতে সংযোগে লাভ করিতে পারে, তখন বিশ্বের সকল রূপের যোগে বিশিষ্ট রূপ হারাইয়া যায়।

"সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে ক'রে;
ওতে রং লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে,
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্ব-ভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে
মিলিয়ে যায় দোলন চাঁপার গন্ধে।"

কেবল সৌন্দর্য্য-ধ্যান নয়, প্রেমের উপলব্ধিও (উভয়ের মধ্যে একই প্রাণের তত্ত্ব আছে বলিয়া) মানবীয় চেতনাকে একটি দুর্লভ আকস্মিক মুহূর্ত্তে অন্তহীন ব্যাপ্তি ও প্রসারতা দান করে। সেই ব্যাপ্তি বা প্রসারতা সকল জন্ম সকল মৃত্যুর সীমা পার হইয়া যায়। যত ক্ষণ-কালের জন্য, যত অস্থায়ীভাবে হোক-না-কেন, নর-নারী যখন আপনার এই অসীমতার পরিচয় লাভ করে, তখন জীবনের আর সমস্ত কিছু আর সকল বোধ একান্ত তুচ্ছ হইয়া যায়। মৃত্যুতে সত্তার একান্ত বিলুপ্তি ঘটুক কিংবা নাই ঘটুক, মানবের স্মৃতি-লোকে অশেষ হইয়া থাকিতে পারা যাক বা না যাক, এই উপলব্ধিতে তাত্ত্বিক ওই সকল জিজ্ঞাসা গৌন শুধু নয়, নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

"সেই মুহূর্ত্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্ত্তের আনন্দ বেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্ম জন্মান্তরে।
সেই মুহূর্ত্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।"

একথা তিনি কত-না-ভাবে কত-না-রূপে ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়াছেন। আমরা তাহাকেই সুন্দর বলি যাহা মানবীয় চেতনাকে সীমার বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়।

"পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।"

সৌন্দর্য্যের ইহা যেমন বস্তুগত ব্যাখ্যা তেমনি সৌন্দর্য্যের একটি ভাবগত ব্যাখ্যার দিকও আছে। মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে, যতই অহং বা সীমার বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে থাকে, ততই তাহার দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যাইতে থাকে। মানবীয় চেতনা এমন একটি পরিণাম লাভ করিতে পারে, যখন রূপের আর অন্ত থাকে না; অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত কিছু তখন অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়া যায়।

এই তত্ত্বটিকেই একটু ভিন্ন ভাবে তিনি এক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ বস্তুকে যখন অন্তহীন দেশ-কালের (মহাপ্রাণ না মহামৃত্যু ?) পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পারি, তখন বস্তুর সৌন্দর্য্য নিঃসীম হইয়া উঠে। বস্তুকে তাহার অন্তহীন দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা তখনই সম্ভব যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে অহং বা সীমার বোধ মুক্ত হয়। এই দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষ দেবতার দিব্য আভা বিজড়িত হইয়া যায়, এই দৃষ্টিতে প্রতি ধূলিকণা অন্তহীন সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়ের আভাস দেয়। এই দৃষ্টিতে এই মর্ত্ত্য-লোকই স্বর্গ-লোকে পরিণত হইয়া যায়। তিনি পাল্কী বাহকের মধ্যে দেবতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"তারমধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্ত্তি ;—"

আর এই আনন্ত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সমস্ত কিছুকে দেখা—

"এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর,
জীবনের চারদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র ;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।"

এই বিশ্বকে দুই দিক হইতে দেখা আছে। একটি ভাব, ধ্বনি ও স্পন্দনের দিক হইতে, অন্যটি রূপ-রঙ্গ ও রেখার দিক হইতে। ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকে, ব্যক্তি-চেতনায় ততই বিশ্বের ভাবধারা অথবা বিশ্বের রূপ-রঙ্গ ও রেখা অস্ফুরাণ হইয়া উঠে। ব্যক্তি-সত্তা আপন সৃষ্টির মধ্যে কখন ভাবকে প্রকাশ করেন, কখন রূপকে চিত্রে রূপায়িত করেন। একই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কোথাও এই উভয় প্রেরণা যুগপৎ ক্রিয়া করিতে পারে।

বিশ্বের যোগে ভাব অনুসরণ করিয়া কবি একদিন এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছিলেন, যে পরিণামে নিখিল বিশ্বের পরিব্যাপ্ত ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে সমুচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। সেই ভাবনাকে তিনি অনায়াসে তাঁহার অতুল বৈচিত্র্যময় কাব্য-ধারার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আজ রূপ অনুসরণ করিয়া বিশ্বের যোগে তিনি এমন একটি পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যে পরিণামে বিশ্বের অন্তহীন আকার বা রূপ তাঁহার হৃদয়-তটে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিতেছে।

বিশ্ব-স্রষ্টা যিনি তিনি দেশ-কালের সীমার ঊর্দ্ধে থাকিয়া দেশ-কালের মধ্যে আপন গড়া অন্তহীন রূপকে অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া শেষ করিতে পারিলেন না।

"সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-জাগরূকের সামনে দিয়ে চলেছে।—"

কিংবা

"চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।"

এই কথা তিনি অন্যত্র অন্যভাবে বলিয়াছেন—

"অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে;
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য;
নির্ব্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।
অমিতার আনন্দ সম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,
শুধু রূপ; আলো দিয়ে গড়া।"

অসীম আকাশের পটে অন্তহীন অন্ধকারের বক্ষে সংখ্যাতীত আলোক-কুসুমের শুধু ফোটা ও ঝরা। অসীমের আনন্দকে সীমা নিয়ত সরিয়া সরিয়া নিয়ত বিদীর্ণ হইয়া, প্রসারিত হইয়াই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

বিশ্ব-রূপকারের এই আদর্শ, মানুষ-স্রষ্টারও আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শকে মানুষ তখনই লাভ করে যখন মানুষ আপনার সকল সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে।

ঈশ্বরের মত মানুষ তখন হয় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আবার এই মুক্তি আসে বিশ্বের সহিত যোগের ভিতর দিয়া বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া পরিণামে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেলে।

> "সমস্ত বিশ্বজুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
> আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
> রচনা করছি দেখা।"

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তো কোন ভাষা নাই। তাহার আছে ইঙ্গিত, ভঙ্গি, ছন্দ ও নৃত্য। তাহার অন্তরের মধ্যে আছে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতাকেই সে প্রকাশ করিতে চায় নানা ব্যঞ্জনায়। সেই প্রকাশের ব্যাকুলতা তৃণ পুষ্প হইতে অন্তহীন নক্ষত্র-লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই প্রকাশের ব্যাকুলতার ভিতর দিয়াই বিশ্বে স্পন্দন দেখা দিয়াছে। এক একটি বিশিষ্ট রূপ এক একটি বিশিষ্ট স্পন্দন বা নৃত্য।

মনুষ্য রচিত কাব্যেও সেই আদি অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতার প্রকাশ। এই প্রকাশের জন্য তাহাকে অনিবার্য্য রূপে ভাষাকে আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু ভাষার সামর্থ্য সীমিত। ভাষা সীমাবদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে। কবি তাই সীমাবদ্ধ ভাষাকে এরূপ ভাবে বিন্যাস করেন, এমন ব্যঞ্জনা দান করেন, এমন ইঙ্গিতময় করিয়া তুলেন যাহাতে তাহা আপনার যুক্তি পারম্পর্য্য হারাইয়া এক অলৌকিকতা লাভ করে। এই অলৌকিক কাব্য-দেহই অলৌকিক ভাবের বাহন। বস্তুত অলৌকিক বোধের রূপায়ন ক্রিয়া ঠিক সচেতনভাবে হয় না। অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধির দুর্ণিবার আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন ভাষা-রূপ আবর্ত্তিত হইতে হইতে ধীরে একটি রূপ ফুটিয়া উঠে; কিংবা বলা যায়, উপলব্ধির অসহনীয় উত্তাপে বিচ্ছিন্ন সীমিত বিচিত্র বোধরূপ বিগলিত হইয়া একটি আশ্চর্য্য ভাষা-ধাতু-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলে। এই ক্রিয়া কতকটা হয় কবির অবচেতন মনে, উপলব্ধির অলৌকিক আনন্দ মুহূর্ত্তে কতকটা হয় সচেতন মনে যখন কবি উহাকে বাহিরে ভাষা-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করেন।

এই উপলব্ধিকেই প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যেমন ভাষাকে বাহন করে তেমনি করে সুরকে। পরমাণুপুঞ্জ যেমন স্পন্দনকে এক-একটি বিশিষ্ট সীমা-রূপ দান করিয়া এক একটি বিশিষ্ট আবর্ত্তন চক্র গড়িয়া তুলে, মানুষের সুরও তেমনি অন্তহীন

সুরকে এক একটি বিশিষ্ট রূপ বা ভঙ্গী দান করে। এই গানে গড়া রূপ, অর্থাৎ মানুষ আপনার সুরের আবেষ্টনী দ্বারা বিশ্ব-সঙ্গীতকে যে একটি বিশিষ্ট সীমিত রূপ দান করে, সেই বিশিষ্ট রূপ আবার সকল স্পন্দিত রূপের সহিত মিলিত হইতে থাকে। ব্যক্তি-চেতনা যতই উন্নত হয়, বিশ্বকে যতই গভীর করিয়া সে লাভ করিতে থাকে, বিশ্বের আদি স্পন্দন তাহার হৃদয়ে ততই অন্তহীন হইয়া উঠিতে থাকে। তাহার সৃষ্ট সুরের সহিত বিশ্ব-সুরের ততই মিল ঘটিতে থাকে।

প্রাণের ধীর অবসানের ফলে বিশ্ব-প্রাণের উপলব্ধির গভীরতাও ধীরে হ্রাস পাইতেছে। ফলে প্রাণের যে লীলা ঘটিত বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্য্য রূপে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য রূপে তাহাও কবির জীবনে ধীরে কেমন ম্লান হইয়া আসিতেছে। ইহার একটি ধারা কবির পরিণত বয়সের কাব্যগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কবির জীবনে এই ধারা সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া মানব জীবনের চিরন্তন বেদনার দিকটিকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ইহা তাই একপ্রকার আত্ম সাক্ষাৎকার। জীবনের এই যে ক্ষতি. ইহা যদি অপূরণীয় হইত তাহা হইলে হাহাকারে মানুষের সকল প্রয়াস যে মুহূর্ত্তে নিরুদ্ধ হইয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষতিকে মানুষ অধ্যাত্ম সম্পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া লয়।

> "মনের রসনা থেকে
> অজানার স্বাদ গেছে মরে,
> অনুভবে পাইনে
> ভালোবাসার সম্ভবের মধ্যে
> নিয়তই অসম্ভব ;
> জানার মধ্যে অজানা,
> কথার মধ্যে রূপকথা।
> ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
> যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,—"

বিশ্ব-সত্তা লাভের পক্ষে একটি মহৎ অন্তরায় ও অসম্পূর্ণতার বোধ সম্পর্কে কবি প্রথম সচেতন হন 'বলাকার' মধ্যে। অন্ততঃ এমন নিঃসংশয় উপলব্ধি করিব জীবনে ইতিপূর্ব্বে যে কথাও ঘটে নাই তাহা বলিতে পারা যায়। এই অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়া কবির জীবনে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতেছে লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বের একমাত্র না হইলেও, অন্তত মুখ্যত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের দিকটিই কবির জীবনে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা পরিণামে বিশ্ব-সত্তাকে লাভ করিতে চাহিযাছে। কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে আশ্রয় করিবার ফলে বিশ্ব-সত্তা অন্তহীন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যরূপে অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বে নির্ম্মমতার, ভয়ঙ্করতার, দুঃসহ তপশ্চর্য্যার, নিদারুণ দাহ, সর্ব্বস্ব সমর্পণেরও একটি দিক আছে।

বিশ্ব-সত্তার মধ্যে এই উভয়ের আশ্চর্য্য সমন্বয় আছে। কোন একটিকে অস্বীকার করিলে বিশ্ব-সত্তা লাভের পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়া বর্ত্তমান কবিতাটির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কাব্য-সাধনা জীবনের যে দিকটিকে আশ্রয় করে, তাহা একান্ত মধুর, স্পর্শকাতর, সযত্নে রক্ষার সামগ্রী, সেখানে লজ্জা, সাধ্বস ও কুণ্ঠা। নানা নিপুণতা, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। জগতিক রূঢ়তা ও মালিন্যের চিহ্নমাত্র সেখানে নাই। তাহা যেন সকল প্রবাহ নিরুদ্ধ এক পদ্ম সরোবর, তাহারই বক্ষে ষড় ঋতুর নানা বর্ণ সম্ভার, আলো ও ছায়ায বিচিত্র অনির্ব্বচনীয় লীলা।

কিন্তু জীবন যেখানে সকল বন্ধনকে অস্বীকার করিযাছে, সকল ঐশ্বর্য্য-অলঙ্কারকে পরিহার করিয়াছে, যাহা নির্ম্মম, যাহারা দুঃসাধ্যের সাধনায় লিপ্ত, যাহারা সত্য লাভের আশায় নিত্য আত্মত্যাগ করিতেছে, যাহারা বিশ্বে নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত, যাহারা একমাত্র বিবেকের নির্দ্দেশ ছাড়া আত্মার আলোক ছাড়া বাহিরের কোন নির্দ্দেশ ও আলোককে স্বীকার করে না, কবির কাব্য-সাধনায় তাহার কতটুকু পরিচয় আছে। তাহার কাব্য সাধনায় জীবনে এই দিকটিকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বারংবার সচেষ্ট হইয়াছেন।

> "যাব দুর্গমে, কঠোরে নির্ম্মমে,
> নিয়ে আসব কঠিন চিত্ত উদাসীনের গান।"

মহাকালের বক্ষে অন্তহীন গ্রহ-নক্ষত্র যেন মহাসমুদ্রের বক্ষে এক একটি বুদ্বুদ। মহাকালের পরিধি তবে কত বিপুল, কত কোটি কল্প কাল ব্যাপিয়া। তাহার মধ্যে আমাদের এই সৌরমণ্ডল কতটুকু। কী অচিন্তনীয় ক্ষুদ্র। সেই মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী

একটি ক্ষুদ্র গ্রহ আমাদের এই মাটির পৃথিবী। তাহাতে আবার ইতিহাসের আরম্ভ কাল। এই ইতিহাসটুকুর মধ্যেই মানুষের সৃষ্ট কত কীর্ত্তি, মানুষের কত জয়ধ্বজা, কত প্রতাপ কালে একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

কবির সৃষ্ট কাব্যও তেমনি একদিন ধুলায় ধুলি হইয়া হারাইয়া যাইবে। কিন্তু যে-ভাবকে তিনি কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, সেই ভাব যে অমর। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একদিন অবসান ঘটিতে পারে, আবার নূতন কল্পের আরম্ভের জন্য; কিন্তু তখনও এই ভাবগুলি থাকিবে কল্পারম্ভে আবার ফিরিয়া রূপলাভ করিবার জন্য। আর এই চিরন্তন ভাব-লোককে আশ্রয় করিয়া কবির চেতনা বারবার সেই অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছে, যাহা সকল জন্ম সকল মৃত্যুর, সকল সৃজন ও সকল প্রলয়ের ঊর্দ্ধে। কবির এই উপলব্ধির সহিত প্লেটোর 'ideas' বা 'forms' সংক্রান্ত মতবাদের যে মিল রহিয়াছে তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি।

"আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্ত্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে?

* * *

কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।"

প্রাণ-মন ও বুদ্ধি সমেত এই যে আমার সমগ্র সত্তা এবং তাহার সহিত অন্বিত করিয়া এই যে আমার জগৎ, আর সেই জগতের সহিত বিজড়িত হইয়া আমার হাসি-কান্না, ভাবনা-বেদনা;—এই সমগ্র প্রকাশ লীলাকে যে ঊর্দ্ধতর কোন সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবে দেখা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে সেই উপলব্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন।

"উপরের তলায় বসে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আসা-নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ায় সুখ দুঃখের আলো আঁধারে।"

এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতারও পরিচয় লাভ করা যায়—

"মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দ ধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা।"

"যিনি সকল ভূতকে আপনার আত্মার মধ্যে এবং আপনার আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন তিনি কোন জুগুপ্সা বোধ করেন না।" (ঈশ উপনিষদ)

"যিনি সকল ভূতকে আপনার আত্মার মধ্যে এক করিয়া জানেন, যিনি এক তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহার কোন্ মোহ, কোন্ শোক থাকিতে পারে?" (ঈশ উপনিষদ)

"জ্ঞান তৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ, প্রশান্তচিত্ত, ধীর যুক্তাত্মাগণ আত্মাকে সর্ব্বদিকে লাভ করিয়া সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেন।" (মুণ্ডক উপনিষদ)

নিখিল বিশ্ব-লোকে প্রাণের প্রকাশে ছেদ কোথাও নাই। সে প্রাণ দেশ-কালের প্রান্ততম সত্তা হইতে মর্ত্ত্যের তৃণ পুষ্প পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্পন্দিত। একটি পরম অস্তিত্বের মহান আনন্দে সকলে যুক্ত, ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধা। ব্যক্তি-চেতনা সেই মহাপ্রাণ সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিচি-বিক্ষেপ মাত্র। ব্যক্তি-প্রাণ যদি মহাপ্রাণ সমুদ্রের সহিত যুক্ত হয়, সেই যোগে যদি সকল রূপের সহিত আপনাকে যুক্ত দেখে তবে এক অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্ব বা মিলনের বোধ জাগে। যে অস্তিত্বের আনন্দ সমগ্র সৃষ্টির মর্ম্মমূলে রহিয়াছে, যে আনন্দে সমস্ত কিছুই সঞ্জীবিত মানুষ সেই আনন্দ সেই অস্তিত্ব বোধ করে।

"যেন কোন্ লোকান্তব গত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
উর্দ্ধলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির-শাশ্বত বাণী
"ভালোবাসি।"

সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যে আনন্দ প্রেরণা, যে প্রেরণায় নিত্য সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইতেছে, সেই এক আনন্দ কবির সকল সৃষ্টির মধ্য দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে, পরম অস্তিত্বের এক নিগূঢ় আনন্দানুভূতি। এই আনন্দের অতিরিক্ত আর কিছু নাই।

"সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণ সমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্রবচন।
এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে—"

যৌবনে জীবন ও জগতের যে অর্থ ধরা পড়িয়াও ধরা পড়ে নাই, পরমের যে রূপকে তিনি কেবল বিচিত্র ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া আভাস মাত্র রূপে লাভ করিয়াছেন; আজ জীবন-সায়াহ্নে বিশ্ব-প্রকৃতি তেমনি রহস্যময়ী মাধুর্য্যময়ী প্রেয়সীর মূর্ত্তিতে ঠিক তেমনি করিয়া কবি-চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে। তেমনি করিয়া মর্ম্মের কোন গূঢ় বাণীকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা তাহার চোখে মুখে। যৌবনের সেই প্রাণের প্রকাশ যদি থাকিত, বিশ্ব-প্রাণের যোগে বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যকে যদি তিনি তেমনি করিয়া বারেকের জন্য ফিরিয়া লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিশ্বের গূঢ়তম বাণী, গভীরতম সত্য যে মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত না তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু জীবনের এই পরিণামে প্রাণের সেই প্রকাশকে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণ যতই প্রসার লাভ করিয়াছে, চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়াছে, ব্যক্তির অন্তরে যেমন একটি রূপ ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বের মধ্যেও তেমনি একটি রূপ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' এবং তাহারও পরবর্ত্তী 'চৈতালি', 'কল্পনা' পর্য্যন্ত এই রূপ কল্পনার ক্রম বিকাশের একটি ধারা নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি।

নিম্নে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহার মধ্যে প্রাণের ধীর অবসানের পরিচয় যেমন তেমনি সেই একই কারণে বিশ্বের সৌন্দর্য্য কল্পনাও ধীরে ম্লান অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

"আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্ত্তি,
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না,
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই।"

এই অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়া লক্ষ্য করা যায় অন্যত্রও। কেবল পুরুষ পয়ারের একটি পদ, কেবল নারীও তেমনি। উভয়ের মিলনে ছন্দের সম্পূর্ণতা। সমগ্র অর্থটি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে। এই বিশ্বে পুরুষ তাই নিয়ত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে তাহার অপর পদকে, আপনার সম্পূর্ণ অর্থটিকে লাভ করিবার জন্য। কিন্তু এই প্রেম, প্রেমে এই মিলন একান্ত দুর্লভ। এই জীবনে পথ চলায় কচিৎ তাহার সাক্ষাৎ মিলে। এক্ষেত্রে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে প্রেমের যে উপলব্ধি আছে, তাহা অতি ক্ষীণ, নিবিড়তায় সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাই পরম অর্থটি তাহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। রূপের একটা আভাস মাত্র জাগাইয়া তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আর সেই ছিন্ন রূপের স্মৃতি বক্ষে জড়াইয়া এক অজানিত বেদনাবোধের নিত্য নিপীড়ন।

"সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ঐটুকু নিয়ে
তারপরে সে চলে গেছে"

নারীপুরুষের প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে পরস্পরের অন্তরে একটি বিশিষ্ট রূপ চিরস্থায়ী হইয়া যায়। বাহিরে রূপের জগতে নিত্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নর-নারীর দেহে-মনে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু উভয়ের ধ্যানে উভয়ের সেই বিশিষ্ট রূপ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। প্রেমে তাই ওই বিশিষ্ট রূপ ছাড়া জীবন ও জগতের আর সমস্ত কিছু অপরিচিত রহিয়া যায়।

প্রেমে যে রূপ-নিষ্ঠা তাহা কেবল একজন পুরুষ এবং একজন নারীর প্রতিই নয়, তাহাদের এক একটি বিশিষ্ট রূপের প্রতি নিষ্ঠা। উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে প্রেমের এই রূপ-তত্ত্বের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"পৃথিবীতে এসে
যাকে জেনেছিলেম একান্তই,
সেই আমার চিরকিশোর বঁধু
তাকে তো আর পাইনে দেখতে
এই ঘরে।"
শুধালেম, "সে কি নেই কোথাও ?"
মৃদু শান্ত সুরে বললে,
"সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আর কোথাও না।"

ধ্যানে যে রূপ চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া আছে তাহার সহিত আজিকার নারীর কোন মিল নেই। শুধু এই জীবনে নয়, জন্ম হইতে জন্মান্তরে সে চলিয়াছে নানা অভাবিত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া। সেদিনের সেই প্রেয়সীর সহিত আজিকার নারীর মধ্যে মিল খুঁজিয়া কোন লাভ নাই। তাহাকে বাহিরে ফিরিয়া লাভ করিবার চেষ্টা তাই বৃথা।

কেবল নারীর মধ্যে নয়, পুরুষের মধ্যেও মিল নেই। সুদীর্ঘ জীবনে তাহার মধ্যেও কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই যুগল মূর্ত্তি কেবল ধ্যানে চিরন্তন হইয়া থাকে, তাহার সহিত পুরুষের যেমন নারীরও তেমনি কোন মিল নেই।

সেই মিলন-বেদী তলে মানুষ চিরকাল কেবল আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। সেই আলোকে ওই যুগল মূর্ত্তিকে উদ্ভাসিত করিয়া সে অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া থাকে। কাল-প্রবাহে ওই দীপ-শিখা যখন নিভিয়া যায়, তখন ওই ধ্যানের রূপ কোন্ শূন্যে হারাইয়া যায় তাহা কে জানে।

এই নিয়ত পরিবর্ত্তন, ভাঙ্গা-গড়া, উঠা-নামা, সৃষ্টি ও বিনষ্টির মধ্যে একটি স্থির সত্তা আছে, যাহা জীবন ও জগৎকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া অনন্ত ব্যাপ্ত। এই ধর্ম্মই সমস্ত কিছুকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। কবি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার আভাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে অপরোক্ষ করিয়াছেন।

"এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।"

নিখিল বিশ্বের প্রত্যেকটি সত্তা, মাটির তলায় প্রচ্ছন্ন বীজ-কণা হইতে গ্রহ-নক্ষত্র লোক সমস্ত কিছুর মধ্যে যে অধীরতা তাহা আপনার পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য। মাটির তলায় বীজের মধ্যে প্রকাশের যে অধীরতা তাহার কোন পরিচয় তাহার এখনকার এই পরিবেশের মধ্যে লেশমাত্র প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। কিন্তু বীজের এই স্বপ্ন তো মিথ্যা নয়। তাহা একদিন মাটির আবরণ ভেদ করিয়া অঙ্কুর রূপে আত্ম প্রকাশ করে, অসীম আকাশের সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে তাহার তখন আনন্দের যোগ। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এমনি একটি পরিণামের ধারা নিশ্চয়ই আছে, যাহার কোন প্রকাশ আজিকার পরিবেশের মধ্যে কোথাও নেই। মানুষের জীবন সম্পর্কেও এ কথা সত্য। একটি পরিপূর্ণতার গূঢ় প্রেরণা বক্ষে লইয়া তাহার জীবন ক্রমাগত ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে, জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া।

"মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ?
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই?"

সামান্য গাছ, শ্যামল প্রাচুর্য্যের মধ্যে পরিচয় হারা, আত্মবিস্মৃত। ফাল্গুনের দুর্লভ আবির্ভাবে তাহার অন্তরে অন্তরে মজ্জায় মজ্জায় আনন্দের যে শিহরণ জাগে, অস্তিত্বের যে গূঢ় অনুভূতি, তাহাকেই সে প্রকাশ করে বাহিরে ফুলের অর্ঘ্যের ভিতর দিয়া। অলৌকিক আনন্দ স্পর্শে এ কোন্ অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। তাহার সাধারণ পরিচিত জীবনের সহিত ইহার তো কোন মিল নেই।

মানুষের গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমনি অভাবিত আনন্দের, এক পরম অস্তিত্বের, চেতনার এক সীমাহীন প্রসারের মুহূর্ত্ত আসে। কবি বা শিল্পীর সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া সেই অলৌকিক আনন্দ আস্বাদ অনিবার্য্যরূপে আত্ম প্রকাশ করে। সামান্য মানুষের মধ্যে তখন অসামান্যতার প্রকাশ ঘটে।

"সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্ন ভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানিনে ;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী -
"আমি আছি।"

কবি আজ জীবনের প্রান্ত সীমানায়। জীবনকে এমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া না আসিতে পারিলে জীবন তাহার সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সমেত সমগ্র রূপ লইয়া প্রতিভাত হয় না। যে জীবনটি এমনি অতিক্রম করিয়া আসি, সেটাই তো আমার আমির একমাত্র প্রকাশ নয়, জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত অন্তহীন আমার আর এক প্রকাশ আছে। আমার প্রত্যেকটি মুহূর্তের সহিত বিজড়িত অন্তহীন অতীত এবং অন্তহীন ভবিষ্যৎ। দুই দিকে প্রসারিত দুই বিপুল নিঃশব্দ। তাহার মাঝখানে আমার এই আমি-রূপে এই জীবনের প্রকাশ। এ কী অপার বিস্ময়! এ কী সুদুর্লভ মহিমা! সবকিছু জড়াইয়া এ জীবনের প্রকাশ কী মধুময়।

"দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা,
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষ কথা বলে যাব-
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।"

বিশ্ব-প্রাণের যোগে প্রাণের সম্পদ আহরণের দিন, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বিচিত্র লীলা সম্ভোগের দিন কবির জীবনে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অতীত সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া তিনি প্রাণের যে বিচিত্র সম্পদ আহরণ করিয়াছেন, অন্তরের মধ্যে তাহাদের সঞ্চয় স্থায়ী হইয়া আছে। এই জীবনের কোন পরিণামে তাহাদের একান্ত রূপে বিনষ্টি ঘটে না। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাহাদের হয়ত লাভ করিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহারা হৃদয়ের গভীরতল আশ্রয় করিয়া জীবনে গূঢ় রস সঞ্চার করিয়া তাহাকে আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি দান করে। অতীত জীবন এই রূপে অক্ষয় হইয়া নিত্য নূতন উপলব্ধির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

কেবল তাহাই নয়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে একপ্রকার অস্পষ্টতা থাকে, কতকটা চঞ্চল, চিত্তের দাহ বিজড়িত হইয়া কতকটা লৌকিক। এই অস্পষ্ট, অস্থির, লৌকিক অনুভূতি কালে হৃদয়ের গভীর হইতে গভীরতর স্থান লাভ করিতে থাকে। গভীরতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির ক্ষেত্রে নানা বিক্রিয়া ঘটিতে থাকে। লৌকিক অনুভূতির তীব্রতা হ্রাস পাইয়া তাহা করুণ-কোমল অপরূপ শ্রী লাভ করিতে থাকে। লৌকিক অনুভূতি এইরূপে গভীরতা ও প্রসারতার ভিতর দিয়া এমন এক আশ্চর্য্য পরিণাম লাভ করে, যাহাকে আর লৌকিক কোন অনুভূতির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। তাহা সকল সুখ-দুঃখ বোধের উর্দ্ধতর এক পরম শান্ত পরিণাম। ঝিনুকের বক্ষের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট বালুকণা দুঃসহ বেদনার সৃষ্টি করে, কিন্তু কালে ঝিনুক তাহাকে লালন করিতে করিতে জয় করিয়া উঠে। বক্ষের উত্তাপ, বিচিত্র রস ক্ষরণের ভিতর দিয়া সেই বালুকণা একদিন দুর্লভ মুক্তায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। মানুষের জীবনেও একথা সত্য। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সঞ্চয় কালে রূপান্তরিত হইয়া এক ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে। সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে জীবন সায়াহ্নে আহরণ করিতে হয়, স্মৃতির দুর্লভ রত্ন-কণা।

"দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্ত্তি তারে দিব নানা মতো
আপনার মনে মনে।" (অতীতের ছায়া)

ব্যক্তি জীবনে সৃষ্টির এই রহস্য যদি সত্য হয়, তবে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কেও একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথ সে কথাও বলিয়াছেন। বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে রূপ-রস-গন্ধ-ধ্বনি হারাইয়া যাইতেছে, তাহাদের একান্ত রূপে যে বিনষ্টি ঘটিতেছে না এমনি একটি গভীর অধ্যাত্ম বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কোন-না-কোন স্বরূপে কোথাও-না-কোথাও তাহাদের অস্তিত্ব থাকিয়া যাইতেছে। কেবল তাহাই নহে, বিশ্বের নব নব রূপ-রস-গন্ধ-ধ্বনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীতের এই সকল সম্পদ কোন দুর্জ্ঞেয় নিয়মে নিগূঢ় প্রেরণা সঞ্চারের ভিতর দিয়া নিয়তই আত্ম প্রকাশ করিতেছে।

"বর্ত্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন;

অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল-মাঝে তারি ফল শস্য ফলিছে নিয়ত।" (অতীতের ছায়া)

এক্ষেত্রে 'প্রভাত সঙ্গীতে'র 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি স্মরণে পড়িতে পারে। সেক্ষেত্রে কতকটা বিশিষ্ট হইলেও এই জাতীয় উপলব্ধিরই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে এই সত্যটিকেই নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে মহান জীবনে বিচিত্র ভাবের এবং আরোও গভীরে একটি অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ধীর বিকাশ ও পরিণাম ধারা থাকে। যেখানে তাহা ঘটে না, সেখানে তাহা যে সত্য নয়, কিংবা গভীরতর কোন সত্য পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মানুষ আসে যায়। এই সংসারে যে যাহার আপন আপন কর্ম্ম সমাধা করিয়া তাহারপর একে একে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই আসা ও যাওয়ার যদ কোন অর্থ থাকে, তবে এই সমগ্র জীবন লইয়া যিনি লীলা করিতেছেন তাহা একমাত্র তাঁহারই নিকট পরিস্ফুট। এইটুকু একপ্রকার বোধ করিতে পারা যায় যে বিশ্ব মহাকবি রচিত কোন মহানাটককে মানুষ নিত্যকাল ধরিয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

"যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
নাট্যগত অর্থ কোনোরূপ, বিশ্ব মহাকবি কাছে
প্রকাশিত।" (নাট্যশেষ)

জীবন ও জগতের এই মায়ার স্বরূপ উপলব্ধিই এই কবিতার মূল ভাব প্রেরণা নয়। যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া চলমান মানব-যাত্রীর যে ছায়াছবি আবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে, মহাকবি তাহারই একটি মুহূর্ত্তকে দেশ-কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাব্যে অমরতা দান করেন। কালে একদিন যাহা বিস্মৃতির তলে বিলীন হইয়া যাইত, তাহা এমনিভাবে কবির কাব্য আশ্রয় করিযা আনন্দের সঞ্চয় হইয়া বিরাজ করে। কবির পরবর্ত্তী জীবনে সৃষ্টি সম্পর্কে যে স্মৃতি তত্ত্বের বারংবার প্রকাশ লক্ষ্য করি, বর্ত্তমান কবিতাটি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

জীবনে প্রেমে অনির্ব্বচনীয়তার প্রকাশ ঘটে। সেই বোধে দেশ-কালের সীমা-রেখা জীবনের পরিধি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। অজানা এক অধীরতায়

নিত্য জাগরণ। অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভরা জীবনের অক্ষয় সে বোধ। সেই বোধে ব্যক্তির আনন্দ-বেদনা বিশ্বের আনন্দ-বেদনায় পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। কে জীবন পাত্রকে এমনি করিয়া অপরূপ মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দেয় কে-ই বা তাহা আবার নিঃশেষ করিয়া দেয়। কিন্তু অনির্ব্বচনীয় এই উপলব্ধি অক্ষয় স্মৃতি রূপে অন্তরে রহিয়া যায়। এই স্মৃতিই কবির জীবনে বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করে।

> "সে ভাঙ্গা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
> ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
> সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে
> অন্ধকার ভিত্তি পটে ; ঐক্য তার বিশ্ব শিল্প সাথে।" (নাট্যশেষ)

নর-নারীর প্রেমে এই মর্ত্ত্যে অন্তহীন রূপ-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। অনির্ব্বচনীয পুলকের আবেশ, অনির্ব্বচনীয় মুগ্ধতা। কিন্তু এই উপলব্ধিই জীবনের শেষ নয়, জীবনের ভিন্নতর উন্নততর পরিণাম আছে। এই উন্নততর পরিণামের সহিত মানবিক প্রেমের স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই ; বরং ওই পরিণাম লাভের জন্য মানবিক এই বোধের অনিবার্য্য প্রয়োজনীযতা আছে। মানুষকে এই মানবিক বোধের ভিতর দিযাই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে নয়। তাহা মানবিক বোধেরই সম্পূর্ণতা। একটিকে পরিহার করিয়া আর একটিকে লাভ নয়, একটির ধীর পূর্ণতার ভিতর দিয়া আর একটির মধ্যে সম্পূর্ণতা।

প্রেমে যে সৌন্দর্য্য-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তাহা যতই অপূর্ব্ব হোক, তাহা বিশ্বের পরিপূর্ণ সুষমা নয় ; বরং এই সুষমা-লোকটি ভাঙ্গিয়া গিয়া সুন্দর ও অসুন্দর ভাগকে একান্ত করিয়া এবং ওই সুন্দর-লোকটির দ্বারা আবার অসুন্দর ভাগকে আচ্ছাদিত করিয়া এক অখণ্ড নির্দ্বন্দ্ব রূপ-লোক সৃষ্টি করে। ইহা পূর্ণ সুষমা-লোক নহে। এই পূর্ণ সুষমা-লোকে রূপ-বিরূপ, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণ্য আশ্চর্য্য ভাবে সামঞ্জস্য লাভ করে।

প্রেম খণ্ড সুষমা-লোক হইতে পরিণামে নর নারীকে অখণ্ড সুষমা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। প্রেমের সেই সৌন্দর্য্য-লোক প্রাণ-মনের সীমার দ্বারা সীমিত। অধ্যাত্মবোধে এই খণ্ডিত সৌন্দর্য্য-লোক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে হারাইয়া যায়।

প্রেমের অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধির কথা কত না ভাবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সে-মুহূর্ত্ত বাঁশির গানের মতো ;
অসীমতা তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত।
সে-মুহূর্ত্ত উৎসের মতন ;
একটি সঙ্কীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সবকিছু দান।" (দুজন)

কিন্তু প্রেম এই সুষমার ভিতর দিয়া পরিণামে আর এক সুষমার আভাস দান করে। "সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।" প্রেমে পরিণামে যে অনির্দ্দেশ্য ব্যাকুলতা, যে অশ্রু উদ্বেলতা তাহার মূলে আছে এই অপরিতৃপ্তি।

"বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলন লিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে।" (দুজন)

বিচ্ছেদে বা বিযোগে বাহিরের রূপ হারাইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা অন্তরে একান্ত শূন্যতার সৃষ্টি করে না, যাহার ছিদ্রপথ দিয়া প্রাণ দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই বিরহের ভিতর দিয়া বাহিরের রূপই অন্তরে ফিরিয়া আসে। অন্তরের মধ্যে এই যে প্রাপ্তি তাহাতে ওই রূপের রূপান্তরীকরণ ঘটে। ওই রূপ তাহাতে অপরূপ মহিমায় ফুটিয়া উঠে। তাহা এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও রহস্য বিজড়িত হইয়া যায়। তাহা একান্ত নিকটের হইযাও একান্ত দূরের, অপ্রাপণীয়। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্যের মাঝখানে তাহার করুণ অতি লঘু হস্তের স্পর্শ লাভ করি, অভিমান অশ্রু-ধারা রূপে গলিয়া গলিযা পড়ে। জাগরণে সেই মূর্ত্তি দূরে আকাশ নীলিমায় তাহার স্থির সজল দুটি চক্ষু মেলিযা ভাসিতে থাকে। অন্তরের মধ্যে এইরূপে আর একটি যে জগৎ সৃষ্টি হইযা যায়, সেখানে সেই নারী মূর্ত্তির সহিত পুরুষের বিচিত্র লীলা চলে। পরিবর্ত্তনশীল রূপ-লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই অন্তর্লোকটি অসীমের বক্ষে বিরাজ করে। বাহিরে বিচিত্র কর্ম্ম-ধারা বিচিত্র স্রোত-ধারা রূপে ওই রূপ-লোকটিকে বেষ্টন করিয়া বহিয়া যায়, সেখানে কত পরিবর্ত্তন, কত ভাঙ্গা-গড়া, কত উত্থান-পতন, দিন-রাত্রির কত কক্ষাবর্ত্তন। সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ধ্যানের জগতে কেবল দুটি সত্তার চিরন্তন বিরহ মিলন লীলা।

"তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা
আমি হীন চিত্ত মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।"

একই বিশ্ব ভিন্ন চেতনা-পর্য্যায়ে ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হয়। প্রাণের প্রথম জাগরণে বিশ্বের যে সুষমা-লোকের প্রকাশ ঘটে, সেই যে অপর এক সত্তার প্রকাশ তাহাকে তিনি এ ক্ষেত্রে 'তুমি' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'তুমি' যেন কিশোরী নারী, যাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের অপরিস্ফুট প্রকাশ। এই 'তুমি' যৌবনে প্রাণের পূর্ণ প্রকাশে অপরূপ সৌন্দর্য্যময়তা প্রাপ্ত হয়, যেন পূর্ণ লাবণ্যময়ী তরুণী; অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে তখন সুষমা আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি লাভ করে। পরিশেষে এই চেতনা এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে, সেই সঙ্গে বিশ্ব এমন একটি অখণ্ড সুষমা প্রাপ্ত হইয়াছে, যেখানে 'তুমি' বিশ্বের সকল রূপের মিলিত প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। তখন বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে তাহারই স্পর্শ লাভ করিতে পারা যায়, তাহারই আভাস ফুটিয়া উঠে।

"চিরন্ন পথখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।" (কৈশোরিকা)

এই অপর সত্তা বা 'তুমি' তাহা বিশ্ব-সত্তারই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, তাহাকে তিনি 'অসীমের দূতী' বলিয়াছেন। অর্থাৎ বিশ্বের বিচিত্র খণ্ড সৌন্দর্য্যকে আশ্রয় করিয়া তিনি এই অখণ্ড রূপেরই শুধু আভাস লাভ করেন নাই, এই সত্তা তাঁহার চেতনাকে নানা ভাবে অসীম বা অরূপের স্পর্শ দান করিয়াছে, অসীমের বিচিত্র অলৌকিক দান ভার।

"অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন-ফুল মালা
অপূর্ব্ব গৌরবে।" (কৈশোরিকা)

এই আভাস রূপে লব্ধ পূর্ণ সুষমা-লোকটিকে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে অপরোক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষাও এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। 'মানসী' 'সোনার তরী' 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে কবির এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র প্রকাশ আমরা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি।

"প্রতি দিবসেব সংসাব মাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে মর্ত্ত্যভূমি
তার আবরণ খসে পড়ে যদি কভু,
তখন তোমাব মুবতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ কবিবে আপন অমরাবতী
সকল কালেব বিবহেব মহাকাশে।" (কৈশোবিকা)

এই অখণ্ড সত্তা কবির জীবনে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী রূপে প্রতিভাত হইলেও এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যোগে কবির জীবনে তাহার বিচিত্র লীলা সঙ্ঘটিত হইলেও তাহা নানা রূপে আত্ম প্রকাশ করিতে পারে এবং অনুরূপ কারণের জন্য স্বাভাবিক ভাবে সেই সব ক্ষেত্রে তাহার যোগের লীলা ভিন্ন স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

"তাহারি বেদনা কত কীর্ত্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অসংখ্যরূপে
পুরুষেব ইতিহাসে।" (কৈশোরিকা)

এই ভাবের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে তিনি বারংবার দান করিয়াছেন। নারী শুধু বিধাতার সৃষ্টি নয়, পুরুষেরও সৃষ্টি। পুরুষ তাহার সৌন্দর্য্য-ধ্যান দিয়া নারীকে বিচিত্র রূপে সৃষ্টি করে। নারী-রূপ বেষ্টন করিয়া পুরুষের এই যে নিত্য নবীন সৌন্দর্য্য কল্পনা, কবি বা শিল্পী এই ধ্যানকেই তো বাহিরে নানা সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন। এই অন্তহীন নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের পরিচয় লাভ করিয়া নারীর বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। একান্ত সাধারণ, বিশিষ্ট কয়েকটি রেখা-বন্ধনের মধ্যে যাহার পরিচয় নিঃশেষিত তাহার মধ্যে এ কোন্ দুর্লভতার প্রকাশ।

কিন্তু পুরুষের এই ঐশ্বর্য্যের দানকে আরো অধিক করিয়া নারী যে আবার পুরুষকেই ফিরাইয়া দেয়, এই ভাবটি এক্ষেত্রে নূতন। নারীর এই প্রত্যর্পণ কি, না, এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানই পুরুষকে আরো উন্নততর লোকে, রসের মুক্তি-লোকে ধীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এই ধীর পরিণতির ভিতর দিয়া পুরুষের প্রাণ-মন কি বিচিত্র দুর্লভ ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া যায় না?

"প্রিয় হাত হতে পর পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে কর তুমি আরবার
দানের মাল্য দান।

নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
কবিয়া মূল্যবান।" (প্রত্যর্পণ)

সকল সীমা বা রূপ অসীম বা অরূপের যোগে সত্য। কেবল তাহাই নয়, সেই অসীম বা অরূপই দেশ-কালের মধ্যে সীমা রূপে প্রকাশিত। অসীম কেমন করিয়া সীমা-রূপ লাভ করিলেন? ইহাই মায়া, ব্যাখ্যাতীত। এই সীমা বা রূপের মধ্যে অসীম বা অরূপের পূর্ণ মহিমা ও বিস্ময়বোধের প্রকাশ।

মানবীর মধ্যে বিশ্ব-রূপিণীর সাক্ষাৎকার তখনই ঘটে যখন প্রেমে মানবীয় চেতনা বিশ্ব-চেতনায় পরিণাম লাভ করে। ওই সীমা তখন মুহূর্তে অসীমে পরিণত হইয়া যায়। তখন বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে ওই অরূপ মাধুরীর লীলা প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া উঠে।

"অধরে তোমার বীণাপানি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝঙ্কার।" (শ্যামলা)

রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় উপলব্ধির পরিচয় আমরা বারংবার লাভ করিয়াছি।

সৌন্দর্য্যবোধ কি, না যাহা সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, (ইহার নানা পরিণাম আছে। এই পরিণাম নির্ভর করে ধ্যান-তন্ময়তার গভীরতার উপর।) যাহা প্রতি-ভাসকে ছাড়াইয়া গভীরতর সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট করায়। সীমা বা রূপ কবিকে অসীম বা অরূপের আভাস দান করিয়াছে, তাই তো তাহা অমন সুন্দর, পরম বিস্ময় বিজড়িত।

প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই কেবল নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবি-চেতনার এই এক পরিণাম ঘটিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং নারীর প্রেম একাকার হইয়া গিয়াছে।

"শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—
ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্ব্বাক মুখখানি।" (শ্যামলা

শ্রাবণের ঘন নীলিমা ভরা অপরাজিতার সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবির মর্ম্মে ধ্বনিত হয় "দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর।" সেই এক সুর ধ্বনিত হয় যখন কবি ওই নির্ব্বাক মুখখানির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন।

অপরাজিতা ফুল এবং নির্ব্বাক মুখ উভয়েই কবি-চিত্তে একই দূর-লোকের আভাস দান করিয়াছে; অর্থাৎ সৌন্দর্য্য প্রকৃতির হোক, অথবা মানবীর হোক, উহার ধ্যান-তন্ময়তার ভিতর দিয়া কবি উন্নততর সৌন্দর্য্য ও প্রেমের, বৃহত্তর সুষমার (যে পূর্ণ সুষমায় প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য্য বিধৃত হইয়া আছে) আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই মানব প্রেমই কবির নিকট পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের মধ্যে প্রেমে এই যে প্রাপ্তি তাহাতে জীবনের সকল অভাব পূর্ণ হইযা যায়। মর্ত্ত্য-লোকে এই অমৃত আস্বাদ করিয়া মানুষ অমরতা লাভ করে।

মানুষ এই সত্যটিকে কোন একটি উপায়ে লাভ করিতে পারিতেছে না বলিয়া অন্তরের এই নিত্য শূন্যতার পীড়া জয় করিয়া উঠিবার জন্য বাহিরে বস্তুর পর বস্তু সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, বস্তু সঞ্চয়ের ক্ষমতাকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে, তাহার জন্য দ্বন্দ্ব সঞ্জাত বিরোধ বিক্ষোভের অন্ত নাই। এই প্রেম যখন জাগে তখন বোধ করিতে পারা যায় যে এতদিন একমাত্র ইহারই জন্য অন্তর তৃষিত হইয়াছিল। এই উপলব্ধিতে বাহিরের আর সমস্ত কিছু নিরর্থক হইয়া যায়।

"তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণ পুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।" (অন্তরতম)

এই জীবন ও জগৎ, সীমা ও অসীম, মুক্তি ও বন্ধনের এক অপরূপ আশ্চর্য্য প্রকাশ। তাহা একদিকে সীমা বা বন্ধন, তাহা না হইলে রূপের প্রকাশ ঘটে না, আর একদিকে মুক্ত বা অসীম, তাহা না হইলে অনন্তের প্রকাশ হয় না। কবির কাব্যের মধ্যে এই একই প্রকাশ রহস্য। তাহা একদিকে সীমিত, বাণী-বদ্ধ, অন্যদিকে ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে সীমাকে অতিক্রম করিয়া

যাইতেছে। কাব্যের ব্যঞ্জনা (শিল্প শাস্ত্রে যাহা বর্ণিকাভঙ্গ) সীমা ও অসীমের মধ্যে সংযোগ সেতু স্বরূপ।

"বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে উঠে মর্ত্ত্যের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গনের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তা'রি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।" (মাটিতে-আলোতে)

এই প্রেমের আলোকে জীবন ও জগতের মাধুর্য্য তাঁহার নিকট অন্তহীন হইয়া ধরা পড়িয়াছে। নারীর যে রূপকে তিনি তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় দেখা রূপ নয়। ঈশ্বর যে প্রেমে এই সীমা-রূপ চিত্রিত করিয়াছেন, সকল রূপের মধ্যে তাঁহার যে প্রেম ব্যক্ত সেই এক প্রেমের আলোকে তি'নি রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সে রূপ তাই অনন্ত বিস্ময় রসে পরিপূর্ণ। তাহা নিত্য নূতন, অনির্ব্বচনীয়।

"তোমার যে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে ;
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর" (মাটিতে-আলোতে)

বিশ্বের সকল রূপ, মর্ত্ত্যের তৃণ-পুষ্প হইতে অন্তহীন নক্ষত্র-লোক পর্য্যন্ত এই সমস্ত কিছুই এক একটি বিশিষ্ট স্পন্দন। এক অনাদ্যন্ত মহা স্পন্দন-সমুদ্রের বক্ষে অন্তহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পন্দনের বিচি বিক্ষেপ। একবার জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

সঙ্গীতের স্পন্দনের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনা সেই নির্ব্বিশেষ স্পন্দন-লোকের সহিত পরিণামে যোগ যুক্ত হইয়া যায়। সেই স্পন্দন-উৎস হইতে মর্ত্ত্য-লোকে

নিত্যকাল ধরিয়া অন্তহীন রূপ বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহারই জন্য সেই পরিণাম লাভে মানব মন বিশ্বের সকল রূপের সহিত অনির্ব্বচনীয় মিলন বোধ করে।

"অনাদি বীণায় বাজে যে-রাগিণী গভীরে গভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দাম ধারায়,
জন্ম মরণরে দোলে ছন্দ দেয় হাসি ক্রন্দনের,
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহ-বন্ধনের
পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধা হীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে—" (গীতচ্ছবি)

সুর সৃষ্টি সম্পর্কেই কেবল যে একথা সত্য তাহা নহে, কবির কাব্য সম্পর্কেও একথা সত্য। কাব্যের রূপ-ধ্যান ছন্দের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া বিশ্ব-স্পন্দনের সহিত মিলিত হইয়া যায় বলিয়া ওই রূপের আভাস বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া এক অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়।

রূপ তাহা নারীরই হোক, অথবা প্রকৃতিরই হোক, তাহার যথার্থ প্রকাশ আমাদের দৃষ্টিতে কোন ক্রমেই ঘটে না। রূপের সম্পূর্ণ প্রকাশ তখনই ঘটে যখন চেতনার মধ্যে অন্তহীন সুদূরতা থাকে। সকল সীমার বোধ মুক্ত হইয়া এই যে রূপ সাক্ষাৎকার, তাহাকেই বলা হইয়াছে অনন্তের পটভূমিকায় রূপ বা সীমাকে সাক্ষাৎ করা। অন্তহীন প্রাণ-সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ, নিশ্চল কৃষ্ণ পটভূমিকায় একটি বুদ্বুদের মতো, একটি চকিত বিদ্যুচ্চমকের মত সে রূপ একবার জাগিয়া উঠিয়া হারাইয়া যায়। রূপের এই বিস্ময়ের কা পার আছে। এই সাক্ষাৎকারে প্রত্যেকটি রূপ আপন বৈশিষ্ট্যে অন্তহীন বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়। এই অন্তহীন বিস্ময় লইয়া তাহা অনন্য।

"নিত্যের চিত্তের পটে ক্ষণিকের চিত্র গেনু দেখি
আশ্চর্য্য সে-লেখা।
সে তুলির রেখা
যুগ যুগান্তর-মাঝে একবার দেখা দিল নিজে,
জানিনে তাহার পরে কী যে।" (দুইসখী)।

'মাটি' কবিতাটির মধ্যে জীবন ও জগতের 'মায়া'-রূপটি সম্পূর্ণ রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

আমার চেতনার দ্বারা সীমিত এই যে আমার বোধ, আমি-রূপে যাহার প্রকাশ, আর আমার একান্ত আপনার এই যে বাসভূমি, যাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আমার এত দীর্ঘ দিনের এত ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়াছে, মৃত্যুতে আমার সকল বোধ লইয়া যখন আমি অনস্তিত্ব হইয়া যাইব তখন এই মাটিতে তাহার রেখা মাত্র কোথাও থাকিবে না। কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে মানুষ এইখানে এই মাটিতে সংসার পাতিয়াছে, কত বিচিত্র জীবন লীলা সমাপন করিয়া মৃত্যুতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে। এই মাটিতে তাহাদের চিহ্নমাত্রও কোথাও নাই। আজিকার মানব যাত্রীও তেমনি কাল নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এখানে তেমনি করিয়া শ্যামল তৃণের প্রকাশ ঘটিবে, তেমনি করিয়া আকাশ ছায়ারৌদ্র লইয়া ইহার বক্ষে খেলা করিবে তেমনি করিয়া ষড় ঋতু তাহার অন্তহীন দানভার লইয়া পর্য্যায়ক্রমে ধরিত্রীর প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইবে।

"আসে যায়
ঋতুর পর্য্যায়,
আবর্ত্তিত অন্তহীন
রাত্রি আর দিন;
মেঘ-রৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে
আদিকাল হতে।" (মাটি)

সেখানে

"হায় আমি
হায়রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া, উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই রবে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তার পরে
এই ধূলি রবে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল তরে।" (মাটি)

কিন্তু এই মায়ার স্বরূপ উপলব্ধিরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। চিরকালের জন্য আমি অনস্তিত্ব হইতে পারি, কিন্তু মানব যাত্রীর তো শেষ নেই। বৎসরে বৎসরে

এই ঋতু, এই আলো-ছায়া তাহাদের আহ্বান করিয়া লইবে, এই মাটির কোলে তাহাদের নিত্য নূতন করিয়া সংসার লীলা চলিবে, ভালোবাসার কত-না অনুভূতি। আর এই অন্তহীন রূপ-লোক তাহাদের মুগ্ধ দৃষ্টিতে কী রূপের অঞ্জন না লাগাইয়া দিবে।—কত-না-স্বপ্নের জাল।

'সত্যরূপ' কবিতাটির মধ্যে কবি যাঁহাকে 'তুমি' রূপে সম্বোধন করিয়াছেন এক্ষেত্রে তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান কবিতায় তাহা গৌণ-দিক। কবি তাঁহার এই তুমির উপলব্ধি বঞ্চিত এবং তুমির উপলব্ধি ধন্য এই দুটি জীবনের পরিচয় এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া দান করিয়াছেন।

'তুমি'র উপলব্ধি বঞ্চিত অবস্থায় কবির নিকট এই জীবন ও জগৎ একান্ত অর্থহীন, শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিদারুণ ভারমাত্র। এখানে মানুষের পরিচয় একান্ত ক্ষুদ্র, কতকগুলি জাগতিক প্রয়াসের মধ্যে নিঃশেষিত। এই সত্তায় মানুষ বিশ্ব-প্রবাহে নিয়ত চঞ্চল, উৎক্ষিপ্ত, আশ্রয় শূন্য।

"মায়ার আবর্ত্ত রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সংসারে।"

তুমির স্পর্শে কবির চেতনা যখন উদ্দীপ্ত তখন এই ব্যক্তি-সত্তার এক দুর্লভ মহিমা ফুটিয়া উঠে।

গণনাতীত রূপ সমন্বিত অপার বিস্ময় পরিপূর্ণ এই যে সীমা-লোক, একটি ব্যক্তি-সত্তার মধ্যেও সেই অসীম বিস্ময়ের প্রকাশ। বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এক চেতনাই সংখ্যাতীত ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে প্রকাশমান। সেই কারণে সেই এক আদি চেতনার সহিত যোগে ব্যক্তি-সত্তা বিশ্বের সকল সত্তার সহিত পরমাশ্চর্য্য মিলন বোধ করিতে পারে।

সীমা অসীমের আনন্দ-রূপের, প্রেমের প্রকাশ। মানুষ যখন সেই আনন্দরূপের সেই প্রেমের সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বের সকল রূপের সহিত মিলন বোধ করে তখন ব্যক্তি-সত্তা একদিকে অসীমের সহিত যুক্ত হইয়া যেমন মুক্তি বোধ করে তেমনি অন্যদিকে বিচিত্র সীমার সহিত মিলন বোধের ভিতর দিয়া অসীমের আনন্দ ও প্রেমকেই উপলব্ধি করে। বিশ্বের সকল সত্তার মত ব্যক্তি-সত্তারও একদিকে অসীম,

অন্যদিকে সীমা, একদিকে মুক্তি আর একদিকে বন্ধন। ব্যক্তি-সত্তায় এই দুই ওতপ্রোত হইয়া আছে।

"— বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি' নিজ সীমা
আপন দেউটি।
সৃষ্টির প্রাঙ্গন তলে চেতনার দীপশ্রেণী মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে;
সেই তো বাখানে,
অনির্ব্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।" (সত্যরূপ)

সকল রূপকে আশ্রয় করিয়া রূপের অতীত একটি সত্তা কোন-না কোন স্বরূপে আছেই। এই অতীত সত্তা আছে বলিয়া তাহারই যোগে আমরা সকল রূপকে উপলব্ধি করিতে পারি। সেই অতীত সত্তাটিকে লাভ করিতে পারিলে স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বের সকল রূপের সহিত মিলন ঘটে। তেমনি বিশ্বের অগণিত নর-নারীর অন্তরে যে ভাব-লোক তাহা ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে পৃথক হইলেও তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া একটি সীমাহীন ভাব-লোক আছে। এই জন্য তাহা যেমন সংযোগ শূন্য হইয়া অন্তহীন বৈচিত্র্যে নিরর্থকতার মধ্যে হারাইয়া যায় না, তেমনি একমাত্র তাহারই যোগে বিশ্বের সংখ্যাতীত ভাব-বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাহা না হইলে অন্য সত্তা আমাদের সম্পূর্ণ অননুভূত রহিয়া যাইত। এই যে সকল রূপের এবং সকল ভাবের অতীত সত্তা, তাহা সকল অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। বিশিষ্ট রূপ বা ভাব অনুধ্যানের ভিতর দিয়া মানবীয় সত্তা এই সকল দেশ-কাল ব্যাপ্ত নির্ব্বিশেষ রূপ বা ভাব-লোকটিকে লাভ করিতে পারে।

সার্থক রূপ বা ভাবের তাই দুটি দিক আছে, তাহা একদিকে নির্ব্বিশেষ পরিণামের সহিত যুক্ত, ইহা রূপ বা ভাবের মুক্তির দিক, অন্যদিকে আকার বদ্ধ।

কবির কাব্যে যে রূপ ও ভাবের অনুধ্যান তাহা যদি ওই নির্ব্বিশেষ পরিণাম লাভ করিয়া থাকে, তবে সকল দেশের সকল কালের পাঠক চিত্তের রূপ ও ভাবের

অনুধ্যানের সহিত তাহার গূঢ় মিল থাকিবেই। এই উপলব্ধিটিকেই তিনি 'পাঠিকা' কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

কবির কাব্য পাঠের ভিতর দিয়া প্রাণের, সৌন্দর্য্য-লোকের সেই প্রথম নিগূঢ় সঞ্চার, একটি অনির্দ্দেশ্য বেদনাবোধ।

"নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বল।" (পাঠিকা)

কবির কাব্যে যে রূপের, ধ্যানতাহারই তন্ময়তার ভিতর দিয়া সেই রূপের সহিত একপ্রকার একাত্মতা ঘটে। কেবল তাহাই নয়, এই একাত্মতা বোধের ভিতর দিয়া চেতনা পরিণামে সেই নির্ব্বিশেষ রূপকে লাভ করিতে পারে বলিয়া আমি-রূপের সহিতও তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কবি-প্রিয়ার যাহা মুক্তির দিক তাহার সহিত সকল যুগের প্রিয়ার মিল আছে।

"ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতি মাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি। (পাঠিকা)

কবির প্রিয়ার ধ্যান এই রূপে সকল যুগের প্রিয়ার ধ্যানে, কবির কণ্ঠের মালিকা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের বিচিত্র অর্ঘ্য এইরূপে সকল যুগের প্রিয়ার অর্ঘ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

"জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যে সে-ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
তোমার মালা এল আমার গলে।" (পাঠিকা)

অসীম যখন আপনাকে সীমিত করিলেন, তখনই দেশ-কালের, অন্তহীন রূপ-লোকের সৃষ্টি হইল, মাধুর্য্য তখনই নিঃসীম হইয়া উঠিল, দিকে দিকে কী অনির্ব্বচনীয়তার আভাসই না ফুটিয়া উঠিল। প্রেম মানেই অসম্পূর্ণতা, এই অসম্পূর্ণতায় বা প্রেমে তাঁহার এই সৃষ্টি রূপলাভ করিয়াছে।

যে সাধনা দেশ-কালের ঊর্দ্ধে কেবলমাত্র অসীম বা অরূপকেই লাভ করিতে চায়, তাহা আর যাহাই লাভ করুক-না-কেন, তাহাতে বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত এই দুর্লভ প্রেম, প্রেমে আশ্চর্য্য প্রকাশ, এই রস আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

অসম্পূর্ণতায় প্রেমে এই যে আশ্চর্য্য প্রকাশ তাহা অসীম বা অরূপ হইতে কোন অংশে ন্যূন তো নয়ই বরং মানবীয় সত্তা একমাত্র এই প্রেমের সহিত একাত্মতা বোধ করিতে পারে বলিয়া এবং তাহাতে মানবীয় সত্তা এক আশ্চর্য্য মূল্য লাভ করে বলিয়া তাহা অধিক আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া উঠিয়া যে সম্পূর্ণতার সাধনা তাহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়, মানবিক বোধের মধ্যে তাহার সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা লইয়া যে পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথ সেই পূর্ণতাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। কবির এই গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধিটি 'ভুল' কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

সকল সীমার বোধ মুক্ত, অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি মুক্ত যে সৌন্দর্য্য তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দান করিয়াছেন।

"নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপবাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।" (ভুল)

এই সৌন্দর্য্যকে আশ্রয় করিয়া মানব প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। মানব প্রেম অসম্পূর্ণ, ত্রুটি বিজড়িত বলিয়া সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে আকাঙ্ক্ষা করে যাহার মধ্যে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আছে। অসম্পূর্ণতা ছাড়া প্রেম আত্ম প্রকাশ করিতে পারে না। করুণা তত্ত্বের সহিত অসম্পূর্ণতার বোধ বিজড়িত।

"একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজ নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—

* * *

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।" (ভুল)

অদ্বৈতবাদীদের সাধনার স্বরূপ আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের সাধনা কি তাহা ও আমরা জানি। জীবন ও জগৎ, এই সীমাবোধ যে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভরা। এই মাধুর্য্যে সীমা জাগতিক অর্থ হারাইয়া পরমার্থতঃ অসীম হইয়া উঠে। সীমার প্রকাশ যে অসীমের প্রকাশ হইতে কোন অংশে ন্যূন নয় এই সত্যটিকেই তিনি

সমস্ত জীবন ধরিয়া নানা দিক হইতে নানা ভাবে উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো,
আমার বেদনাতে।" (ভুল)

এই মর্ত্ত্যেই দেবতার-আবির্ভাব ঘটে, অর্থাৎ এই মর্ত্ত্যেই মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়। সেই অমৃতের আস্বাদ লাভ জীবনে কোন্ কোন্ অবস্থায় ঘটে কবি তাহারই পরিচয় দান করিয়াছেন 'দেবতা' কবিতাটির মধ্যে।

অমৃতের আস্বাদ মানুষ তখনই লাভ করে যখন ব্যক্তি-চেতনা সীমার সকল আবেষ্টনী মুক্ত হইয়া বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-লীলার ক্ষেত্রে আপনাকে পরিব্যাপ্ত দেখে, সে-প্রাণ তৃণ-কণা হইতে দূরতম জ্যোতিষ্ক-লোক পর্য্যন্ত প্রসারিত। কবি আপনার জীবনে এই পরিণাম কত বারবার লাভ করিয়াছেন।—সেই উপলব্ধিরই নূতন প্রকাশ।

"মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝঙ্কৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য আজানা;" (দেবতা)

মর্ত্ত্যের নারীকে আশ্রয় করিয়া মানব-অন্তরে যখন প্রেম জাগে তখন মানুষ যে অনির্ব্বচনীয়তার আস্বাদ পায় তাহাই অমৃতের আস্বাদ। প্রেমের স্পর্শে বিশ্বের সকল অন্তর্লীন মাধুর্য্যের প্রকাশ ঘটে। প্রেমে সীমার সকল বোধ লুপ্ত হইয়া যায়।

মানুষ যখন অন্যায়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দারুণতম শেল বিদ্ধ করে, তাহার জন্য হাসি মুখে সকল দুঃসহ দুঃখ ও নির্য্যাতনকে বরণ করিয়া লয়, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে ইতস্তত করে না তখনই মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়। মানুষ আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া আপনার অসীমতা, অমৃতরূপকে প্রকাশ করে।

সীমার সকল বন্ধন-মুক্ত চেতনার মহান প্রসারের উপলব্ধির পরিচয় কবি 'শেষ' কবিতাটির মধ্যেও দান করিয়াছেন।

"বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা,
ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্ত্তের আবর্জ্জনা,
লয়ে প্রীতি,
লয়ে সুখ স্মৃতি,

আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া
এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।" (শেষ)

দেহ-মুক্ত চেতনার সেই অলৌকিক উপলব্ধি—

"ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদি তারা সম
এ চৈতন্য মম।" (শেষ)

দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর সত্তায় এই জীবন ও জগৎ যে এই স্বরূপে প্রতিভাত হইবে না একথা সত্য ; সেদিন কি এত বড় সত্য মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে? এই জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের বোধ সীমার। এই সীমার বোধ দিয়া তাহার যে স্বরূপ উপলব্ধি করি, অসীমের দিক হইতে নিশ্চয়ই তাহা ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হইবে। সে কোন্ স্বরূপে তাহা কে জানে।

"যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সব কিছু অন্য এক অর্থে দেখি,
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি।" (জাগরণ)

অদ্বৈতবাদীদের মতে এই জগৎ এক অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ। ইহাই মায়া। মর্ত্ত্য-চেতনায় এই জগৎ ও জীবনকে যে সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা আপেক্ষিক সত্য মাত্র। দেশ-কালের বোধ বা সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে এই জীবন ও জগৎ তাহার সকল অর্থ সমেত ছায়া হইয়া কোথায় হারাইয়া যায়। যদি এই উপলব্ধি সত্য হয়, তাহা হইলে সমগ্র জীবনের উপলব্ধ সত্য যেখানে মিথ্যা হইয়া যায়, সেখানে তাহার সত্যতার প্রমাণ কি? তাহা কাহার সাপেক্ষে সত্য?

মহাকাল প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্তিকা ও আকাশ-পটে কত অপরূপ ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আবার আপন হস্তে নির্ম্মমভাবে তাহা মুছিয়া দিতেছেন। তাহার এই আঁকা ও মোছার বিরাম নাই। প্রাণ-স্রোতে ভাসমান ইহা যেন অন্তহীন রূপের প্রদীপ, জ্বলিতেছে নিভিতেছে। যেন মহাকবির কাব্যের এক একটি

বিচ্ছিন্ন শ্লোক। আশ্চর্য্য, অপরূপ রূপের আভাস জাগাইয়া কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। রূপ প্রতি মুহূর্ত্তে সরিয়া যাইতেছে, হারাইয়া যাইতেছে, নিয়ত প্রসারতা লাভ করিতেছে বলিয়া অরূপের আনন্দ নিত্য সঞ্জীবিত হইয়া আছে। রূপ স্থির হইলে অরূপের আনন্দ মুহূর্ত্তে বন্ধ্যা হইয়া যাইত।

সৃষ্টির এই তত্ত্বকে জীবনেও সত্য করিয়া তুলিতে হয়, নহিলে আসক্তি মানুষকে বাঁধে। মানুষের জীবনে তাহা ঘোর বিনষ্টি ঘটায়। এই অন্তহীন অমৃত-ধারাকে আমরা 'আমি'র (দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট সত্তা) পাত্র ভরিয়া আকণ্ঠ পান করিতে পারি মাত্র। 'আমি'র বা অহঙ্কারের একমাত্র সার্থকতা এইখানে। অর্থাৎ এই অহঙ্কারের দ্বারা নির্ব্বিশেষকে বিশেষ করিয়া তুলিতে পারি বলিয়া আমরা একটি বিশেষ আনন্দ পাই। ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু অহঙ্কার যখন তাহাকে আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে চায় তখন জীবনে দুঃখ নিঃসীম হইয়া উঠে।

"মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়ো তারে অকাতরে অনায়াসে।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার;
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি। (ক্ষণিক)

দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রাণের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই অহেতুক আনন্দ অফুরন্ত সৃষ্টি-রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। এই মহাপ্রাণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বের সকল রূপ নিত্য ক্ষয়ের ভিতর দিয়া চির নবীন হইয়া বিরাজ করিতেছে।

মানুষের প্রাণও যতদিন বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত যুক্ত থাকে ততদিন মহান অস্তিত্বের যোগে সে আপন অস্তিত্বের উপলব্ধি করে। এই পরম অস্তিত্বের উপলব্ধিই মহান আনন্দের। যখন ব্যক্তি-সত্তা বিশ্বের প্রাণ-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে, তখনই একক সত্তার ভার তাহাকে নিয়ত ক্লিষ্ট করিতে থাকে, নিঃশেষিত প্রাণের জন্য জরা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত বলিয়া তুচ্ছ তৃণ অমর হইয়া আছে, আর মানুষের অহঙ্কারের দ্বারা সৃষ্ট, প্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া প্রবলতম প্রতাপ, কীর্ত্তি-সৌধ কালে কতই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

"নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে।
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখ
কেন চারিধারে।
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক না উৎসুক
খুলে রাখো অনিমেষ চোখ;
ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে,
যাহা পাও টেনে লও তীরে
ঝিমুক শামুক যাই হোক।" (প্রাণের ডাক)

প্রাণ-সমুদ্রে সন্তরণ করিয়া প্রাণের বিচিত্র আঘাত সহিবার যে সামর্থ্য তাহা কবির জীবনে আর নাই। এখন কেবল প্রাণ-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহারই বিচিত্র লীলা সাক্ষাৎ করা। এখন কেবল অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া থাকা।

মহৎ স্রষ্টার জীবন আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় রূপ লাভ করে। এই উপলব্ধি যখন তাহার জীবনে সত্য হয়, তখন বাহিরের কোন নিন্দা, কোন ক্ষতি, কোন প্রলোভন, নির্ম্মমতম বঞ্চনা-প্রবঞ্চনাও তাহাকে আর বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। অচঞ্চল দীপ-শিখার মত তাঁহার চেতনা দিব্য-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার এই সৃষ্টি ঈশ্বরীয় সৃষ্টির অনুরূপ। অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন তাঁহার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন; এই প্রকাশেই, এই সাক্ষাৎকারেই তাঁহার আনন্দ, ইহার অধিক কোন ফল লাভ তাঁহার নাই; স্রষ্টা মানুষও তেমনি তাঁহার অন্তরের ধ্যান-রূপকে বাহিরে বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশই তাঁহার আনন্দ। ইহার অতিরিক্ত কোন ফল লাভ তাঁহার জীবনে থাকিতে পারে না।

"জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।" (রূপকার)

পত্রপুট

'পত্রপুটে'র মধ্যে কবির কাব্য-প্রতিভা কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন।

কবি-প্রতিভার বর্ত্তমান পরিণাম বুঝিতে একাদশ সংখ্যক-কবিতাটি বিশেষ সহায়তা করে। বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত কবির প্রাণ যত গভীর করিয়া মিলিত হইয়াছে, মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেম কবির নিকট ততই অপার মহিমা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আজ কবির সত্তা বিশ্ব-সত্তা হইতে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে বিশ্ব-প্রকৃতি কবির নিকট একান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির সেই লজ্জা বিনম্রা নববধূর মত আবেগ কম্পিত আশ্চর্য্য মোহিনী মূর্ত্তি কোথায়? সেই সৌন্দর্য্য, যাহাকে আশ্রয় করিয়া কবি ধ্যানে রূপ হইতে রূপান্তরে রসলোক হইতে রসলোকে অভিসার করিয়া ফিরিয়াছেন? অলৌকিক সৌন্দর্য্য-পাথারে কবির পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণ দেহ-ভেলায় সৌন্দর্য্য-সাগর পাড়ি দিবার দিন, সেই মানসী-সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালী-কল্পনার দিন বুঝি একেবারেই অতীত হইয়া গিয়াছে। কবির সে কী ঈর্ষা বিজড়িত অভিযোগ!

"আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে,
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই,
নেই সেই নীরব ঝঙ্কার।"

এই নির্ম্মম ঔদাসীন্য তো প্রকৃতির নয়। কবির অন্তরের রিক্ততা প্রকৃতিকে অমন রিক্ত করিয়া দিয়াছে। এই রিক্ততা বোধের দার্শনিক কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম যে সত্তার বিচ্ছিন্নতা বোধ। কবি আরও বলিতেছেন—

"আজ তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব।"

সৌন্দর্য্যবোধের অর্থই হইল সামঞ্জস্য বা সুষমা। ব্যক্তি-চেতনার সহিত বিশ্ব-চেতনার সামঞ্জস্য যত গভীর করিয়া সাধিত হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধও ততই বাড়িয়া যায়।

আদিতে মনে হয় এই জগৎ যেন অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ সামঞ্জস্য শূন্য একটা অন্ধ আবর্ত্তন মাত্র। তাহার পর বিশ্বের সহিত যোগ যত গভীর করিয়া অনুভূত হইতে থাকে, সামঞ্জস্য বোধটিও তত বাড়িয়া যায়। আমরা আমাদের ভালোলাগার বিশিষ্ট কতকগুলি সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রথমে একটি রূপদানের বা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করি। সামঞ্জস্যবোধের বৃদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সামগ্রীও বাড়িয়া যায়। বিশ্ব-চেতনা লাভে মানবীয় চেতনা পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে। অর্থাৎ বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্য কঠোর-কোমল, রূঢ়-ললিত সমস্ত কিছু যে এক পরম সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। আজ বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সুষমা নাই, সেখানে—"আলোছায়ার মৈত্রী বিহীন দ্বন্দ্ব" তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, যে বিশ্বের সহিত কবি-চেতনার যোগ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ব-প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে সংখ্যাতীত রূপ ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে, যেন সৌন্দর্য্যের এক একটি ফুল, ফুটিয়া আবার ঝরিয়া পড়িতেছে। পশ্চাতে প্রাণের (মৃত্যুর?) কৃষ্ণ-নীল মহাসমুদ্রের নিথর সীমাহীন বিস্তার, তাহারই বক্ষে রূপের পদ্ম একটির পর একটি দল বিস্তার করিয়া পরিপূর্ণ মাধুর্য্যের ভরে টলমল করিতেছে, সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। তাহার পর একটির পর একটি দল ঝরাইয়া দিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। রূপের প্রকাশ এত অপরূপ অথচ এত ক্ষণিক! এমনি অন্তহীন রূপের সৃষ্টি ও বিনষ্টি অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে।

মহাপ্রাণের বুকে রূপ লীলার এই অন্তহীন বিস্ময়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। ওই বিস্ময় বিমুগ্ধতায় তাঁহার অন্তরের সকল দার্শনিক জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ,—

"ফোটে না ফুল

বহে না কল মুখরা নির্ঝরিণী।"

অর্থাৎ প্রাণের বুকে রূপের সে লীলা তো নাই।

আজ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য ও প্রেম আস্বাদের দিন কবির জীবনে একান্ত গত হইয়াছে। আজ শুধু অতীতের স্মৃতিমাত্র সম্বল।

> "আমি বাস করি
> তোমার ভাঙ্গা ঐশ্বর্য্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
> আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
> কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।"

বিশ্বের সকল রূপ আপাত দৃষ্টিতে শৃঙ্খলাহীন, যোগসূত্র বিরহিত, সামঞ্জস্য শূন্য বলিয়া বোধ হয়। এই দেখা ইন্দ্রিয়ের দেখা। এমনি ক্রমিক উন্নততর চেতনায় দেখা আছে ; প্রাণে দেখা, মনে দেখা, ধ্যানে দেখা, অতীন্দ্রিয় বোধে দেখা। চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে মানুষ ততই রূপকে অনুবিদ্ধ করিয়া ক্রমাগত গভীরে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, ততই আপাত বিরোধের, বৈপরীত্যের মধ্যে সে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়। কবি বা স্রষ্টার অন্তরে এক একটি দিব্য আবিষ্ট মুহূর্ত্তে কতকগুলি আপাত বিরোধ ও বৈপরীত্য মিলাইয়া এক একটি অখণ্ড রূপ ভাসিয়া উঠে। এই দেখার সম্পূর্ণতা সেইখানেই যেখানে এই বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য এক অখণ্ড বোধে পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যায়।

আজ বিশ্বের সকল রূপ এমনি খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেন কোন রূপসীর মনি-মুক্তা খচিত কঙ্কন আকস্মিক আঘাতে ভাঙ্গিয়া রেণু রেণু হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কুড়াইয়া এক করিয়া লইতে পারা যায় না।

জাগতিক বোধে জগৎ ও জীবনের সামঞ্জস্যবোধ যত উর্দ্ধে উঠিতে পারে রবীন্দ্র-কাব্যে সেই সর্ব্বাধিক সামঞ্জস্য বোধের পরিচয় আমরা পাইয়াছি ; কিন্তু ওই বোধ ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ না করিয়া এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন, তাহার একটি কারণও আমরা ইতিপূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি।

দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে একস্থলে কবি আপনার জীবনের এই পরিণতিকে একটু পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (ইতিপূর্ব্বে ইহার নানা রূপ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।) তাহা এই যে জীবন ও জগতের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় আজ কবির পক্ষে তাঁহাকে দূর হইতে দেখা সম্ভব হইয়াছে।

"সান্ধ্য হল দুই তীর নিয়ে
ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।
ছোটো ছোটো আবর্ত্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্ত প্রবাহে ভেসে যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।
সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে
রাত্রের অন্ধকারে।"

ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের বিক্ষোভ যখন শান্ত হইয়া আসে তখন সেই ধ্যান-তন্ময় অন্তরে জীবন ও জগতের সার্থক রূপটি ফুটিয়া উঠে।

পরিণত বয়সে এই চাঞ্চল্য দূর হইতে কবির পক্ষে তাই এই জগৎ ও জীবনকে তাহার স্বরূপে তাহার সম্পূর্ণতায় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাণচাঞ্চল্যে, বিক্ষুব্ধ মানসে রূপ তাহার স্বাভাবিকতা হারায়। সূর্য্যের সার্থক প্রতিবিম্ব পড়ে নিস্তরঙ্গ জল বিস্তারে।

তৃতীয় সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে আজ পৃথিবীর সমগ্র বৈচিত্র্য একটি অখণ্ড স্বরূপে কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই। বৈচিত্র্যগুলি অসংলগ্ন ভাবে কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। ইহারই উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছিলাম। পৃথিবী ললিতে-কঠোরে মধুরে-ভীষণে এক অপূর্ব্ব প্রকাশ। একথা সত্য, কিন্তু আজ পৃথিবী বন্দনায় তাহার সকল বৈচিত্র্য বিজড়িত একক এই অপূর্ব্ব প্রকাশটি ধরা পড়ে নাই।

অনন্ত বৈপরীত্য, বৈচিত্র্য লইয়া পৃথিবী আজ কবির নিকট এক অপরিজ্ঞাত লোক। সমগ্র বন্দনার মধ্যে তাই একপ্রকার অপরিচয়ের ভীতি, বিস্ময় বিহ্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

অন্তরে যে সামঞ্জস্য বোধ থাকিলে বিশ্বের সামঞ্জস্য তত্ত্বটির সাক্ষাৎ লাভ ঘটে, সেই সামঞ্জস্য বোধ আজ নাই বলিয়া বিশ্বের সুষমা-লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ তাই তাহার বিচিত্র ধাতু একান্ত হইয়া দৃষ্টি বিদ্ধ করে।

মর্ত্ত্য-বন্দনা কবির জীবনে এই প্রথম নয়, বরং অনেক পুরাতন। সেই সকল ক্ষেত্রে ধরিত্রী কবির দৃষ্টিতে পূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পূর্ণ সুষমা ধরা পড়ে তখনই যখন কবি-চিত্ত বিশ্ব-চিত্তের সহিত যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

মর্ত্ত্য পরিপূর্ণ সুষমা লইয়া প্রকাশ পাইলেও 'সোনারতরী','চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যেও কবির সামঞ্জস্য বোধ সম্পূর্ণ নয়। তাহা বিশ্ব-মূর্ত্তি নয় এই কারণে যে সে সাক্ষাৎকারে মর্ত্ত্যের ভীষণ, কঠোর, ভয়ঙ্কর, অতি নির্ম্মম দিকটির কোন পরিচয় নাই। সেই অপরূপ রূপ সাক্ষাৎকার, যাহা সকল সুন্দর-অসুন্দরের মিলিত অলৌকিক প্রকাশ। বিশ্বের কেবল সৌন্দর্য্য-ভাগটিকেই কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে এক-প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিযাছেন। ইহার পরিচয় লাভ করিতে পত্রপুটের দ্বাদশ সংখ্যক কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড় তলিতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।"

বিশ্ব-সত্তা লাভের পূর্ণ উপলব্ধির আস্বাদ বঞ্চিত হইয়া কবি পরিণত বয়সে গভীর বেদনা বোধ করিতেন, এক মর্ম্ম নিপীড়ন কারী হাহাকার, তীব্র জ্বালাময়ী ক্ষোভ।

"মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডব আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।"

এই অসম্পূর্ণতা বোধ কবির জীবনে ইতিপূর্ব্বেই দেখা দিয়াছে। বলাকার মধ্যে এই অসম্পূর্ণতাবোধের প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাহার পর হইতে এই বোধ ক্রমাগত গভীর হইয়াছে।

ভারতীয় মোক্ষ সাধনা জন্ম মৃত্যুর বারংবার আবর্ত্তনের উর্দ্ধে যে পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছে, সেই নির্ব্বাণ মুক্তি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য নয়। পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি-সত্তা যখন দিব্য-সত্তার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ লাভ করে, রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহাই মুক্তি,-মুক্ত স্বরূপে লীলা। ব্যক্তি-সত্তার ধীর বিকাশ ঘটে আবার বিশ্বের যোগে। বিশ্ব-সত্তা লাভে ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ প্রকাশ।

এই রূপে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি সাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও দিব্য-সত্তা একটি একতান সূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনার এই স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যক্তি যতদিন না বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে, অর্থাৎ ব্যক্তির প্রকাশ যতদিন না সম্পূর্ণ হয় ততদিন দিব্য-সত্তা লাভের যে মূল অভিপ্রায় অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার, এইরূপে জগতের পূর্ণ রূপান্তর সাধনের যে লক্ষ্য তাহা সাধিত হইতে পারে না।

কবি বিশ্ব-সত্তায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে কেন অসমর্থ হইয়া ছিলেন, তাহার কারণ তিনি স্বয়ং পরবর্ত্তী কাব্যগুলির মধ্যে নানা ভাবে দান করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বাপর ইহার একটি ধারা নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। কারণ কবির অধ্যাত্ম জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে ইহা একটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ পরিবর্ত্তন অধ্যায়।

বিশ্ব-সত্তার যে স্বরূপের পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি, বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভাগের মিলিত প্রকাশ। তাহা যথার্থ বিশ্ব-সত্তা নহে। বিশ্ব-সত্তায় রূপ-বিরূপের, পাপ-পুণ্যের, আলো-অন্ধকারের আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটে। তাহাতে পরিণামে এই দ্বৈতবোধটাই লুপ্ত হইয়া যায়। সাধনার যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশ্বের একমাত্র সৌন্দর্য্য ভাগটিই একান্ত হইয়া কবির জীবনে পূর্ণ পরিণতি লাভের পথে মহৎ অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন-না-কোন স্বরূপে এই অসামর্থ্যের বীজ নিহিত আছে।

পত্রপুটের মধ্যে কতকগুলি তত্ত্বকে কবি যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এখন তাহাদের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

সুরের স্পন্দন আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির প্রাণ-স্পন্দন কেমন করিয়া বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দনে একাকার হইয়া যায় এবং এই পরিণামের মধ্যেই যে সঙ্গীতের সার্থকতা সে পরিচয় নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে কবি দান করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে সঙ্গীতের এই সামর্থ্যের দিকটির সুন্দর একটি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

> "শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
> যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
> সরোবরের অপরূপ প্রকাশ।"

যে কবিতাটি হইতে অংশটি উদ্ধৃত করিলাম, সেক্ষেত্রে সুরের এই স্পন্দনে রূপ-ধ্যানটিও বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। ধ্যান-লোকে সৌন্দর্য্যের তাহা এক বিশিষ্ট মানস-সম্ভোগ। এই সম্ভোগে 'আমি' ও 'তুমি'র পৃথক বোধটি থাকিয়া যায়।

"অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদু মৃদু
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ধীরে ধীরে।"

একটি ধ্যান যেন সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হইতে চায়। কোন্ অনাদি কাল হইতে সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া, নিত্য রূপান্তরের ভিতর দিয়া এই সৃষ্টি গিয়াছে কোন্ অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে একটি সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য। কোন একটি চেতনায় নিশ্চয়ই অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ বিধৃত হইয়া আছে এবং সেই চেতনায় নিশ্চয়ই সম্পূর্ণতার একটি ধ্যান রহিয়াছে। যে চেতনায় অনন্ত দেশ-কাল বিধৃত, সেই চেতনাই বা কি, তাঁহার যে ধ্যান বাহিরে সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হইতে চায় সেই ধ্যানই বা কি?

"এই দেহহীন সঙ্কল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
সে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
সে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।"

একটি ধ্যান ঈশ্বরের অন্তরে সম্পূর্ণ হইয়া আছে। নিখিল বিসৃষ্টির ভিতর দিয়া সেই ধ্যান ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে।

সেই পূর্ণতার উপলব্ধি না থাকিলেও এ সম্পর্কে কবি নিঃসংশয় যে নিখিল বিশ্বের এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে একটি শাশ্বত নিয়ম আছে। এই পরিবর্ত্তন কেবল পরিবর্ত্তন মাত্র নহে, ইহার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি ধারা আছে। এই অভিব্যক্তি আবার অন্তহীন নহে, তাহার একটি পরিণাম বা পরিণতি আছে, এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে রহিয়াছে এক চিরস্থির চেতনার লীলা।

মর্ত্ত্য-লোকে আমাদের সকল প্রয়াস, সকল অনুভূতি যেন এক স্বপ্ন সঞ্চরণ মাত্র। মানুষ যখন মনেরও ঊর্দ্ধে সকল সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠে তখন এই স্বপ্ন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যায়।

সীমা বোধের মধ্যে আমরা যতদিন থাকি ততদিন ভয়ের অন্ত থাকে না। সীমার বোধ ছাড়াইয়া যখন অসীমের বোধে পরম স্থিতি লাভ করিতে পারি তখন এই সমস্ত ভয় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সীমার বোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভয় থাকে,

কারণ মৃত্যুতে এই সীমা একান্ত রূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। অসীমের দিক হইতে সীমাকে দেখিলে ভয় থাকে না, কারণ বিনষ্টির ভয় লুপ্ত হইয়া যায়।

"দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো তুলে ধরো,
ছায়া যাক মিলিয়ে,
থেমে যাক ওর বুকের কাঁপন।"

সৌন্দর্য্য-সাক্ষাৎকার এবং তাহার অনুধ্যান কবির চেতনাকে ক্রমে কেমন বিশ্ব-চেতনার সহিত একাত্ম করিয়া দেয় তাহার পরিচয় আমরা সর্ব্বত্র পাইয়াছি। বর্ত্তমান কাব্যেও তাহার কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ করে।"

কবির জীবনে এই উন্নততর চেতনা লাভের মুহূর্ত্ত বারংবার আসিয়াছে। পরমের স্পর্শ লাভ যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তবে ওই সকল আবিষ্ট মুহূর্ত্তে বলিয়া কবি তাহাদের আশ্রয় করিয়া এমনি নানা রূপ-কল্পনা করিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ের রক্ত পদ্মের বীজ, কাল আপনার সূত্রে তাহাদের একে একে গ্রথিত করিয়া মাল্যরূপে পরম দেবতার কণ্ঠে দুলাইয়া দিবে। কবির জীবনে কেবল ওই মুহূর্ত্তগুলি অমর। ওই সকল মুহূর্ত্তে কবি মৃত্যুর যবনিকা ছিন্ন করিয়া অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন।

ব্যক্তির লীলায় রহিয়াছে একটি অশাশ্বত সত্তা, তাহা জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিত্য নূতন রূপ লাভ করিতেছে। আর একটি শাশ্বত সত্তা, সকল জন্ম সকল রূপ লাভের ভিতর দিয়া যাহার চকিত স্পর্শ লাভ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাস, যে এই ক্ষণিক রূপেরও একটি অবিচ্ছিন্ন চিরন্তন ধারা আছে, আবার এই ক্ষণিক রূপ আশ্রয় করিয়া দিব্য-উপলব্ধির একটি ধারা আছে, শাশ্বত-চেতনার চিরস্থির প্রকাশ তো আছেই। রবীন্দ্রনাথের নিকট এই ত্রিধারাই সত্য, ক্ষণ, পরম ক্ষণ, শাশ্বত চেতনা। একটি জীব-সত্তা, দ্বিতীয়টি অধ্যাত্ম-সত্তা, তৃতীয়টি দিব্য-সত্তা।

"এই রস নিমগ্ন মুহূর্ত্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্ত পদ্মের বীজ;
এই দিয়ে বিধাতার দরবারে গাঁথা চলেছে একটি মালা
আমার চিরজীবনের খুশির মালা।"

একদিকে অন্তহীন রূপের লীলা, অন্যদিকে আমির প্রকাশ। যে অনন্ত প্রাণের যোগে এই রূপ সত্য, সেই একই প্রাণের যোগে আমিও সত্য। অসীম প্রাণের একদিকে অসংখ্য রূপের মধ্যে 'আছে'-রূপে প্রকাশ, সেই একই প্রাণের যোগে 'আমি'র 'আছি'-রূপে অস্তিত্ব বোধ।

ব্যক্তিকে বিশ্ব-প্রাণের যোগে অনন্ত রূপের সহিত মিলাইয়া তাহারই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ রূপে যখন দেখি তখন বিস্ময় বোধের আর সীমা পাওয়া যায় না। এই বিস্ময় বোধের প্রেরণা রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্ট একটি প্রেরণা।

"অপূর্ব্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেদিন আমি ছিলেম জগতে
বলতে পেরেছিলাম
আশ্চর্য্য।"

উন্নততর চেতনা লাভের গোপন প্রেরণা সকল কালের নর-নারীর মধ্যে আছে। ব্যষ্টির ব্যাকুলতার মধ্যে তাই সমষ্টির ব্যাকুলতার একটি আধ্যাত্মিক স্বাধর্ম্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

এই বোধ আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তায় একাত্মতা লাভ করিয়া আপনাকে অসীম দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত দেখে। এই বোধ তাই অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সকল কালের নর-নারীর সাধারণ বোধ। এই বোধে আর পৃথক বোধ থাকে না।

"সেদিনকার বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয় বন্দনার তান,
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
সে নিয়ো তোমার অর্দ্ধ নিমীলিত চোখের পাতায়,
তোমার দীর্ঘ নিশ্বাসে।"

যে ব্যাকুলতা কবি সেদিন বোধ করিয়াছিলেন, সেই ব্যাকুলতাকে তিনি একালের নর-নারীর অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চান। সে ব্যাকুলতা যে সকল কালেই সত্য। যেমন করিয়া হোক, যে বোধ আশ্রয় করিয়া তাহা ঘটুক না কেন, এই আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে এই ব্যাকুলতা বোধ জাগিবেই। এই ব্যাকুলতাকে মর্ত্ত্যের কোন সম্পদের দ্বারা লুপ্ত করিয়া দিতে পারা যায় না।

মানুষের একটি বোধ সীমার আর একটি চিরন্তন ভাবের বোধ। মৃত্যুতে এই সীমার বোধ লুপ্ত হয়, কিন্তু এই ভাব-লোকটি থাকিয়া যায়। সীমার বোধে বিশ্বের

নরনারী আপনাদের পৃথক পৃথক বোধ করে, কিন্তু ভাব-লোকের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বোধটি লুপ্ত হইয়া যায়, কালের ব্যবধানও থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য কেবল তো ব্যক্তি-সত্তার পরিচয় বহন করে না। তাহা ধীরে ধীরে চেতনাকে ব্যক্তির সীমা ছাড়াইয়া সকল কালের নর-নারীর নির্ব্বিশেষ ভাব-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

"সেদিনকার ব্যথা
অকারণে বাজবে তোমার বুকে,
মনে বুঝবে, সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে,
নিখিল যৌবনের রঙ্গ ভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ওপারে।"

এবং

"যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।"

বিশ্ব-মন বলিতে বিশ্বের সকল মানব মনের মিলিত প্রকাশ বুঝায় না। বিশ্ব-মন বিশ্বের সম্মিলিত মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণ করিয়া অনন্ত প্রসারিত। সম্মিলিত মানব মন বিশ্ব-মনকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিয়া চলিয়াছে। ব্যক্তি মনে যাহার প্রকাশ নাই তাহার প্রকাশ আছে সম্মিলিত মানব-মনে, সম্মিলিত মানব-মনে যাহার প্রকাশ নাই, তাহার প্রকাশ আছে বিশ্ব-মানব মনে।

বিশ্বের এমনি একটি চিরন্তন ভাব-লোক আছে। বিশ্বের সম্মিলিত ভাবনা-লোক (সকল অতীত সমেত) এই চিরন্তন ভাব-লোকটিকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিতেছে। ব্যক্তির ভাবনার সহিত বিশ্বের সম্মিলিত ভাবনার যেমন যোগ আছে, ইহার সহিত আবার বিশ্ব-ভাবনা-লোকের নিগূঢ় যোগ আছে। বিশ্ব ভাবনা তাহার সহিত যুক্ত করিয়া বিশ্ব-মানবের সম্মিলিত ভাবনার যোগ আছে বলিয়া ব্যক্তির ভাবনা ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে পৃথক হইয়াও অন্তহীন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হারাইয়া পরস্পরের উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে না।

ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনার ক্ষেত্রে যাঁহারা বাঁচেন তাঁহাদের জীবনের পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র মৃত্যুতে তাহা একান্ত রূপে হারাইয়া যায়। যাঁহারা বিশ্বের সম্মিলিত ভাবনার ক্ষেত্রে বাঁচেন, অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে বিশ্বের সকল অতীত বর্ত্তমানের ভাবনার মিলিত প্রকাশ ঘটে, তাঁহাদের জীবনের পরিধি যে বহু দূর বিস্তৃত তাহাতে সংশয় নাই।

বিশ্বের সকল নর-নারীর অন্তরে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। বিশ্বের সকল নর-নারী আপন আপন ভাবনার প্রতিরূপ তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পান। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আছেন, যাঁহাদের চেতনা অতীত-বর্ত্তমানের ভাবনা-লোককেও অতিক্রম করিয়া যায়। তাঁহারা সেই বোধের মধ্যে জন্ম লাভ করেন, যেখানে সকল অতীত-বর্ত্তমানভ-বিষ্যতের ভাবনার পূর্ণ প্রকাশটি রহিয়াছে। সেই প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহারই মধ্যে থাকিয়া সমগ্র মানবীয় চেতনা আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

পত্রপুটের মধ্যে দুটি কবিতা আছে, যাহাদের মধ্যে কবি স্বয়ং আপনার কাব্য-প্রবাহের তিনটি ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনার কাব্য-সাধনা সম্পর্কে কবির নিজস্ব অভিমত এই প্রসঙ্গে বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

কবির কাব্যের প্রথম ধারা,—

"যারা এসেছে ইতিহাসেব মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।"

কিংবা

"মর্ত্ত্যলোকে যার আবির্ভাব
মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে উদ্ধাব কববার জন্যে
দুর্দ্দাম উদ্যমে।"

রবীন্দ্র-কাব্যের দ্বিতীয় ধারা,

"এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণ-লীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদি যুগের।"

অন্যত্র

"আমি বললেম, দুই না চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তবে।"

তৃতীয় ধারা,—

"এরা ধরেছে সুন্দরকে, বস্তুর অতীতকে,
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।"

অথবা

"সে এসেছে অপরিসীম ধ্যান-রূপে
আমার সর্ব্ব দেহ মনে
পূর্ণতর করেছে আমাকে আমার বাণীকে
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের গভীর শিখা।"

রবীন্দ্র-কাব্যে রহিয়াছে মহামানব বন্দনা, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান এবং উন্নততর চেতনা-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য এই তিনটি ধারা একটি কোন গভীরতর অধ্যাত্ম প্রেরণা পুষ্ট। সেই উৎস প্রবাহটিকে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যানের পশ্চাতে যে প্রেরণা তাহা যে উন্নততর জগতের আভাস লাভের আকাঙ্ক্ষা জাত তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে নানাভাবে লাভ করিয়াছি। কবি মুখ্যতঃ এই দুই পথ আশ্রয় করিয়া উন্নততর জগতের আভাস লাভ করিয়াছেন, সুতরাং শেষ দুই ধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র এই রূপে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

ইহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, মানুষ যখন উন্নততর চেতনা লাভ করে তখন সে আপনারই অসীম ব্যাপ্তিবোধে মৃত্যুভীতি জয় করিয়া উঠে। মহামানবের অমরতার উপলব্ধি সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধ আশ্রয় করিয়াও জীবনে ঘটিতে পারে।

যেমন করিয়াই হোক মানুষকে একটি শাশ্বত-সত্তার উপলব্ধি করিতেই হইবে, তাহা সৌন্দর্য্য ও প্রেম বোধ আশ্রয় করিয়া হোক, অথবা অন্য নানা রূপে আত্মত্যাগের প্রবল প্রেরণায়। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ এই তিনটি ধারা আশ্রয় করিয়া এক পরিণাম লাভ করিয়াছেন। এই পরিণাম লাভে মানুষের মৃত্যুভয় ঘুচিয়া যায়, সে হয় অমৃতের অধিকারী। এই খানেই মানুষের স[illegible]শেষ সার্থকতা।

শ্যামলী

কবি প্রতিভা-প্রদীপ্ত যৌবনে রূপ অথবা ভাবকে যেমন একটি পরিপূর্ণ আকার দান করিতে পারিতেন, তেমনি ওই ধ্যানের পথ ধরিয়া তিনি মাঝে মাঝে বিশ্ব-সত্তার সহিত একাত্ম হইয়া যাইতেন।

আজ একান্ত পরিণত বয়সে রূপ অথবা ভাব কোনটিই কবির চেতনায় সুস্পষ্ট আকার লাভ করিতে পারিতেছে না, সেই সঙ্গে কবি বিশ্ব-সত্তায় ওই বিশিষ্ট পরিণাম লাভ হইতেও বঞ্চিত। একটি সত্য এই সঙ্গে অনুভূত হয়, যে যেখানে ভাব বা রূপ একটি পরিপূর্ণ সুষমা লাভ করিতে পারে নাই, যেখানে মানস-লোকে ধ্যান একান্ত দুর্ব্বল এবং সেইজন্যই চেতনার ওই উত্তরণও সম্ভব হয় না। চেতনার উন্নততর পরিণামে রূপটিকে আদিতে সত্য হইতে হয়।

শ্যামলী আলোচনার প্রারম্ভে তাহারই একটি পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

"এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপসা হয়ে যাওয়া রূপ
ফিকে হয়ে যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে যাওয়া গান,
তাপ হারা স্মৃতি বিস্মৃতিব ধূপছায়া
সব নিয়ে একটি মুখ ফিরিয়ে চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটা পরা অভিমানিনী।" (বিদায় বরণ)

কবি রূপের ওই পরিণামটিকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ রূপ আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-সত্তা লাভ।

"তোমার ছবি আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই"—(বিদায় বরণ)

কিন্তু ইহা আজ আকাজ্ক্ষা মাত্রেই রহিয়া গিয়াছে। প্রাণের প্রবল প্রেরণা যেমন অন্তরে সুসম্পূর্ণ রূপ গড়িয়া তুলে তেমনি প্রাণের প্রেরণাই চেতনাকে মর্ত্ত্য-সীমার ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

আজ কবির প্রাণের অনুভূতি যে একান্ত আচ্ছন্ন, তাহা তাঁহার ওই আকারহীন, রূপহীন, ভাবশূন্য, নিরুদ্ধ, মূক একপ্রকার বেদনাবোধ হইতে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। প্রাণের যে শক্তি মানস-লোকে একটি সুস্পষ্ট রূপ ফুটাইয়া তুলে, সেই শক্তিই পরিণামে মানুষকে সকল রূপের ঊর্দ্ধের বোধে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

'আমি' বা 'বিশ্ব-আমি' দেশকালের সেই তত্ত্ব যাহাকে আশ্রয় করিয়া অসীম এই অন্তহীন বিচিত্র দেশ-কাল বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই বিশ্ব-মনের তত্ত্ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমি বা মন সেই এক বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মনের অন্তর্গত। বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মন সকল আমির মিলিত প্রকাশ নয়, সকল অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের আমি বা মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মন তাহাকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিয়া চলিয়াছে।

"মানুষের অহঙ্কার পটেই
বিশ্বকর্ম্মার বিশ্ব শিল্প।" (আমি)

অসীম যে তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া এই অন্তহীন রূপ-লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই আমি-র তত্ত্ব।

আমির তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য অফুরাণ হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রেম আর কোথাও বাধা মানিতেছে না।

"অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারে ঘটল সঙ্গম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।" (আমি)

এই নিখিল বিসৃষ্টি তাঁহার আনন্দ-রূপের প্রকাশ। তাঁহারই আনন্দ-রস সকল রূপের ভিতর দিয়া নিত্য প্রকাশ লাভ করিতেছে। এই প্রকাশের কোন অর্থ নাই।

মানুষের সৃষ্টিও তেমনি অলৌকিক, অহেতুক আনন্দ-রূপের প্রকাশ। ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকে, ব্যক্তির চেতনায় এক

পরম অস্তিত্বের মহান, গূঢ় অনুভূতি ততই জাগ্রত হয়, তাহার সৃষ্টি-প্রেরণা তত অনায়াস তত অন্তহীন হইয়া উঠে।

"আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি পাত্রে নিয়ে রঙ।" (আমি)

অদ্বৈতবাদীদের সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম্মের' মধ্যে এক স্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

"আমাদের দেশে এমন সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহং তত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীব প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জ্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জ্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্ম্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম্ম খণ্ড কর্ম্ম নয়, যাঁর কর্ম্ম বিশ্বকর্ম্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ যাঁর মধ্যে জ্ঞান শক্তি ও কর্ম্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি কর্ম্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।"

সেই কথাই তিনি বলিয়াছেন,

"তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।" (আমি)

অদ্বৈত দর্শনে সীমা ও অসীমের যে যোগ তাহা প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। তাহা দুইয়ের মিলনে এক নয়, তাহা একের মধ্যেই এক। সাঙ্খ্য দর্শন দুইয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু সেখানের মিলনও জ্ঞানের মিলন প্রেমের মিলন নয়। বৌদ্ধ দর্শনে নাম-রূপের পশ্চাতে শৃঙ্খলা স্বরূপ 'বিজ্ঞান' নামক এক নিদানের স্বীকৃতি আছে; কিন্তু সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান সমেত সমগ্র নাম-রূপই অবিদ্যা (ভ্রান্তজ্ঞান বা অজ্ঞান) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহার উর্দ্ধে কোন ধ্রুব সত্তা নাই। নাম-রূপের উর্দ্ধের অবস্থাকে তাই একমাত্র শূন্যতা আখ্যা দেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ সীমা ও অসীমের চূড়ান্ত অস্তিত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে যে যোগ তাহা প্রেমের যোগ। প্রেমে পৃথকত্ব স্বীকার করিয়াও মিলিত হইতে পারা যায়।

অদ্বৈত ও সাঙ্খ্য দর্শনের উপলব্ধির পশ্চাতে যে অসম্পূর্ণতা তাহার পরিচয় দান করিয়া তিনি আপনার উপলব্ধিকে প্রসঙ্গত উপস্থাপিত করিয়া একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন।

"ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত তাহলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলই আরো কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না।

* * * মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উল্‌টে যায়। প্রকাশের একটি উল্‌টো পিঠ আছে, সে হচ্ছে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে ওঠার মধ্যে দুটো জিনিস থাকাই চাই—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উল্‌টো পিঠেই চোখ রাখে, বলে সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না; বলে, জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি এ-সমস্তই 'না'; তা হলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো ক'রে, ভয়ঙ্কর ক'রে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর, অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু শুদ্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই; আর যিনি কেবলমাত্র আছেন তিনি স্থির, ওই প্রলয় রূপিণী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই; এখানে যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।" (জাপানযাত্রী)

এই প্রেমের যোগ না থাকিবার জন্য সাঙ্খ্যের পুরুষ এবং অদ্বৈত দর্শনের ব্রহ্মের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যতার স্বরূপের দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তিনি অদ্বৈত দর্শনকে এই কারণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দর্শন বলিয়া উল্লেখ করিতে লেশমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। স্থায়ী কোন অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতি দুইই এই কারণে সমার্থক হইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তের সমষ্টিমাত্র রূপে প্রকাশ এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনশীল অন্তঃ ও বহির্জগৎকে আমরা উপলব্ধিই করিতে পারিতাম না, যদি না ইহাদের পশ্চাতে স্থায়ী কোন সত্তার অধিষ্ঠান থাকিত। বৌদ্ধদর্শন ইহাকেই বলেন বিজ্ঞান।

রবীন্দ্র-দর্শনে অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মের স্বীকৃতি আছে. আবার সীমার ভিতর দিয়া তিনিই আপনাকে ধীরে পরিণাম সূত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়া সীমারও স্বীকৃতি আছে। সীমার মধ্যে অসীমের এই যে প্রকাশ তাহা তাঁহার আনন্দ বা লীলা। রবীন্দ্র-দর্শনে এইরূপে আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির সহিত বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তির পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে।

জাগতিক অর্থে রূপের সীমা থাকিলেও পরমার্থত রূপেরও সীমা নাই। রূপ নিয়ত বিকাশ ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া, বিদীর্ণ, বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত ও রূপান্তরিত হইয়া অসীমকেই প্রকাশ করিতেছে। এত ভাবে এত করিয়াও সে অসীমকে সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না তাহার নিয়ত অস্থিরতার ভিতর দিয়া সে আপনার অসামর্থ্যকেই প্রকাশ করিতেছে, অসীমকেই অফুরাণ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

"ইহারা অন্তহীন গতিদ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দ্দেশ কবিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চবম আশ্রয় চরম আনন্দ।" (রূপ ও অরূপ)

"—সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সাবি সারি দাঁড়াইয়া পথরোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি।" (রূপ ও অরূপ)

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৩২১ সালে। সেই সংস্করণ খানিই অধুনা প্রচলিত। এই সময়ে অর্থাৎ ১৩২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'আমার জগৎ' নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধটিকে সমগ্র 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থখানির একপ্রকার প্রত্যুত্তর বলা যাইতে পারে। জিজ্ঞাসার মধ্যে অদ্বৈতদর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

জগতের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা গুলির মধ্যে বলা হইয়াছে যে সুখ ও দুঃখ, সুন্দর ও অসুন্দর, পাপ ও পুণ্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল এখানে আশ্চর্য্যভাবে সমন্বয় লাভ করিয়াছে। অভিব্যক্তিবাদীদের যে যুক্তি অর্থাৎ জগতে দুঃখ, অসুন্দর, পাপ ও অমঙ্গলের ভাগ ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া সুখ, সৌন্দর্য্য, পুণ্য ও মঙ্গলের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহা সত্য নহে ; এবং অধর্ম্ম, অমঙ্গল, পাপ ও অসুন্দর ভাগই যে জগতে বেশি এবং এই জন্য জীবন ও জগৎ যে স্বরূপত দুঃখময় ইহা সপ্রমাণ করিবার একপ্রকার প্রবণতা সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাস কি ছিল তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে সীমা ও অসীমের স্বরূপ সম্পর্কিত উপলব্ধির পার্থক্য। উভয়ের যোগের যে রহস্যের সন্ধান অদ্বৈতবাদীরা লাভ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ সেই যোগের রহস্যের সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে এই স্থির বিশ্বাস গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছিল।

অদ্বৈত দর্শনে সৃষ্টির স্বরূপ ব্যাখ্যায় মনের রহস্যভেদের কোন চেষ্টা নাই। একই দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত কিছুকে বিচার করিবার চেষ্টায় জীবন ও জগৎ স্বাভাবিক ভাবে তাই অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে তাঁহার বিচারের কিছু কিছু অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"আমার মন ইন্দ্রিব যোগে ঘন দেশেব জিনিসকে একরকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিসকে অন্য বকম দেখে, দ্রুত কালেব গতিতে এক বকম দেখে, মন্দ কালের গতিতে অন্যরকম দেখে—এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা।" (আমাব জগৎ)

"দেশ-কালের বৈচিত্র্যেব মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি।" (আমার জগৎ)

"অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল, সেই দিকেই রূপ-রস-গন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই প্রকাশ। * * *

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারে ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্য আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তা হলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সঙ্কুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতা তিনি ত্যাগ করেন নি।" (আমার জগৎ)

"আমার এক কোটিতে অন্ত আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত আমি আমার ব্যক্ত আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত আমি আমার অব্যক্ত আমির যোগে সত্য।

* * * অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহঙ্কার। সোঽহমস্মি। সেখানে তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার

আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেই জন্যই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে।" (আমার জগৎ)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপ ফুলকে যে-আয়তনে দেখছি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে সে আয়তনে দেখি নে। আকাশকে আরও অনেক বেশী আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে গোলাপের পরমাণু পুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগল মিলনের নৃত্য লীলা রূপে দেখতে পারি, সে আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ সে-আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়, এই আকাশেই। তাই পরম সত্যকে উপনিষদ বলেছেন : তদেজতি তন্নৈজতি, একই কালে তিনি চলেন ও তিনি চলেনও না।

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে কাব্যের মাত্রা, আর একটি অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। বিশ্ব-সৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশ-কালের মাত্রা অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবামাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়। এই বিশ্বছন্দের মাত্রাকে আমরা আরও গভীর করে দেখতে পারি; তাহলে চরম বিশ্বকবির ইচ্ছা শক্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হবে। মাত্রা সেখানে মাত্রার অতীতের মধ্যে; সীমার বৈচিত্র্য সেখানে অসীমের লীলা অর্থে প্রকাশ পায়।" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)

আমি আছি সত্য, কিন্তু আমার অস্তিত্ব বা চেতনার সহিত অন্বিত করিয়া বাহিরের যে বিরাট জগৎ তাহার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। বাহিরের অস্তিত্ব ছাড়াও অনুভূতি লাভ ঘটিতে পরে, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম। আমিই এই দেশ-কাল সৃষ্টি করিয়াছি, দেশ-কালের মধ্যে বস্তু জগৎকে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার মধ্যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার সৃষ্টির সহিত এই বিপুল বিশ্ব জগতের যেমন সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি আমার বিনষ্টিতে দেশ-কাল সমেত এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও অনস্তিত্ব হইয়া যাইবে। কেন আমি এইরূপ করি তাহা জানি না, ইহা আমার খুশি, আমার লীলা। আমি এইরূপ করিয়া থাকি। ইহা অনির্ব্বাচনীয়, তাই মায়া।

এই 'আমার জগতের' কথা রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় 'লক্ষকোটি বোধের ভুবন'; কিন্তু অসীমের যোগে এই বৈচিত্র্য সত্য বলিয়া কোন ভুবনই আমাদের অনুভূতি বহির্ভূত হইয়া যাইতে পারিতেছে না। যে তত্ত্বে এই সকল 'আমি' বা মন বিধৃত তাহাকেই তিনি বলিয়াছেন বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মন। অসীম আমি বা বিশ্ব-মনকে আশ্রয় করিয়া অন্তহীন আমি বা মনের সৃষ্টি করিয়াছেন। সাঙ্খ্য ও বেদান্ত দর্শনে এই বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মনের কোন স্বরূপ উপলব্ধি নাই।

অসীম বা অরূপ মহাশূন্য নয়, মহামৃত্যুও নয়, তাহার মধ্য হইতেই অন্তহীন রূপ ও প্রাণের নিয়ত প্রকাশ ঘটিতেছে। এই বিরুদ্ধ তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

"শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র, আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তু ব্যাপার সেই শূন্যের সেই মহাযতির পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদ মহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলা-খেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।" (আষাঢ়)

"এই যে আমি যাহা দেখিতেছি এই যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি ; যেখানে বৃহৎ যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারই উপর দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুর নিক্কন, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।" (রোগীর নববর্ষ)

ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া যেমন, অন্তহীন রূপকে আশ্রয় করিয়া তেমনি অসীমের এই যে নিত্য লীলা চলিতেছে তাহাতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় অভিব্যক্তির দিকটি অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

"এই হৃদয়মনের বীণা যন্ত্রটি জড় যন্ত্র নয়, এ-যে প্রাণবান এই জন্যে এযে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে তা নয়, এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই ; কোথাও গিয়ে সে থামবে না ; মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন।" (আমার জগৎ)

"অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সত্তার ক্রন্দন গ্রহে নক্ষত্রে। এই সত্তা বিদ্রোহী, অসীম অব্যক্তের সঙ্গে তার নিরন্তর লড়াই। বিরাট অপ্রকাশের তুলনায় সে অতি সামান্য, কিন্তু অন্ধকারের অন্তহীন পারাবারের উপর দিয়ে ছোটো ছোটো কোটি কোটি আলোর তরী সে ভাসিয়ে দিয়েছে-দেশ-কালের বুক চিরে অতল স্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান। কিছু ডুবছে, কিছু ভাসছে তবু যাত্রার শেষ নেই।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

কোথাও এই লীলার মধ্যে অভিব্যক্তির রূপটিকে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"আজ যেন আকাশ সরস্বতী নীল পদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে। আমার মন ওই সঙ্গে সঙ্গে দুলছে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরে। আমি যেন আলোতে তৈরী, বাণীতে গড়া, বিশ্ব-পৃথিবীতে ঝঙ্কৃত, জলে

খুলে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া। আমি শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রটা কোন কাল থেকে কেবল ভেরী বাজাচ্ছে আব পৃথিবীতে তারই উত্থান পতনের সঙ্গে জীবের ই'তহাস যাত্রা চলছে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিরাটাকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্তার দুঃস্বপ্নের মতো দলে দলে এল, আবার মিলিয়ে গেল। তারপরে মানুষের ইতিহাস কবে শুরু হল প্রদোষের ক্ষীণ আলোতে, গুহা-গহ্বর অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। * * * একটি জগৎ জোড়া কল ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুলছে অন্তরীক্ষকে, যে-অন্তরীক্ষের উপর বিশ্বরচনার ভূমিকা, যে-অন্তরীক্ষকে বৈদিক ভাবত নাম দিয়েছে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুব পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত শিশুর ক্রন্দন, যে-শিশু উর্দ্ধস্বরে বিশ্বদ্বাবে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তার প্রথম ক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, 'অয়মহংভোঃ'। অসীম ভাবিকালেব দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা বারে বাবে তাকে ছিন্ন করতে হয় আবরণ, চূর্ণ করতে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার পড়ে পাওয়া জিনিস নয়, প্রতি মুহূর্তেই সেটা লড়াই কবে নেওয়া জিনিস। তাই তার কান্না এত তীব্র, আর জীবলোকে সকলেব চেয়ে তীব্র মানবসত্তাব নবজীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ কবা নবজাত আলোকের ক্রন্দনধ্বনি। তারই সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেবলোকে বাজে মঙ্গল শঙ্খ, উচ্চারিত বিশ্বপিতামহের অভিনন্দন মন্ত্র।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

অন্তহীন সীমা বৈচিত্র্য অসীমের আনন্দের প্রকাশ। পরম অস্তিত্বের আনন্দই রূপের ভিতর দিয়া নিয়ত প্রকাশ লাভ করিতেছে। এই অস্তিত্বের উপলব্ধির আনন্দ ছাড়া সৃষ্টির মধ্যে আর কোন অভিপ্রায় নাই, অর্থও নাই।

মানুষের সৃষ্টিও পরম অস্তিত্বের যোগে প্রকাশের অহেতুক আনন্দ রূপের প্রকাশ। অসীমের বক্ষে এই অচিন্তনীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ চঞ্চল রূপের প্রকাশের মধ্যে 'আমি' ও একটি প্রকাশ। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যিনি আপনাকে অন্তহীন ভাবে উৎসর্জিত করিতেছেন সেই এক সত্তা আমার চেতনাকে আশ্রয় করিয়াও নানাভাকে প্রকাশ করিতেছেন। সৃষ্টি তাই ভাবের উপকরণ দ্বারা কোন-কিছু গড়া নয়, সৃষ্টি এই অর্থে হওয়া।

সকল রূপের মধ্য দিয়া যে চেতনার বিচিত্র প্রকাশ, সেই চেতনার সহিত ব্যক্তি-চেতনাকে যত গভীর করিয়া যুক্ত করিতে পারা যায় ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি-প্রেরণা তত অন্তহীন হইয়া প্রকাশ লাভ করিতে থাকে।

"সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি নেই।

* * * গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আনন্দ নয়, কেন না সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না। একটি রূপ বিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য করে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা ; তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

*** এই খুশির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে ; একেবারে পৌঁছায় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্ব্বচনীয়।

*** সৃষ্টির অন্তরতম এই অহেতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁই ফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা খেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহ নক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত্ত একই, সেখানে সূর্য্য আর সূর্য্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝ সকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

মহাপ্রলয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার দিক হইতেও সত্য। সেদিন এত রূপ, রঙ্গ, রেখা এত রস সব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেদিন অন্তহীন মহাকাশে কেবল এক সুর-হারা শক্তির কম্পন ছুটিয়া চলিবে। সেদিন অসীমের এত প্রেম, প্রেমে এমন অন্তহীন মাধুর্য্যের প্রকাশ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কোথাও তাহার লেশমাত্র প্রকাশ থাকিবে না।

"বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
 যুগ যুগান্তর ধ'রে।'
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন-
 'কথা কও, কথা কও',
বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর'
 বলবেন 'বলো, আমি ভালোবাসি'? (আমি)

এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া কবিতাটির সমাপ্তি ঘটিলেও ইহা যে সংশয় ব্যাকুল নয়, তাহা নিঃসংশয়ে বোধ করিতে পারা যায়। তাঁহার রূপ-হারা প্রেম আবার একদিন রূপ লাভ করিবে। এমনি করিয়া কোটি কল্প কল্পান্ত ধরিয়া তাঁহার লীলা চলিতেছে ; একবার সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে, আবার সকল রূপ-হারা একাকারত্বের মধ্যে।

বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের লীলা চলিয়াছে, নানা রূপের, নানা রঙ্গের, নানা সুরের, নানা খেলার ভিতর দিয়া। নিত্যকাল ধরিয়া এক কী আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয়

প্রকাশ। মহান এক অস্তিত্বের যোগে অস্তিত্বের এক কী নিবিড় অনুভূতি, কী নিঃসঙ্কোচ, নির্ভীক প্রকাশ। এই প্রাণের লীলায় আমার প্রাণও রহিয়াছে! অনন্তকোটি রূপ-লোক, তৃণ-পুষ্প হইতে দূরতম জ্যোতিষ্ক-লোক পর্য্যন্ত রূপের সকল প্রকাশের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমি আছি। সেই এক অনির্ব্বচনীয় রস আমার মধ্য দিয়াও প্রকাশ লাভ করিতেছে। এ কী অপার বিস্ময়!

"আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তে।" (প্রাণের রস)

প্রাণের এই লীলাকে ইহার বিপরীত দিক হইতে দেখা সম্ভব। তাহাতে দেখা যায় বিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়তই অনস্তিত্ব হইয়া যাইতেছে। বিশ্ব জোড়া এক সুমহৎ বিভীষিকা। কিন্তু এই সকল চলমানতার ভিতর দিয়া রূপ যে নিয়তই এক স্থিতিকেই ফুটাইয়া তুলিতেছে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টিই যায় না। কেবল বিনষ্টির দিক হইতে রূপকে দেখিলে রূপ বিবিক্ত এমন একটি সত্তাকে স্বীকার করিতে হয় রূপের সহিত যাহার কোন সংযোগ নাই; কিংবা এই বিভীষিকার উর্দ্ধে এক মহান শূন্যতাকে স্বীকার করিয়া বসি। রূপ-শূন্য অস্তিতের বোধে এবং শূন্যতার বোধে কোন পার্থক্য নাই।

রূপ নিয়ত বিনষ্টির ভিতর দিয়া যে এক পরম অস্তিত্বের আনন্দকেই নিয়ত ব্যক্ত করিতেছে, এই সাক্ষাৎকারই একমাত্র সত্য।

"তারাও ছিল বেঁচে,
তারা যে নেই তার চেয়ে সত্য ঐ কথাটি।" (প্রাণের রস)

কবি সমগ্র মানব-সভ্যতাকে গতিশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিতর দিয়া এই গতিতত্ত্ব অপরোক্ষ হইয়াছিল, সেই মূল দার্শনিক উপলব্ধিকে তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের, সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই উপলব্ধি মূর্ত্ত্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, মানুষের সৃষ্টিপ্রেরণার ও জ্ঞানের সকল বিভাগকে তিনি গতিশীল করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। নিত্য নূতন রূপ-লাভের ভিতর দিয়া এই সমস্ত কিছু ক্রমিক উন্নততর মূল্য লাভ করিতেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই গতিতত্ত্ব স্বীকৃত নয়। তাহার ফলে ভারতীয় সাধনা এমন কতকগুলি দার্শনিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলে যাহার মধ্যে মূল্যের স্থিতির

দিকটিই একমাত্র স্বীকৃত। তাহা এইরূপে যে-ধর্ম্মবোধ ও সমাজ-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতেও গতির দিকটি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। মানুষের সৃষ্টির আর সকল দিকগুলিকেও একটি চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। মূল এই দার্শনিক উপলব্ধির পার্থক্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির প্রত্যেকটি বিভাগের বন্ধন-মুক্তি সাধনে সমগ্র জীবন ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন।

সমগ্র প্রকাশটিকে এইরূপে স্থিতিশীল করিবায় চেষ্টা ভারতীয় মধ্যযুগেই যে কেবল দেখা দেয় তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বত্র এইরূপ একটি চেষ্টা প্রায় একই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এইরূপ এক একটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায় যখন লব্ধ সম্পদকে সে চিকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। এই মানসিক প্রবণতার ফলে সে ইহার অনুকূল বিচিত্র জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলে। কিন্তু প্রাণের আবেগ পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একসময় সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

প্রাণের যে প্রেরণা এইরূপে যুগে যুগে প্রাচীনের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিত্য নবীন সৃষ্টি-প্রেরণার প্রকাশ ঘটায় রবীন্দ্রনাথ আপনাকে সেই প্রাণ-তত্ত্বের সহিত একাত্ম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বের মূর্ত্ত্য প্রকাশ।

'চিরযাত্রী' কবিতাটির মধ্যে সেই 'চিরনূতনের' 'চির যৌবনের', 'চির বিদ্রোহী'র বন্দনা গান।

"সীমানা ভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্ব্বত,
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।" (চিরযাত্রী)

নারী-সত্তার মধ্যে যে প্রকাশ, তাহার দুর্লভ রূপটি ধরা পড়ে পুরুষের প্রেমে। সত্তার একক প্রকাশ তো বন্ধ্যা, সে সত্য নয়। বিশ্ব-প্রাণের যোগে মানুষের প্রাণের যোগ, এবং এই যোগের ভিতর দিয়া সে যখন বিশ্বের সকল সত্তার সহিত মিলন বোধ করে, তখন তাহা মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে। পরম মিলনের আনন্দই অমৃত। অন্তহীন প্রাণের যোগে তখন প্রাণ সত্য বলিয়া প্রাণের বিনাশের ভয় থাকে না।

ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণের সহিত যে বোধে মিলন বোধ করে সেই বোধকেই বলে প্রেম।

পুরুষের অন্তরে প্রেমে নারীর যে-রূপ উদ্ঘাটিত হইয়া যায় তাহা বাহিরের রূপ অপেক্ষাও সত্য। যাহা নিবিড় অনুভূতির সঞ্চার করিয়া সমগ্র চেতনাকে উন্মুখ করিয়া তুলে। আমরা তাহাকেই বলি সত্য। অন্তরে ধ্যানের মধ্যে নারীর যে রূপ পুরুষ গড়িয়া তুলে তাহা এই কারণেই সত্য। এই রূপকেই পুরুষ অন্তরের মধ্যেই কেবল নানা ভাবে আস্বাদ করে না, তাহাকেই বাহিরে বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সাধনা করে। এই রূপকেই সৃষ্টি করিতে চাহিয়া মানুষের শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত।

"দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।" (দ্বৈত)

প্রেমে এইরূপে পুরুষ ও নারী একটি নূতন ভাব-লোকে জন্মগ্রহণ করে। সেই লোকে তাহারা বিচিত্র ভাবনার জন্ম দেয়।

"আমি বেঁধেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে,
তোমাব দৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।" (দ্বৈত)

পুরুষের অন্তরে নারীর আর এক যে রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাতে অন্তহীন বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়। তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয়তার আভাস ফুটিয়া উঠে, তাহা অস্তমিত সূর্য্যের আভায় রাঙা একখণ্ড মেঘের মত বহুদূরের অথচ নিত্য নব নব বর্ণের ও রূপের প্রকাশে মায়াময়। নারী আপনার এই আশ্চর্য্য রূপ সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে পুরুষের অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকটিকে নারী-রূপই উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

"আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।" (দ্বৈত)

এমন এক একটি অধ্যাত্ম উপলব্ধির মুহূর্ত্ত জীবনে আসে যে মুহূর্ত্তে জগৎ ও জীবনের দৃশ্যপটটি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অকস্মাৎ মনে হয় এই আমি এবং

আমার পরিচিত প্রিয়জন, এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের অনন্ত কোটি নর-নারী যেন গভীর ঘুমে স্বপ্ন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। যেন অন্তরের অন্তরতম লোকে কাহার অনিবার্য্য গূঢ় অশ্রুত বংশীধ্বনি হইতেছে, তাহারই প্রেরণায় বিস্ফারিত আঁখি মেলিয়া জীবন ভোর আমরা চলিয়াছি। সে বাঁশির সুরে ব্যাকুল আহ্বানের বিরাম নাই, এই যাত্রারও শেষ নাই।

কোন সুরের অনিবার্য্য আকর্ষণে এই অনন্ত কোটি নর-নারী এই জগতে আসিয়া পড়িয়াছে, আবার সেই সুরের টানে কোন্ অপরিচিত লোকে ইহারা চলিয়া যায়। ইহারাই বা কে ইহাদের তো আমি চিনি না, আমাকেও ইহারা চেনে না। সকলেরই তো দৃষ্টি আচ্ছন্ন। বাঁশির সেই গূঢ় আহ্বানের স্বরূপ কি, অনন্ত কোটি জীবের এ যাত্রা কোথায় গিয়া শেষ হয়? কোন দিব্য-চেতনা-লোক কি রহিয়াছে, যে চেতনা-লোকে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জীব-জগতের এই নিয়তি রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়? কেমন করিয়াই বা তাহাকে লাভ করিতে পারা যাইবে?

"সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই।
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা।
ঘুমের স্বচ্ছ আকাশ তলে
কোন্ নির্ব্বাক রহস্তের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি,
'কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন লোকে'!" (অকাল ঘুম)

হিন্দু নারীর জীবনে সহস্র লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই যে বিশিষ্ট একটি সাধনাও সিদ্ধির দিক আছে, কবি বাঁশিওয়ালা' কবিতাটির মধ্যে তাহারই একটি আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছেন।

বাহিরের সহস্র লাঞ্ছনা, অসম্মাননা এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইহারা যেন কোন প্রতিবাদই করিতে পারে না। প্রতিবাদ করিতে পারে না বলিয়াই অন্তর্জীবনে অধ্যাত্ম-জীবনে ইহারা বাঁচিবার একটি পথ অন্বেষণ করিয়াছে।

এই অন্তরের পথ বাহিয়া ইহারা দিব্য আর এক মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছে। সেই মুক্তির আস্বাদ মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্য জীবনের সকল বন্ধন, দারুণতম গ্লানি বিজড়িত যে 'আমি' তাহা কোথায় ছায়া হইয়া মিলাইয়া যায়। তাহাকে মানুষের কোন পাপ,

কোন অপরাধ আর স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না। নারী এমনি অন্তরের পথে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অমৃত আস্বাদ করিতে পারে বলিয়াই সমাজের এতবড় পাপের বোঝাকেও বুক দিয়া ঠেলিতে পারে। এমনি করিয়া সে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে বুকে জড়াইয়া তাহাকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। নারীর ইহাই সাধনা ও সিদ্ধি।

ইউরোপীয় নারী-সমাজে বাহিরের বন্ধন ছিন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। হিন্দু নারী বাহিরের শৃঙ্খলকে মানিয়া লইয়া অন্তরে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। অবশ্য পূর্ণতার সাধনা অন্তর এবং বাহির উভয়ের যুগপৎ মুক্তি লাভের মধ্যে। দুই আদর্শের মিলিত প্রকাশে শ্রেষ্ঠ আদর্শ জন্ম লাভ করিবে।

অন্তর্জীবনের সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়ত মুষ্টিমেয় কয়েক জন নারী করিয়াছে, কিন্তু বাহিরের বঞ্চনা ইহাদের অধিকাংশ জীবনকেই পঙ্গু করিয়াছে। অন্তরের এই সাধনার নামে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ইহারা আত্মবঞ্চনা করিয়া চলিয়াছে।

"বেজে ওঠে তোমার বাঁশি
ডাক পড়ে অমর্ত্ত্য লোকে,
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।" (বাঁশিওয়ালা)

কৈশোরে, প্রারম্ভিক যৌবনে কত প্রেম গড়িয়া উঠে, কয়জন নর-নারীর ভাগ্যে সে প্রেম সার্থক হয়। বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ, কর্ম্মময় সংসারে কে কোন্ দিকে যে সরিয়া যায় তাহার ঠিকানা মিলে না।

ওই বিচ্ছেদে পুরুষের ধ্যানে সেদিনের প্রেম চিরন্তন হইয়া থাকে। যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া কোন এক দিব্য মুহূর্ত্তে পুরুষের অন্তরে প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেই রূপ অন্তরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। তাহার পর জীবনে কত পরিবর্ত্তন আসে, কত বিচিত্র বোধ জাগে, কিন্তু ওই রূপ-ধ্যানের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আসে না। অসীম কাল-প্রবাহ ওই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া থাকে।

"আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়স হারা এই সব পরিচয়ের দলে।
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।" (মিল ভাঙ্গা

আজ সেই নারীর সহিত যদি সাক্ষাৎও হয় তবে সেই রূপ, সেই প্রেমের সহিত তাহার কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বাস্তব নারী অপেক্ষা ওই ধ্যানের রূপটিই বুঝি সত্য।

কেবল তাহাই নহে, পরিণত জীবনে সে প্রেমের সহিত যেন বিচ্ছেদ আসে। তবু এই বিচ্ছেদ জীবনে একান্ত সত্য নয়। সকল বিস্মৃতির পরপারে দাঁড়াইয়া সে প্রেম আজিও জীবনে নূতন প্রেরণা প্রতি মুহূর্তে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে।

"এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিল ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে,
এর মধ্যে আছে তার বেগ।" (মিল ভাঙা)

প্রান্তিক

জীবনের বিচিত্র গ্রন্থি ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে কবির জীবনে সেই অনুভূতি আসে যখন জাগতিক বিচিত্রবোধের সমষ্টিভূত, তাহার বিচিত্র অনুপ্রেরণায় গড়িয়া তোলা এই দেহ-প্রাণ-মন শরতের লঘু মেঘের মত আকাশ প্রান্তে বিলীন হইয়া যায়। দেহ-প্রাণ-মনের সম্পূর্ণ বোধ মুক্ত চেতনার সে এক অলৌকিক উপলব্ধি। এই বিশিষ্ট উপলব্ধির কথা ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার উপলব্ধির ক্ষেত্রে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রান্তিকের কবিতাগুলির মধ্যে এই অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধির কথাই নানা ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু কবির এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কবির সেই উপলব্ধির সহিত এই বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গত উল্লেখ করিব।

প্রারম্ভের কবিতাটির মধ্যে সত্তা হইতে চেতনার ধীর বিশ্লেষ এবং পরিণামে তাঁহার সত্তা মুক্ত অলৌকিক উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। প্রথমে জাগতিক বোধের ধীর বিলুপ্তি। এক অলৌকিক বেদনাবোধের ভিতর দিয়া দৃঢ় হস্তে তাহার মার্জ্জনা। সম্পূর্ণ জাগতিক বোধ মুক্ত সাময়িক শূন্যতা এবং অন্ধকারের বোধ।

তাহারপর উর্দ্ধ হইতে এক দিব্য জ্যোতির প্লাবন নামিয়া সেই অন্ধকারের বক্ষকে যেন শতদীর্ণ করিয়া দিল। অন্ধকারের বক্ষে সেই আলোর সঞ্চার আশ্চর্য্য গোপন, নিগূঢ়, শ্রাবণের ধারাপাতে যেমন করিয়া প্রতি বৃক্ষের শিরায় শিরায় রস-ধারা প্লাবিত হইয়া যায়।

"শূন্য হতে জ্যোতিব তর্জ্জনী
স্পর্শ দিল এক প্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে
আলোকেব থবহব শিহবণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে অসীম তন্দ্রাব স্তূপে স্তূপে
দীর্ণ দীর্ণ কবি দিল তাবে।"

কিযৎক্ষণেব জন্য আলো-অন্ধকারের এক অপরূপ সমন্বয়। মন ও দিব্য-চেতনার মধ্যবর্ত্তী এই অন্ধকার-লোকই মৃত্যু-লোক। খ্রীষ্টানদের ভাষায় যে চিরন্তন evil বা Sin দ্বারা এই জগৎ পবিবৃত, ইহা সেই অজ্ঞানতার জগৎ। অন্ধকার-লোক বিদীর্ণ করিয়া যে দিব্য আলোর প্লাবন কবি-চেতনায় নামিয়া আসিতেছে, তাহা ব্যক্তি জীবনে যেমন সত্য, তেমনি সমগ্র বিশ্ব মানব-মনের জগতেও তাহা সত্য। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া দিব্যচেতনা নিম্নতর চেতনা-লোকে অবতবণ করিতে চান, সমগ্র সত্তার আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য।

"আলোক আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্দ্ধস্ফুট অস্পষ্টেব বচিল বিভ্রম।"

তাহারপর সেই জ্যোতি প্লাবনে কবির সমগ্র সত্তা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দেহ-প্রাণ মনের সর্ব্বশেষ বন্ধন, ক্ষীণতম আবরণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হইয়া গিযাছে। দেহ মুক্ত সত্তার তাহা এক নূতন জন্ম লাভ।

"নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবাবিত
স্বচ্ছ-শুভ্র চৈতন্যেব প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে।"

কবির উপলব্ধির এই যে ধীর পরিণাম আমরা লক্ষ্য করিলাম তাহাতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কবির নিকট জীবন ও জগৎ যেন মাযা হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে এমন এক উপলব্ধির সম্মুখীন তিনি হইয়াছেন, যে উপলব্ধির মুহূর্ত্তে জীবন ও জগৎ তাহার বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধের প্রকাশ লইয়া মহাশূন্যে ছায়া হইয়া দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, এই পরিণাম লাভের মধ্যেও কবির চেতনা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয় নাই, সত্তার একটি অস্তিত্ববোধ কোন-না কোন স্বরূপে আছে। কবির মুক্তি-তত্ত্বে সত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তি কোন পরিণামে ঘটিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে বিশ্ব-কর্ম্মটাই যে নিরর্থক হইয়া যায়। এই পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তাঁহাকে সেই সামর্থ্যই দান করিয়াছে, কিংবা করিবে, যে সামর্থ্যে স্বয়ং ঈশ্বর অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া অন্তহীন রূপ-সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

দিব্য-চেতনাশ্রয়ী হইয়া মানুষ যে আশ্চর্য্য সমৃদ্ধিও সৃষ্টি-প্রেরণা লাভ করিবে, তাহাতে যে বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে সে আপনাকে প্রকাশ করিবে তাহার কতটুকু কল্পনা আজ আমরা করিতে পারি।

কবির জীবনে এই উপলব্ধি যে নবতর সৃষ্টির প্রেরণা দান করিবে, তাঁহার ইতি-পূর্ব্বের সৃষ্টি-প্রেরণা ও সৃষ্টি-রূপ হইতে তাহা যে অনেক বেশি উন্নত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিশ্ব-কর্ম্মের তত্ত্বই কবিকে মায়া-তত্ত্ব হইতে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

> "বিশ্ব সৃষ্টিকর্ত্তা একা, সৃষ্টি কাজে আমার আহ্বান
> বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
> পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
> ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
> নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।"

এই পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধির স্বরূপ যেমনই হোক, তাহাতে এই জীবন ও জগতের পরিপ্রেক্ষি যে বদলাইয়া যায় তাহাতে কোন সংশয় নাই। দেশ-কালের বোধ শূন্য, শূন্য দিগন্তের ভূমিকায় 'নূতন জীবনচ্ছবি'র বিরচন যে কী রূপ তাহা আমাদের বোধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত সামগ্রী। সৌন্দর্য্যের সম্যক উপলব্ধি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা অনিবার্য্যরূপে করিতে হয়, কিন্তু দেশ-কালের ঊর্দ্ধে উঠিয়া যে চরম ব্যবধান সৃষ্টি তাহাতে এই বিসৃষ্টির কোন্ রূপ ফুটিয়া উঠে?

কবি এই জীবনে এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া যে বিচিত্ররূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কালে ম্লান হইয়া আসিতেছে, (ইহা কবির বোধ) অতি পরিচয়ে তাহার বিস্ময়

ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে, মূল্য নিরূপণের জন্য মানুষের কাছে তাহার বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা। সৃষ্টি-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বাহিরের এই যে পরিচয়, তাহা ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, সুন্দর হোক বা বিকৃত হোক, জীবনান্তর লাভে তাহার আদৌ কোন মূল্য নাই। মানুষকে এই সমস্ত কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া, নিঃস্ব হইয়া মহা অজ্ঞাত সংখ্যাতীত গ্রহ নক্ষত্রের পথে ভয়ঙ্কর একাকিত্বের ভিতর দিয়া যাত্রা করিতে হয়। এই উপলব্ধি মুহূর্ত্তের জন্যও ঘটিলে জীবনে সার্থকতা ও অসার্থকতাবোধ সম্পূর্ণ বহিঃ নিরপেক্ষ হইয়া যায়।

"হেনকালে একদিন আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে
আরতি শঙ্খের ধ্বনি যে লগ্নে বাজিল সিন্ধুপারে,
মনে হল, মুহূর্ত্তেই থেমে গেল সব বেচাকেনা,
শান্ত হল আশা প্রত্যাশার কোলাহল।"

যে সত্তার ভিতর দিয়া আদি সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশ লাভ করে কালে তাহার দীপ্তি ম্লান হইয়া যায়। তাহাকে তাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া বারংবার পরিশুদ্ধতা লাভ করিয়া নূতন দেহ লাভ করিতে হয়।

"আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন-বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যু স্নান তীর্থ-তটে সেই আদি নির্ঝর তলায়।"

এমনি করিয়া বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া সৃষ্টি-প্রেরণাকে নূতন করিয়া লাভ করিতে হয়। এই নিখিল বিশ্ব-শিল্পের শিল্পী যিনি তিনিও নূতন করিয়া সৃষ্টি-প্রেরণা লাভের জন্য এই রূপের প্রকাশকে নির্ম্মম হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলেন; অথবা উন্নততর চেতনার প্রকাশের ভিতর দিয়া উন্নততর সৃষ্টি-রূপের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেন।

"বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্যবীথি পারে
পূর্ব্ব-ইতিহাস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে—
যে প্রথম বারে বারে ফিরে আসে বিশ্বের সৃষ্টিতে
কখনো বা অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয় হুঙ্কারে,
কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙ্গা পরম বিস্ময়ে
শুকতারা নিমন্ত্রিত আলোকের উৎসব প্রাঙ্গনে।"

রবীন্দ্রনাথের মুক্তির স্বরূপ আমরা জানি। তাহা ব্যক্তি-প্রাণের সহিত বিশ্ব-প্রাণের পরিপূর্ণ যোগের নিবিড়তম আনন্দের বোধ। বিশ্ব-চেতনা সংখ্যাতীত সত্তা বা রূপ আশ্রয় করিয়া আপনার যে আনন্দকে ব্যক্ত করিতেছে, সেই এক আনন্দই তো কবির বিচিত্র সৃষ্টি-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এমনি করিয়া প্রাণের যোগে প্রাণ অফুরন্ত সৃষ্টি করে, আবার প্রাণেই বিলীন হইয়া যায়।

যাঁহারা জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়া মুক্তি লাভ করিতে চান তাঁহাদের জীবনে ভয়ঙ্কর শূন্যতা নামে। তিনি যে অন্তহীন কাল ধরিয়া আপনার আনন্দকে, রসকে রূপের ভিতর দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাই রূপকে পরিহার করিলে তাঁহাকেই পরিহার করা হয়।

"মুক্তি এই সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে।"

বনস্পতির কম্পমান পল্লবে পল্লবে প্রাণের যে আনন্দ উল্লাস, সেই আনন্দই তো লোক লোকান্তরে পরিব্যাপ্ত, সেই আনন্দই আকাশে, পুষ্পে, পাখির কল কাকলিতে উৎসারিত। ইহাই তো সৃষ্টির আনন্দ-রূপ, মুক্তির পূর্ণ প্রকাশ।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত যখন প্রাণের সংযোগ ঘটে তখন বিশ্বের সকল প্রাণের সহিত তৃণ-লতা হইতে জীব-জগৎ মনুষ্য-লোক পর্য্যন্ত সকলের সহিত নিবিড় একাত্মতা বোধ জাগে। মানুষের জীবনে ইহার উর্দ্ধতর প্রাপ্তি আর কিছু নাই।

"অনিঃশেষ যে তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
সে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে, তারি বর
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব্ব দেহ মন প্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ওই নিঃশব্দ প্রান্তরে—"

বিশ্ব-প্রাণ-লীলায় কবি যোগ দিয়াছেন, তাহারই আনন্দ-বেদনাকে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধ্যান-লোকে অপূর্ব্ব মানসী-মূর্ত্তি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্ব-সৌন্দর্য্য সাগর মন্থনে লক্ষ্মীর মত ভাসিয়া ওঠা অপরূপ সে নারী-মূর্ত্তি। 'মানসী' হইতে 'কল্পনা' পর্য্যন্ত কাব্যগুলির মধ্যে কবির এই মানসী মূর্ত্তির কত-না-পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। অপরূপ দিব্য-রূপ এমনি করিয়া কবির চিত্ত-পটে বারংবার

ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া গিয়াছে। আজ কবির জীবনে তাহার কোন প্রকাশ না থাকিলেও তাহা যে কোন-না-কোন স্বরূপে তাঁহার চেতনায় যুক্ত হইয়া আছে তাহাতে সংশয় নাই। তাহা এমনি লুপ্ত থাকিয়া নিগূঢ়ভাবে আজও তাঁহার চেতনায় অনুপ্রেরণা দান করিতেছে। প্রভাত আকাশ যেমন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র সুরে, মাধুর্য্যে স্পন্দিত কবির মনও তেমনি অনির্ব্বচনীয় কত-না ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহা কতক প্রকাশ লাভ করিয়াছে, কতক অপ্রকাশের বেদনায় নিয়ত সজল, বর্ষণ কাঙাল মেঘের মত।

এমনি করিয়া বিশ্বের যোগেই কবির সত্তা ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। জীবন শতদল একের পর এক দল মেলিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। নট নটী যেমন মহা-নাটকের এক একটি বিশিষ্ট চরিত্র অভিনয় করিয়া নেপথ্য ভূমিতে প্রয়াণ করে, তেমনি কবিও বিশ্ব মহাকবির মহা নাটকের কোন একটি অংশ অভিনয় করিয়া প্রচ্ছন্ন অন্ধকার লোকে প্রযাণ করিবেন। এই জীবনের কোন অর্থ যদি থাকে তাহা একমাত্র সেই মহানাট্যকারই জানেন।

"—আলোকিত রঙ্গমঞ্চে
প্রচ্ছন্ন নেপথ্যভূমে, সুগভীর সৃষ্টি রহস্যের
যে প্রকাশ পর্ব্বে পর্ব্বে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে উদ্‌বারিত‌‌
আমার জীবন-রচনায়।"

কেবল এই উপলব্ধিই কবির জীবনে সত্য নয়। জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায়ে জাগতিক এই বিচিত্রবোধকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা বারংবার সকল সীমার বোধমুক্ত এক অনির্ব্বচনীয়তার আস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

জীবনের কোন একটি বিশিষ্ট পরিণামে সত্য লাভ ঘটে, তাহা ছাড়া আর সমস্ত বোধটিই অজ্ঞানতা এই বোধে রবীন্দ্রনাথের যে লেশমাত্র বিশ্বাস ছিল না তাহা বলা বাহুল্য।

"—তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে কতদিন জাগরণ ক্ষণে
অপরূপ অনির্ব্বচনীয়।"

মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, জীবনের একটি পর্য্যায়ের অবসান। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষ নিত্য নূতন জগৎ লাভ করিয়া চলে মাত্র।

"আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয় যাত্রায়।"

জাগতিক বোধ হইতে সত্তার ধীর বিশ্লেষ এবং পরিণামে অন্তহীন রূপ ও বোধের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির যে অভিজ্ঞতা তিনি এইকালে লাভ করিয়াছিলেন তাহার আর একটি পরিচয় নবম সংখ্যক কবিতার মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

"এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ব বৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়।"

দেহ-প্রাণ-মনের বোধ মুক্ত, বিশ্বের বোধ মুক্ত চেতনার যে মহান একাকীত্ববোধ তাহা সাধারণ মানুষের বোধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত সামগ্রী। ব্যক্তির এই পরিণাম লাভই সর্ব্বশেষ পরিণাম নয়। ইহারও ঊর্দ্ধতর পরিণাম লাভের পক্ষে বুঝি মানুষের ব্যক্তিগত সাধনাই যথেষ্ট নয়। এইখানে ঈশ্বরীয় করুণার কথা আসে। তিনি স্বয়ং যদি তাঁহার সর্ব্বশেষ আবরণ, মায়ার আস্তরণ না সরাইয়া নেন, তাহা হইলে মানুষ বুঝি আপনার চেষ্টায় তাহা উদ্ভিন্ন করিতে পারে না। এই কথাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আত্মা যাঁহাকে নির্ব্বাচন করেন, একমাত্র তিনিই আত্মাকে লাভ করিতে পারেন। এই সর্ব্বশেষ আবরণ দূর করিয়া আত্মাকে অপরোক্ষ করিবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা পরিশেষে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা কবির সেই ব্যাকুল প্রার্থনা, যুগে যুগে ব্রহ্মর্ষিগণ ঈশ্বরের নিকট যে ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন।

"হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।"

"হে পূষণ * * তোমার রশ্মিজাল বিকীর্ণ কর, তোমার তেজ সংহরণ কর, যেন তোমার কল্যাণতম রূপ দেখিতে পাই। আমি সেই পুরুষকে দেখিতে চাই যে পুরুষ তোমার এবং আমার মধ্যে এক।" (বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষদ)

"লোক-দ্বার অপাবৃত কর, বৈরাজ্য লাভের জন্য যেন তোমার সাক্ষাৎলাভ করি।"
(ছান্দোগ্য উপনিষদ)

"হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। হে পূষণ, উহা অপাবৃত কর। আমি সত্যপ্রিয়, যেন সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।" (ঈশ উপনিষদ)

"যিনি এক, বর্ণহীন হইয়া বহুধা শক্তি যোগের দ্বারা আপনার নিহিতার্থ বহুবর্ণ প্রদান করেন, আদিতে এবং অন্তে বিশ্ব যাঁহার মধ্যে সমাহিত হয় তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধি প্রদান করুণ।"
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)

আমরা লক্ষ্য করিযাছি কবি, যাহাকে পূর্ণ পরিণাম বলিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। মায়ার সর্ব্বশেষ সূক্ষ্মতম আবরণ তাঁহার দৃষ্টির পথরোধ করিয়াছিল। "দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া আমার আপন ছায়া"। ঈশ্বর তাঁহার জীবনে সর্ব্বশেষ পরিণাম চিহ্নিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার অহঙ্কারের আবেষ্টনী হইতে সম্পূর্ণ রূপে বাহির হইয়া আসিতে পারেন নাই।

"সেই আলোকের সামগান
মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে
সৃষ্টির সীমান্ত-জ্যোতির্লোক, তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ।"

জাগতিক বোধের ভিতর দিয়া কবির জীবন ধীরে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া জীবন পরিশেষে জাগতিক বোধ প্রসূত সকল অনুপ্রেরণাকে ছাড়াইয়া যায়। তাহাতে জীবনও জগতের আর এক অর্থ ফুটিয়া উঠে, সৃষ্টি-প্রেরণার আর এক দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। দিব্য-চেতনার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রিত জীবনের কবিত্ব প্রেরণাকে কবি 'চরমের কবিত্ব মর্য্যাদা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পূর্ণ পরিণতি লাভের জন্যই কবি সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া দেহ-প্রাণ-মনকে প্রস্তুত করিয়াছেন, "এরি লাগি সেধেছিনু তান"।

কোন্ স্বরূপে কবির সাধনার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ছিল, যাহার ফলে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা চরিতার্থ হয় নাই? ইহারই একটি কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি, বিশেষ করিয়া গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-পর্য্যায়ের পর হইতে। তাহাতে এই ভাবটিই বারংবার সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কবির পূর্ণতার সাধনায় ব্যক্তি-সত্তা, বিশ্ব-সত্তা ও দিব্য-সত্তার পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন প্রয়োজন। ব্যক্তি-সত্তা যতক্ষণ না বিশ্ব-সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারিতেছে, ততদিন কবির সাধনায় পরিপূর্ণ রূপে দিব্য-সত্তা লাভের প্রশ্ন উঠে না। কারণ তাহা হইলে যে ব্যক্তির বিশ্ব-কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। বিশ্ব-সত্তা লাভ ঘটিলে স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপে কবি-চেতনা দিব্য-চেতনায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। বিশ্ব-সত্তায় কবি-সত্তা পূর্ণতা লাভ কেন করিতে পারেন নাই, ইতিপূর্ব্বে তাহার একটি কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নের উদ্ধৃত অংশ হইতেও এই কারণ নির্দ্দেশ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

"আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্য ডালি—' পরে।"

জীবন পরিপক্ক ফলের মতন সুসম্পূর্ণ হইলে তবেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভের মধ্যে সর্ব্বশেষ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবে।

কবি সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া সংখ্যাতীত ভাবকে বাণী রূপ দান করিয়াছেন। অপরূপ দীপ্তিতে তাহারা সমুজ্জ্বল। জীবনে তাহাদের প্রভাব অনিবার্য্য। বর্ণ ও গন্ধ সমৃদ্ধ খ্যাতিবান কুসুমের মত মানুষের প্রাণ-মনকে তাহারা হরণ করিবেই। এই অতুল ভাব-রাশি ছাড়া এমন অসংখ্য ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে রহিয়া গিয়াছে যাহাদের তিনি অতি সামান্য বলিয়া, অত্যন্ত দ্রুত পরিণামী বলিয়া, অতি লঘু স্পর্শ কাতর বলিয়া ভাষা বন্ধনে বাঁধিতে পারেন নাই।

মহৎ ভাবকে রূপায়িত করিতে প্রাণ-মনের যে সামর্থ্যের প্রয়োজন কবির জীবনে তাহার অবসান ঘটিয়াছে। প্রাণের স্রোত-হারা-হৃদয়-লোকে আজ সেই অবহেলিত তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভাবনাগুলিই পথ-পার্শ্বে অবহেলিত অখ্যাত অনামা কুসুমের মত ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। মানুষের সমাদর তাহারা লাভ করিতে পারিবে না, প্রাণের প্রাচুর্য্যে তাহারা রূপ লাভ করিয়া ঝরিয়া যাইবে, লোক চক্ষুর অন্তরালে যেমন করিয়া অসংখ্য তৃণ-পুষ্প ফুটিয়া ঝরিয়া যায়।

"—আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের সেঁউলি-সম যারা
নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত, হাওয়ায় হাওয়ায়,
রূপ নিয়ে দেখা দেবে ভাঁটার নদীর প্রান্ততীরে
অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতো—"

বিশ্বের সংখ্যাতীত রূপ-লোকের মধ্যে আমার এই সত্তা বিরাজিত। যে চেতনার যোগে, প্রকাশের যে তত্ত্বে এই সমস্ত কিছুর প্রকাশ, সেই একই চেতনার যোগে, প্রকাশের সেই একই তত্ত্বে আমারও প্রকাশ। এই বিস্ময়ের কী পার আছে। দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপ্ত অন্তহীন চেতনা প্রসারের সহিত আমার চেতনা বিজড়িত। যে আলোক-সূত্রে মর্ত্ত্যের সকল প্রাণ বিধৃত, সকল প্রাণের প্রকাশ, সেই আলোক

সূত্রে আমার সত্তাও বিধৃত, সঞ্জীবিত। সেই এক আলোকের সহিত যুক্ত হইয়া আছি বলিয়া তাহারই সহিত যোগে সকল আলোক-সত্তার সহিত আমি গূঢ় মিলন বোধ করি। আমার চেতনা অন্তহীন প্রসারতায় হারাইয়া যায়। যে অন্তহীন ভাবনা-লোক যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া সংখ্যাতীত নর-নারীর চিত্ত-লোক আশ্রয় করিয়া ক্রমিক প্রসারতা লাভ করিয়া চলিয়াছে, কবির চেতনা তাহাকে নানারূপে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার প্রকাশের নানা বাধা দূর করিয়া তাহাকে আরো ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্ব-ভাবনার যোগে কবি এই মর্ত্ত্য-লোকে এক অপার ব্যাপ্তি বোধ করিয়াছেন। এই বিস্ময়ের অন্ত কোথায়। তাহার পর জীবনকে বারংবার মৃত্যুর গ্রন্থি ছেদন করিয়া বারংবার নূতন রূপ লাভ করিয়া একাকী অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিতে হয়।

কবির এই মিলন বোধের প্রসারতা একদিকে রূপের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে ভাবের ক্ষেত্রে, আবার তাহা জন্ম জন্মান্তর লোক-লোকান্তর ব্যাপ্ত। চেতনার এই ব্যাপ্ত বোধের মধ্যে কবির সকল দার্শনিক জিজ্ঞাসা অবসান লাভ করিয়াছে।

বিশ্বের যে অপার সৌন্দর্য্য-লোক আজ কবির দৃষ্টি সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন সব কিছু অলৌকিক মাধুর্য্যে ভরা, নূতনের অক্লান্ত বিস্ময় বিজড়িত, তাহা কোন্ চেতনা পরিণাম লাভ করিলে ঘটা সম্ভব, বর্ত্তমান কবিতাটির মধ্যে একমাত্র তাহাই আমাদের লক্ষণীয়।

> "আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
> অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
> সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন।"

ইহা তিনি ইতিপূর্ব্বে নানা ভাবে বুঝাইয়াছেন যে সৌন্দর্য্য-সাক্ষাৎকার ইন্দ্রিয়ের সহায়তার আছে, তাহাতে সৌন্দর্য্য-লোক একান্ত সীমিত। যখন প্রাণের সম্যক প্রকাশ ঘটে, তখন সৌন্দর্য্য-লোক আরোও প্রসারতা লাভ করে, এইরূপে মনের সহায়তার সৌন্দর্য্য-লোকের প্রসারতা আরোও বাড়িয়া যায়। পরিশেষে অধ্যাত্ম-বোধের যখন বিকাশ ঘটে তখন সৌন্দর্য্যের আর সীমা থাকে না। অধ্যাত্মবোধ কি, না যে বোধে মানুষের সকল সীমিত বোধ লুপ্ত হইয়া যায়। বলাবাহুল্য কবি-চেতনা সেই পরিণাম লাভ করিতে বিশ্বের সৌন্দর্য্য অফুরাণ হইয়া উঠিয়াছে।

সে জুতি

প্রান্তিকের উপলব্ধি কবির জীবনে এক নূতন দিগন্তরাল উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। জীবন ও জগৎ তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আর এক নূতন অর্থ লইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। মানস-চক্র ভাঙ্গিয়া আর এক নূতন দেশ-কালের আবির্ভাব। পূর্ব্বের জগৎ হইতে এ জগৎ কত বিপুল, কী অলৌকিক দীপ্তি বিজড়িত। সে দীপ্তির কতটুকু প্রকাশ ধরা পড়িয়াছিল কবির ইতিপূর্ব্বের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে। আপনার দীর্ঘ ছায়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ইহা যেন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত। দৃষ্টিভঙ্গীর এমনি আমূল পরিবর্ত্তন।

বর্ত্তমানের এই উপলব্ধি এবং ইতিপূর্ব্বের প্রাণের আনন্দ-বেদনা ও দুঃখ-সুখের বিচিত্র লীলা আস্বাদের মধ্যে পার্থক্য যে গভীর তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এই উভয় উপলব্ধি বিপ্রকৃতিক নয়। প্রাণের এই লীলার ভিতর দিয়া আমাদের অন্তঃগূঢ় চেতনা যে পরিপূর্ণতা লাভ করে তাহাই পরিণামে চেতনাকে উন্নততর বোধের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। যে চেতনা সুখ-দুঃখের নাট্য-লীলায় দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, সেই চেতনাই—

"—নিয়ে যেতে চায়
অচিন্তিতের পারে,
নব প্রভাতের উদয় সীমায়
অরূপ লোকের দ্বারে।" (উৎসর্গ)

কবির ইতিপূর্ব্বের জীবন যদি হয় রাত্রির নাট্যলীলা, তবে এখনকার জীবনকে নবীন প্রভাত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। একটি দীপ-শিখা, অপরটি অন্তহীন আলোক ধারাবর্ষী উদয় সূর্য্য। প্রথম সাক্ষাৎকারের বিস্ময় ও অভিভূত অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই বটে, তবে ভীতি বিহ্বলতা অনেকটা দূর হইয়াছে। সে বোধ অনেকটা সহনীয় হইয়াছে।

"আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমি ঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।" (উৎসর্গ)

সে জগৎ অপরিচিত সন্দেহ নাই, তাহার ভাষাও কবির সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই, তবু কবি জানেন এখন হইতে তাঁহাকে ওই নূতন জগতের ভাবকে নূতন ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে। সেঁজুতি কাব্যের মধ্যে কবির সেই চেষ্টাই রূপ লাভ করিয়াছে।

কবি মৃত্যুর জন্য জীবনকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। তাহাকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য আসক্তির সকল বন্ধন একে একে ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। যে চেতনা তাঁহাকে জন্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই চেতনার নিকট আসন্ন বিদায় মুহূর্তে কবি ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

"করো মোরে
আশীর্ব্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিণী মরীচিকা।"

মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া তাহারই আলোকে জীবনের একটা দিক যে 'মায়াবিণী মরীচিকা' হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। তাহা জীবনের কোন্ দিক?

ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন বিশিষ্ট কবির যে সত্তা বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদ করিয়াছে, তাঁহার চেতনায় নানা বোধের সঞ্চার করিযাছে, নানা সত্তার বা রূপের সহিত তাঁহার সত্তাকে যুক্ত করিয়াছে, সেই সত্তা আজ একান্ত জীর্ণ, ভগ্ন দেউলের মত শ্রীহীন। ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সে সামর্থ্য আজ প্রায় নিঃশেষিত। বিশ্ব একদিন যে সম্পদ অফুরন্ত করিয়া কবিকে দান করিয়াছে, সে আজ তাহা একে একে ফিরাইয়া লইতেছে। প্রাণের সকল দান মৃত্যুতে কি নিঃশেষ করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়? মৃত্যু পরিণামে জীবনকে কি এমনি শূন্য করিয়া দেয়? কিছুই কি অবশেষ থাকে না? জীবন বলিতে কি ইহাই বুঝায়? প্রাণের সম্পদে একবার ভরিয়া উঠা, একবার নিঃশেষে ফুরাইয়া যাওয়া?

প্রাণের এই হরণ পূরণের অন্তরালে আর একটি সত্তা আছে যাহা মৃত্যুকেও জয় করিয়া ওঠে।

"জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে।" (জন্মদিন)

এই 'আনন্দ স্বরূপের' সহিত বিশ্বের সকল রূপের অন্তরালবর্ত্তী আনন্দ সত্তার সহিত যোগ। কবির কাব্য এই উভয়ের মিলনের আনন্দ প্রকাশ।

"সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী;
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'।" (জন্মদিন)

এই 'ভালোবাসা' কবির চেতনাকে এমন এক সমুন্নতি দান করিয়াছে, এমন এক অপূর্ব্বতার আস্বাদ দান করিয়াছে, এমন এক লোকে উত্তীর্ণ করিয়াছে, যাহা সকল জন্ম-মৃত্যুর সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

"সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয় ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে।" (জন্মদিন)

এই প্রেমের আশ্রয় স্বরূপ কবির বাণী-রূপ একদিন হয়ত দীপ্তিহীন, ম্লান হইয়া পড়িবে, কিন্তু কবির চেতনায় তাহা চির অম্লান হইয়া বিরাজ করিবে।

"তবু সে অমৃত রূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু পরপারে।" (জন্মদিন)

ফাল্গুনের কত আম্র মঞ্জরীর রেণু, শরতের কত শেফালিকা, দোয়েলের কল কাকলি, বিশ্বের বিচিত্র রূপ সেই রূপকে কত না ভাবে বিচিত্রিত করিয়াছে আর এই সকল রূপের ভিতর দিয়া কবির চেতনা কত বারবার সেই লোকের আভাস লাভ করিয়াছে, 'সেথা নাহি যায় হাত নাহি যায় বাণী।'

মানবিক বিচিত্র স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, জাগতিক বিচিত্র সৌন্দর্য্য একান্ত মিথ্যা নয়, কারণ কবি যে অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করিয়াছেন, তাহা এই মর্ত্তের সৌন্দর্য্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া।

"তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে।" (জন্মদিন)

মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের নিবিড় উপলব্ধি তাঁহাকে যে রহস্যের আভাস দান করিয়াছিল, মৃত্যুতে হয়ত সেই রহস্যকে তিনি অপরোক্ষ করিবেন।

জীবন ও জীবনাতীত, রূপ ও অরূপের মধ্যে এইরূপে একটি সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা বর্ত্তমান কবিতাটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু পরিশেষে মর্ত্ত্যের প্রেমই যে কবির নিকট পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আর মৃত্যুতে তাহাকে কোন স্বরূপে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যাইবে না বলিয়া একটি পরিব্যাপ্ত বিষাদের সুরের মূর্চ্ছনা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ প্রাণের সম্পদ আর আহরণ করা যাইবে না। স্মৃতি-লোকে প্রাণের যে সম্পদ রহিয়াছে তাহাকেই তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিবেন। অরূপের পূজারতি নয়, জীবনের শেষ কয়েকটি দিন এমনি করিয়া তিনি প্রাণের বন্দনা করিয়া যাইবেন।

"জীবনের স্মৃতি দীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে;" (জন্মদিন)

মর্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে তিনি বলিয়াছেন, 'খেযাতরী হারা'। অর্থাৎ মৃত্যুর কৃষ্ণ সাগর পার হইয়া মর্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে অমর্ত্য-লোকে লইয়া যাইতে পারা যায় না। পশ্চাতে তাহাদের অসহায়ভাবে ফেলিয়া যাইতে হয়। জীবন ও জীবনাতীতের মধ্যে এই চিরন্তন যোগের লীলা? না ইহাতে উভয়ের যোগের রহস্য আরো নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে?

"আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেযাতরী হারা
এ পারের ভালোবাসা—" (জন্মদিন)

রূপকে আশ্রয় করিয়া কবি রূপের অতীত লোকের যখন আভাস লাভ করিয়াছেন, তখনই কৃতার্থতায় তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। সেই অপূর্ব্বতার ভিতর দিয়া কবি নিঃসংশয়ে বোধ করিয়াছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা কোথায়। কিন্তু সেই বোধে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তাহারই আলৌকিক প্রেরণায় যে শ্রেষ্ঠ কাব্যকলা তাহা কবির জীবনে আজও সত্য হয় নাই।

"শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতি কলা।" (পত্রোত্তর)

সেই 'প্রিয় অনির্ব্বচনীয়'কে কত রূপে তিনি লাভ করিয়াছেন। তাহারই সুধাস্পর্শে তাঁহার জীবন অপরূপ মাধুর্য্যে আবিষ্ট হইয়াছে। সেই অমৃত রূপেরই তো প্রকাশ দেখা যায় প্রাণের বিচিত্র চঞ্চলতায়। বিশ্ব-প্রাণের এই অমৃত লীলায় যোগ দিয়া তাঁহার চেতনা বারংবার সকল সীমার অতীত লোকে প্রয়াণ করিয়াছে।

জীবনে পরম পরিণাম চিহ্নিত না হইলেও, সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বাণী-রূপের প্রকাশ আজও না ঘটিলেও কবি ইহা নিঃসংশয়ে জানেন, যে রূপের ভিতর দিয়া মৃত্যু পার হইয়া অরূপের অমৃতকে লাভ করিতে হয়। রূপকে আশ্রয় করিয়াই সত্তার ধীর বিকাশ ও পরিপূর্ণতা এবং এই পরিপূর্ণ জীবন আশ্রয় করিয়া পরিণামে অরূপের অমৃত লাভ করা।

দেশ-কালের উভয় তট পূর্ণ করিয়া প্রাণের প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই ছুটিয়া চলার বেগে সংখ্যাতীত রূপ-বুদ্বুদ একবার জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

"ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা;
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।" (পত্রোত্তর)

মুক্তি এই মহা প্রাণ-লীলার সহিত ব্যক্তি-প্রাণকে যুক্ত করিয়া দেওয়া।

"সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।" (পত্রোত্তর)

সীমা যদি কেবলমাত্র সামাই হইত তবে অসীমকে আমরা কোন কালেই জানিতে পারিতাম না, অসীমের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সমার্থক হইয়া যাইত। সীমাও তত্ত্বত সীমা নহে। তাহার নিয়ত চঞ্চলতা, নিয়ত বিকাশ, ক্ষয়, প্রসার, বিদারণের ভিতর দিয়া সে অসীমের আনন্দ-রূপকেই প্রকাশ করিতেছে। চলিয়া চলিয়া ক্ষইয়া ক্ষইয়া এই বাণীকেই সে নিয়ত উচ্চারণ করিতেছে, 'আমি কোন-রূপে তাহাকে নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; অফুরাণ তাহার ঐশ্বর্য্যের দান।' সেই কথাই তিনি বলিয়াছেন, 'সীমা থাকে থাক্, তবু তার সীমা নাই।" জীবন ও জগৎ তাই অনির্ব্বচনীয়।

মৃত্যুতে কবির জীবনের আর সমস্ত কিছুর বিনাশ ঘটিবে, কিন্তু কবির জীবনে এমন বোধের জগৎ আছে, যাহাকে মৃত্যু স্পর্শ মাত্র করিতে পারিবে না। সীমাবোধের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু যে বোধ সকল সীমার অতীত তাহার মৃত্যু ঘটিবে কেমন করিয়া।

মর্ত্ত্যের এই তৃণ-তরু-লতা এই নীল আকাশ নিয়ে আলো-ছায়ার বিচিত্র লীলা কবির মনকে কী অনির্ব্বচনীয়তারই না আভাস দান করিয়াছে। তাহাদের বিচিত্র রূপ-রঙ্গ-রেখা কবি-প্রাণকে বারংবার বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া দিয়াছে।

'অসীম কাল', 'অসীম আকাশ' পরিপূর্ণ করিয়া প্রাণের যে অন্তহীন প্রবাহ, রূপের যে নিয়ত ভাঙ্গা ও গড়া, বিশ্বের বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়া কবি পরিণামে সেই আদি প্রাণ উৎসের সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

"অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
নীচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।" (যাবার মুখে)

সেই বাণী হইল, যে-এক প্রাণের দ্বারা বিশ্বের সকল প্রাণ সঞ্জীবিত সেই এক প্রাণ আমার মধ্যেও লীলায়িত। সেই অন্তহীন প্রাণের উপলব্ধিকেই কবি তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

"সে আমি সকল কালে
সে আমি সকল খানে,
প্রেমেব পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।" (যাবার মুখে)

কবির এই স্থূল সত্তার অতীতে একটি সূক্ষ্ম ভাবময় সত্তা আছে। মৃত্যুতে এই স্থূল দেহ-রূপের বিনাশ ঘটিবে, কিন্তু সেই অপর ভাবময় সত্তার বিনাশ ঘটিবে না। কবির সেই অপর ভাবময় সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে দিনে দিনে পলে পলে বাহিরের বিচিত্র রূপ-রঙ্গ-রেখা-গন্ধ-স্পর্শকে আশ্রয় করিয়া।

এই ভাবময় সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কবি অসীম বা অরূপের স্পর্শলাভ করিয়াছেন। এই সত্তার আধারে তিনি অমৃত পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মৃত্যুতে আর সব কিছুকে হারাইতে হয়, পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়, কিন্তু এই ভাব সত্তা অটুট থাকে। অনন্ত যাত্রা পথে মানবাত্মার তাহাই একমাত্র সঙ্গী।

"সে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোবের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্ব্বেরে যার লেগেছে ভালো
যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্ব্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—" (অমর্ত্ত্য)

জগতের সমস্ত কিছু দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তে যাহাকে সত্তায় অস্তিত্ববান দেখিতেছি, পরমুহূর্ত্তে তাহা অনস্তিত্ব হইয়া যাইতেছে। সমস্ত কিছু ফুরাইয়া হারাইয়া যাইতেছে, বিশীর্ণ, বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জীবনকে যখন এই দিক দিয়া দেখি তখন জীবন ও জগৎ এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা বলিয়া বোধহয়।

কিন্তু জীবন ও জগৎকে অন্য দিক দিয়াও দেখা আছে এবং তাহাই সত্যকারের দেখা। রূপ এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অরূপের আনন্দকেই ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। অরূপের মধ্যে যে আনন্দ-তত্ত্ব তাহা সীমা বা রূপ না থাকিলে কিছুতেই প্রকাশ লাভ করিতে পারিত না।

"অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে,
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই ক'রে আছে।" (পলায়নী)

"ইহা চঞ্চল এবং ইহা অচঞ্চল। ইহা দূরে ইহা নিকটে। ইহা এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ইহা এই সমস্ত কিছুর বাহিরে।" (ঈশ উপনিষদ)

"এখানে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু সেখানে আছে। সেখানে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু এখানেও আছে। যে এখানে বৈচিত্র্য দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করে।" (কঠ উপনিষদ)

"উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ আসিয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে।" (ঈশ উপনিষদ)

কেবল রূপ বা মুহূর্ত্ত সত্য হইলে কোন রূপ বা মুহূর্ত্তকে আমরা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। ইহাদের পশ্চাতে একটি স্থায়ী সম্বন্ধ-সূত্র নিশ্চয়ই আছে, যাহার সহিত যুক্ত করিয়া আমরা ক্ষণকে উপলব্ধি করিতে পারি। এই স্থায়ী সম্বন্ধ-সূত্রকেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে পরিণামবাদ। অর্থাৎ রূপের নিয়ত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া একটি ভাবের ধার বিকাশ আছে। রূপের জগৎ তাই অর্থহীন প্রহেলিকা নয়।

রূপের জগতে এই অভিব্যক্তিকে আমরা স্বীকার করিতে চাই না। এক একটি সময় আসে যখন আমরা অতীতের সমস্ত চিন্তা, ভাবনা, বোধ ও উপলব্ধিকে সজ্জিত করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। ইহাতে বিকাশ-ধারা সাময়িক ভাবে

কতকটা ব্যহত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি সময়ে প্রাণ-প্রবাহে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া জীর্ণ তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যায়।

চিন্তা বা ভাব-জগৎকে অচল করিয়া তুলিবার এই যেমন একটি চেষ্টা আছে, বস্তু জগতেও শক্তিকে ক্রমাগত বিপুল করিয়া তুলিয়া প্রাণকে নিরুদ্ধ করিবার প্রয়াস ও আছে। এই সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত নানা আলোচনা করিয়াছেন। তাহার দুই একটি অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব; তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্ম্মনীতিকে দুর্ব্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে-লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।" (পাওয়া)

"যে স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলা শক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ, সে কিছু জমতে দেয় না, কেন না জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে-যে নিত্য নূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্ম্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো ক'রে সেই গুলোকে আগলে রাখবার জন্য নিগড় বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপ গ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তু পুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয় গর্ব্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্য্যকে পরাভূত করে দিয়ে তারপরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এ সব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" (জাপান যাত্রী)

বহুদূরের প্রজ্বলন্ত, মহাবেগে ধাবমান গ্রহ-নক্ষত্র সকলকে স্থির, স্নিগ্ধ এক একটি জ্যোতির্বিন্দু বলিয়া বোধহয়। যদি এই ব্যবধান না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের ভয়ঙ্করতায়, বিপুলতায়, প্রচণ্ড গতিবেগ দৃষ্টে আমরা মুহূর্ত্তে বিমূঢ় হইয়া যাইতাম।

এই বিপুল বিশ্বের যে অধিকাংশ নর-নারী অখ্যাত, অজ্ঞাত, জীবন যাপন করিয়া যুগে যুগে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তাহাদের কতটুকু পরিচয় আমরা

জানি। সে পরিচয় বহুদূরের যেমন দূরের আকাশের নক্ষত্র মালা। তাই তাহাদের জীবনকে শান্ত, অবিক্ষুব্ধ, একান্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর বৈচিত্র্যবিহীন বলিয়া বোধ হয়।

তাহাদের হৃদয়-লোকের ঠিক মাঝখানটিতে স্থান লাভ করিতে পারিলে এক বিস্ময়কর নূতন জগৎ তাহার অন্তহীন রসবৈচিত্র্য লইয়া নিঃসন্দেহে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত।

আমরা দূর গ্রহ-নক্ষত্রের স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যাকুল,—

"কিন্তু এই-যে এই মুহূর্ত্তে বেদন হোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল
বিশ্বধারায় দেশে দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে—
আলোক তাহার, দহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে চলছে রাত্রি দিন
তাহা মর্ত্ত্যজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।" (চলতি ছবি)

এই দূরের মানব-সমাজের হৃদয়-লোকের পরিচয় লাভের জন্য কবি অন্তরের মধ্যে নিয়তই একটি ব্যাকুলতা বোধ করিতেন। তাহা লাভ না করিতে পারিলে তাঁহার বিশ্ব-প্রেম যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। প্রেমের প্রবাহ এমনি করিয়া ধীর প্রসারতা লাভ করিয়া সমগ্র মানব সমাজকে একদিন প্লাবিত করিয়া দিবে। দূরের মানুষ এইরূপে একদিন একান্ত নিকটের মানুষ হইয়া ধরা দিবে। সমগ্র মানব-সমাজে যতদিন একটি মানুষও অজ্ঞানতায় নিমগ্ন থাকিবে, দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিবে ততদিন কোন একজনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এই নিঃসংশয় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-তত্ত্বে একক মুক্তি বলিয়া কিছু নাই।

দেশ-কালের ঊর্দ্ধে কোন্ পরম পুরুষের দৃষ্টি সম্মুখে অন্তহীন রূপের তরণী ভাসিয়া চলিয়াছে, কোন্ অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া। এই রূপের প্রবাহ তাঁহার চেতনায় যে বিচিত্র বোধের ঢেউ তোলে তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। কী নির্ম্মম নিরাসক্ত এই লীলা।

এমনি নিরাসক্ত ভাবে জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুকে দেখা সম্ভব। এই যে আমার সৃষ্টি সম্মুখে ছায়া-ছবির মত সমস্ত কিছু ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাতে আমার অন্তরে আনন্দ-বেদনার যে বোধ সঞ্চারিত হইতেছে, এই বোধের সম্বন্ধ সূত্রের ভিতর দিয়া যাহা গড়িয়া উঠে তাহাকেই আমরা বলি জীবন। প্রত্যয় বা বোধ সমেত সমস্ত জীবনকে এমনি নিরাসক্ত ভাবে দেখা যে সম্ভব, তাহা কবি আপনার উপলব্ধির ভিতর দিয়াই বোধ করিয়াছেন।

"যেতে যেতেই ছাড়া
দিন রাত্রির মনটাকে দেয় নাড়া।
বেঁচে থাকার চলতি খেলা লাগছে ভালোই তবু।" (পালের নৌকা)

তাহারপর একদিন এই লীলার অবসান ঘটে। অর্থাৎ এই বিচিত্র প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের পরম্পরা প্রসূত জীবনের অবসান ঘটে। যে-আমির যোগে এই প্রত্যয়ের উপলব্ধি, এই প্রত্যয়গুলিকে অন্তরে বাহিরে দেশ-কালের মধ্যে সজ্জিত করিয়া (দেশ-কালের বোধও একটি প্রত্যয়, তাও আমার চেতনার দ্বারা গড়িয়া তোলা) আমি অন্তরে বাহিরে এই নাম-রূপ, এই অন্তর্জগৎ ও বহিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, আমির অনস্তিত্বের সঙ্গে এই সমস্ত কিছু অনস্তিত্ব হইয়া যায়। জীবনের এই স্বরূপ। ইহা আমারই লীলা। ঈশ্বরের পরিপূর্ণ লীলা-তত্ত্বের সহিত মিলিত করিয়া জীবনের এই লীলাকেওদেখা সম্ভব; কারণ উভয়ের মধ্যে স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই।

"তাহাব পবে রাত্রি আসে, দাঁড় টানা যায় থামি,
কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধার তীর্থ গামী।
ভাঁটার স্রোতে ভাসে তরী, অকূলে হয় হারা—" (পালের নৌকা)

আকাশ প্রদীপ

কবি যাহাদের প্রাণের সহিত প্রাণ মিশাইয়া এই জীবন ও জগৎকে অপরূপ সুন্দর বলিয়া বোধ করিয়াছেন, যাহাদের আশ্রয় করিয়া তাঁহার চিত্তে বিচিত্র ভাব-ভাবনার সঞ্চার হইয়াছিল, একে একে তাহারা জীবন রঙ্গভূমির নেপথ্যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কবির সে প্রেম আজ স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া আছে মাত্র। জীবনে যাহাদের কোন কালে কোন রূপে লাভ করিতে পারা যাইবে না, স্বপ্নে আমরা

তাহাদের সহিত মিলিত হইতে চাই। সে মিলন আমাদের চেতনাকে পরিণামে সেই লোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, যেখান হইতে কোন কিছু কখনই হারাইতে পারে না। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, প্রত্যক্ষ লব্ধ প্রেম একের পর এক আনন্দ-লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া পরিণামে চেতনাকে যে অন্তহীন আনন্দ-সাগরে বিলীন করিয়া দেয়, স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া আজ তাহা একের পর এক বেদনা-লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া অন্তহীন ব্যথা সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে।

> "অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে
> যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।" (আকাশ প্রদীপ)

রূপের জগতে নিরন্তর ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, কিন্তু এই রূপের অতীতে চিরন্তন একটি idea বা ভাবের জগৎ আছে। এই আকার বিহীন ভাবই একবার আকার লাভ করিতেছে, আবার তাহা ভাবমাত্র রূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। কবি বা শিল্পী বস্তু আশ্রয় করিয়া, বাণী, রঙ্গ ও রেখা আশ্রয় করিয়া সেই চিরন্তন কল্প বা ভাব-লোককে রূপায়িত করেন বলিয়া বাহিরের আশ্রয় লুপ্ত হইলেও তাহা দেশ-কাল ব্যাপ্ত করিয়া চিরকাল বিরাজ করে। আকার বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কোন রূপ-কল্পনা বা ভাবনা একান্ত রূপে হারাইয়া যায় না, আবার কোন মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্ম প্রকাশ করে। কবির এই উপলব্ধির পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার লাভ করিয়াছি, পরেও ইহার নানা পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

> "কালস্রোতে বস্তু মূর্ত্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
> আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে
> *　　*　　*
> আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
> আমার আপন রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে" (ভূমিকা)

অন্তহীন দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত যে প্রাণের প্রবাহ সেই প্রাণেরই এক একটি বিচি বিক্ষেপ এক একটি রূপ, যাহা ফল রূপে, ফুল রূপে, পত্র রূপে প্রকাশিত। এই রূপ ব্যক্তির অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া পরিণামে বক্তি-প্রাণকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

> "সে রহস্য আমি করিতাম লাভ
> যার আবির্ভাব
> অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব্ব জলে স্থলে।" (স্কুল পালানে)

ব্যক্তির অন্তরে প্রাণের যে অনুভূতি বিচিত্র ভাবনা রূপে প্রকাশ লাভ করে সেই এক প্রাণ তৃণ-তরু-লতায় পুষ্পপত্র রূপে প্রকাশিত। এক প্রাণ-স্পন্দনে মানুষ ও প্রকৃতি বিধৃত হইয়া আছে।

"যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রস রক্ত ধারে
মানব শিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।" (স্কুল পালানে)

আজ প্রাণ অবসানের দিনে, প্রাণের অনুভূতি-ক্ষীণ-জীবনে কবির সেই কালের কথাই বারংবার মনে পড়িয়া যায় যখন কবি চেতনা সহজেই প্রকৃতির যে-কোন রূপ আশ্রয় করিয়া সকল রূপের আশ্রয়ভূত, সকল রূপ যাহার দ্বারা সঞ্জীবিত আবার সকল রূপ যাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, সেই নির্ব্বিশেষ প্রাণ-চেতনায় একাকার হইয়া যাইত। আজ সেই প্রেরণা নাই, আছে সেই প্রেরণাশ্রয়ী বিচিত্র তত্ত্বোপলব্ধি।

বস্তু হইতে ভাব উপজাত হোক, অথবা ভাব হইতে বস্তুর উদ্ভব ঘটুক, রবীন্দ্র-দর্শনে ভাব ও বস্তুর চিরন্তন দ্বন্দ্ব নাই। একটি অপরটির অনিবার্য্য পরিণাম। বস্তুকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে বিজ্ঞান আজ এমন একটি পরিণামে আসিয়াছে যেখানে কেবল শক্তির স্পন্দন। এই আকার হীন শক্তির স্পন্দন-সমুদ্রে এক একটি ছন্দ-বিশিষ্ট হইয়া শক্তির যে প্রকাশ ঘটিতেছে, তাহাই এক একটি বস্তু-রূপ। মানুষের চেতনাও একটি বিশিষ্ট শক্তি-স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। পরমাণুতে বিপরীত তড়িৎ কণার মাঝে মাঝে যে ফাঁক, যে শূন্যতা, সেই শূন্যতা হইতেই যে তড়িতের বস্তু কণার উদ্ভব আজ তাহাতেও সংশয় নাই। অন্তহীন শূন্যতার বক্ষে আকারহীন শক্তি স্পন্দনের উদ্ভব, আবার এই শক্তি স্পন্দন হইতে এই রূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশ। এই ক্রম পরিণামের মধ্যে ছেদ বা বিরোধ কোথাও নাই।

"চোখে দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।" (ধ্বনি)

রূপের স্পন্দন কবি-চেতনাকে কত বারবার সকল রূপের অতীত আকারহীন মহা স্পন্দ-সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

"কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষ স্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।" (ধ্বনি)

নারীর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে আশ্রয় করিয়া বালকের অন্তরে প্রথম যে কল্পনা-লোক যে ছায়া-প্রতিমার সৃষ্টি হয়, তাহার প্রসার যেমনই হোক, তাহা প্রত্যক্ষ প্রাণের অনুভূতির যোগে তখন সত্য হইয়া উঠিতে পারে না।

"বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারী মন্ত্র আগমনী পানে
ছন্দের লাগাল দোল আধো জাগা কল্পনার শিহর দোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।"

যত অসম্পূর্ণ ভাবে হোক-না-কেন, নারীর এই মাধুর্য্যই যে বালকের কল্প-লোকের সকল দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় তাহাতে সংশয় নাই। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, প্রাণেরই অনুভূতি, যত ক্ষীণভাবেই হোক-না-কেন বালকের অন্তরেও তাহা অনুভূত হইবেই।

তাহাপর এই মানস প্রতিমার সহিত মিশিয়াছে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া কবি এই মাধুর্য্য-লোকের আভাস লাভ করিয়াছেন। এই অতল মাধুরীর প্রকাশ ঘটিতেছে নারীর সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের যে প্রকাশ সৌন্দর্য্য রূপে, নর-নারীর মধ্যে তাহারই প্রকাশ ঘটে প্রেমরূপে। ব্যক্তি প্রাণের সহিত বিশ্ব-প্রাণের যোগ যতই গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিতে থাকে, পুরুষের অন্তরে সৌন্দর্য্য-লোক ঘিরিয়া ততই অনির্ব্বচনীয়তার যেমন প্রকাশ ঘটিতে থাকে, তেমনি বিশ্বের সকল রূপ যে ওই রূপেরই বিচ্ছুরণ এমনি একপ্রকার বোধ জাগে।

অন্তরের এই সৌন্দর্য্য-লোকটিকে পুরুষের চেতনা নিঃশেষ করিয়া লাভ করিতে

পারে না। পুরুষের চেতনা যতই প্রসারিত হোক-না-কেন, নারীর মাধুর্য্য-লোক তাহার সীমাকে সকল অবস্থায় ছাড়াইয়া যায়।

প্রেমে পুরুষ-চিত্তে প্রাণের যে উপলব্ধি, এই পরিণাম তাহারও পূর্ব্বের। প্রেমে চেতনার এমন এক আশ্চর্য্য প্রসার ঘটে, যাহাতে এইখানে আসিয়া সৌন্দর্য্য-লোক পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"অকস্মাৎ একদিন কাহাব পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ;
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্ত্তেই
তুমিই কি সেই,
আঁধারেব কোন ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।" (বধূ)

সৌন্দর্য-লোকে যে মানস অভিসার তাহার অন্ত কোথাও নেই। চেতনা যতই বিকাশ লাভ করে ততই নূতন নূতন মাধুর্য্য-দিগন্তের রস-লোকের একের পর এক দ্বার উদ্ঘাটিত হইযা যায়। নিঃশেষ করিয়া যাহাকে লাভ করা যায় তাহা স-সীম, সৌন্দার্য্যের সীমা নাই বলিয়া তাহাকে কখনই কোন অবস্থায় ফুরাইয়া ফেলিতে পারা যায় না।

প্রেমের প্রথম সঞ্চার মুহূর্ত্তে নারী-রূপ বেষ্টন করিয়া মাধুর্য্যের যে মায়া-লোক সৃজিত হইয়া যায়, তাহাকে বহুদূরের, অপ্রাপণীয় বলিয়া বোধ হয়।

"ওযে দূরে, ওযে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের উর্দ্ধশাখা যেথা হতে ধীবে,
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।" (শ্যামা)

সেই মাধুর্য্য-লোকের ধ্যানে পুরুষের মন নিমগ্ন হইয়া যায়, সমগ্র সত্তাকে পরিপূর্ণ করিয়া লাবণ্যের ধারা বহিয়া যায়। তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া অন্তরের মধ্যে কত-না স্বপ্নের জাল বোনা হইতে থাকে, কিন্তু তাহাকে নিকটে লাভ করিতে পারা যায় না।

প্রেম যখন পরিচয়ের ভিতর দিয়া সত্য ও নিবিড় হয়, যখন নারী ও পুরুষ পরস্পরকে নিকটে লাভ করে তখনও এই অসম্পূর্ণতার বেদনা রহিয়া যায়। উভয়ের মাঝখানে ইহা যে অতল মাধুরীর ব্যবধান। তাহাকে পার হইয়া কেমন করিয়া

পরস্পরকে লাভ করিতে পারা যাইবে। বাহুবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও তাই কান্নার অন্ত নাই। যাহাকে লাভ করিবার জন্য কান্না তাহা তো বাহিরে কোথাও নাই, আছে অন্তরে, নিত্য নব রূপতার ভিতর দিয়া তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রেম রূপের দুয়ারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া রূপের অতীত সেই অরূপ মাধুরীকে লাভ করিতে চায়।

"তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।" (শ্যামা)

বিচ্ছেদে বা বিয়োগে এই রূপ মাধুরী যখন হারাইয়া যায়, তখন মন অন্তরে তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকে নিত্য অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে। প্রেমে অন্তরে এই যে পাওয়া তাহা বাহিরের পাওয়া অপেক্ষাও বড়। বসন্তের রূপের ঐশ্বর্য্যের, চঞ্চলতার অবসানের পর ইহা চৈত্রের ফসল পরিণাম। মানবাত্মা মৃত্যুতে কি এই সুপরিণত প্রেম বক্ষে লইয়া যাইতে পারে? কোন স্বরূপে কোথাও তাহার দান অফুরাণ, তাহার দীপ্তি অনিঃশেষ হইয়া বিরাজ করে?

"পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশ তলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোণার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই।" (শ্যামা)

নারী মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্যও প্রেমের প্রতীক। নারী বন্দনার ভিতর দিয়া কবি মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বন্দনা করিয়াছেন। কবির কাব্যে একদিকে এই সৌন্দর্য্য ও ধ্যান, অন্যদিকে চিরন্তন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা সত্য প্রেমের উপলব্ধির সহিত অনিবার্য্য রূপে জাগিবেই। মৃত্যুতে আমি হারাইয়া যাইব, বাণীর সকল বন্ধন কালে একদিন জীর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার এমন প্রেম, এমন মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠা, নিখিল বিশ্বময় বিতত হইয়া যাওয়া, সকল সীমার বোধকে ছাড়াইয়া যাওয়া, তাহাকে কি মর্ত্ত্য কোন স্বরূপে চিরন্তন করিয়া রাখিবে না?

"এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।" (প্রশ্ন)

ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণের যোগে অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে-লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় তাহাতে মানব-সত্তা এমন এক প্রাপ্তির আস্বাদে নিমগ্ন হইয়া যায় যাহার নিকট বহির্জীবনের আর সমস্ত কিছু তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। পরিণত বয়সে কবি আর সব পাইয়াছেন, বিশ্বজোড়া খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্মান, কিন্তু প্রাণের যোগে প্রাণ উপলব্ধি করিবার দিন সৌন্দর্য্যও প্রেম উপলব্ধির দিন চিরকালের জন্য অবসান লাভ করিয়াছে।

"তরুণী সে ললাটে তার
কুঙ্কুমেরি ফোঁটা,
অলকেতে সদ্য অশোক ফোটা।
সামনে পদ্ম পাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধ্যেবেলার বাতাস গন্ধে ভরে।
নিশ্বাসিয়া বললে কবি,
এই মালাটি নয় তো আমার তরে।" (বঞ্চিত)

আম্রবৃক্ষে প্রাণের সকল ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ শীতে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, বাহিরের আপাত দীনতার অন্তরালে তাহা যেন একপ্রকার প্রচ্ছন্ন হাসি। তাহার পর যখন ফাগুন আসে তখন সেই প্রচ্ছন্ন হাসি অকস্মাৎ উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসে, সুপ্ত ঐশ্বর্য্য নবীন পুষ্পে মুকুলে অফুরন্ত হইয়া উঠে।

কবির বাহিরের দীনতার অন্তরালে প্রাণের ঐশ্বর্য্য কি অমনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে মাত্র? কোন একটি পরিণাম লাভে কোন এক নূতন লোকের সম্মুখীন হইলে নূতন কোন চেতনার স্পর্শে তাহা আবার অফুরাণ হইয়া আত্ম প্রকাশ করিবে? বর্ত্তমানের দীনতা তাহারই এক লীলার ছল?

"একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হ'তে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হতে থাকে।

অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
মুকুলে মুকুলে।" (আমগাছ)

মহাশূন্য হইতে আলোর ধারা দুকূল প্লাবী বন্যার মত যেমন অবিশ্রান্ত ধারায় নামিয়া আসিতে থাকে, আর তাহারই সজ্ঘাতে সজ্ঘাতে বিচিত্র রূপ-রঙ্গ-রেখা অন্তহীন হইয়া ফুটিয়া উঠে, তেমনি কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে প্রাণের স্রোত নিম্নে নামিয়া আসিতেছে আর তাহারই সজ্ঘর্ষণে চতুর্দ্দিকে সংখ্যাতীত সত্তার মহান্ উল্লাস বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সৃষ্টির কোন্ আদিম যুগে প্রাণের এই লীলা সুরু হইয়াছিল?

প্রাণের এই মহা লীলায় মৃত্যু আছে, সত্তার বিনষ্টি আছে। কিন্তু এই মৃত্যু আছে বলিয়া মৃত্যুর শূন্যতা পূর্ণ করিয়া নিত্য নূতন প্রাণের প্রকাশ ঘটিতেছে। মৃত্যু যদি না থাকিত, রূপ যদি গতিহারা হইত তবে মুহূর্ত্তে বস্তুর পাষাণ-ভিত্তিতলে প্রাণ মহান আর্ত্তনাদ তুলিয়া চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইত। রূপ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াই তো অরূপের অনির্ব্বচনীয়তাকে প্রকাশ করিতে পারে। রূপ স্থির থাকিলে অরূপের অনির্ব্বচনীয়তা হারাইয়া মুহূর্ত্তে কালো হইয়া যাইত।

"রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশি মৃত্যুরন্ধ্রে সেই মতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।" (পাখির ভোজ)

বৃহৎ বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের মহাযজ্ঞে প্রাণী মাত্রেরই নিমন্ত্রণ। মাঝে মাঝে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসে। প্রাণ প্রাণকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতে এক এক সময় বিশ্ব জোড়া গোপন কুটিল জাল বিস্তার করে। প্রাণের কান্না মহাশূন্যে নক্ষত্র-লোক পর্য্যন্তকে স্পন্দিত করে। এই দুর্য্যোগ আবার দূর হইয়া যায়, প্রাণের তখন সহজ আনন্দ রূপ ফুটিয়া উঠে।

পুরুষ নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রতিমা গড়িয়া তুলে। পুরুষ এমনি করিয়া রূপ সৃষ্টি করিতে ভালোবাসে। আপনার সৃষ্ট রূপের

ধ্যানে সে আপনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। আপনার প্রাণ দিয়া গড়া মূর্ত্তির নিকট সে আপনার প্রাণ, ইহকাল পরকাল সমস্ত কিছু বিসর্জ্জন দিয়া বসে। ইহাই পুরুষের ধর্ম্ম। পুরুষের এই স্বধর্ম্ম কেন, তাহার বুঝি কোন উত্তর নাই।

"পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মন গড়া মূর্ত্তি রচে তারি ;" (নামকরণ)

এই আনন্দের আকারহীন আবর্ত্তনে ঘুরিতে ঘুরিতে কত উপমা কত তুলনা ভাসিয়া উঠিয়া ওই মানসী মূর্ত্তিকে সুস্পষ্ট আকার দান করে। শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে রহিয়াছে সমগ্র বিসৃষ্টির আনন্দ তত্ত্ব।

তাঁহারই অকারণ আনন্দের টানে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ মহা শূন্যলোক হইতে এই অন্তহীন রূপ-লোক প্রস্ফুটিত গোলাপের মত পূর্ণ সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর হইতে এই রূপ-লোককে তিনি অন্তহীন কাল ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার এই লীলা, এই রূপ-সৃষ্টি অহেতুক, তাই মায়া। পুরুষের সৃষ্টিও তেমনি অহেতুক, মায়া।

"এই যারে মায়া বথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে
সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা আসে মন্ত্র এই সাধনার।" (নামকরণ)

সকল রূপের অতীত যে স্পন্দন-সমুদ্রে নিত্য নব রূপের প্রকাশ ঘটিতেছে, তাহারই যোগে পুরুষের চেতনায় নিত্য নব রূপের, ছন্দ ও ধ্বনির প্রকাশ ঘটে। সৃষ্টির তাই বুদ্ধি গ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা নাই। আমরা ব্যাখ্যা করি কেবল আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য।

আমরা তাহাকেই মন্ত্র বলি যাহার ধ্বনি মাত্র (গৌন ভাবে শব্দ ও অর্থকে আশ্রয় করিলেও, কোথাও এই অর্থের আদৌ কোন আশ্রয় নাই) পরিণামে চেতনাকে বুদ্ধির অতীত লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। শ্রেষ্ঠ কাব্য-কৃতিও মন্ত্র

লক্ষণাক্রান্ত। তাহার সমগ্র বাণী-রূপটাই কবির সচেতন মানস ক্রিয়ার বহির্ভূত বিষয়।

সীমা ও অসীমের যোগের সম্পর্ক নিরূপণ বিষয়ে তাঁহার একটি নিঃসংশয় অধ্যাত্ম উপলব্ধি ছিল। এই মূল উপলব্ধিকেই তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া নানা ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই মূল উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সামগ্রিক জীবন-দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা তাঁহার মধ্যে পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচনা নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে করিয়াছি। 'তর্ক' কবিতাটির মধ্যে সেই একই ভাবের পরিচয় লাভ করা যায়।

"পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।" (তর্ক)

শুধু অরূপ বা অসীম বন্ধ্যা আপনার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় হারা। এখানে সৃষ্টি নাই, রূপ নাই, রস নাই। তাহা তাই একপ্রকার ভয়ঙ্কর শূন্য পরিণাম। অপূর্ণ অর্থাৎ সীমার সহিত (এইখানে মন বা দেশ-কালের তত্ত্ব আসিয়াছে) সজ্ঘাতে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ অন্তহীন হইয়া পড়িয়াছে।

এক জাতীয় বিশিষ্ট সাধনায় এই সীমাকে মায়া বলিয়া পরিহার করিয়া কেবলমাত্র অসীম বা অরূপকে লাভ করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে শূন্যতার সাধনা বলিয়াছেন।

"এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে
পড়ে থাকে তীরে।" (তর্ক)

অরূপের আস্বাদ লাভ করিতে হয় একমাত্র রূপকে আশ্রয় করিয়া রূপের ভিতর দিয়া। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমৃত লাভ করিতে হয়। কোন একটিকে পরিহার করিলে পূর্ণতা লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

"পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহ তরী বেয়ে তাই সুধা সাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
অসীমের ছায়া।" (তর্ক)

সীমা বা রূপকে আশ্রয় করিয়া এই যে সাধনা এই বিশ্বে তাহার একমাত্র এবং প্রধান উপকরণ নারী। নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া উঠে বাহিরে তাহার কতটুকু পরিচয় আছে। অন্তরের এই সৌন্দর্য্য-লোক আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনা মাধুর্য্য ও রস-লোকের গভীর হইতে গভীরে যাত্রা করে, পরিণামে ওই রূপ আশ্রয় করিয়া অসীমের আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়।

অন্তরে এই মোহ সঞ্চারিত করিয়া দিবার উপকরণ বিশ্বের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। যে মন এই মোহে বিস্মৃত হয় না, 'সেইখানে সৃষ্টি কর্ত্তা বিধাতার হার'। বস্তুত প্রেম আর মোহ, সীমা ও অসীম দুই বিপরীত বা বিরুদ্ধ তত্ত্ব নয়।

"নারীর সূক্ষ্ম শিল্প কারুময়া কায়া'র সহিত বিধাতা কায়ার অতীত একটি মায়া বিজড়িত করিয়া দিয়াছেন। তাহা প্রত্যক্ষ লাভের বহির্ভূত সামগ্রী। তাহার অপরূপ রূপ ধরা পড়ে একমাত্র ধ্যানে হৃদয়ের আলোকে। এই রূপকে প্রকাশ করিতে চাহিয়া শিল্পীর শিল্প, কবির কাব্য। আর তাহাকে নিঃশেষ করিয়া লাভ করিতে প্রকাশ করিতে পারা যায় না বলিয়া সকল সৃষ্টি-রূপের মধ্যে একটি বিষাদ বিজড়িত হইয়া যায়। এই মায়া আছে বলিয়া নারী রূপের মধ্যে মাধুর্য্যের অন্ত নাই। ইহাকে নিশ্চিৎ রূপে লাভ করিবার জন্য যে পুরুষ নারীকে আপনার ভোগের আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিতে চায় সে নারীকে যেমন আপনাকেও তেমনি সার্থকতা হইতে বঞ্চিত করে।

নারী-রূপ এবং বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে এই মোহ বিজড়িত হইয়া আছে। পুরুষকে এই মোহ আশ্রয় করিয়া কামনার অতীত লোকে বিচিত্র সৃষ্টি রূপে আত্ম প্রকাশ করিতে হয়। ইহার ভিতর দিয়াই এই অরূপ বা অসীমের আস্বাদ লাভ ঘটে। পূর্ণতাকে লাভ করিবার আর কোন উপায় নাই।

যুগে যুগে মানুষের কত প্রবল প্রতাপ, কত মহৎ কীর্ত্তি ধূলায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের চিহ্ন নাই। সেই সঙ্গে মানুষের সৃষ্ট কত শিল্পরূপ কত কাব্যও হারাইয়া গিয়াছে। মহাকালের বক্ষে কবির অতুল কাব্যও একদিন রেখামাত্র পাত না করিয়া শূন্যে হারাইয়া যাইবে। মানুষের সৃষ্টির প্রতি মহাকাল এমনি নির্ম্মম উদাসীন। মানুষের সকল সৃষ্টি কালে এমনি জীর্ণ হইয়া হারাইয়া যায়, কিন্তু বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত বলিয়া এই সামান্য তৃণ-তরু-লতা চিরকাল অম্লান হইয়া বিরাজ করে।

কবির সকল সৃষ্টি রূপ যদি কালে বিনিষ্ট হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি, মর্ত্ত্যের যে-প্রেম তাঁহার কণ্ঠে সুর জাগাইয়া তুলিয়াছে, সে প্রেমের প্রকাশ ক্ষণিক হইলেও তাহার বক্ষে অমৃত লুকান আছে। তাহা তাই সকল ক্ষণকালকে অতিক্রম করিয়া চিরকাল বিরাজ করিবে।

> "—প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রয়েছে
> অসংখ্য বর্ষ কালের চূড়ায়,
> তারই উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
> আমার শুনায়নী,
> ভোরবেলার শুকতারা।
> সেই ক্ষণিকের কাছে হার মানবে বিরাট কালের বৈরাগ্য।" (ময়ূরের দৃষ্টি)

নব জাতক

নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে অন্তহীন সৃষ্টি, রূপের নিত্য প্রকাশ, অন্যদিকে সৃষ্টির কী নির্ম্মম অপচয় ও বিনষ্টি। কেন মহাকাল নিত্যকাল ধরিয়া এমনি এক হাতে পরিপূর্ণ করিয়া দান করিতেছেন, আবার অন্য হাতে সব অপহরণ করিয়া লইতেছেন? তাঁহার এই লীলার অর্থ কি? এই জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ কবি জীবনের একেবারে প্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বারংবার করিয়াছেন, বারংবার মহামৌনতার মধ্যে তাঁহার এই জিজ্ঞাসা কোন উত্তর লাভ না করিতে পারিয়া মহাশূন্যে কেবল প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে।

"—একি মহাকাল কল্প কল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন।" (কেন)

এই লীলা কেবল বাহিরে রূপের জগতে নয়, মানুষের মনোরাজ্যেও অনুষ্ঠিত দেখিতে পাই। নিখিল বিশ্ব-চিত্ত-লোকে কত ভাবনার, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার, কত কল্পনার বুদ্বুদ নিয়ত জাগিয়া উঠিতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। বাহিরে কত শিল্প-রূপ, কত সৌধ, কত মহানগর বারংবার গড়িয়া উঠিয়া আবার ধূলায় হারাইয়া গিয়াছে।

"মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূত খেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন।" (কেন)

প্রভাত সঙ্গীতের 'প্রতিধ্বনি' কবিতার মধ্যে কবি আপনার যে উপলব্ধির পরিচয় বাণী-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই একটি ধারা পরবর্ত্তী কাব্যগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীথিকার 'অতীতের ছায়া' কবিতাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান কবিতাটির মধ্যে কবি তাঁহার প্রারম্ভিক জীবনের সেই উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন।

অরণ্য ও সমুদ্রের নিয়ত ক্ষুব্ধ গর্জ্জন, ঝটিকার ভয়ঙ্কর স্বনন শব্দ, দিবস রাত্রি মানব-হৃদয় ঘিরিয়া বোধের বিচিত্র সজ্ঘাত, ঋতুতে ঋতুতে মানবের নিত্য বিচিত্র প্রয়াস, বিচিত্র কলরোল, বিশ্বের বিচিত্র ধ্বনি, এই সমস্ত কিছু বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে কোথাও রহিয়া যাইতেছে। সেই কেন্দ্রস্থল হইতে তাহা আবার প্রতিধ্বনি রূপে, নূতন ধ্বনি ও সৃষ্টি-রূপে নিয়তই প্রকাশ লাভ করিতেছে। কবির সত্তা তেমনি এক প্রতিধ্বনির প্রকাশ।

"বহু যুগ যুগান্তের কোন্ এক বাণী ধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথ হারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।" (কেন)

কবির মৃত্যুতে এই কায়-বদ্ধ বাণী আবার রূপ-শূন্য অবস্থায় নক্ষত্রে নক্ষত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া বেড়াইবে। কত কল্প কল্পান্ত কাল ধরিয়া তাঁহার রূপ-হারা এই যাত্রা চলিবে কে জানে। আর সেই যাত্রা পথে এই জীবনের সকল ব্যথার সঞ্চয় ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে? কে এই রূপের পাত্র পূর্ণ করিয়া বোধের বিচিত্র রস আস্বাদ করে, আবার আস্বাদ শেষে নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া দেয়? কেন এমন পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া, কেন আবার এমন নিঃশেষ করিয়া নেওয়া?

> "আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার
> রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
> চলে যাবে বহুকোটি বৎসরের শূন্য যাত্রা পথে?
> উজাড় করিয়া দিবে তার।
> পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার
> ভোজ শেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙ্গা ভাণ্ড হেন?
> কিন্তু কেন।" (কেন)

মানুষ কেবল এই সৃষ্টির রহস্যই ভেদ করিতে চান নাই, যখন কোন সৃষ্টি ছিল না, তখনকার সেই আদি অবস্থার রহস্যও ভেদ করিতে চায়। মানব মনের সঙ্গে বিশ্ব-মানব-মনের যোগের রহস্যই শুধু ভেদ করা নয়, অনন্ত কোটি বিশ্ব-মন যে-সত্তায় ('মানুষের ধর্ম্মে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরম জাগতিক সত্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন) কেবল বুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে, মানব মন সেই সত্তারও স্বরূপ জানিতে চায়। রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্ব-মানব-মনের স্বরূপ বিশ্লেষণের বিচিত্র প্রয়াসের পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি। কবির বর্ত্তমান কাব্য-পর্য্যায়ের বিচিত্র জিজ্ঞাসা সেই পরম জাগতিক সত্তা সম্পর্কিত।

অজ্ঞাত কোন এক রূপকার তাঁহার সত্তা আশ্রয় করিয়া একটি শিল্প-রূপ যে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন তাহাতে কবির সংশয় নাই। এই শিল্প-রূপ হইল কবির অধ্যাত্ম-সত্তা। এই সত্তার নিঃসংশয় প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি 'মানসী'র মধ্যে, যাহার সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ

প্রতিমা'। এই প্রতিমা বা কবির অধ্যাত্ম-সত্তার ধীর বিকাশের বিস্তারিত পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছি।

রূপকারের যে-ধ্যান কবির অধ্যাত্ম-সত্তা আশ্রয় করিয়া ধীরে রূপলাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনে এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। তাই তাঁহার সত্তাকে ঘিরিয়া এমন অপরিচয়ের বিস্ময়, এমন বেদনার উদ্বেলতা। সেই রূপ-ধ্যান সম্পূর্ণতা লাভ করিলে বিশ্বের সকল রূপ বা সত্তার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত; কারণ সকল রূপের মধ্যে এক রহস্য নিহিত। আর সেই পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-সত্তার সহিত অরূপের প্রত্যক্ষ যোগের লীলা যে কীরূপ তাহা কবি বোধ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন। মুক্তি বলিতে কবি এই যোগের লীলাটিকে বুঝিতেন।

"মনে যে কী ছিল মোর
যেদিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে
শেষ রেখা পাতে,
সেদিন তা জানিতাম আমি;
তার আগে চেষ্টা গেছে থামি।" (ভাগ্যরাজ্য)

যে কারণের জন্যই হোক সাধনার এই অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়ার বারংবার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কবির পরবর্ত্তী জীবনের কাব্যগুলির মধ্যে। তাহার কারণ যিনি নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তিনি কবির অধ্যাত্ম ও শিল্প-সাধনার সকল রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন।

তবু এই অসম্পূর্ণ ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া কবি স্বপ্নে কত কল্প-রূপই না সৃষ্টি করিয়াছেন।

"সেই শেষ না জানার
নিত্য নিরুত্তর খানি মর্ম্মমাঝে রয়েছে আমার;
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি।" (ভাগ্যরাজ্য)

মৃত্তিকা নিম্নের বীজ আলোর ইঙ্গিত বক্ষে করিয়া অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া চলে। বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে যখন তাহার লেশমাত্র পরিচয় নাই, বরং সর্ব্বত্রই নির্ম্মম প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতি তখনও সে তাহার বিশ্বাস হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। তাহারপর একদিন তাহার এই যাত্রার অবসান ঘটে, যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া

সে আলোকে বাহির হইয়া আসে। আলোর সহিত আকাশের সহিত তখন তাহার প্রত্যক্ষ যোগের লীলা।

একথা সমগ্র বিশ্ব-লোক সম্পর্কেও সত্য। একটি আবেগের প্রেরণা বক্ষে লইয়া সে ক্রমাগত পথ পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে। কোথায় গিয়া কোন্ পরিণামে তাহার এই যাত্রার অবসান ঘটিবে তাহা আমরা জানি না, তবে তাহার যে একটি ধ্রুব পরিণাম আছে তাহাতে সংশয় নাই। ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কেও একথা সত্য। মাঝে মাঝে মানব মনের উপর কোন্ অজানিত লোক হইতে চকিতে আলোক উদ্ভাসিত হইয়া যায়, তাহার কোন স্বরূপ আমরা জানি না, তবে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে একটি স্থির প্রত্যয় কেমন করিয়া গড়িয়া উঠে, যাহাতে যাত্রার লক্ষ্য সম্পর্কে বারংবার আমরা সচেতন হই। যতদিন না এই যাত্রার অবসান ঘটিতেছে, ততদিন ইহার সম্পূর্ণ অর্থ আমরা কোন মতেই বোধ করিতে পারিব না। 'রাতের গাড়ি' কবিতাটির কয়েকটি অংশ পরপর উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে মূল এই ভাবটির প্রকাশ ঘটিয়াছে।

> "ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
> পার হয়ে যায় চলি!
> অজানার পরে অজানায়,
> অদৃশ্য ঠিকানায়।" (রাতের গাড়ি)
> "বলে, সে অনিশ্চিৎ, তবু জানে অতি
> নিশ্চিৎ তাব গতি।" (রাতের গাড়ি)
> "ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
> কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে।" (রাতের গাড়ি)

ইস্‌টেশনের নিয়ত আসা ও যাওয়ার, মিলনও বিরহের নিত্য লীলা কবির দৃষ্টি সমক্ষে সমগ্র বিশ্বের এই লীলা-রূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

> "চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
> মনেতে দেয় আনি
> নিত্য মেলার নিত্য ভোলার ভাষা
> কেবল যাওয়া-আসা।" (ইস্‌টেশন)

সমগ্র বিশ্বে একদিকে কেবলই যাওয়া কেবলই হারাণ কেবলই মুছিয়া মুছিয়া যাওয়া, আর অন্যদিকে সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া কেবল নূতন নূতন রূপের ফুটিয়া

ফুটিয়া ওঠা। কোন উদাসীন চিত্রকরের ইহা যেন নিতকাল ধরিয়া অন্তহীন অপরূপ ছবি ফুটাইয়া তোলা, আবার তাহাকে নির্ম্মম হস্তে মুছিয়া দেওয়া।

"ওদের চলা ওদের পড়ে থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে:
কেবল ছবি আঁকায়।
* * *
চিত্রকরের বিশ্ব ভুবনখানি
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।" (ইস্টেশন)

সাধারণ মানুষের রূপ সাক্ষাৎকারের সঙ্গে হৃদয়বোধ বিজড়িত থাকে বলিয়া রূপের প্রকাশ ও বিলয় সৃষ্টি ও বিনষ্টি তাহাদের অন্তরকে আনন্দ-বেদনায় নিয়ত বিক্ষুব্ধ করিয়া রাখে। হৃদয়বোধকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে জগৎ-সংসারের এই লীলা-রূপটিকে সামগ্রিক রূপে দেখা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

বিসৃষ্টির ক্রম বিপরিণামকে ধ্বনি-তত্ত্ব, (এই ধ্বনি-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় শব্দ ব্রহ্ম বা স্ফোটবাদের সুবৃহৎ দার্শনিক পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্ত্র সাধনার মন্ত্রভাগ এই ধ্বনি-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত) সুর, ভাব বা রূপ-তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনে এই প্রত্যেকটি দিক ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তবে সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বকে কেবল মাত্র রূপ-তত্ত্বের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সেই লক্ষ্য করা যায়। এই সময় হইতে তাঁহার শিল্প-সৃষ্টি আশ্চর্য্য প্রাচুর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ নূতন এক রূপের জগতের দ্বার আকস্মিক ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

"দুবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইস্টেশনে একা।" (ইস্টেশন)

কবির অন্তর্জীবনকে আশ্রয় করিয়া যে অদৃশ্য চেতনা ধীরে একটি রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আপনার সেই শিল্প-রূপকে কবি আপনি কি সম্পূর্ণ রূপে চিনিতেন। তাহার কতকটা প্রত্যক্ষ গোচর, অধিকাংশ বোধের সীমার বাহিরে। কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া সেই শিল্প-রূপেরই কতকটা আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মের আশ্রয়ভূত, মর্ম্মগত সেই যে কল্প-লোক, তাহার কতকটা আভাস হয়ত তিনি লাভ করিতে পারেন, যিনি সামগ্রিক ভাবে কবির সৃষ্টি-চেতনার সহিত আপনার চেতনাকে যুক্ত করিতে সমর্থ।

কবির এই অন্তর্জ্জগৎ বা অধ্যাত্ম-লোক, যাহা সৌন্দর্য্য-প্রেমের ধ্যান-লোকই, তাহার ধীর উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির পরিচয় লাভই কবির যথার্থ পরিচয় লাভ। বাহিরে বিচিত্র কর্ম্ম, বিচিত্র লৌকিক অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্যে তাঁহার যে পরিচয় ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহার অন্য মূল্য যাহাই থাক, তাহাকে আশ্রয় করিয়া কবির যথার্থ পরিচয় লাভ কখনই সম্ভব নয়। এ কথা কবি স্বয়ং নানাভাবে বলিয়াছেন। 'আমায় খুঁজো না অমন করে আমায় খুঁজো না বাহিরে'। এই জীবনের সমগ্র প্রকাশ, যথার্থ রূপ একমাত্র তাঁহার দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত যিনি এই জীবনকে ধীরে রূপদান করিতেছেন।

"কাল সমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্ত্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।" (জন্মদিন)

কেবল তাহাই নয়, আমরা মানুষকে জানি আমাদের বিচিত্র সীমিত বোধ, বিচিত্র সংস্কারের সহিত অন্বিত করিয়া, বিচ্ছিন্ন পরিচয়ের সহিত কল্পনা মিশাইয়া। তাহা এইরূপে আমাদের মনগড়া আর একটি মূর্ত্তি হইয়া উঠে।

"বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।" (জন্মদিন)

মৃত্যুতে এই দেহ-রূপের বিনষ্টির সঙ্গে, তাঁহার অন্তরের শিল্প-রূপেরও যে বিনষ্টি ঘটে তাহা সত্য। যদি তাই হয়, তবে মানুষের মন দিয়া গড়া কবির রূপও একদিন নিঃশেষে হারাইয়া যাইবে তাহাও সত্য।

রবীন্দ্র-কাব্যে সত্তার বিস্ময় বোধের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নক্ষত্র-লোক হইতে তৃণ-পুষ্প পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল অস্তিত্বের মাঝখানে আমার সত্তাও রহিয়াছে। এই বিস্ময়ের পার কোথায়! যে এক চেতনা সকল সত্তার পশ্চাতে থাকিয়া বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই এক চেতনা আমার মধ্যেও বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে প্রকাশমান। পরম অস্তিত্বের সহিত যুক্ত হইয়া সকল রূপের সহিত যে মিলন বোধ, তাহারও বিস্ময়ের অন্ত নাই। আমার অস্তিত্ব যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ হোক, আমি নহিলে বিশ্বের ছবি কোন-না-কোন রূপে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। আমার অস্তিত্বের এই মূল্যবোধেরও বিস্ময় অপার। বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রঙ্গ, বিচিত্র গন্ধ-স্পর্শের সহিত সজ্ঞাতে আমার চেতনার ধীর বিকাশ ঘটিয়াছে। আমার এই সত্তার প্রকাশের পশ্চাতে জল-স্থল-আকাশের কত কোটি কল্প বৎসরের সাধনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সত্তাকে ঘিরিয়া তাই অন্তহীন বিস্ময়। সকল অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ কাল ধরিয়া আমার চেতনার প্রসার। এ কী বিস্ময়। রবীন্দ্র-কাব্যে এই প্রত্যেকটি বোধের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে এই বোধেরই একটি প্রকাশ।

"আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্যগতি।
বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্প পরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।" (প্রশ্ন)

বহু দূরের চিন্তার অতীত বিপুল এক নক্ষত্র-লোকের বিস্ময় একটি সত্তাকে ঘিরিয়া প্রকাশিত। নক্ষত্র-লোকের মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্প রাশি, অগ্নিপিণ্ড যেমন নিয়ত আলোড়ন, আবর্ত্তন তুলিতেছে, প্রবল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, সঙ্কোচন ও প্রসারণের ভয়ঙ্কর লীলা চলিতেছে, মানবিক বিচিত্র বোধের মধ্যে তেমনি নিয়ত সজ্ঞাত চলিতেছে। বিচিত্র বোধ সমন্বিত সত্তার এই প্রকাশ কী বোধাতীত বিপুল।

মৃত্যুতে এই অচিন্তনীয় রহস্য পরিপূর্ণ সত্তা আবার বুদ্বুদের মত কোথায় চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়।

"এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নামি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্ত্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানা রঙা জলবিম্ব প্রায়," (প্রশ্ন)

সত্তার এই সৃষ্টি ও বিনষ্টির হয়ত কোন অর্থ আছে, কিন্তু কবির নিকট তাহা অজ্ঞাত। বিস্ময়বোধ কবিতাটির মুখ্য প্রেরণা নয়, অসম্পূর্ণতার বেদনাবোধই কবিতাটির মর্ম্মমূলে স্পন্দিত।

"অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা।" (প্রশ্ন)

যখন কবি এই মর্ত্ত্যে থাকিবেন না, তখনও আকাশে অগণিত নক্ষত্র-লোক বিরাজ করিবে, আর অনির্ব্বাণ জ্যোতি শূন্য হইতে মহাশূন্যে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিবে। এই মহৎ সৃষ্টি ও বিনষ্টির অর্থ তখনও মানবের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে।

"তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে,
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্ত্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।" (প্রশ্ন)

সৌন্দর্য্য নারীর হোক বা প্রকৃতির হোক, তাহার মধ্যে রূপের অতীত অনির্ব্বচনীয় একটি মায়া আছে। এই মায়া বা মোহকে আশ্রয় করিয়া নারী ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পুরুষের অন্তরে আর এক সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্টি করে। চেতনা যতই সমুন্নতি লাভ করিতে থাকে, এই সৌন্দর্য্য-লোক ততই গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিয়া চলে, ততই তাহা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে। এই সৌন্দর্য্য-লোককে আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনা রস বা মাধুর্য্য-লোকের গভীরে নিমজ্জিত হইতে থাকে। এই সৌন্দর্য্যমুখীনতাই পুরুষকে ধ্যানী ও মিস্টিক করিয়া তুলে। কবির কাব্যে ও শিল্পীর শিল্পে এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানেরই রূপায়ণ। এই সৌন্দর্য্যের তরী

বাহিয়া পুরুষের চেতনা সুধা-সাগর পারে অসীম ক অরূপের আভাস লাভ করে। রূপের আশ্রয় না হইলে অরূপের আভাস লাভ করিতে পারা যায় না।

"যে কল্প লোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।" (রোমাণ্টিক)

কবিতাটির মধ্যে বাস্তব-প্রেরণা ও সৌন্দর্য্য-প্রেরণা একটি অখণ্ড বোধের সূত্রে বিধৃত না হইয়া স্পষ্টই দ্বিধা হইয়া গিয়াছে।

আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনার দ্বারা বহির্বিশ্বকে আমরা যতটুকু আবেষ্টন করিতে পারি ততটুকুই আমাদের বোধের জগৎ। তাহার বাহিরে যে কোন জগৎ আছে আমার উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাহার কোন প্রমান নাই। এমনি ভাবে প্রত্যেকটি মানুষ পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি জগতের মধ্যে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। একের বোধের জগৎ হইতে অন্যের বোধের জগতে প্রবেশ করিবার কোন উপায় নাই।

"বিচিত্র বোধের এ ভুবন
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।" (প্রজাপতি)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-মনের তত্ত্বের পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। বিশ্ব-মন নিখিল মানব মনের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। নিখিল মানব মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা অনন্ত ব্যাপ্ত। তাহা না হইলে মনের বিকাশ ঘটিতে পারিত না। নিখিল মানব মনের বিকাশ যতই ঘটুক না কেন, তাহা কোন পরিণামে বিশ্ব-মনকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।

প্রত্যেকটি মন বিশ্ব মনের সহিত যুক্ত বলিয়া আমরা পার্থক্য সত্ত্বেও অন্য মনের পরিচয় লাভ করিতে পারি। তাহা না হইলে অন্য মনের কোন উপলব্ধিই আমাদের ঘটিত না। 'লক্ষকোটি বোধের ভুবন' হইলেও সকল ভুবন এক সত্তার সহিত যুক্ত বলিয়া তাহা কোন পরিণামে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারিতেছে না।

বিশ্ব-মনের বা দেশ-কালের উর্দ্ধতর সত্তার অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার নাম তিনি দিয়াছেন, পরম জাগতিক সত্তা। তবে মানবীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহাকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এই

সত্তায় মানবীয় চেতনার কোন গতি নাই। পরে তিনি বোধ করেন মানবীয় চেতনা দেশ-কালের সীমাকেও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে যে ভিন্নতর চেতনা-লোকের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা যে দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর চেতনা বা বিশ্ব-মনের তত্ত্বের ঊর্দ্ধতর তত্ত্ব তাহাতে কোন সংশয় নাই।

"কী আছে বা নাই কী এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে
আমার চৈতন্য সীমা অতিক্রম করি' বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপ পুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর।" (প্রজাপতি)

তিনি তাঁহার কাব্য-সাধনার, অধ্যাত্ম-সাধনাই বটে, অসম্পূর্ণতার কথা বারংবার বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি প্রথম সচেতন হন বলাকা কাব্য-গ্রন্থ রচনার সময় হইতে। পরবর্ত্তী কাব্য-ধারার মধ্যে এই অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়া যে ক্রমাগত গভীর হইয়া চলিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই ধারার একটি পরিচয় দানের চেষ্টা পূর্ব্বাপর করিয়া আসিয়াছি। এই অসম্পূর্ণতার কারণ সম্পর্কেও কবি সচেতন।

তিনি বিশ্বের কেবল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের দিকটিকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকে বাণী-রূপ দান করিয়াছেন; কিন্তু বিশ্বে কেবল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যই নাই, নির্ম্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও ভয়ঙ্করতার দিকও আছে, যেখানে মানুষের দেবভাগ নিয়তই নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া এই দিকটিকে তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধ্যানে ডুবিয়া থাকিয়াও তিনি যে বেদনা ও অসম্পূর্ণতা বোধ করিতেন তাহা যে বিশ্বকে তাহার সামগ্রিক স্বরূপে না লাভ করিতে পারিবার জন্য, তাহা বোধ না করিয়া তিনি প্রাণপণে অসুন্দর ভাগটিকে আরো একান্ত করিয়া পরিহার করিবার চেষ্টা করেন। অনেক পরে যখন আপনার ভ্রম সম্পর্কে সচেতন হন, তখন জীবনে নূতন করিয়া সাধনা সুরু করিবার দিন অবসিত হইয়াছে।

তিনি উপলব্ধি করেন বিশ্ব-সত্তা অখণ্ড বা পরিপূর্ণ রূপময় কোন সত্তা নয়। তাহা রূপ-বিরূপের এক আশ্চর্য্য সমন্বয়; কিংবা তাহাও নয়, কারণ রূপ-বিরূপের বোধ মানসিক, তাহা অনির্ব্বচনীয় এক সত্য স্বরূপ। তিনি তাঁহার ইতিপূর্ব্বের কাব্য-সাধনার পরিচয় এই ভাবে দান করিয়াছেন।

"সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে;
তার সঙ্গীতের তালে
ছন্দো ভঙ্গ হল তাই,—" (রূপ-বিরূপ)

অভিব্যক্তিবাদকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ দিক দিয়া কতটা পরিমাণে স্বীকার করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ হইতে তাহা কোথায় বিশিষ্ট তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি।

প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যেখানে জড় ও চেতনার, দেহ ও আত্মার সৎ ও অসতের, 'Matter' ও 'form'র চিরন্তন দ্বন্দ্বকে স্বীকার করা হইয়াছে, (ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি) সেখানে কোথাও অভিব্যক্তিকে আদৌ স্বীকার করা হয় নাই, (ভারতীয় দর্শনে এই অস্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়) কোথাও আংশিক এবং কতকটা বিশিষ্ট অর্থে স্বীকার করা হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারার সেই স্বীকৃতির পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতি দুইটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"The doctrine of matter and form in Aristotle is connected with the distinction of potentiality and actuality. Bare mattar is conceived as a potentiality of form : all change is what we should call 'evolution', in the sense that after the change thing in question has more form than before. That which has more form is considred to be more 'actual'. God is pure form and pure actuality; in Him, therefore, there can be no change. It will be seen that this doctrine is optimistic and teleological; the universe and everything in it is developing towards something continually better than what went before."

"Only God consists of form without matter. The world is continually evolving towards a greater degree of form, and thus becoming progressively more like God. But the process can not be completed, because matter can not be wholly eliminated. This is a religion of progress and evolution, but God's

static perfection moves the world only through the love that finite beings feel for Him." (History of Western Philosophy : Bertrand Russel)

বিশ্ব-চিন্তার ইতিহাসে কয়েকটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঈশ্বরীয় প্রকাশ (revealation) ও সৃষ্টি তত্ত্বকে নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। (ইহা মানুষের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার দিক) আর একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। তৃতীয় ধারা হইল এই উভয় চিন্তাধারা অর্থাৎ মন ও অতি মনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। যাঁহারা এই দুটি ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া, সেইহেতু কোন অবস্থায় সমন্বয় সাধন করা যাইতে পারে না বলিয়া বোধ করেন, অথচ দুই ধারাকে পৃথক পৃথক ভাবে মূল্য দিতে প্রস্তুত তাহারও একটি ধারা আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে মধ্যযুগে বিচিত্র দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতির উদ্ভব হয়। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র মিল তো ছিলই না, বরং বিরুদ্ধ ও বৈপরীত্যই অধিক ছিল ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের কতকগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বিশ্বাসবোধ ছিল। ইহাও লক্ষণীয় যে এই সাধারণ বিশ্বাসবোধ গড়িয়া উঠে, কোন একটি বিশিষ্ট প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া নয়, ইহাকে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সাধারণ চিন্তাধারার একপ্রকার প্রাকৃতিক বিকাশ বলা যাইতে পারে।

এই সাধারণ বিশ্বাসবোধকে আশ্রয় করিযা যে দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠে, তাহাকে ইংরেজীতে scholastic দর্শন বলা হয়।

"The Middle Ages produced a Mahommedan Scholasticism in the East, as well as a Catholic Scholasticism in the West. The Vedanta embodies a Brahminical Scholasticism, the writings of the Jewish Philo, a Jewish Scholasticism and nearer home nothing would hinder us from speaking of a protestant Scholasticism." (Maurice De Wulf)

এই দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Christian of the East and Christian of the West, Arabians and the Jews alike, belong to a theological epoch, and give a systematic conception of the world and of life, in which God and Immortality hold the foremost place, and which embodies in varying proportions, religion and theology, Greek and Latin philosophy, especially Neo-Platonism, together with the scientific affirmations of antiquity and of contemporary explorers." (M. Picavet)

"The deepest and widest character of scholasticism is the union of Philosophy with theology, or, to express it otherwise, of human and natural science with divine and revealed science." (Gonzalez)

মধ্য যুগের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, আনন্দ কেন্টিশ কুমার স্বামীর নিম্নের উদ্ধৃত উক্তি কয়েকটির মধ্যে তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"মৃত্যুতে জীবের আর সমস্ত কিছু বিনাশ পায়, কেবল 'নাম' অবিনশ্বর হইয়া থাকে। 'নাম' হইল 'ভাব' এবং চেতনার মধ্যে কর্ম্মের মূল প্রতিরূপ স্বরূপ নামের চিরন্তন স্থায়িত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই ব্যক্তি-সত্তা। ইহার 'মনন' আমাদের 'স্থিতি'। "শিল্পীর মধ্যে শিল্প" একহার্ট, ১,২৮৫, ঈশ্বর-বুদ্ধি অথবা বৌদ্ধ-আলয়-বিজ্ঞান, একহার্ট যাহাকে বলেন আমাদের 'ভাব ও বিদেহী রূপের ভাণ্ডার,' ১,৪০২ "ঈশ্বরের শিল্প" ১,৪৬১, "দিব্য-সত্তার মধ্যে সকল জীবের স্বাভাবিক প্রকাশ রূপ আদর্শীকৃত", ১,২৫০। সত্তার সকল আনুষঙ্গিক গুণের ব্যক্তিগত মূল প্রতিরূপের চিরন্তনতা এবং ব্যক্তি-আত্মার চিরন্তনতা এক বস্তু নয়, কারণ আত্মা কোন উপায়ে পুনস্কার নয়, উহা নিছক অমূর্ত্ত্য এবং নামাত্মক।" (অনূদিত)

"যাঁহারা এখনও সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ নন, অথচ উহা লাভ করিবার পথে, কিংবা যাঁহারা সৎ কর্ম্মের দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেন। এই স্থায়িত্ব দিব্য-অস্তিত্বের কোন একটি নিম্নতর স্তর। এখানে আত্মা কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল ভোগ করেন। এখানে হয়ত তিনি বৈকুণ্ঠ-লোক পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারেন এবং আপনার শাশ্বত মূল প্রতিরূপের মধ্যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, 'জীবন গ্রন্থে'র মধ্যে তাঁহার নাম লিখিত। ইহা তাঁহারই স্বরূপ, কারণ প্রকাশমান 'পুত্রের' মধ্যে তাঁহার অবস্থান। "আত্মা তাঁহার জৈবিক সত্তা পরিহার করিলে তাঁহার অনন্ভুত মূল প্রতিরূপ (নাম) উদ্ভাসিত হইয়া যায়, এখানে আত্মা বিগ্রহের মূল প্রতিরূপ অনুসারে অনভুতির মধ্যে আপনাকে আবিষ্কার করে," একহার্ট ১,১৭৫ অর্থাৎ তিনি আপনাকে আদর্শবস্তু, খ্রীষ্ট, মেষ, অশ্ব, প্রজাপতি, বৎসরের মধ্যে দেখিতে পান। এই সত্তা সেখানে পূর্ণ বিকশিত, পুষ্পিত, আপনার অস্তিত্বের ভূমিতে ইহা প্রথম উদ্গত কলিকা, এখানে সমস্ত উপলব্ধ, এখানে ঈশ্বর আপনাকে অর্থাৎ আনন্দ উপলব্ধি করেন, একহার্ট ১,২৯০ এবং ৮২।" (অনূদিত)

"কিন্তু এই অবস্থা যত মহান যত আকাঙ্ক্ষিত হোক-না-কেন এবং চিন্তার অতীত (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪র্থ অধ্যায় ৩, ৩৩, তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১২,৮) যেমনই আনন্দ হোক-না-কেন তাহা দিব্য মিলনের সর্ব্বশেষ পরিণাম নয় বলিয়া আত্মার আবাস স্থল নয়।" একহার্ট "সর্ব্বজ্ঞতা ছাড়া নির্ব্বাণ নাই" সৎ ধর্ম্ম পুণ্ডরিক ৫ম অধ্যায় ৭৪,৭৫ "জ্ঞাতব্য সমস্ত কিছু না জানা পর্য্যন্ত আত্মা অপরিচিত সৎকে লাভ করিতে পারে না," একহার্ট ১,৩৮৫। ইহা তাই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কিংবা খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গীতে সর্ব্বশেষ পরিণাম নয়। কারণ "আপনার আদর্শ বস্তুর মধ্যে আত্মা যে শাশ্বত প্রকৃতি

প্রত্যক্ষ করে, তাহা বহুত্ববোধ সমন্বিত, কারণ ব্যক্তি-সত্তা পৃথক। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "কেহ আমার মধ্য দিয়া ছাড়া পরম পিতার নিকট আসিতে পারে না।" যদিও তাঁহার মধ্যে আত্মার আবাসস্থল নাই, যিশুর বাণী অনুসারে, আত্মাকে তাঁহার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

"এই উদ্ভিন্ন করিয়া যাইবার মধ্যে আত্মার দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটে এবং প্রথম মৃত্যু অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব পূর্ণ।" একহার্ট, ১,২৭৫ "তাঁহার প্রকাশের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করেন এবং যে উৎস হইতে আমরা আসিয়াছি তাহার মধ্যে ফিরিয়া যান—এই দ্বারের ভিতর দিয়া সমস্ত কিছু তাহাদের পরমানন্দের মধ্যে ফিরিয়া যায়," একহার্ট ১,৪০০। ইহার প্রকাশ বৈদিক দেবতা আদিত্যের মধ্যে। ইনি লোক-দ্বার। ইহার ভিতর দিয়া তত্ত্বজ্ঞকে ব্রহ্মলোকে (প্রাণারাম, আত্মার লীলাস্থল) প্রবেশ করিতে হয়।" (অনূদিত) (A New Approach to the Vedas)

অধ্যাত্ম-সাধনা এবং বৈজ্ঞানিক সত্যোপলব্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মধ্যযুগে ফুটিয়া উঠে, তাহারই একটি ধারা আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে। জীন্‌স্, এডিংটন, বাটলার প্রভৃতির মধ্যে এই জাতীয় চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে কেবল Samuel Butler-এর ধর্ম্ম সম্পর্কে Basil willeyর দুই একটি মন্তব্য কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

"He hoped, he said, that his purposive theory of evolution might help to reconcile 'the two main opposing currents of English thought :—the one which starts from God and the other which starts from the creation ; both can meet in accepting on all-pervading mind and purpose, though they reach this conception from opposite side." (Basil Willey)

"Instead of deifying Humanity, he deifies all living creatures, all Life, the Life Force. There is no meaning, he says, in the idea of a God who is not a living person ; 'an impersonal God is as much a contradiction in terms as an impersonal person'. Where are we to find this person ? There is no harm in using the word 'God' to mean the personification of 'our own highest ideal of power, wisdom and duration', bnt a personification is not a person. 'God is', he concludes, 'the animal and vegetable world. and the animal and vegetable world is God,' a vast leviathan, composed of all living creatures as the body is composed of cells. What then of the mineral kingdom—is this no part of the kingdom of God ? This very question afterwards occured to Butler, and he realized that he could not logically deny life to every material particle in the universe. * * * If all life is God, the whole universe is the living God, and mind is omnipresent. The Life Everlasting is life in this God * * *.

This, then, is 'God the known'. Butler goes on to ask, what can this 'panzoism' tell us of the origin of matter, or of the primordial life-cell ? The

world was made and prepared to receive life; hence there must have been a 'designer', some far vaster person who looms out behind our God. If so 'we are members indeed of the God of this world but we are not his children; we are children of the unknown and Vaster God who called him into existence'. Butler's God, then, is not only composed of material units, but is himself a unit in an unknown and vaster personality, who is composed of Gods. This is God the Unknown. It is remarkable that Butler, having reduced God to 'all life considered as a whole, goes on to bring in-almost as an after thought—this super God who really is transcendent, and who has designed the world and the world-God. To which is our worship and reverence due? He says in one place that his world God, being living and visible, can be believed in, loved and devotedly served; it is presumably to him, then, that are in duty bound. But this lacks the luminous quality of the super God, he has no power to inspire reverence or demand service." (Basil Willey)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সকল ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার, দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক সকল সত্যের যে পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ওই প্রত্যেকটি যুগের প্রামাণ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত কেবল উদ্ধৃত করিলাম।

চিত্রা কাব্যে জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতা রচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রথম সুস্পষ্ট রূপে বোধ করেন (মানসী কাব্যের মধ্যে এই বোধের প্রথম সঞ্চার লক্ষ্য করা যায়।) কোন এক দিব্য অভিপ্রায় তাঁহার জীবন ও সৃষ্টি-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে চায়। এই সম্পর্কে কবি জীবনের প্রথম হইতেই এক প্রকার সচেতন ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের এক একটি বিশেষ ভাবের সুসম্পূর্ণ প্রকাশ হইলেও তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ভাবের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রহিয়াছে। কোন এক শিল্পী তাঁহার অন্তরের মধ্যে থাকিয়া অপূর্ব্ব কোন একটি ভাব, অজ্ঞাত কোন একটি ধ্যান-রূপকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। এই অজ্ঞাত একটি অভিপ্রায় আছে বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি-কর্ম্ম সচেতন ভাবনাকে অতিক্রম করিয়া এমন একটি ভাবকে প্রকাশ করিতেছে, যাহার সম্বন্ধ-সূত্রে তাঁহার পূর্ব্বাপর সমগ্র কাব্য বিধৃত। এই পরিপূর্ণ ধ্যান-রূপটি কি? কবির জীবনে তাহা পরিণামী বলিয়া তাহা নির্দ্দেশ করা অসাধ্য। তবে কবির সমগ্র কাব্য-প্রবাহ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কিছু আভাস বা ইঙ্গিত লাভ

করা যাইতে পারে মাত্র। যখন জীবনে ও সৃষ্টি-কর্ম্মে এই ধ্যান-রূপ সম্পূর্ণ হয় কেবল মাত্র তখনই তাহার পরিচয় লাভ সম্ভব।

সত্তার স্বধর্ম্মের ভিতর দিয়া এই যে ধীর বিকাশ ও সম্পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের নিকট ইহাই মুক্তি। ঔপনিষদিক বা বৌদ্ধ নির্ব্বাণ মুক্তির সহিত রবীন্দ্রনাথের এই মুক্তি-তত্ত্বে যে সুদূর কোন সাদৃশ্য নাই তাহা নিশ্চয় আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

তাঁহার বর্ত্তমান সত্তা ও সৃষ্টি-রূপ অতীত কত জন্মের ধীর বিকাশের ফল স্বরূপ। যতদিন না এই সত্তা এবং তাঁহার সৃষ্টি-রূপাশ্রয়ী ধ্যান পূর্ণতা লাভ করিতেছে, ততদিন জন্ম হইতে জন্মান্তর লোক হইতে লোকান্তর লাভের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন-লীলা অব্যাহত থাকিবে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফল লাভের সহিত যুক্ত করিয়া ভারতীয় জীবন-দর্শনে যে জন্মান্তর তত্ত্ব রহিয়াছে তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তর তত্ত্বের সুদূর কোন সম্পর্ক নাই। রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তর তত্ত্বে রহিয়াছে সত্তার বা রূপের ধীর বিকাশ ও পরিণামে সম্পূর্ণতা, অন্যদিকে ভারতীয় জন্মান্তর তত্ত্বে রহিযাছে সত্তার ধীর বিনষ্টি ও পরিণামে নিশ্চিহ্নতা।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে তেমনি তিনি এই পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই। এইজন্য অসম্পূর্ণতার বেদনা বহন করিয়া তাঁহাকে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু এই সম্পর্কে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল যে ইহার জন্য তাঁহাকে আরো একটি জীবনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে মাত্র। অপরিপূর্ণতায়, অসম্পূর্ণ জানায় জীবনের ছেদ হইতেই পারে না।

তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া একটি ধ্যান-রূপ যেমন ধীর বিকাশ লাভ করিতেছে, তেমনি সকল অতীত সমেত সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে একটি সমগ্রতার ধ্যান ধীরে রূপলাভ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, এই সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। ব্যক্তি-সত্তার মুক্তি বলিতে তিনি যেমন সত্তার সম্পূর্ণতা বুঝিতেন, তেমনি বিশ্বের মুক্তি বলিতে তিনি বিশ্ব-মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া যে ধ্যান ধীরে রূপ লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহারই সম্পূর্ণতা বুঝিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবন-দর্শন এই গতি ও বিকাশ তত্ত্বের সহিত বিজড়িত। অথচ

ভারতীয় জীবন-দর্শনে বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের জীবন-সাধনায় এই গতি ও বিকাশ তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইরূপে বিশ্বের প্রত্যেকটি নর-নারী আপন আপন স্বধর্মের পূর্ণতা সাধন করিয়া (স্বধর্মে স্থিত হইয়া) বিশ্ব-মনের রূপ-ধ্যানকেই পরিণামে বিশ্বে ফুটাইয়া তুলিবে। উভয়ের ইচ্ছা ও কর্মের মধ্যে তাই পরিণামে বিরোধ অসম্ভব। ইহাতে ব্যক্তি বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মুক্তিলাভ করিয়াও বিশ্ব-সত্তার অমোঘ নিয়মকে আনন্দে চরিতার্থ করিবে।

Whiteheadর ঈশ্বরীয় সত্তার স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া Charles Hart shorne একস্থলে মন্তব্য করিযাছেন,

"—it is not God as conceived by Whitehead who is (nearly) coincident with God as thought by of Aristotle, but a radically different thing-the Primordial Nature of God. No to entities could be more diverse, the one the purely 'abstract' form, radically empty or 'deficient in actuality', of Deity in its bare eternal identity, and the other by incomparable richness of the concrete divine actuality." (Whitehead and Contemporary Philosophy : Charles Hart Shorne)

Whilehead যে পরিপূর্ণ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরীযবোধের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। Aristotleর ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সহিত ঔপনিষদিক ব্রহ্মের তত্ত্বত কোন পার্থক্য নাই। ইহা সকল পূর্ণতার অতীত অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহার মধ্যে মানবিক বা জাগতিক বিচিত্র বিরুদ্ধবোধের আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মুক্তির ক্ষেত্রে তাই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা অপরিহার্য্য।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা ও কাব্য-সাধনা পৃথক ছিল না। তাই কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে, বিশ্বের সকল রূপ ও বিরূপের সমন্বয় তত্ত্বটিকে লাভ করিবার চেষ্টা ধীরে তীব্র হইয়া পরিণামে একটি আর্তিরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ইহা রবীন্দ্রনাথের একক জীবনের বিশিষ্ট কোন সাধন-পদ্ধতি ও দার্শনিক উপলব্ধি নয়। ইহাকে আধুনিক যুগের পূর্ণ জীবন-দর্শন লাভের সাধনা বলা যাইতে পারে। আধুনিক যুগে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যে কোন বড় প্রতিভার ক্ষেত্রে এই বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের কোন-না-কোন রূপ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কীটসের সাহিত্যোপলব্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া Douglas Bush একস্থলে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a world of inexplicable mystery and pain the experience of beauty is the one sure revelation of reality ; beauty lives in particulars, and these pass, but they attest principle, a unity, behind them. And if beauty is reality, the converse is likewise true, that reality, the reality of intense human experience, of suffering, can also yield beauty, in itself and in art. This is central in the poet's creed..." (Keats and His Ideas : Douglas Bush)

"Here, or in the whole episode, seem to be concentrated, and perhaps reconciled on a new plane, some of Keat's central perplexities—the fluidity of experience and the enduring truth of art,—a vision of life that embraces but transcends all suffering, that unifiies all diverse and limited human judgments sub specie aeternitatis; the supreme sensation and insight of death without death itself. Moneta's face and eyes reflect, in calm benignity, the knowledge that had rushed upon Apollo, and Keats is reaffirming the Godlike supremacy of the poetic vision but his conception has risen above mere negative capability to what suggests, to one critic at least, Christ taking upon himself the sorrows of the world."

(Keats and his ideas : Douglas Bush)

তিনি পরিশেষে মন্তব্য করিয়াছেন,

"Though his poetry in general was in some measure limited and even weakened by the romantic preoccupation with 'beauty', his finest writing is not merely beautiful because he had seen 'the boredom, and the horror' as well as 'the glay'."

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতাও কতকটা 'romantic preoccupation with 'beauty' জাত এবং পরবর্তীকালে এই রোমান্টিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র তত্ত্ব হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সেই সত্যকেই তিনি লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে সুন্দর ও অসুন্দর একই সত্যের দুটি দিক মাত্র। 'সাহিত্যের পথে'র মধ্যে তিনি এই উপলব্ধিকেই প্রকাশ করিয়াছেন।

"একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেন, সৌন্দর্য্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। * * *

তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের

বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না বলি তাতে কিছু আসে যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

*** মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। ***

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীট্‌সের বাণী মনে পড়ল: Truth is beauty, beauty truth। অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোন জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকে সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।"

সুখও সত্য নয়, দুঃখও সত্য নয়, সুন্দরও সত্য নয়, অসুন্দরও সত্য নয়, ইহাদের সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া যে আত্মা ফলবান হইয়া উঠে একমাত্র তাহাই সত্য। কীটসের জীবনের এই উপলব্ধির কথা উক্ত সমালোচক বলিয়াছেন।

"In this view of life as a series of trials Keats finds 'a system of Salvation' more rational and acceptable than the Christian."

ভারতীয় মোক্ষসাধনার অতিমানবিক লক্ষ্যের জন্য ভারতীয় সাহিত্য-তত্ত্বমূলক আলোচনাগুলি কোন-না-কোন রূপে ওই পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছে। তাহার আনন্দ ও রসতত্ত্ব অতিমানবিক চেতনালব্ধ। তাহার মধ্যে সমন্বয়ের কোন তত্ত্ব নাই। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাধারায় মুক্তি-তত্ত্ব সম্পূর্ণতার, পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের, সমন্বয়ের তত্ত্ব, তাই তাঁহার সৃষ্টি-কর্ম্মও এই এক পরিণাম লাভকে লক্ষ্য করিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে যে সত্য সম্পর্কে তিনি সচেতন হন—

"সৃষ্টি রঙ্গভূমি তলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতাল ঘাতে
উদ্দাম চরণ পাতে
সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহ বন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।" (রূপ-বিরূপ)

এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-সাধনাকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।—এই উপলব্ধি লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন ও পরবর্ত্তী জীবন। দুটি জীবন-সাধনার মধ্যে জন্মান্তরের পার্থক্য। পরবর্ত্তী জীবনে সম্পূর্ণ নূতন এক বোধ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তিনি বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহাকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সাধনা কোন মহামানবের জীবন-সাধনায় সম্পূর্ণতা লাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

নানা রূপে বারংবার তিনি একই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জীবনের এই যে ধীর অপরূপ দুর্লভ প্রকাশ, বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধের সহিত সঙ্ঘাতে চেতনার এই ধীর বিকাশ, হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া নিয়ত এই যে বিচিত্র বোধের প্রকাশ, যাহা সমগ্র সত্তাকে মাঝে মাঝে কোন্ সীমাহীন মাধুর্য্য-লোকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার একান্ত বিনষ্টি ঘটে? সত্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন দিব্য-চেতনার লীলা যে আছে তাহাতে সংশয় নাই। যে সত্তাকে তিনি আপন হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাহাকে তিনি আবার আর কোন রূপে ফুটাইয়া তুলেন, না চিরকালের জন্য তাহা হারাইয়া যায়?

> "কেন এই আসা আর যাওয়া,
> কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
> জানি না, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
> আবার নূতন রঙে, আঁকিবে কি তুমি, শিল্পী কবি।" (শেষ কথা)

সানাই

জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সত্যোপলব্ধি নিত্য নূতন হয় না, তাহার ধীর বিকাশ ও পরিণতির একটি ধারা থাকে মাত্র, এবং পূর্ণতা লাভের পর স্রষ্টা তাহাকে নানারূপে প্রকাশ করিয়া চলেন। একই উপলব্ধিকে ফিরিয়া ফিরিয়া বলা। কবির পরবর্ত্তী কাব্য-ধারার মধ্যে পরিণত সত্য বোধের বিচিত্র প্রকাশই লক্ষ্য করা যায়।

সীমা ও অসীমের সম্পর্ক নিরূপণের উপর বিচিত্র দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-দর্শনও স্বাভাবিকভাবে এই উভয়ের সম্পর্ক নিরূপণের

উপর দাঁড়াইয়া আছে। বর্ত্তমান কাব্যের মধ্যে দুটি কবিতা আছে, 'সানাই' ও 'যক্ষ' যাহাদের মধ্যে তিনি এই উভয়ের যোগের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একদিকে আছেন অসীম বা পূর্ণ। তিনি চিরস্থির, আপনার মহিমায় আপনি চির সমাসীন।

"সেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।" (সানাই)

আর অন্যদিকে সীমা বা রূপের লোক। এই সীমা বা রূপ যে অসীম বা অরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন সত্তা নহে, বরং সেই এক অসীম বা অরূপই যে দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন সীমা-রূপ লাভ করিয়াছে, সীমা যে অসীমের মাধুরীকে নিয়ত চঞ্চলতার ভিতর দিয়া কেবলই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে, এই দিক দিয়া সীমা যে তত্ত্বত অসীম এই বোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। অসীমের সীমা-রূপ লাভকেই তিনি বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রজাল'। ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা 'অনির্ব্বচনীয়' 'মায়া।'

"বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলি পুটে।" (সানাই)

মহান কবি বা শিল্পী কোন-না-কোন রূপে সৃষ্টির এই রহস্যকে কতকটা ভেদ করিতে পারেন, যে রহস্যকে আশ্রয় করিয়া অসীম নিয়তই সীমা-রূপে অন্তহীন ধারায় নিম্নে বহিয়া আসিতেছেন। এই রহস্যকে যিনি যতখানি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্টি তত অফুরন্ত, তত অপরূপ, অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিতে থাকে।

রূপ-লোকের অচিন্তনীয় নিয়ত রূপান্তরতা সত্ত্বেও যে একটা প্রত্যয় কোন-না-কোন রূপে আমরা লাভ করিতে পারিতেছি, ইহার পশ্চাতে একটি স্থায়ী সত্তা

আছে বলিয়া। এই স্থায়ী সত্তার একটি নির্দ্দিষ্ট ধ্যান দেশ-কালের মধ্যে রূপ-লোক আশ্রয় করিয়া ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় দর্শনে সীমা ও অসীমের যোগের তত্ত্ব লালার দিক দিয়া কোথাও স্বীকৃত হইলেও তাহার এমন প্রকাশ যে কোথাও নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে, রূপের জগতে পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে যে একটি স্থির অভিপ্রায় আছে এবং ইহার ভিতর দিয়া যে মূল্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এই সত্য ভারতীয় দর্শনে বীজরূপে কোথাও থাকিলেও ('মানুষের ধর্ম্ম' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ অথর্ব্ববেদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন) তাহার ব্যাখ্যাশ্রয়ী একটি সামগ্রিক দর্শন যে একমাত্র তিনিই গড়িয়া তুলেন তাহাতে সংশয় নাই। মানুষের মুক্তি যে নিখিল মানবের সামগ্রিক মুক্তির সহিত জড়িত, মুক্তি বলিতে সমগ্র সত্তার পূর্ণতা, সেইজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ণতা বুঝায় এই নিঃসংশয় সত্যবোধও রবীন্দ্র-দর্শনে নূতন। রূপের জগতে সেই ধীর বিকাশের পরিচয়—

"এই সুর প্রত্যহের অবরোধ' পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবীযুগ আরম্ভের অজানা পর্য্যায়।" (সানাই)

সীমা-লোকের মধ্যে অপূর্ণতার বোধ আছে বলিয়াই সীমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তার এমন প্রকাশ। এই অপূর্ণতার বেদনা বক্ষে লইয়া রূপ নিত্য নব রূপতা লাভ করিয়া চলিয়াছে, নিত্য নূতন মাধুরী ক্রমাগত অফুরাণ হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ণতা পূর্ণকে লাভ করিতে চায়, তাহার এই নিয়ত ব্যাকুল প্রার্থনায় সৌন্দর্য্যের আনন্দ-লোক নিয়ত উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইতেছে। ব্যবধান বা বিচ্ছেদ আছে বলিয়া গান জাগে সে গানে সীমা সীমা-রূপেই অতল মাধুরীর সন্ধান দেয়। ব্যথার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই যে অমৃত শতদলের প্রকাশ, ইহার সৌন্দর্য্যে কবির প্রাণ-মন ভুলিয়াছে। ইহার আনন্দাস্বাদ কবির নিকট পূর্ণতার আস্বাদকেও অনাকাঙ্ক্ষিত করিয়া দিয়াছে।

"পথিক কালের মর্ম্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ

মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।" (যক্ষ)

পূর্ণতার মধ্যে এই ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ নাই।

"নিত্যপুষ্প নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড় শোক,
নাই মর্ত্ত্যভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।" (যক্ষ)

অসীমের স্থির পাষাণবক্ষের উপর সীমা ক্রমাগত আছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে মুখর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে; আর নিত্যকাল ধরিয়া উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে চির অনুনয়ের বাণী, 'কথা কও কথা কও'।

"স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায় বিচিত্র এই নানা বর্ণ মর্ত্ত্যের আলোতে
উহাবে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।" (যক্ষ)

কবি-চেতনা সেই পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যে পরিণামে অসীমের পরিপূর্ণ আনন্দ-লীলাটিকে সাক্ষাৎ করা সম্ভব। অসীম নিত্যকাল ধরিয়া কাল স্রোতে সংখ্যাতীত রূপের-তরী ভাসাইয়া দিতেছে। তাহারা ক্ষণকাল ভাসিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। চিরস্থির দিগন্ত প্রসারিত নির্ম্মল আকাশের বক্ষে কোথা হইতে মেঘ আসিয়া জমে, আপনার বক্ষে বিচিত্র রঙের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া আবার কোথায় হারাইয়া যায়। সমগ্র বিসৃষ্টি অসীমের বক্ষে এমনি লীলা মাত্র। ক্ষণেক প্রকাশ অন্তে আবার অবসান লাভ।

"ফেনোচ্ছল সে নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্য তরী নাহি চলে,
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানের খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা।" (দূরের গান)

আমার এই সত্তা বিশ্বের অগণিত সত্তার মত দুর্ব্বার প্রাণের স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া তেমনি এক রূপের তরণী, এক ছিন্ন তান। ক্ষণকালের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইবে।

বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও নারীর প্রেম আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে যে-সৌন্দর্য্য-লোক, স্বপ্ন-লোক গড়িয়া উঠে, সেই সৌন্দর্য্যই তো ক্ষণে ক্ষণে চেতনাকে বেদনায় নিপীড়িত করিয়া সেই সীমাহীন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যেখানে সংখ্যাতীত রূপ-লোক বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নিকটতম সত্তা সেই দূরতম লোকের আলোকে ছায়াছবির মত বিচরণ করিতে থাকে।

"নীল আলো প্রেয়সীর আঁখি প্রান্ত হতে,
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।" (দূরের গান)

চেতনার সেই সমুন্নতি লাভ ঘটিলে তাহারই আলোকে বিশ্বের যে রূপ ফুটিয়া উঠে কবির কাব্যে তাহারই চকিত আভাস লাভ করিতে পারি মাত্র।

কবির কাব্যে সেই তত্ত্বের প্রকাশ আছে, যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অসীম নিত্যকাল ধরিয়া আপনাকে অন্তহীন রূপে রূপে উৎসর্জিত করিতেছেন।

"এ বাঁশি দিবে সে-মন্ত্র যে-মন্ত্রেব গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীব রহস্যখানি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে মনে দিবে আমি.
সৃষ্টির প্রথম গূঢ় বাণী।
সেই বাণী অনাদির সুচির বাঞ্ছিত
তারায় তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃ সীমা আঁকি।" (দূরের গান)

কবির কাব্যে সৌন্দর্য্য-লোকের প্রকাশ আজ তেমন করিয়া ঘটে না। ইহার ধীর ম্লানিমার একটি ধারাও পূর্ব্বাপর নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহার কারণ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সামর্থ্যের ধীর অবসান। তাহার ফলে বিশ্ব-সত্তা বা 'তুমি'র মাধুর্য্য ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে।

আর একটি ধারাও লক্ষ্য করিয়াছি, জীবনের অসুন্দর ভাগের প্রতি তাঁহার ইতিপূর্ব্বের ঔদাসীন্যের জন্য তীব্র পীড়া বোধ। ইহাই যে নিয়তি স্বরূপ হইয়া

কবিকে সাধনার সর্ব্বশেষ সিদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি। কবির সাধনার অসম্পূর্ণতা বোধ যেমন তেমনি এই নিয়তিকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা কবির জীবনে দিনে দিনে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে।

কবির অধ্যাত্ম-সাধনা বা কাব্য-সাধনার ধীর পরিণামের ক্ষেত্রে এই দুটি ধারাই ওতপ্রোত হইয়া আছে। বিশ্ব-সত্তায় সুন্দর-অসুন্দর ভাগ বলিয়া কিছু নাই। বিশ্ব-সত্তা যখন কেবলমাত্র মাধুর্য্যরূপে প্রকাশমান তখনও তাহা যেমন সম্পূর্ণ সত্য নয়, তাহা যখন যাবার শুধুই নির্ম্মম, কঠোর ও ভীষণ তখনও তাহার প্রকাশ অসম্পূর্ণ। তাহা উভয়ের মিলনে এক পরমাশ্চর্য্য প্রকাশ।

"এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্য্যের প্রচণ্ড মরণ," (বিপ্লব)

বিশ্ব-প্রকৃতির আচ্ছন্ন রূপকে তিনি একদিন 'ঔদাসীন্য', 'ক্লান্তি' ও 'বিস্মরণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমরা সে পরিচয় লাভ করিয়াছি। আজ তিনি নিঃসংশয়ে বোধ করেন, প্রকৃতির মাধুর্য্য-রূপ যদি অন্তর্হিত হইয়া গিয়া থাকে তবে তাঁহার জীবনে প্রকৃতি আর এক সাধনাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে চান। নিরাভরণ শক্তির সেই নির্ম্মম, ভয়ঙ্কর সাধনাকে তিনি জীবনে সত্য করিয়া তুলিবেন। পূর্ব্বের সাধন-ধারাকে পরিহার করিয়া এক নূতন সাধন-পথে যাত্রার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন।

"তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্ব্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণ তলে ক্রুর বালুকারে।" (বিপ্লব)

প্রেমে বাহিরের রূপকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। তাহাকে নিত্য নূতন ভাবে আমরা লাভ করিতে আস্বাদ করিতে পারি, কিন্তু নিঃশেষ করিয়া দিতে পারি না। এই

মাধুর্য্য (মায়া) আস্বাদের ভিতর দিয়া আমাদের চেতনা কোন্ অতলতায় তলাইয়া গিয়া স্বপ্নাবিষ্ট চোখে এক দিব্য-রূপের আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। তাহাকে বাহিরে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

"অনন্তের সমুদ্র মন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।

তোমা মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জ্জনীর মানা,
সব নহে জানা।" (জ্যোতির্বাষ্প)

'মায়া' রূপাশ্রয়ী অনির্ব্বচনীয়তার সেই তত্ত্ব যাহাকে আশ্রয় করিয়া এক অলৌকিক মুহূর্ত্তে অন্তরে চিরকালের জন্য এক সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্ট হইয়া যায়। তাহারপর হইতে বাহিরের রূপ গৌণ হইয়া যায়। অন্তরের রূপকে আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনা নব নব সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্টি করিয়া চলে।

"আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া;
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।" (মায়া)

বাহিরে রূপের জগতে নিয়তই পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, কিন্তু তাহা অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকটিকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। প্রেমে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নর-নারীর একটি রূপ চিরন্তন হইয়া থাকে। বাহিরের রূপের সহিত তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"যদি জীবনের বর্ত্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোর তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।" (মায়া)

প্রেমে অন্তরে যে মানসী মূর্ত্তি চিরন্তনী হইয়া ফুটিয়া উঠে, সে মূর্ত্তি কি পুরুষের চেতনাকে পরিণামে মুক্তি দিতে পারে, যদি না নারীর অন্তরে প্রেম উপলব্ধ হয়? এমনি একপ্রকার সংশয় মূলক জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছিল। প্রেমের সাধনা যুগলের সাধনা। কেবল সৌন্দর্য্য বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক

গড়িয়া উঠে তাহা পুরুষের চেতনাকে পরিণামে মুক্তি দেয় না। সৌন্দর্য্যের সাধনা যে অর্থে মায়ার সাধনা তাহা প্রেমাশ্রয়ী। অর্থাৎ উভয়ের প্রেমে উভয়ের অন্তরে যে মায়া-জগৎ গড়িয়া উঠে, একমাত্র তাহাই নর-নারীকে মুক্তি দেয়।

সৌন্দর্য্য সাধনায় মুক্তি কি তাহা পুরুষ উপলব্ধি করিয়াছে। নারী রূপকে বেষ্টন করিয়া যে মায়া তাহা পরিনামে মায়ার অতীত সত্তার অভাস দান করে। নারীর মধ্যে প্রেম না থাকিলেও নারী-রূপ পুরুষের চেতনায় রূপের অতীত সত্তার প্রতি নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করে; কিন্তু নারীর মধ্যেও যদি সেই প্রেম সত্য না হয় তাহা হইলে পুরুষের একক প্রেম সাধনার শেষ সিদ্ধি লাভ কবিতে পারে না। তাহার অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখী হইয়া থাকে।

"অস্পষ্ট তোমারে যবে
ব্যগ্র কণ্ঠে ডাক দিই অত্যুক্তির স্তবে
তোমারে লঙ্ঘন কবি সে-ডাক বাজিতে থাকে সুরে
তাহারি উদ্দেশে আজো যে রয়েছে দূরে।
হয়তো সে আসিবে না কভু,
তিমিরে আচ্ছন্ন তুমি তারেই নির্দ্দেশ কর তবু।" (শেষ কথা)

উভয়ের প্রেমে উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। এক পক্ষের বঞ্চনায় উভয়েই সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হয়।

"আমারে যা পারিলে না দিতে
সে-কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।" (শেষকাল)

দূরে ধ্যান মূর্ত্তিতে পাওয়াই সত্যকারের পাওয়া। তাহাতে চেতনা বিচিত্র রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া মুক্তি লাভ করে। মিলনে এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে আসক্তি একান্ত হইয়া উঠে। পুরুষের জীবনে তাহা ঘোর বিনষ্টিকর।

"ছায়া তোমার মনের কুঞ্জে ফিরত চুপে চুপে
কায়া নিত অপরূপের রূপে।" (দূরবর্ত্তিনী)

বাহিরে রূপের জগতে নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এক একটি অলৌকিক মুহূর্ত্তে বাহিরের বিচ্ছিন্ন এক একটি রূপ অন্তরে চিরকালের জন্ম মুদ্রিত হইয়া যায়। ইহাই মায়া তত্ত্ব। এই অচঞ্চল এক একটি রূপ আশ্রয় করিয়া নর-নারী বিচিত্র রূপ

সৃষ্টি করিয়া চলে। এই সৃষ্ট রূপ কত বারবার সেই লোকের আভাস দান করে, যেখান হইতে বাক্য ও মন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

"বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
  পালায় চকিত নৃত্যে
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
  বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।" (মানসী)

রোগ-শয্যায়

বিশ্বের একদিকে নিরন্তর সৃষ্টি, অন্যদিকে নিরন্তর বিনষ্টি। একদিকে অফুরাণ ঐশ্বর্য্যের সংহৃতি, অন্যদিকে তাহার মহৎ সংহার। সঞ্চয় ও অপচয়, প্রকাশ ও অপ্রকাশ—এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া এক মহান অস্তিত্বের প্রকাশ। রূপ আপনার সৃষ্টি, রূপান্তর ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া সেই এক পরম অস্তিত্বের নিত্য প্লাবী আনন্দকে নিয়ত প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। তাহাকে যে-নামে চিহ্নিত করা যাক-না-কেন, সকল সত্তার মত কবির সত্তা তাহারই বক্ষে জন্ম লাভ করিয়া আবার তাহারই মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

"চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্ব প্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।"

যাহারা কবির অন্তরে অতুল প্রাণের সম্পদ আনিয়া দিয়াছে, যাহাদের মধ্য দিয়া কবির অন্তর সুখ-দুঃখের বিচিত্র দোলায় দোল খাইয়াছে, জীবন-নাট্যের রঙ্গ মঞ্চে একে একে তাহারা যবনিকার অন্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। যাহাদের আশ্রয় করিয়া কবির প্রাণ-ধারা ক্রমাগত প্রসারতা লাভ করিয়াছে, একে একে তাহাদের হারাইয়া সেই প্রাণ-ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে।

নির্জ্জন অবসরে সেই প্রিয়জনদের স্মৃতি কবির অন্তরকে আকুল করিয়া তুলে। তাহাদের ছায়ামূর্ত্তি অন্তর হইতে একে একে বাহির হইয়া দূর আকাশ পটে ভাসিয়া বেড়ায়। সেইদিকে স্থির দৃষ্টি মেলিয়া অনুরাগে ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাদের নামের মালা জপিতে জপিতে কখন বেলা বহিয়া যায়। প্রকাশশূন্য অসহায় একপ্রকার বেদনাবোধ।

"আজকে তারা এল আমার
স্বপ্ন লোকের দুয়ার ঘিরে
সুর হারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।"

কোন একটি সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কবির অন্তরে যখন প্রাণ উপলব্ধ হয় তখন কবি সেই উপলব্ধির ভিতর দিয়া বোধ করিতে পারেন যে নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত প্রাণের মধ্যেই সকল প্রাণ সঞ্জীবিত। প্রাণের ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রাণ আপনাকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিতেছে।

"যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব,
মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।"

এই বোধের প্রকাশ বর্তমান কাব্যে একাধিক কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রারম্ভের উৎসর্গ কবিতাটি।

যে অপার প্রাণ-ধারা বিশ্বের অন্তরালে থাকিয়া পশু পক্ষী তৃণ-তরু-লতায় নিয়ত প্রাণ সঞ্চারিত করিতেছে, যাহা কিছু জীর্ণ, বিদীর্ণ, বিশুষ্ক তাহাকে ঝরাইয়া দিয়া নূতন প্রাণের প্রকাশ ঘটাইতেছে, সেই এক প্রাণের নিগূঢ় ক্রিয়াকে তিনি নিয়ত সেবারতা দুটি নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"বিশ্বের আরোগ্য লক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশুপক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা

জীর্ণতায় মৃত্যু পীড়িতেরে
অমৃতের সুধা স্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে—"

কিংবা সর্ব্বশেষ কবিতাটি।

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যে প্রাণ, যে চেতনা, যে পরিব্যাপ্ত অখণ্ড শান্তি, নারীর মধ্যে তিনি তাহারই প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।"

পরম তত্ত্ব লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া গৌতম বুদ্ধ বোধি বৃক্ষ মূলে ধ্যান নিমগ্ন হইলেন। বারংবার তাঁহার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। সেদিন সুজাতা পায়সান্ন রন্ধন করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া আবার ধ্যান নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সুচির আকাঙ্ক্ষা সেদিন সফল হইল। সেই সিদ্ধি লাভের পশ্চাৎ রহস্য কি? কবি বলিতেছেন, যে সেই দিনই তিনি প্রত্যক্ষ করেন, যে যে-চেতনা নিখিল বিশ্ব পূর্ণ করিয়া শূন্যে শূন্যে বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই চেতনাই পরমাশ্চর্য্য রূপে সুজাতার প্রেমে, তাঁহার অপার করুণায়, তাঁহার কল্যাণ ব্যাপ্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

জীবনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের এই স্বরূপ বিশ্লেষণ কবি বহুকাল পূর্ব্বে করিয়াছিলেন। আজ আপনার জীবনে সেই শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব হইয়াছে।

একথা সত্য প্রাণ-মনের অসামর্থ্যের জন্য আজ কবি আপনার বিচিত্র কল্পনাকে সার্থক রূপদান করিতে পরিতেছেন না। অন্তশ্চেতনায় অবশ বিচিত্র সৌন্দর্য্য কল্পনা ও ভাবনা কেবল ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

সৃষ্টির আদিম অবস্থা কি এমনি ছিল? এমনি আকারহীন, মূঢ়, মূক, বিকলাঙ্গ স্বপ্নের কেবল উঠা ও নামা? তাহার পর কোন্ রূপকারের স্পর্শে তাহা এই সৌন্দর্য্য রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে? তাঁহার সেই ধ্যান তো সৃষ্টির মধ্যে আজও

'সম্পূর্ণ হয় নাই। নিয়ত গ্রহণ ও বর্জ্জন, প্রকাশ ও অপ্রকাশের ভিতর দিয়া তাঁহার ধ্যান ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

"অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্য্যালোকে।
মূর্ত্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সঙ্কল্পের ধারা।"

মৃত্যুতে কবি কি কোন এক উন্নততর চেতনা লোকে জাগিয়া উঠিবেন যেখানে এই জীবনের সকল অসম্পূর্ণতা একটি পুষ্পিত গোলাপের মত পূর্ণ সুষমায় ফুটিয়া উঠে? এ সম্পর্কে কবির অন্তরে কোন সংশয় ছিল না।

সৃষ্টির নিয়ত পরিবর্ত্তন, প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে যে একটি বিকাশের ধারা আছে এই সম্পর্কে কবির যে একটি গভীর অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল তাহার বিচিত্র প্রকাশ আমরা তাঁহার ইতিপূর্ব্বের রচনায় লাভ করিয়াছি। নিম্নের উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে এই বোধেরই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"দারুণ ভাঙ্গন এযে পূর্ণেরই আদেশে;
কী অপূর্ব্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে
গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।"

এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া যে-প্রাণ তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ঘটায় পরিণত বয়সে সেই প্রাণই সত্তা হইতে সকল সম্পদ একে একে হরণ করিয়া লয়। জীবনের এই নিয়তি সাক্ষাৎকারের মধ্যে মানুষের কোন সান্ত্বনা নাই। প্রাণ-সম্পদের হরণ-পূরণের ভিতর দিয়া সুখ-দুঃখ বোধের বিচিত্র লীলাকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ এমন একটি সত্তার নিঃসংশয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, যাহা চির-জ্যোতির্ম্ময় চিরস্থির। বঞ্চিত প্রাণের লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া কবি সেই বোধ-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। তাহারই জন্য প্রার্থনা।

"হে প্রভাত সূর্য্য,
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,

প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত ;
দুর্ব্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্য্যে তোমার
দূর করি দাও,—"

কবি বারংবার তাহারই চকিত আভাস লাভ করিয়াছেন, যাহা সকল সীমিত বোধের পরপারবর্ত্তী। মৃত্যুতে জাগতিক সকল সীমিতবোধ পুষ্পের বহিরাবরণের মত জীর্ণ হইয়া ঝরিয়া যাইবে, আর তাহারই ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ লোকের প্রকাশ ঘটিবে পূর্ণ বিকশিত পুষ্পের মত। মৃত্যুতে সেই আদি চৈতন্য-সাগর কূলে জাগিয়া উঠা যেখানে এই সংখ্যাতীত রূপ বুদ্বুদের মতো নিয়ত জগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

"সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার,—"

রূপের নিরন্তর ভাঙ্গা-গড়া, সৃষ্টি ও বিনষ্টি, নিয়ত রূপান্তরতার ভিতর দিয়া কেবল উদ্দেশ্যহীন এক শক্তির প্রবাহ চলিয়াছে; (বৌদ্ধ স্পন্দবাদের মধ্যে যাহার প্রকাশ দেখি) কিংবা এই সকলকে আশ্রয় করিয়া এমন এক জ্ঞানময়, চৈতন্যময় সত্তা বিরাজিত যাহার নিকট রূপ-বিরূপের কোন পার্থক্য বোধ নাই, অস্তিত্বের যে কোন প্রকাশ সম্পর্কে যাহা সম্পূর্ণ উদাসীন (সাঙ্খ্যের প্রকৃতি পুরুষ অথবা অদ্বৈত বেদান্তের মায়া তত্ত্ব) ইহার কোন একটি সত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না।

পরমের একটি ধ্যান এই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সকল সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া সকল অবস্থাতেই অনন্তকোটি গ্রহলোকাশ্রয়ী এই রূপ জগৎ এক আশ্চর্য্য সুষমার চিরস্থির আদর্শকে প্রকাশ করিতেছে।

"লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
* * *
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ম্ময় বিরাট গোলাপ।"

বিশ্বকে এইরূপে পরিপূর্ণ সুষমা, আনন্দ ও অমৃত রূপে উপলব্ধি করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ।

"অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।"

জীবনের কোন একটি বিশেষ পরিণামে ধ্যানে তাঁহাকে লাভ করা যায় এ সত্য রবীন্দ্রনাথের সত্য নয়। তিনি আপনাকেই যে দেশ-কালের মধ্যে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

মানুষের মধ্যে যে চেতনার প্রকাশ, তাহা একটি আকস্মিক প্রহেলিকা মাত্র, তাহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না, মৃত্যুতে সেই অস্তিত্ব আবার নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অর্থাৎ মানুষ আসে এক শূন্যতা হইতে মৃত্যুতে আবার ওই শূন্যতায় হারাইয়া যায়, এই সাক্ষাৎকার সত্য নয়। মানুষের এমন একটি সত্তা আছে, যাহার যোগে নিখিল বিশ্বের সকল সত্তা সত্তাবান।

"এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে
* * *
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য্য গ্রহ তারা,
অস্খলিত ছন্দ সূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।"

এক চেতনা-সূত্রে এই বিশ্বের সমস্ত কিছু বিধৃত। চেতনার যে আবেগ বক্ষে লইয়া মহাশূন্যে অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তকোটি গ্রহ-নক্ষত্র অচিন্তনীয় বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই এক চেতনার প্রকাশ মানুষের মধ্যে। সৃষ্টির মধ্যে রূপ-বৈচিত্র্যের প্রবাহ বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, কিন্তু এই সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক চেতনার দুর্ণিরীক্ষ প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে।

এই জীবনে দুঃখ আছে। অসহনীয় দুঃখের নাগপাশে মানুষ বিজড়িত। ইহার মূল রহিয়াছে মানুষের অজ্ঞানতা ও প্রবৃত্তির মধ্যে। এই অজ্ঞানতা ও প্রবৃত্তি হইতে কেমন করিয়া দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার পরিচয় পাই সাহিত্যে, বিচিত্র নৈতিক জিজ্ঞাসায়। মানুষের দুঃখভোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে একটি-না-একটি কারণ

নিঃসন্দেহে লাভ করা যায়। এই অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাই সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের মর্ম্ম কথা।

কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে মানুষ সান্ত্বনা পায় না। কারণ এই অজ্ঞানতা ও প্রবৃত্তিকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিবার কোন উপায় নাই, তাই মানুষের জীবনে দুঃখ ভোগও চিরন্তন। মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনা নৈতিক জিজ্ঞাসার সীমাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। নৈতিক বোধ হইল সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্যের বোধ।

এই অধ্যাত্ম-সংগ্রামের ভিতর দিয়া সে পরিণামে এমন একটি চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, যেখানে সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্যের এই বিচিত্র জিজ্ঞাসা অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। সৎ-অসৎ পাপ-পুণ্যের বোধ কেবল মানবিক সত্তায়, দিব্য-চেতনা সাক্ষাৎ-কারে সীমার বোধ, তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া পাপ-পুণ্যের, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার সকল বোধ একত্রে বুদ্বুদের মত শূন্যে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই অধ্যাত্ম সত্তা লাভই মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা, সর্ব্বশেষ সিদ্ধি। নৈতিক বিচিত্র জিজ্ঞাসায় মানুষের কোন সান্ত্বনা নাই।

"আপন আত্মায় যারা—
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানব সৃষ্টির।"

সকল সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের বোধকে আশ্রয় করিয়াও যাঁহারা এই জীবনে পরম সত্তার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন, মানুষের ইতিহাসে তাঁহারাই অমরতা লাভ করেন।

অধিকাংশ মানুষের জীবন কতকগুলি সুখ-দুঃখ বোধের সমষ্টি মাত্র। তাহারা এ সংসারে প্রাণ-লীলায় বুদ্বুদের মত একবার ভাসিয়া উঠিয়া চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়।

"আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন—"

মহাকাল এক হাতে রঙ্গের পাত্র, অন্য হাতে তুলিকা লইয়া শূন্য পটে অনন্তকাল ধরিয়া সংখ্যাতীত রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আবার তাহা মুছাইয়া ফেলিতেছেন। সৃষ্টি ও বিনষ্টি লইয়া তাঁহার এই এক নির্ম্মম, নিরাসক্ত লীলা।

কবির কাব্য সৃষ্টি, বিচিত্র রূপ সৃষ্টির পশ্চাতে তেমনি যেন এক নিরাসক্তি থাকে। কারণ যুগে যুগে কত বিচিত্র সৃষ্টি-রূপ হারাইয়া গিয়াছে। আজিকার দুর্লভ রূপ কাল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

"কবির ছন্দের মেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকা আঁকি।

একদিকে অসীমের বিচিত্র অনুভূতি, অসীমকে অপরোক্ষ করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল প্রার্থনা, তাহারই জন্য প্রস্তুতি, অন্যদিকে মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেমে অমৃতের আস্বাদ লাভ। কবির জীবনে এই উভয় প্রেরণাই সত্য। সীমা ও অসীমের সম্পর্কের স্বরূপ নির্দ্দেশের মধ্যে কবি প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাই এমন পরিণাম লাভেও কবির জীবনে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে নাই।

"আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।"

আরোগ্য

মৃত্যুতে কোন্ অজ্ঞাত লোকে আমাদের নিঃসঙ্গ অভিসার তাহা আমরা জানি না। তবে মর্ত্ত্যের প্রেম যে সেই মহাযাত্রায় দুর্লভ পাথেয় স্বরূপ হইয়া থাকে, ধ্রুব তারকার মত স্থির স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া দিক নির্দ্দেশ করে তাহাতে কবির অন্তরে কোন সংশয় ছিল না। জীব-লোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে জীব-লোকের শেষ স্পর্শ লাভের জন্য যে ব্যাকুলতা তাহার সত্য মূল্য এইখানে। তাহা মানুষের আসক্তি মাত্র নয়। মর্ত্ত্যের প্রেমই ঈশ্বরীয় প্রেমের দিকে নর-নারীকে অনিবার্য্যরূপে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। মর্ত্ত্যপ্রেমের প্রতি কবি তাই কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন।

"তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায় স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিক বন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা,
অন্ধকারে লুপ্ত পথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্টক্ষণে।"

মর্ত্ত্যের সীমা-রূপের ভিতর দিয়া অসীমের আনন্দই যে নিয়ত ব্যক্ত হইতেছে, অসীম সীমা রূপেই যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, জীবনের এই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকেই কবি সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্র খানি,"

মর্ত্ত্যের সীমা-রূপকে আশ্রয় করিয়া কবির চেতনা সেই অনির্ব্বচনীয়তার বারংবার আভাস লাভ করিয়াছে, যাহা সকল জন্ম সকল মৃত্যুর অতীত। সীমা বা রূপ কেবল মাত্র সীমা হইলে তাহার মাধুর্য্য মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সীমা তাই পরমার্থত অসীম। তাই তাহাকে ঘিরিয়া এমন অতল মাধুরীর উদ্বেলতা। কবির রূপের প্রতি শ্রদ্ধা তাই তত্ত্বত অরূপের প্রতি শ্রদ্ধাই। এই দৃষ্টিতে রূপ ও অরূপ সমার্থক হইয়া গিয়াছে।

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

এই স্থির উপলব্ধিই নানা ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। রূপের নিয়ত প্রকাশ, অস্থিরতা ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া অরূপের আনন্দই নানা ভাবে প্রকাশ লাভ করিতেছে।

"অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শ মণি
রস মূর্ত্তি করিছে রচনা,—"

চির পুরাতন এক প্রাণই নিত্য নূতন রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। প্রাণের আনন্দ লীলায় কোথাও কোন ছেদ ও বিকৃতি নাই। নিত্য সৌন্দর্য্য রূপে প্রকাশিত এক প্রাণই মানব অন্তরে প্রেম রূপে প্রকাশিত। এই প্রাণের যোগে, প্রেমে মানুষ পরিণামে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনার চেতনাকে অনুপ্রবিষ্ট দেখে। এই প্রাণ-সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে সকল লোক-লোকান্তর, সকল অতীত ভবিষ্যৎ। মানুষ তাই কোথায় হারাইয়া যাইবে? পরম অস্তিত্বের আনন্দবোধে মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়।

"সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্ব্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন"।

ওপারের আহ্বান যখন একান্ত হইয়া কানে বাজে, যখন ছুটির ঘণ্টা ধ্বনিত হয়, মর্ত্ত্যের সহিত সকল বন্ধন যখন একে একে ছিন্ন করিয়া তরী ভাসাইয়া দিবার সময় আসন্ন, তখনই কেন অন্যদিকে মর্ত্ত্যের বিচিত্র উপেক্ষিত ছবি চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে ছায়াছবির মত ভাসিয়া অতি দ্রুত আবর্ত্তিত হইয়া যায়। অবশ মন তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারে না। কেবল স্থির দৃষ্টি মেলিয়া দেখা। ইহা এক আশ্চর্য্য মানসিক অবস্থা। একটি ভাবনা-সূত্রে এই সকল আপাত বিশৃঙ্খল চিত্রগুলি নিশ্চয় বিধৃত। সেই ভাবনাকে মর্ত্ত্য-প্রেম ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রেম আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় করুণ। আবার এই বিচ্ছেদ বেদনা আছে বলিয়া তাহা সুদুর্লভ।

"পথে চলা এই দেখা শোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্ব্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

পরিণত বয়সে বাহিরে প্রাণের সম্পদ তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া আসিতে থাকে, পরাজয়ের বিচিত্র প্রকাশ ফুটিয়া উঠে। ইহা যেমন সত্য, তেমনি অন্তরে আর এক প্রাপ্তির দ্বারা সেই শূন্যতা ধীরে ভরিয়া উঠে। ইহাই অধ্যাত্ম সত্তা। এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা ক্ষণে ক্ষণে এমন একটি সত্তার আভাস লাভ করে যাহার বিনাশ নাই। মানুষের গভীরতম সত্তার সহিত তাহার মিল।

"এ পরাভবের লজ্জা এ অবসাদের অপমান
যখন ঘনিয়ে ওঠে, সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
দিনের পতাকাখানি স্বর্ণ কিরণের রেখা আঁকা ;"

কিংবা

"প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখ বিজয়ীর মূর্ত্তি দেখি আপনার
জীর্ণ দেহ দুর্গের শিখরে।"

মৃত্যুতে সীমার সকল বোধ স্খলিত হইয়া গিয়া কবি আপনার জ্যোতির্ম্ময় অসীম সত্তায় আপনি নিমগ্ন হইয়া যাইবেন।

কবি আপনার জীবনের দুলভ মুহূর্ত্তের কথা ইতিপূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছেন। দুর্লভ মুহূর্ত্ত বলিতে তিনি সেই সকল মুহূর্ত্তের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যে সকল মুহূর্ত্তে কোন একটি রূপকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করিয়াছে। এই সকল মুহূর্ত্ত যেন এক একটি রক্ত পদ্মের বীজ, প্রাণ-সূত্রে গাঁথা হইয়া যাইতেছে, জীবন শেষে তাহা একটি মাল্যের আকার ধারণ করিবে। মৃত্যুতে পরমের কণ্ঠে সেই মাল্যখানি তিনি দুলাইয়া দিবেন।

আজ কবি জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। কবির সেই প্রত্যাশা আজ সার্থক হইয়াছে। মৃত্যু আর কিছু নয়, জীবনের যে সব সুন্দর অসীম বা অরূপের আভাস দান করিয়াছে, তাহারই সাম্মিলিত প্রকাশ। মৃত্যু কী অপরূপ রূপ লইয়াই না কবির দৃষ্টি সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্যুর (সীমার সর্ব্বশেষ লোক) এই রূপের ভিতর দিয়া তিনি অসীম বা অরূপের সহিত মিলিত হইবেন।

"সেথা সিংহ দ্বারে বাজে দিন অবসানের রাগিণী
যার মূর্চ্ছণায় মেশা সে এজন্মের যা কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রা পথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।"

আনন্ত্য দেশ-কাল জুড়িয়া অনন্ত কোটি রূপ লইয়া ইহা যেন কোন এক যাদুকরের আতস বাজির খেলা। মুহূর্ত্তে বিচ্ছুরিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত অগণিত রূপ মহাশূন্যে জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। অর্থহীন পরিণাম হীন, উদ্দেশ্য শূন্য এই সৃজন প্রলয়ের লীলা। এই রূপ লীলার মাঝখানে অতি ক্ষুদ্র দেশ-কালে এই 'আমি'-চেতনার আকস্মিক আবির্ভাব ও বিলয়। ইহারও বুঝি কোন অর্থ নাই।

"বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতস বাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য্য তারা লয়ে
যুগ যুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নি কণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।"

"—সেই লোক অগ্নি, স্বয়ং সূর্য্য তাহার সমিধ, রশ্মি ধূম, দিন শিখা, চন্দ্র অঙ্গার, নক্ষত্র বিস্ফুলিঙ্গ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

"—পর্জ্জন্য অগ্নি, বায়ু তাহার সমিধ, মেঘ ধূম, বিদ্যুৎ শিখা, অশনি অঙ্গার, বজ্র বিস্ফুলিঙ্গ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

"—সূর্য্য অগ্নি, বৎসর তাহার সমিধ, আকাশ ধূম, রাত্রি শিখা, দিক সমূহ অঙ্গার, অবান্তর দিক সমূহ বিস্ফুলিঙ্গ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

দেশ-বন্দনার নামে কবি একদিন 'জন গণ মন অধিনায়ক' ঈশ্বরের বন্দনা করিয়াছিলেন, যাঁহার পুণ্য নামে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশ সুপ্তি হইতে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে।

দেশ বন্দনার নামে সেই ঈশ্বর বন্দনা নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়া আজ প্রত্যক্ষ মানব বন্দনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই ধীর রূপান্তরের পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার উপন্যাসে, নাটকে, বিচিত্র নিবন্ধে। যে মানুষ নিয়ত কর্ম্মভারে পীড়িত হইয়াও আত্মার অনিঃশেষ তেজের দ্বারাই মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনাকে দেবতার মত প্রতি মুহূর্ত্তে জয় করিয়া উঠিতেছে, ইহা সেই কর্ম্মরত মানুষের বন্দনা গান। আত্মার শুভ্রতম প্রকাশ তাহাদেরই মধ্যে। সমগ্র জীবনবোধের কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। কবির গদ্য রচনা হইতে কেবল একটি মাত্র অতি সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

"যে কর্ম্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্ম্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ বা শিক্ষক, কেউ বা বিচারক, কেউ বা শাসন কর্ত্তা, কেউ বা ধর্ম্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষি আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়—আজকের এই রৌদ্রে উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেল গাছের মর্ম্মরে তাদের জীবন সঙ্গীতের মূল সুরটি বাজছে।" (জাভাযাত্রীর পত্র)

যে জীবন বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই জাতীয় মন্তব্য করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার সহিত একদিকে গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারা এবং অন্যদিকে খ্রীষ্টান, স্টোইক ও ডেমোক্র্যাটিকদের চিন্তাধারার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার জন্য বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'History of Western Philosophy' গ্রন্থ হইতে দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The close connection between virtue and knowledge is characteristic of Socrates and Plato. To some degree, it exists in all Greak thought, as opposed to that of Christianity. In Christian ethics, a pure heart is the essential, and is at least as likely to be found among the ignorant as among the learned, This difference between Greek and Christian ethics has persisted down to the present day."

"Can we regard as morally satisfactory a community which, by its essential constitution, confines the best things to a few, and requires the mazority to be content with the second best ? Plato and Aristotle say yes, and Nietzsche agrees with them. Stoics, Christians, and democrats say no. But there are great differences in their way of saying no. Stoics aud early Christians consider that the greatest good is virtue, and that external circumstances can not prevent a man from being virtuous ; there is therefore no need to seek a just social system, since social injustice affects only unimportant matters. The democrat, on the contrary, usually holds that. at least so far as politics are concerned, the most important goods are power and property ; he can not, therefore, acquiesce in a social system which is uujust in these respects.

The Stoic Christian view requires a conception of virtue very different from Aristotle's since it must hold that virtue is as possible for the slave as for his masters. Christian ethics disapproves of pride, which Aristotle thinks a virtue, and praises humanity, which he thinks a vice. The intellectual virtues, which Plato and Aristotle value above all others, have to be thrust out of the list altogether, inorder that the poor and humble my be able to be as virtuous as any one else."

"Greek philosophers, including Plato and Aristotle, had a different conception of justice, and it is one which is still widely prevalent. They thought originally on grounds derived from religion—that each thing or person had its or his proper sphere, to overstep which is 'unjust'. Some men, in virtue of their character and aptitudes, have a wider sphere than others, and thus is no injustice if they enjoy a greater sphere of happiness."

এইরূপে বিশ্বের সর্ব্বত্র সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে দুটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি বিধি-বিধান দ্বারা সমাজকে ক্রমাগত দৃঢ়বদ্ধ করিতে এবং এইরূপে সামাজিক স্তর বিন্যাসকে স্থায়িত্ব দান করিতে চাহিয়াছে; অন্যটি সামাজিক বিধি-বিধানকে ক্রমাগত শিথিল করিয়া সামাজিক স্তর বিন্যাসকে সচল করিতে চাহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা কোন্ ধারাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

"ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।

দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।"

বিশ্বের সকল প্রকাশ রূপের অন্তরালে থাকিয়া যে চেতনা নিয়ত শুশ্রূষার ভিতর দিয়া বিশ্বকে চির নবীন রাখিয়াছে, লক্ষ কোটি প্রাণী বক্ষে ধৈর্য্যময়ী মাতা বসুন্ধরার ন্যায় যে চেতনা যাহা কিছু জীর্ণ, বিশুষ্ক, ক্ষীণ, পাণ্ডুর যাহা কিছু বিরূপ তাহাকে নিয়ত ঝরাইয়া দিয়া নূতন প্রাণের প্রকাশ ঘটাইতেছে, নারী সেই চেতনার মূর্ত্ত্য বিগ্রহ। মর্ত্ত্যের প্রাণের দীনতা এমন সেবা দিয়া, সহনশীলতা, ত্যাগ ও দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া জয় করিয়া উঠিবার এমন প্রাণপণ প্রযাস আর কোথাও নাই। নারীকে কত রূপে তিনি বন্দনা করিয়াছেন। নারীর এই স্বরূপের একটি প্রকাশ ধারাও সেই সঙ্গে সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

"যে জীব লক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।"

কিংবা

"বিশ্বের পালনী শক্তি তুমি নিজ বীর্য্যে বহ চুপে চুপে
মাধুরীর রূপে।"

ব্যষ্টির ভাবনা-লোককে মিলিত করিয়া বিশ্বের সকল মানবের সমষ্টিগত ভাবনা-লোকের কল্পনা করা সম্ভব। ব্যষ্টির ভাবনা-লোক এই সমষ্টিগত ভাবনা-লোকের অন্তর্গত। বিশ্ব-ভাবনা-লোক বলিতে এই সমষ্টিগত ভাবনা-লোক বুঝায় না। সমষ্টিগত ভাবে ভাবনা যতই বিকাশ লাভ করুক না কেন, তাহা বিশ্ব-মানব-মনের ভাবনাকে কোন অবস্থায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। সমষ্টি মনের ভাবনার বিকাশ ঘটে বিশ্ব-মানব-মনের ভাবনার যোগে।

চেতনা যতই বিকাশ লাভ করে ব্যক্তি-চেতনায় নিখিল মানবের বিচিত্র ভাব-ভাবনার ততই প্রকাশ ঘটিতে থাকে। চেতনার এমন সমুন্নতি মহামানবদের মধ্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে তাহা নিখিল বিশ্বের সমষ্টিগত ভাবনাকে গ্রাস করিয়া বিশ্ব-মানব-মনের ভাবনার সহিত যুক্ত হইয়া সমষ্টিগত ভাবনাকে ক্রমাগত বিকাশ, উন্নততর পরিণাম দান করিয়া চলিয়াছে।

"বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণী পুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকা সম।
সে আমার মনঃ সীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘণীভূত,
আবর্ত্তন করিতেছে আমার রচনা কক্ষ পথে।"

নিখিল মানব-চিত্ত আশ্রয় করিয়া ভাবের বিকাশের এই যেমন একটি দিক আছে, তেমনি ভাব রূপায়ণের মধ্যেও যে ধীর সম্পূর্ণতার একটি ধারা আছে তাহাও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।

চেতনার পূর্ণ বিকাশের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে তিনি উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া ইতিপূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছিলেন, যিনি আপনার চেতনাকে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দেখেন, বিশ্বের সমস্ত কিছু যাঁহার চেতনার মধ্যে অনু প্রবিষ্ট হয় তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। এই পূর্ণ উপলব্ধির আস্বাদ কবি আপনার জীবনে লাভ করিয়াছিলেন।

"জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।"

জাগতিক সকল বোধের ঊর্দ্ধে উঠিয়া মন ও দেশ-কালের সীমারও পরপারবর্ত্তী দিব্য-চেতনা-লোক লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা।

"এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।"

কিন্তু তাহার পরেই আবার এই প্রার্থনা আছে—

"সর্ব্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের অনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।"

যে বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মন সকল আমি বা মনকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের সকল অবস্থায় সকল পরিণামে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, সেই বিশ্ব-আমির আনন্দকে অব্যবহিত রূপে লাভ করিবার প্রার্থনা। এইরূপে কবির প্রার্থনায় বিশ্ব-সত্তা এবং পরম জাগতিক সত্তাকে একযোগে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তা এবং পরম জাগতিক সত্তার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধনের সাধনা রবীন্দ্রনাথের সাধনা।

জন্মদিনে

যে সম্পূর্ণতা কবির লক্ষ্য ছিল, মুক্তি বলিতে তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহার আভাস নানারূপে তিনি লাভ করিলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা যে তাঁহার আপ্রাপণীয় রহিয়া যায়, তাহা স্বীকার করিতে তিনি লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। লক্ষ্য বড় বলিয়া এই অসম্পূর্ণতার জন্য পীড়া বোধ থাকিলেও প্রকাশে কুণ্ঠা ছিল না। অধ্যাত্ম-সাধনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেখানে পাওয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি আকাঙ্ক্ষার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছেন। সমগ্র জীবনের সমাধান তাহার মধ্যে নাই, জীবন ও জগতের সমগ্র অর্থের প্রকাশ সেখানে নানা রূপে ব্যাহত।

এমনি একপ্রকার নিঃসংশয় বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে ছিল যে, যে-শিল্পী তাঁহার জীবন আশ্রয় করিয়া বিচিত্র বোধের রঙ্গ মিলাইয়া মিলাইয়া একটি পরিপূর্ণ ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাঁহার তুলিকার শেষ রেখাপাতের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবন একটি অখণ্ড চিত্ররূপে তাঁহার চরম অর্থ এক মুহূর্ত্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে। এই বিশ্বাস বোধ হইতে তিনি আজও লেশমাত্র বিচলিত হন নাই ; কিন্তু এই জীবনে যে সেই শেষ রেখাপাত ঘটে নাই তাহা তিনি বোধ করিতে পারেন। ইহার জন্য তাঁহার কেবল জন্মান্তরের প্রতীক্ষা।

"এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন আবরণ
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটে নি তাহাব মাঝে ছবিব চরম পরিচয়।"

কবির এই জগৎ হইতে বিদায় লইবার দিন একান্ত আসন্ন। অথচ এই জগৎ কবির নিকট তেমনি চিরকালের মত অপরূপ মাধুর্য্যে ভরা, তেমনি অপার রহস্য বিজড়িত। সেই মাধুর্য্যে সেই রহস্যে প্রাণ-মন তেমনি করিয়া উতলা হইয়া উঠে। প্রাণের স্পর্শে প্রাণের আনন্দ সম্পদ প্রত্যর্পণের ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতার মুহূর্ত্তে কবি অন্যমনা হইয়া পড়েন। ব্যথায় নিপীড়িত হইয়া আবার সচেতন হন। এই লীলার পরিপূর্ণ অমৃত পাত্র পথ পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্য মর্ত্ত্য-লোক হইতে বিদায় লইতে হইবে। সেই বিদায় মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া উঠিল বলিয়া। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা পরিমাপ আমাদের সাধ্যাতীত।

"মনে করি, গান গাই বসন্ত বাহারে।
আসন্ন বিরহ স্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।"

কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। সেই প্রদক্ষিণ পথে একে একে চেতনার কত পর্য্যায়, কত মাধুর্য্য-লোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। মনের বিকাশে মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য্য আজ যেন অফুরাণ হইয়া পড়িয়াছে। মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া সেই ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণার সৃষ্টি শক্তি যেন সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু এখানে আসিয়া এই পরিণাম

সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র মানব-সমাজের সৃষ্টি-প্রেরণার ধারাটিকে একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে মনেরও যে ধীর বিকাশ ঘটিতেছে এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। কেবল তাহাই নয়, এই ধীর বিকাশের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে এমন অসামান্যতার প্রকাশ ঘটে, যাহার ভিতর দিয়া মনেরও উর্দ্ধতর চেতনার নিঃসংশয় আভাস লাভ করিতে পারা যায়। সমগ্র মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া এই বিকাশ ঘটিলেও যাহার মন যত উন্নত তাহার ভিতর দিয়া এই বিকাশ তত অধিক পরিমানে ঘটে। মাঝে মাঝে এমন এক একটি মানব-সত্তার আবির্ভাব ঘটে যাঁহার ভিতর দিয়া সমগ্র মানব-সমাজের অভিব্যক্তি ক্রিয়া করে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে তেমনি একটি সত্তা। সমগ্র বিশ্ব ও মানব-সমাজকে আশ্রয় করিয়া এই যে ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ অর্থ পরিণাম-পর্য্যায়ে কোন সত্তার পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।

"আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই আত্মার এ মর্ম্ম নিকেতন,
* * *
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য্য প্রদক্ষিণ—
সে রহস্য সূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।"

সীমাহীন প্রাণ সমুদ্রের বক্ষে অন্তহীন রূপের কেবলই উঠা ও নামা, কেবলই প্রকাশ ও বিলয়। রূপের এই নিয়ত সরা, নিয়ত চলা, নিয়ত সৃষ্টি-বিনষ্টির ভিতর দিয়া অসীমের মাধুর্য্যই কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাকে তিনি বলিয়াছেন, 'অধরার প্রতিবিম্ব'।

"মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা
কেবলি দক্ষিণে ও বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে।"

বিশ্বের এই প্রাণ প্রবাহের সহিত ব্যক্তি, প্রাণ যুক্ত হইলে হৃদয়ে অন্তহীন ভাবের নিয়ত উঠা-নামা চলিতে থাকে। আর এই সকল ভাবকে আশ্রয় করিয়া এক অলৌকিক আনন্দের নিয়ত স্পর্শ লাভ ঘটে। এই আনন্দের প্রকাশ ছাড়া সমগ্র সৃষ্টির যেমন কোন অর্থ নাই। তেমনি রূপের যোগে হৃদয়ে এই আনন্দের আস্বাদ ছাড়া জীবনে আর কোন ফল লাভ নাই। এই শাশ্বত আনন্দময় সত্তাকে তিনি বলিয়াছেন, 'অধরা', 'স্তব্ধমৌনী অচল'।

"স্তব্ধ মৌনি অচলের বতিয়া ইশারা
নিবন্তব স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়,—"

রূপের মধ্যে এই ইশারা বা প্রতিবিম্বকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে একটি ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, তাহার ভিতর দিয়া মন ক্ষণে ক্ষণে অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করে।

প্রকৃতির সহিত মিলনের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া শৈশবে অনুভূতির ছাপ পড়ে এবং এই সকল প্রভাব হইতে কেমন করিয়া যৌবনে সাধারণ চিন্তা গড়িযা উঠে, পরিণত বয়সে এই সকল সাধারণ চিন্তা হইতে কিভাবে জটিল চিন্তার উদ্ভব হয তাহার বিস্তারিত পরিচয় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বিশেষ করিয়া তাঁহার Prelude কবিতার মধ্যে দান করিযাছেন।

"So the great union of Mind and Nature is consummated; by a process of association which links up, at every stage of life, experience and the experiencing self, leading from sensation to feeling from feeling to thought, and then creating a union of all these faculties in God who is the whole of Being-" (Herbert Read)

পরিণামে ঈশ্বরীয় সত্তার সহিত যোগের যে উপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা যে মানব মনেরই এক বিশিষ্ট পরিণাম, তাহা চূড়ান্ত হইতে পারে, তাহা নির্দেশ করিয়া এই সমালোচক লিখিতেছেন,

"though the same impulse animates all objects of all thought, the mind rises above the objects it contemplates, to the creation of a moral being, a soul.

But the philosophy is humanistic. It is the greatest exaltation of the mind of man that has been conceived. * * * —it is highest expression of humanism, even of a scientific humanism, that the world has yet seen." (Herbert Read)

কিন্তু মানব মনের ধর্ম্ম সীমার ধর্ম্ম। উহা তাই কোন পরিণামে অসীমকে লাভ করিতে পারে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্বয়ং এই বোধ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁহার জীবনে পরবর্ত্তীকালে এই উভয় চেতনার মধ্যে সঙ্ঘাত ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা যে পরিণামে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় তাহা উল্লেখ করিয়া উক্ত সমালোচক লিখিতেছেন,

"Either God is prescient and in his will is our peace, or a man is accountable to his own conscience and Intelligence, and has no need of a God. There is no compromise between these alternative. But Wordsworth pretended there was, and his whole philosophy is vitiated by this inherent inconsistency. Wordsworth knew this, and the last phase of his life shows him vainly attempting to hide the heretical significance of his philosophy of nature under a screen of orthodox beliefs. The attempt was doomed to failure, and involved all that was life of his poetic force." (Herbert Read)

সীমা ও অসীম মানবিক ও অতি মানবিক চেতনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে কতটা সফলতা লাভ করিয়াছে, কিংবা আদৌ করে নাই, তাহার বিচার এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এই উভয়ের যোগে যে পূর্ণ জীবন-দর্শন গড়িয়া উঠিতে পারে এই বিশ্বাস বোধের ভিতর দিয়া যে নূতন এক অধ্যাত্ম জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা নিসংশয়ে বলিতে পারা যায়। ইহাকে নব যুগের সাধনা বলিলাম এই কারণে যে তাঁহার সমসাময়িক কবি গেটের মধ্যেও ঠিক এই জাতীয় সমন্বয় চেষ্টার আর একটি রূপ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সমন্বয় চেষ্টার বিচিত্র প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

"Imagination, for Wordsworth, was 'an awful Power' which 'rose from the minds' abyss like an unfathomed vapour' and usurped the light of the senses. But in the moment of its manifestation, the invisible world of infinitude, where 'greatness makes abode,' is revealed 'with a flash'" (Herbert Read.)

প্রকৃতি ও মানব-মনের যোগের ভিতর দিয়া পরিণামে যে উদ্দীপ্ত অবস্থা লাভ, যে অবস্থায় মানবীয় চেতনা সকল সীমার বোধকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যেও আমরা নানাভাবে লাভ করিয়াছি। প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তিনি যে এক সামগ্রিক ধর্ম্মবোধ ও ধর্ম্মসাধনা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন এক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন, তবে প্রসঙ্গত সামান্য পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার 'ধর্ম্মশিক্ষা' নিবন্ধের দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেব মন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থ বন্ধন হীন মঙ্গল কর্ম্মই আমাদেব পুজানুষ্ঠান।" (ধর্ম্মশিক্ষা)

"সে ধর্ম্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন যেখনে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনেব বোধ ব্যবধান বিহীন ও তরুলতা পশুপক্ষীব সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গল কর্ম্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে; কোনো সঙ্কীর্ণ দেশকাল পাত্রেব দ্বাবা কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে খণ্ডিত না কবিয়া যেখানে, বিশ্বজনীন মঙ্গলেব শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিবাজ করিতেছে; যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধাব চর্চ্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতাব ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে: যেখানে সঙ্কীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সকল আনন্দকে বাধা গ্রস্ত করা হইতেছে না এবং সংযমকে আশ্রয় কবিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্ব্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে; যেখানে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্ক সভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দ সঙ্গীত এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে, তাহারা নানা প্রকার কল্যাণ-ভার লইয়া কর্তৃত্ব গৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনবোধের দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালক বৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের ও চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।" (ধর্ম্মশিক্ষা)

প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া ঋতুতে ঋতুতে মানুষের যে আনন্দোৎসব, যে ধর্ম্ম-সাধনা তাহার রূপটি কেমন হইবে তাহার পরিচয় তিনি তাঁহার বিচিত্র নিবন্ধের মধ্যেই কেবল দান করেন নাই, তাঁহার ঋতু-উৎসব নাটকগুলির (শারদোৎসব, ফাল্গুনী, বসন্ত, শ্রাবণগাথা প্রভৃতি) মধ্যেও নানাভাবে দান করিয়াছেন। নিম্নে শারদোৎসব নাটকের একটি বিস্তারিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও / একবার পূর্ব্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

অপি হ্রুখোত্থিতস্যেব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্গণং নাস্তি ঋভূনাং অগ্নিবোধত।
কনকাভানি•বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবন প্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ যত্রো পদৃশ্যতে।

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুর্দা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও। তোমাদর উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

* * *

সন্ন্যাসী। পৌঁচেছে, তোমাদেব গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁব। দেখতে পাচ্ছ কি শাবদা বেবিয়েছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না। সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে সেই উদয়াচলের প্রথম শিখরটির কাছে। যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছায় না, অথচ ভোরের অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক দূরে! সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি।

সন্ন্যাসী। এবারে আর দেখিতে পাই নি বলবার জো নাই।

প্রথম বালক। কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও না।

সন্ন্যাসী। ওই যে সাদা সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখছি।

সন্ন্যাসী। ওই যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী। তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে! এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন! দেখছ না বেতাসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে! গাও গান, ঠাকুর্দা, বরণের গানটা গাও!"

এমনি করিয়া মানবমন প্রকৃতির যোগে নিত্য নূতন রূপ কল্পনার ভিতর দিয়া অসীমকে নিত্য নব রূপে লাভ করিয়া চলিবে। কিন্তু যেখানে বলা হয়, অসীমকে

কেবলমাত্র বিশিষ্ট কয়েকটি রূপের অনুধ্যান ও পূজা-পদ্ধতির ভিতর দিয়া লাভ করিতে হইবে সেখানে মনের সৃষ্টি-ধর্ম্মকে, ব্যক্তির অন্তহীন বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়। 'রূপ ও অরূপ' প্রভৃতি নিবন্ধের মধ্যে তিনি বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের এই নিত্য সচলতার দিকটির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মানবিক বিচিত্রবোধের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধনের ভিতর দিয়া যে জীবন-দর্শন অসীমের সহিত যোগের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছে, রবীন্দ্র-দর্শনের এই মূল উপলব্ধিকে আশ্রয় করিরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে এই জাতীয় উপলব্ধির একটি ধারা অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছি।

জড় ও চেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে যেখানে স্বীকার করা হইয়াছে সেখানে চেতনার ক্রমিক বাধা মুক্তির উপর সেই সঙ্গে জড়ের ক্রমিক প্রভাব হ্রাসের উপর রূপের ক্রমিক উন্নততর তত্ত্বও স্বীকৃত। ঈশ্বর একমাত্র তত্ত্ব যিনি সম্পূর্ণরূপে রূপের বন্ধন মুক্ত। এই তত্ত্বে অধ্যাত্ম-সাধনার সর্ব্বশেষ লক্ষ্য হইল চেতনাকে রূপের সর্ব্বশেষ পরিণামের ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। এই পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতম হইতে উচ্চতম পর্য্যন্ত সকল রূপের জগৎ অস্বীকৃত হইয়া যায়।

মানব মন কোথাও সৌন্দর্য্য ও প্রেমের একটি কল্প-লোক সৃষ্টি করিয়া জড় ও চেতনার এই চিরন্তন দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। শেলী, কীট্স ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য-সাধনার মধ্যে এই বিশিষ্ট সাধন-রূপটি লক্ষ্য করা যায়।

শেলীর কাব্য-সাধনার এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক লিখিতেছেন,

"He believed literally that there is a spirit in Nature, and that Nature therefore is never a mere 'outward world.' When he invoked the breath of Autumn's being, he was not indulging in an empty figure. The breath ('Spiritus') that he invoked was to him as real and as awful as the Holy Ghost was to Milton. He believed that this spirit works within the world as a soul contending with obstruction and striving to penetrate and transform the whole mass. He looked forward to that far-off day when the 'plastic stress' of this power have mastered the last resistance and have become all in all, when outward nature, which now suffers with man, shall have been redeemed with him. This is the faith of the prophet, the faith held by the authors of

Isaiah and of the Revelation, though of course their Thelogies differed widely and fundamentally from Shelley's. Shelley's main passion as a poet was not, in the ordinary sense, to reform the world ; it was to create an apocalypse of the world formed and realized by Intellectual Beauty or Love."

(The case of Shelly : Frederic Pottle)

এই সাধনা জড় ও চেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে স্বীকার করিয়া অন্তর্জীবন ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনকে একমাত্র পথ স্বরূপ আশ্রয় করিয়াছে।

সাধনার আর একটি দিক হইল জড় বা রূপ-লোকের কেবল স্বীকৃতি নয় তাহার মূল্যের পরিবর্ত্তনেরও স্বীকৃতি। এই সাধনা জড় ও চেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে। মূল্যের ধীর পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া রূপ এমন একটি পরিণাম লাভ করিবে যেখানে অরূপের সহিত যোগের লীলা একান্ত অনায়াস হইবে। এই পরিণামকে রূপ ও অরূপের পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত অবস্থা বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-নাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাস ও সাধনপথ কি ছিল তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি জাতীয় জীবনে এমনকি সমগ্র মানব-সমাজকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের কোন একটি অভিপ্রায় যে ধীরে চরিতার্থতা লাভ করিতেছে রবীন্দ্র-কাব্যে এই উপলব্ধির প্রথম পরিচয় পাই খেয়া কাব্যের দুই-একটি কবিতার মধ্যে। তাহারপর হইতে তাঁহার এই বোধ ক্রমিক গভীরতা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র মানব সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করিবার ক্ষমতাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অধ্যাত্ম-সাধনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। তবে 'Old Testament'-এ ইসরাইলের সাধকদের কথা স্বাভাবিকভাবে মনে আসে। এক একটি জাতির উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া এক একটি বিশিষ্ট কোন অভিপ্রায় যে চরিতার্থ হইতেছে, কেবল তাহাই নয়, এইরূপে সমগ্র মানব-সমাজকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরীয় কোন একটি অভিপ্রায় যে ধীরে ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে এই বিশ্বাসবোধ বিশ্ব-সভ্যতায় তাঁহাদের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন, এই অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিতেছে ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া। এ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বিশ্বাস হইতে তাঁহার বিশ্বাস যথেষ্ট বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই বিশ্বাসবোধে বিশ্ব-সংস্কৃতির সমগ্র রূপটি গতি ও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে ভারতীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃতির এই সমগ্র রূপটি স্থির পিরামিড আকৃতি বিশিষ্ট একটি সুসম্পূর্ণ স্থাপত্যের মত। অসীম বা অরূপ যিনি তিনি রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে ক্রমাগত প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া বিশ্ব সংস্কৃতি স্থির কোন রূপাশ্রয়ী হইতেই পারে না।

ব্যক্তি-হৃদয়কে ঈশ্বরের বধূরূপে কল্পনা সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কোন না কোন রূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু সমগ্র জাতি বা জাতি-চিত্তকে ঈশ্বরের বধূ রূপে কল্পনা বোধ হয় ইসরাইলের মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয়তা বোধকে যেখানে অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি স্বরূপে আশ্রয় করা হইয়াছে, সেখানে ব্যক্তি-হৃদয়ের ভিতর দিয়া যেমন তেমনি জাতি-হৃদয়ের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় বোধের প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। এই বোধও অবশ্য যথেষ্ট আধুনিক। কেবল ব্যক্তি বা জাতি-চিত্তকে আশ্রয় করিয়া নয় ঈশ্বরের এই যোগের লীলা চলিতেছে সমগ্র মানব-চিত্তকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বাসবোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করিয়াছে।

বিশ্ব-প্রকৃতি ও নিখিল মানব-সংসারকে আশ্রয় করিয়া এই মর্ত্ত্য-লোক। কবির কাব্যে এই অখণ্ড মর্ত্ত্য-লোকের বিচিত্র প্রকাশ। প্রকৃতি ও মানবের অন্তহীন ভাব-ভাবনাকে তিনি তাঁহার কাব্যে রূপদান করিয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবে তাহার সমগ্র প্রকাশ তাঁহার কাব্যে ধরা পড়ে নাই। অসম্পূর্ণতার একটি দিকের কথাই তিনি বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে বলিয়াছেন।

যে লাঞ্ছিত মানব-সমাজ তাহাদের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া দূর গ্রহের মত আবর্ত্তিত হইতেছে। যাহাদের সম্পর্কে আমাদের কোন কৌতূহল নাই, কেবল এক আশ্চর্য্য মনগড়া ধারণা পোষণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি মাত্র; যাহারা বিশ্বের সকল কর্ম্মের ভার বহন করিতেছে, অথচ বিনিময়ে মনুষ্যত্বের সকল দাবী যাহাদের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত। তাহাদের হৃদয়-লোকটি যদি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারা যাইত তবে কী এক আশ্চর্য্য জগৎই না প্রকাশ হইয়া পড়িত।

এই দায়িত্ব কেবল মহৎ প্রতিভা সাপেক্ষ নয়, ইহা তাঁহারই পক্ষে সম্ভব যিনি ওই মানব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার সুখ দুঃখ বোধের মধ্যে তাহাদের সুখ দুঃখ বোধের প্রকাশ, তাঁহার সম্মান-অসম্মানে তাহাদের সম্মান-অসম্মান। যাঁহার আত্ম-প্রকাশের সংগ্রামের মধ্যে ওই সমগ্র মানব-সমাজের আত্ম-প্রকাশের সংগ্রাম, কবি তাঁহারই আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই অনাগত মহৎ প্রতিভার উদ্দেশে তিনি আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। ততদিন মহামানবের প্রকাশ অচরিতার্থ রহিয়া যাইবে, বিশ্ব-মানব-মনের প্রকাশ সীমিত কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কবির ধর্ম্ম সামগ্রিক ধর্ম্ম বলিয়া তাহা সমাজের কোন একটি অংশকে, জীবনের কোন একটি দিককে অস্বীকার করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

"এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্ব্বাক মনের।
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"

এই জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবে যে দেখা সম্ভব তাহা কবি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির এই উপলব্ধির পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার লাভ করিয়াছি। এমনি ভাবে জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত জীব-জীবনের সকল ক্রিয়াকে কোন এক উর্দ্ধতর চেতনায় অধিষ্ঠিত হইয়া কি দেখা সম্ভব? এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির আভাসও সেই সঙ্গে লাভ করা যায়। হিন্দু যোগ শাস্ত্র বলেন, জীবের দিব্য-চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করিবার পরেও জাগতিক ক্রিয়া কিছুকাল অব্যাহত থাকিতে পারে, যে-পর্য্যন্ত না পূর্ব্ব এবং ইহ জীবনের কর্ম্মফল সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়। একটি উপমার সহায়তায় এই তত্ত্বটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্রুত ধাবমান রথ হইতে চাকা খুলিয়া গেলেও তাহার মধ্যে রথের গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়া থাকিবার জন্য তাহা যেমন অনেকটা দূর পর্য্যন্ত আপনি আবর্ত্তিত হইতে থাকে, তেমনি মুক্তি লাভের পরেও কর্ম্মফল নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন-ক্রিয়া চলিতে থাকে। যোগ শাস্ত্রের এই পরিপূর্ণ নিরাসক্ত অনুভূতির কথা রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন।

"আমর আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে।"

কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে তাঁহার এই উপলব্ধির পার্থক্য এই যে যোগশাস্ত্র যেখানে বলিতেছেন, যে মুক্ত অবস্থা লাভের পর একটি পরিণামে জীব সত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে, রবীন্দ্রনাথ সেই সত্তার বিলুপ্তিকে কোন পরিণামে স্বীকার করিতে চান নাই। তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া রূপের (দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট সত্তা) রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাহা না হইলে রূপ ও অরূপের রহস্য ভেদ যে হয় না। তিনি যোগের মুক্তি তত্ত্বকে যেমন একদিকে স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি চিরন্তন রূপের লীলাকেও স্বীকার করিয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যে যোগ কোন না কোন স্বরূপে আছেই। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া এই যোগের রহস্য ভেদের সাধনা করিয়াছেন।

"এই বাহ্য আবরণ জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আসি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।"

বিশ্বের সীমিত বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা বারংবার সকল সীমার অতীত সত্তার আভাস লাভ করিয়াছে। মৃত্যুতে সীমার সকল বোধ লুপ্ত হয়; কিন্তু এই দুর্লভ অনুভূতির মুহূর্ত্তগুলি অক্ষয় হইয়া থাকে, অজ্ঞেয় যাত্রা পথের এক মাত্র পাথেয়, অনির্ব্বাণ আলোক বর্ত্তিকা।

"সে পথের পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে
সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।"

সেই অপর সত্তা, যাহা অসীম বা অরূপ, লাভের মধ্যে জীবনের সর্ব্বশেষ সার্থকতা।

"বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,—"

একথা তিনি নানা ভাবে বারংবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন শক্তি, উপকরণ, ঐশ্বর্য্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় যে জাতির মধ্যে সমাজে অসাম্য যত

কম সে জাতি তত সভ্য, উন্নত ; অন্যদিকে অসাম্য বাড়িতে বাড়িতে জাতিকে এমন এক পরিণামের সম্মুখীন করে যেখানে ধর্ম্ম জাতির একেবারে মর্ম্মস্থলে দারুণ আঘাত করে। কত জাত এইরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

"এক পাখা শীর্ণ যে পাখীর
ঝড়ের সঙ্কট দিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধূলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধিব কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।"

মৃত্যুর পরপারবর্ত্তী সেই চিরজ্যোতির্ম্ময় অমৃত লোকটিকে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা।

"হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।"

বর্ত্তমান কাব্যে একটি কবিতা আছে, যেখানে জীবনের নিয়তিকে কোন তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা নাই। জীবনের নিয়তিকে কেবলমাত্র জীবনের স্বরূপে মানিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা।

ধরিত্রীর বুকে ফুল যেমন করিয়া ধীরে বিকশিত হয়, তাহার পর আপনার সৌন্দর্য্য সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া একদিন নিঃশেষে ঝরিয়া যায়, ঝরিবার কালেও শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত সৌরভ বিকীর্ণ করিতে কার্পণ্য করে না, মানব জীবনকেও তেমনি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

আপন হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য সম্পদ দিয়া এই ধরিত্রীকে যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন কেবল ভালোবাসিয়া লওয়া, তাহারপর মৃত্যুতে মানব ভাগ্যকে অক্লিষ্ট অন্তরে বরণ করিয়া লওয়া।

ইহাকে আরো একটু তত্ত্বান্বিত করিয়া বলা যায়, যে-ধরিত্রী ফুলের মধ্যে অমন অপরূপ সৌন্দর্য্য সৌরভের প্রকাশ ঘটাইয়াছে, স্বাভাবিক নিয়মে ধরিত্রী যেদিন একে একে তাহার সব দান ফিরাইয়া লয়, সেদিন ফুল তাহাকে আসক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া আমার বলিয়া ধরিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে না।

মানব জীবনে ইহাকেই সত্য করিয়া তুলিতে হয়। ধরিত্রীর অন্তহীন প্রাণের যোগে এই প্রাণ সৃষ্ট। প্রাণের যোগ জীবনে যত গভীর হয়, অন্তরে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সম্পদ ততই অফুরাণ হইয়া উঠে। তাহারপর ধরিত্রী যদি প্রাণের যোগ ধীরে ধীরে ছিন্ন করিয়া সকল সম্পদ একে একে ছিনাইয়া লয়, তবে তাহাকে আমার বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার কি আছে। তাহাতে আসক্তির নিদারুণ বিকৃতিই শুধু নামে। মানব ভাগ্যের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম শুধু ব্যর্থ। তাই মৃত্যু যেদিন আসিবে সেদিন কবি যেন হাসিমুখে ধরিত্রীর দেওয়া সম্পদকে আপন হস্তে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারেন।

> "ফুলের জগতে
> মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি,
> শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের
> পানে অসুন্দর।"

শেষ লেখা

মর্ত্ত্যের রূপের মধ্যে কবি ক্ষণে ক্ষণে যে অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করিয়াছিলেন, সেই যে অধরা অনির্ব্বচনীয়, আজ সকল রূপের উর্দ্ধে উঠিয়া তাহাতে নিঃসংশয়ে স্থিতি লাভ করিবার ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে।

> "হয় যেন মর্ত্তের বন্ধন ক্ষয়,
> বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
> পায় অন্তর নির্ভয় পরিচয়
> মহা অজানার।"

এই প্রার্থনার মধ্যে মর্ত্ত্য বা রূপের সত্য মূল্য অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ নাই। রূপকে আশ্রয় করিয়া তিনি যে সমগ্র জীবন ধরিয়া অরূপের সহিত লীলা করিয়াছেন, এইরূপে মৃত্যুর সকল ভয় মুক্ত যে প্রকাশ, তাহাও মৃত্যুর মুখামুখি হইতে ভাজিয়া পড়িয়াছে। একটা মহা অজ্ঞাত লোকের দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার ইতিপূর্ব্বের সকল লীলা তত্ত্ব যে ধূলিসাৎ হইয়া

গিয়াছে তাহাও অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কাব্যেই তাহার নিঃসংশয় পরিচয় আছে।

প্রেমে মানুষ এমন কিছু আস্বাদ করে যাহা মৃত্যুর অতীত। তাহা মৃত্যুর অধিকার লোকের বাহিরের সম্পদ। এই জীবন ও জগৎ যে স্বরূপত মিথ্যা, তাহা যে কেবল এক মহৎ বঞ্চনা, এক সুবৃহৎ পরিহাস, তাহা সত্য নয়। বিশ্বের সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। সত্তা মাত্রেরই এই ধর্ম্ম। জীবন মৃত্যুতে একান্তরূপে বিনষ্ট হয় একথা তাই কখনই সত্য হইতে পারে না।

"সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্ত্ত বেগে
সেই তো কালের ধর্ম্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্ত্তনে,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে—"

মায়াবাদীরা বলেন, একটি অস্তিত্বের প্রত্যয় বা অনুভূতি যে আমাদের আছে তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু প্রত্যয় বা অনুভূতি থাকিলেই বাহিরে তাহার অস্তিত্ব থাকিবে এমন কোন প্রমাণ নাই। আমি আছি সত্য এবং এই অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া আমি এই দেশ কালের বোধ (ইহাও বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগে সৃষ্ট এক নূতন প্রত্যয়) গড়িয়া তুলিয়া তাহাতে এই সকল প্রত্যয়কে বিন্যস্ত করিয়া এই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিযাছি। ইহার আমি-নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নাই। আমার চেতনা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও লুপ্ত হইয়া যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই নিঃসংশয় সত্যোপলব্ধি।

"বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষি সেই ;
পরম আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।"

বিশ্বের অস্তিত্বের সত্যতা যে আমির চেতনা যোগে, সে আমির সত্যতা আবার পরম আমির সত্যে। মায়াবাদীরা বলেন, মনের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিলে, অর্থাৎ 'পরম আমি'কে লাভ করিলে 'আছে' বা রূপের এই বিচিত্র তত্ত্ব মুহূর্ত্তে ছায়া হইয়া মিলাইয়া যায়। এই উপলব্ধিও আংশিক সত্য। পূর্ণ উপলব্ধিতে রূপ ও অরূপ

শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব। ইহাকেই তিনি বলিয়াছিলেন, 'আছি আর আছে অন্তহীন আদি প্রহেলিকা'। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনে 'আমি', 'বিশ্ব আমি' ও 'পরম আমি' এই তিন তত্ত্ব পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

অবতার অর্থ অবতরণ। এক একটি সময় আসে যখন পূর্ণ স্বরূপ আপনার পূর্ণ স্বরূপত্ব ও চৈতন্য লইয়া মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন। এমনি বিশ্বাস প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে কোন না কোন রূপে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ মহামানব বলিতে এই অবতার তত্ত্ব বুঝিতেন না। তিনি মহাপুরুষদের কথা বলিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতর দিয়া মর্ত্ত্যের মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্বের শুধু নয়, ঈশ্বরীয় বিভূতির নানা আভাস লাভ করিতে পারেন, যাঁহাদের ভিতর দিয়া সমগ্র মনুষ্য-সভ্যতা উন্নততর পরিণাম লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ অভি-ব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁহার পক্ষে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশে বিশ্বাস করা সম্ভব হয় নাই। সমগ্র মানব-সমাজ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে লাভ করিয়া চলিয়াছে। তিনি যেখানে বলিয়াছেন, 'ঐ মহামানব আসে', সেখানে সমগ্র মনুষ্য সমাজের মধ্যে অভাবনীয় সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের অনাস্বাদিত সামর্থ্য ও শক্তির, সৃষ্টি-শক্তির পরমাশ্চর্য্য প্রকাশের কথাই বলিয়াছেন। সমগ্র মনুষ্য-সমাজকে আশ্রয় করিয়া যে মনুষ্যত্বের ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে, মহামানব বন্দনা তাহারই সম্মিলিত রূপের বন্দনা সমগ্র 'মানব-অভ্যুদয়ে'র বন্দনা।

স্রষ্টা আপন সৃষ্ট রূপের ভিতর দিয়া আপনার অন্তর রূপকেই নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেন। এই রূপে সমগ্র জীবন-ব্যাপী সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া স্রষ্টা আপনার সত্য পরিচয়টিকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হন। সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আত্মপরিচয় লাভটিই বড় কথা। মৃত্যুতে সে সৃষ্টিরূপের কী পরিণাম ঘটিবে সে চিন্তা নিরর্থক। কালে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সব কি বিনষ্ট হইয়া যায়, প্রকাশ রূপের কিছুই কি অবশেষ থাকে না, যাহা ধ্রুবতারকার অম্লান জ্যোতিতে চির সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে?

"জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে।

আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছু বা যায় মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

কবির জীবনে মনের ভাবনাকে সার্থক বাণী-রূপ দান করিবার সামর্থ্য একান্তরূপে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার জন্য কবির কী অপরিসীম গ্লানিবোধ। কিন্তু তাহার চেয়েও গভীর বেদনার কথা এই যে, কবি যে দিব্য-স্বপ্নকে, যে অমর্ত্ত্যরূপকে, অলৌকিক ভাব-ভাবনাকে একদিন সর্থক রূপদান করিয়াছিলেন, তাহা ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া এককালে নিঃশেষে হারাইয়া যাইবে ; কিন্তু সেই স্বপ্ন, সেই রূপ, সেই সকল ভাব-ভাবনা যে কোন স্বরূপে রহিয়া যায় এসম্পর্কে আজও কবির মনে সংশয় নাই।

"বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্ব্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্ত পটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি
তোমারে বাহন রূপে
ডেকেছিল,
চিত্তশালে যত্নে রেখেছিল,
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি—
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্য তার দিক বিহীন পথে
তুলি নিল বাণী হীন রথে।"

জীবন ও জগৎ পর্য্যাপ্ত করিয়া এক অখণ্ড সত্য বিরাজিত। সকল প্রয়াস, সকল দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষ সেই সত্যকেই নানাভাবে লাভ করে। সমগ্র জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন তপশ্চর্য্যা, মৃত্যুতে তাহারই চরম মূল্য দান।

"আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে ;"

অধ্যাত্ম বিচিত্র তত্ত্ব অপরোক্ষ করা সত্ত্বেও কবির নিকট সত্তা বা রূপের রহস্য কোন কালে ঘুচে নাই। এই সম্পর্কে বিস্ময়বোধ কবির অন্তরে চিরকাল রহিয়া গিয়াছিল। সকল তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া কেবল অসীম বা অরূপ লাভের জন্য যে সাধনা তাহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল না। আত্ম-তত্ত্বে এই রূপের জন্য তো কোন সান্ত্বনা নাই। তাহা তাই পূর্ণ সত্য নহে। রূপ ও অরূপ উভয়কে লইয়া পূর্ণ সত্য রূপের প্রকাশ। পূর্ণতার সাধনায় তাই উভয়ের স্বীকৃতি প্রয়োজন।

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
*　　　*
দিবসের শেষ সূর্য্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগর তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।"

কবি পরমের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই মন্তব্য করিয়া অনেকে কবির এই কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া আত্মমত সমর্থন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাহা যে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধির স্বরূপ আদৌ না জানিবার ফল এক্ষেত্রে কেবল তাহাই মাত্র আমরা বলিতে পারি।

মৃত্যুতে জীবনের কি পরিণাম ঘটে, তাহা লইয়া আমাদের অন্তরে জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কত-না সংশয়ের জাল বোনা হইতে থাকে ; কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর স্পর্শে এই সকল সংশয়ের জাল ছিন্ন হইয়া যায়। মৃত্যু এই ভীতির মুখোশ দিয়া জীবন ও জগতের অমৃত রূপটিকে কেবল আড়াল করিয়া রাখে মাত্র।

"ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।"

বাহিরে রূপের জগৎ প্রতি মুহূর্তে আমাদের চেতনাকে বহির্মুখী করিয়া দিতেছে, সুখ-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য-প্রতিপত্তির প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিতেছে। বাহিরের কোন কিছুর সহায়তায় পরম সত্যকে লাভ করিতে পারা যায় না বলিয়া বহির্জগৎ 'ছলনাময়ী', 'মায়া' হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা প্রতি মুহূর্তের এই প্রলোভনকে জয় করিয়া উঠিয়া কেবল অন্তর্জগৎকে আশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহারাই পরিণামে পরম সত্য লাভ করিয়া যান। সুখ-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য-প্রতিপত্তির মধ্যবর্ত্তী হইয়া মানুষ ইঁহাদের বঞ্চিত বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ করে, কিন্তু তাহারাই যে জীবনে সর্ব্বাধিক বঞ্চনা লাভ করিয়া যায় তাহা তাহারা বোধ করিতে পারে না। তথাকথিত বঞ্চিত বিড়ম্বিত এই মানুষগুলিই অন্তরের জ্যোতিপথ ধরিয়া মৃত্যুর অন্ধকার-লোক পার হইয়া যায়। সৃষ্টি মানব-মনকে বাহিরের দিকে নিয়ত আকর্ষণ করে বলিয়া মায়া।

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।"

মহত্ত্বের পরীক্ষা এই ছলনা জয় করিয়া উঠিবার জন্য।

"এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত।"

কেবলমাত্র অন্তরের পথে পরম সত্যের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। অন্তর্জগৎকে আশ্রয় করিবার মধ্যে এই সকল মানুষের অন্তরে কেমন করিয়া নিঃসংশয় বিশ্বাস গড়িয়া উঠে। এই 'সহজ বিশ্বাস'ই ভক্তি।

"সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চির স্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে সমুজ্জ্বল।"

বহির্জগতের ঐশ্বর্য্য বঞ্চনায়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীনতায় লোকে তাঁহাদের জীবনকে বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ করে, কিন্তু পরম সম্পদকে তাঁহারাই কেবল লাভ করিতে পারেন।

"লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।"